
২৯ জন খুনির কাহিনি
সম্পাদনা
অনীশ দেব
খুনির রং

খুনির রং



খুনির রং

সম্পাদনা

অনীশ দেব

সাহিত্যম্ ॥ কলকাতা

KHUNIR RANG
Edited By ANISH DEB
SAHITYAM
18B Shyamacharan Dey Street
Kolkata 700 073
(033) 2241 9238, (033) 2241 4003
Fax : (033) 2241-3338
E-mail : nirmalsahityam@gmail.com
Web : www.nirmalsahityam.com

প্রকাশক :
নির্মলকুমার সাহা
সাহিত্যম
১৮ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রাপ্তিস্থান :
নির্মল বুক এজেন্সি
২৪ বি কলেজ রো
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক :
লোকনাথ বাইন্ডিং অ্যান্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস
কসবা ইন্ডাসট্রিয়াল এস্টেট
কলকাতা—৭০০১০৮

বর্ণগ্রন্থন :
অনুপম ঘোষ
পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ :
সৌরীশ মিত্র

অলংকরণ :
রঞ্জন দত্ত

প্রথম প্রকাশ :

জানুয়ারি ২০১৬
মুদ্রণসংখ্যা : ১১০০ কপি

রহস্যসন্ধানী পাঠকদের

এক মিনিট, আপনাকে বলছি

বাংলা সাহিত্যে খুনচর্চা অথবা খুনিচর্চা প্রায় ১২০ বছরের পুরোনো। একথা বলছি তথাকথিত ক্রাইমকাহিনি কিংবা গোয়েন্দাকাহিনির কথা মনে রেখে—যেসব কাহিনিতে খুন অথবা খুনির একটা মুখ্য ভূমিকা আছে। ব্যাপারটা 'ট্রু ক্রাইম স্টোরিজ'—বাংলায় 'সত্যকাহিনি' তকমা এঁটে যেসব কাহিনিকে বিপণন করা হয়—ধরনের কাহিনি দিয়ে শুরু হয়েছিল। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'দারোগার দপ্তর' কিংবা বাঁকাউল্লার বিবরণীতে 'বাঁকাউল্লার দপ্তর' সেই অর্থে বাংলা ক্রাইমকাহিনির সূচনার মুখ।

কিন্তু মূলধারার সাহিত্যেও তো ব্যবহার হয়েছে খুন অথবা খুনির। যেমন শেক্সপিয়ারের 'ম্যাকবেথ', রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি সমর্পণ', আলবেয়ার কামুর নাটক 'ক্রস পারপাস', অথবা তুলনায় আধুনিক সময়ের লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প 'মটর মাস্টারের কৃতজ্ঞতা' ইত্যাদি। এরকম নজির আরও বহু রয়েছে।

সাহিত্য থেকে যদি এবার জীবনের দিকে তাকাই তা হলে দেখা যায়, প্রায় প্রতিদিনই আমরা টিভি অথবা খবরের কাগজের মাধ্যমে খুনের ঘটনার 'মুখোমুখি' হই। সেইসব খুনের আড়ালে রয়েছে একজন অথবা কয়েকজন খুনি। আর সেইসব খুনির আড়ালে রয়েছে খুনির জটিল বিকৃত মনস্তত্ত্ব। এই মনস্তত্ত্বের স্বরূপ এখনও পর্যন্ত অনেকটাই মনোবিদদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

খুন যেমন বহু ধরনের হয়, তেমনই খুনিও। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে খুনের মোটিভও হয় নানান রকম। সেই কারণেই খুন, খুনি ইত্যাদি একটি বহুমাত্রিক বিষয়। তা ছাড়া খুনি কখনও থাকে প্রত্যক্ষে, কখনও বা পরোক্ষে।

এই বহুমাত্রিক বিষয়টির অল্পবিস্তর আভাস দেওয়ার জন্যই এই সংকলনের আয়োজন। মোটামুটিভাবে গল্পের প্রকাশকালের সময় অনুসারে ১৯৫৮ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত ২৯টি গল্প সাজিয়ে দিয়েছি আপনার জন্য। তার মধ্যে ২০০০ সাল পর্যন্ত, মানে, গত শতকের গল্প রয়েছে ৮টি। বাকি ২১টি গল্প একুশ শতকের। তবে প্রতিটি গল্পেই রয়েছে খুন, খুনি অথবা খুনির মনস্তত্ত্ব।

সংকলনের লেখক তালিকা হয়তো আপনাকে একটু অবাক করলেও করতে পারে। কারণ, সুবিখ্যাত প্রথিতযশা লেখকদের প্রায় কেউই হাজির নেই লেখকসূচিতে। এর কারণ, সংকলনটিকে আমি 'চরিত্রে' আধুনিক করতে চেয়েছি। আর চেয়েছি খুন কিংবা খুনিদের বহুমুখী বৈচিত্র্য তুলে ধরতে। এ ছাড়া আরও চেয়েছি, এ সময়ের যেসব লেখক তাঁদের নিত্যনতুন গল্পে আমাকে চমকে দিচ্ছেন —চমকে দিচ্ছেন তাঁদের প্লট, ভাষা এবং স্টাইল দিয়ে—তাঁদের লেখা আপনার কাছে উপহার হিসেবে সাজিয়ে দিতে।

এই সংকলেনর লেখকদের মোট চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় : অপরিচিত, স্বল্প পরিচিত, পরিচিত এবং সুপরিচিত। কিন্তু তাঁদের লেখা গল্পগুলোর শ্রেণি একটাই : দারুণ!

দু—চারটি ব্যতিক্রম ছাড়া সংকলনের প্রায় সবক'টি গল্পই এমন সব পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল যেগুলোকে আমরা বেশিরভাগ পাঠকই নামে চিনি না। আর কয়েকটি ক্ষেত্রে লেখকের কোনও গল্প সংকলন থেকে নির্বাচিত গল্পটি সংগ্রহ করেছি।

সবশেষে বলি চারটি গল্পের কথা।

সংকলনের শেষ চারটি গল্প লিখেছেন পিনাকী মুখোপাধ্যায়, জয়দীপ চক্রবর্তী, সুজন ভট্টাচার্য ও দেবার্চন বসু। হয়তো আপনার কাছে এই চারটি নাম নতুন। এই চারজন লেখক নতুন গল্প লিখে দিয়েছেন এই সংকলনের জন্য। এঁদের গল্প আমাকে এতই খুশি করেছে যে, সংকলনে এই চারজনের গল্প প্রকাশ করতে

পেরে সম্পাদক হিসেবে আমি গর্বিত। আমার মনে হয়েছে, বাংলা সাহিত্যের ময়দানে এই চারজন অনেক লম্বা রেসের ঘোড়া। এই চারজনকে আগাম অভিনন্দন জানাই।

কিন্তু এই সংকলনের সবক'টি গল্পেরই গুণমান বিচারের সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছেন, হে পাঠক, আপনি। আপনার বিচারই শেষ কথা। শুধু গল্পগুলোর নয়, সম্পাদক হিসেবে আমি ব্যর্থ না অব্যর্থ, সে—বিচারও করবেন আপনি। শুধুই আপনি। তাই আপনার সাধুবাদ কিংবা বকুনির অপেক্ষায় রইলাম।

অনীশ দেব

২৩ জানুয়ারি, ২০১৬

ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা ৭০০০০৯
anishdeb2000@yahoo.co.in

সূচি

দীপান্বিতা রায়　　জীবনের রংমশাল

জয়ন্ত দে　　গোলা

অনন্যা দাশ　　মরীচিকা

যশোধরা রায়চৌধুরী　　আততায়ী

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত　　প্রস্তর ঘাতক

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়　　হিসেবে কিছু ভুল ছিল

পিনাকী মুখোপাধ্যায়　　ঋতির উপহার

জয়দীপ চক্রবর্তী　　পালটানো যায় না

সুজন ভট্টাচার্য　　চিত্রনাট্য

দেবার্চন বসু　　ব্ল্যাক উইডো

নীল রুমাল

প্রণব রায়



বাড়িটা শহরের একটেরে— সীমানার বাইরেও বলা যায় । হঠাৎ দেখলে একটা সাবেককেলে গির্জা বলে মনে হয় । খুঁজে খুঁজে এই বাড়িটাতে নিশীথ তার স্টুডিও করেছে ।

শহরের কলরব-ব্যস্ততার থেকে দূরে, একান্তে বসে কাজ-কারবারের পক্ষে এই প্রাচীন নিরিবিলি বাড়িটা নাকি চমৎকার । তাছাড়া আশেপাশে একটা জংলা আভাসও আছে । বাড়িটার চারপাশ ঘিরে অনেকটা জমি — সাবু আর বড় বড় দেবদারু গাছে ভর্তি । পিছন দিকে বড় গোছের একটা খালও আছে । এককালে নাকি এই খালপথে বড় বড় ছিপ অন্ধকার রাত্রে নিঃশব্দ কুমিরের মতো ভেসে চলত শিকারের সন্ধানে । শোনা যায়, তারা নাকি চট্টগ্রাম থেকে ছটকে-আসা জলদস্যুর দল । কিন্তু সে বহু বছর আগেকার কথা ।

এখন হপ্তাহে একবার করে গঞ্জ-ফেরত ব্যবসায়ীদের নৌকো ছাড়া খালের জলে আর কিছু দেখা যায় না ।

নিশীথ কিন্তু এই পাণ্ডববর্জিত জায়গাতেই একটা স্টুডিও খুলে বসেছে । নামকরা শিল্পী সে— তৈলচিত্র আর প্ল্যাস্টারের মূর্তি গড়ায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে তার । অদ্ভুত প্রকৃতির লোক এই নিশীথ । তার বহু ছবি, বহু মূর্তি দেশ-বিদেশে প্রদর্শনীতে পুরস্কার লাভ করেছে, প্রচুর দামে বিক্রি হয়েছে । শিল্প-রসিক বহু নরনারী তার শিল্পকে দেখেছে, তারিফ করেছে, কিন্তু শিল্পীকে বিশেষ কেউই দেখতে পায়নি । কত অভিনন্দন-সভা থেকে আমন্ত্রণ এসেছে—নিশীথ সাড়া দেয়নি, কত অনুরাগীর আসরে উপস্থিত হওয়ার জন্যে অনুরোধ এসেছে— অসুস্থতার অজুহাতে সে উপস্থিত হয়নি । এমনকী নিজের ছবি একখানা— তা-ও সে কোনোদিন আঁকেনি ।

নিশীথের এই আত্মগোপনের রহস্য আর কেউ না জানলেও একটি মানুষ জানত— সে ‘রোমাঞ্চ’র বিখ্যাত গোয়েন্দা প্রতুল লাহিড়ী । পাঠক-পাঠিকারা এতক্ষণে নিশ্চয়ই অপরাধের গন্ধ পেয়ে সচকিত হয়ে উঠেছেন । কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, নিশীথের আত্মগোপন-রহস্যের মধ্যে অপরাধের লেশমাত্র গন্ধ নেই । আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই : নিশীথ লোকটা দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত— শুধু কুৎসিত নয়, একেবারে হত-কুৎসিত । মুখখানার গঠন অনেকটা ‘এপ ম্যান’ বা গরিলার মতন । হাত দুটো অস্বাভাবিক দীর্ঘ এবং রোমশ । সারা জীবন যে সুন্দরের পুজো করে আসছে, তার প্রতি সৌন্দর্য-দেবতার কেন যে এতখানি অকরুণ উপেক্ষা— তা বোধ করি ভগবানই জানেন । কিন্তু নিজের কদাকার চেহারার জন্যে নিশীথের লজ্জা বেদনা অভিমানের অন্ত ছিল না । তার শিল্পকলার নিদর্শন দেখে কত অনুরাগিণী নারী অনুরাগপত্র পাঠিয়ে তার দর্শন-প্রার্থিনী হয়েছে । প্রথম প্রথমদু-একজনকে সে আসতেও লিখেছিল । কিন্তু দেখা হলে কেউ-বা তাকে মনে করেছিল ভৃত্য, কেউ-বা আতঙ্কে চিৎকার করে পালিয়ে

গিয়েছিল । সেই থেকে নিশীথ লোকচক্ষুর অন্তরালে এই নির্জনবাস বেছে নিয়েছে । সেই থেকেই বিখ্যাত শিল্পী নিশীথের আত্মগোপনের পালা শুরু । প্রতুল তার বাল্যবন্ধু । বন্ধুর জীবনের এই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি তার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল । তাই এই নির্জনবাসের মধ্যে প্রতুলই নিশীথের একমাত্র অবসর-সঙ্গী ।

সেদিনও সন্ধ্যার পর প্রতুল এসেছিল স্টুডিওতে । বাইরে শীতের রাত কুয়াশায় থমথম করছে । মাঝে মাঝে ঝোড়ো বাতাসও দিচ্ছে । দেবদারু-শাখাপুঞ্জের ভেতর দিয়ে তার অতৃপ্ত আত্মার আক্ষেপের মতো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ।

পাইপটা আর একবার ধরিয়ে প্রতুল বলল, হুঁ— কী বলছিলে, স্বপ্নের কথা! মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষ যে স্বপ্ন দেখে, তার সঙ্গে অবচেতন মনের সংযোগ আছে । কথাটা সোজা করে বলি! মানুষের গোপন ইচ্ছা, গোপন বাসনা অনেক সময় তার স্বপ্নের রূপ ধরে ওঠে । যেমন ধরো, তুমি গায়ক নও, অথচ গান অত্যন্ত ভালোবাসো, গান গাইবার একটা গুপ্ত ইচ্ছাও আছে প্রবল । তুমি কোনোদিন স্বপ্নে দেখতে পারো যে, বিরাট সভায় বসে গান গাইছ— লোকে তোমার অজস্র প্রশংসা করছে । অবশ্য মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, সব জিনিসেরই ব্যাখ্যা আছে ।

থাক তোমার মনোবিজ্ঞানীদের কথা । স্বপ্নের মাঝে এমন কিছুও ঘটে, বিজ্ঞান দিয়ে যার-ব্যাখ্যা চলে না, যা নিতান্ত অস্বাভাবিক ।— একটা অসমাপ্ত নারীমূর্তি নিয়ে নিশীথ কাজ করছিল প্রতুলের দিকে পিছন ফিরে । পিছন ফিরেই সে এই কথাগুলো বলল ।

প্রতুল মৃদু হাসল ।

গোয়েন্দাগিরি করতে করতে শেষ অবধি এই জেনেছি যে, অস্বাভাবিক বলে দুনিয়ায় কিছুই নেই । লোকের মুখে-মুখে শুনে বা খবরের কাগজের রিপোর্টে পড়ে যে ঘটনাটা অস্বাভাবিক বলে মনে হয়, বিশেষ পরিবেশ বা অবস্থার মাঝে তাকে দেখলে নিতান্ত স্বাভাবিক বলেই মনে হয় । কেননা, জীবনে ভালোটাও যেমন স্বাভাবিক, মন্দটাও ঠিক ততখানি স্বাভাবিক নিশীথ!

কিন্তু স্বপ্ন?— নিশীথের হাতের কাজ হঠাৎ থেমে গেল । স্বপ্ন তো ঘটনা নয়, স্বপ্ন জিনিসটাই অবাস্তব । অবাস্তবের ব্যাখ্যা তুমি কী ক'রে করবে প্রতুল?

আগে স্বপ্ন-কাহিনিটা শুনি, তারপর নাহয় চেষ্টা করা যাবে ব্যাখ্যা করবার ।

নিশীথ আবার কাজে হাত লাগিয়ে বলল, তুমি যুক্তি-তর্কবাগীশ মানুষ, তোমার কাছে আমার এই স্বপ্ন-কাহিনি হয়তো আষাঢ়ে গল্পের মতো মনে হবে ।

মন্দ কী!— সোফার হাতলের ওপর পা-দুটো তুলে দিয়ে, পাইপে আরাম করে একটা টান দিয়ে প্রতুল বলল, শীতের এই ঠান্ডা রাতে আষাঢ়ে গল্প জমবে ভালো । আজকের মতো কাজ বন্ধ করে গল্প শুরু করে দাও!

নিশীথ বলল, ভেবেছিলাম আমার স্বপ্নের কথা কোনোদিন কাউকে বলব না । কারণ, এ কাহিনি যত মধুর তত ভয়ংকর । সবচেয়ে সেরা মদ আর সবচেয়ে উগ্র বিষ একসঙ্গে মিশিয়ে খেলে যা হয়, সে-স্বপ্নের কথা মনে পড়লে আমার অবস্থাও হয় ঠিক তেমনি । সে যে কী অদ্ভুত অনুভূতি, তা তোমায় বোঝাতে পারব না প্রতুল । আনন্দ যে এত যন্ত্রণাদায়ক হয়, আগে তা জানতাম না । বলি শোনো প্রতুল ।

হাতের যন্ত্র ফেলে দিয়ে নিশীথ এতক্ষণে ধীরে ধীরে প্রতুলের দিকে মুখ ফেরাল । এতক্ষণ যে ঝোলানো আলোটার নীচে নিশীথ কাজ করছিল, সেটা এখন তার পেছনে । তার পরিবর্তে নিশীথের মুখে পড়েছে— প্রতুলের সামনে টেবিলের ওপর যে রিডিং-ল্যাম্প, তারই মৃদু আলো । সে-আলোটা নিচু দিক থেকে মুখে পড়ায়, তার গরিলাকৃতি মুখখানা যেন সত্যিই পশুর মতো বীভৎস হয়ে উঠেছে ।

প্রতুল স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল । বাইরে শীতের ঝড়ো হাওয়ার আর্তনাদ একটা খোলা জানলা দিয়ে ঘরে আসছে । দুলছে ঘরের ঝোলানো আলোটা, আর আলো-আঁধারির বিচিত্র ঢেউ খেলে যাচ্ছে দেওয়ালে-দেওয়ালে ।

আজও সেই স্বপ্নের কথা মনে হলে আমি যেন কীরকম হয়ে যাই প্রতুল। কেমন একটা অস্থির আতঙ্ক আমায় যেন পাগল করে দেয়। মনে হয়, সারাজীবন বুঝি এ-যন্ত্রণা ভোগ করে কাটাতে হবে।

বলতে বলতে নিশীথ এগিয়ে এসে প্রতুলের সামনে বসল। ধীরে ধীরে তার মুখের পাশব-ভাব বদলে গিয়ে প্রশান্ত হয়ে এল। চোখ-দুটো আস্তে আস্তে এল বুজে। হাত দুটো জোড় হয়ে বুকের কাছে উঠে এল। নিশীথ বলতে লাগল, কিন্তু অসীম করুণা ভগবানের, আমার এ ভাব কয়েক মুহূর্তের বেশি থাকে না। যখন মনে পড়ে যায়, স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই, তখনই নিশ্চিন্ত প্রশান্তিতে মন আবার সুস্থ হয়ে ওঠে।

প্রতুলের পাইপটা নিভে গিয়েছিল। কিন্তু তার স্থির দৃষ্টি তখনও নিশীথের মুখের ওপর। ছাই ঝাড়বার জন্যে পাইপটা ঠুকতেই নিশীথ যেন ধ্যান থেকে জেগে উঠল।

মৃদু গম্ভীর গলায় ধীরে ধীরে সে বলতে শুরু করল: ঠিক এক বছর আগেকার কথা। তারিখটা ছিল আজকেরই মতন ১৩ ডিসেম্বর আর রাতটাও ছিল ঠিক এমনি ঝড়ো, কনকনে। পরের দিনই একখানা পোর্ট্রেট সম্পূর্ণ তৈরি করবার কথা ছিল। কেননা, সেখানা জাহাজে করে বিদেশে যাবে। তাই স্টুডিওতে সারাদিন কাজ করে ছবিখানা যখন শেষ করলাম, তখন সন্ধে উৎরে গেছে। সারাদিন একনাগারে চোদ্দো-পনেরো ঘণ্টা কাজ করে ক্লান্তিতে শরীর যেন ভেঙে পড়েছিল। সেদিন তুমিও আসোনি প্রতুল। খানিকক্ষণ গল্প করে কাটাবারও সময় ছিল না তখন। ভাবলাম, আজ সকাল-সকাল বিশ্রাম নেব। ক্লান্তিতে বাড়ি ফেরারও উৎসাহ ছিল না— যদিও বাড়ি আমার স্টুডিও থেকে আধ মাইল দূরে। নেপালি চাকরটাকে এক কাপ কফি আর দু'টুকরো রুটি দিতে বলে রাত্তিরের মতো তাকে ছুটি দিয়ে দিলাম। স্টুডিওর চাবি আমাকে দিয়ে সে তার ঘরে চলে গেল। তুমি জানো, এ হলটার পশ্চিম দিকে যে ছোট ঘরখানা, সেখানে একখানা লোহার খাটে আমার বিছানা সবসময় পাতা থাকে— কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু বিশ্রাম নেবার জন্যে। কফি আর রুটি খেয়ে কোনোরকমে বিছানায় গিয়ে শুয়ে রইলাম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, ঘুম ভেঙে গেল দেবদারুর শাখায় শাখায় ঝড়ো হাওয়া আর কাতরানির শব্দে। বাইরে শীতের রাত ঘন কুয়াশায় ঠিক এমনি থমথম করছে।

ঘুম ভেঙে যেতে ইচ্ছে হল, পোর্ট্রেটটাকে একবার ভালো করে দেখি, যদি আর এক-আধটুকু তুলির টান দরকার হয়। আমার শোবার ঘরের মোটা পর্দা ঠেলে এই হলের মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। হলের ঝোলানো বাতিটা তখনও জ্বলছিল— বোধ হয় নিভিয়ে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। সেই আলোয় এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম— আলোর সামনে হলের মাঝখানে পোর্ট্রেটটা ইজেলের ওপর দাঁড় করানো। আর তারই সামনে আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। ঘন নীল রঙের সিল্কের পোশাক তার পরনে। শুধু অনাবৃত কাঁধ দুটি শঙ্খের মতো সাদা। মসৃণ কালো চুলগুলি কাঁধ পেরিয়ে আর নীচে নামেনি। বোঝা গেল, এদেশের মেয়ে নয়— বিদেশিনী। পাশের সোফায় মেয়েদের একটা টুপি আর ফার-কোট পড়ে আছে। জীবনে এতখানি আশ্চর্য আর আমি কখনও হইনি। রাত তখন কত কে জানে! এত রাতে এই নির্জন স্টুডিওর মধ্যে অচেনা বিদেশিনী মেয়েটি এল কেমন করে? কেনই বা এল? একি স্বপ্ন, না সত্যি, না ভৌতিক ব্যাপার! আপনা থেকেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল— কে?

মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট মনে ছবি দেখছিল। আমার গলার আওয়াজে চমকিয়ে ফিরে তাকাল। আশ্চর্য— ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলাম। মনে হল, পোর্ট্রেট থেকে জ্যান্ত হয়ে নেমে মেয়েটি যেন হলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। আজ সাতদিন এই চেহারাই তো আমি রং আর তুলি দিয়ে এঁকেছি। সেই সবুজাভ চোখের তারা, সেই ঈষৎ স্ফুরিত রক্তবর্ণ ওষ্ঠ, সেই পানের মতো মুখের গঠন— পোশাকটার সঙ্গে ছবিটাও হুবহু মিলে যাচ্ছে, পা পর্যন্ত ঝোলানো কাঁধকাটা গাঢ় নীল রঙের সিল্কের পোশাক— ছবি কি কখনও জীবন্ত হয়? না আমার দৃষ্টিবিভ্রম হয়েছে? মনে করে দেখলাম, না, অন্যদিনের মতো আমি তো আজ হুইস্কি খাইনি! তবে— তবে এ কী দেখছি?

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে মেয়েটি কুণ্ঠিত স্বরে বললে, ক্ষমা করবেন । আমি না বলে ছবিখানা দেখছিলুম । যদিও আমার এই ছবিখানা আঁকবার ফরমাস আমিই দিয়েছি । তবু— চিত্রকরের দেখা পেলে আমি ক্ষমা চেয়ে নিতাম ।

তার প্রয়োজন হবে না । ছবির মালিকের ছবি দেখবার নিশ্চয়ই অধিকার আছে । — আমি জানালাম ।

মেয়েটির ঈষৎ স্ফুরিত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কয়েকটি কুন্দদন্ত দেখা গেল । বললে, অনেক ধন্যবাদ ।

আমি বললাম, আপনিই তাহলে বারবারা স্মিথ? নিজে এসে সিটিং না দিয়ে পোর্ট্রেট আঁকবার জন্যে ফোটোগ্রাফার পাঠিয়েছিলেন কেন জানতে পারি কি?

আমি এক মার্চেন্ট অফিসে স্টেনোগ্রাফারের কাজ করি । আসবার সময় পাই না । কিন্তু আমার বরাবর ইচ্ছে ছিল এখানে আসবার, চিত্রকরের সঙ্গে দেখা করবার ।— বারবারার দুই চোখে আগ্রহ ফুটে উঠল ।

বললাম, তার সময় কি এই? এই অন্ধকার ঝোড়ো শীতের রাত; আপনি একা শহরের বাইরে এতদূরে এলেন কী করে? কে-ই বা আপনাকে দরজা খুলে দিলে?

বারবারা বললে, অনেক খুঁজে আমায় আসতে হয়েছে, এসে দেখলাম দরজা খোলাই আছে । ভেতরে ঢুকে দু-তিনবার ডাকলাম, কোনো সাড়া পেলাম না । তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছবিখানা দেখছিলাম— তখন আপনি এলেন ।

বারবারা কি সত্য কথা বলছে? এতরাত্রে স্টুডিওর দরজা খোলা ছিল? তাই হবে । টেবিলের ওপর ওই তো চাবি পড়ে আছে । বন্ধ করতে আমি নিশ্চয় ভুলে গেছলাম ।

বারবারা বলতে লাগল, কাল আমি সানফ্রান্সিসকো চলে যাব । কাল হয়তো আসবার সময় হবে না, তাই এলাম আজকে । রাত অবশ্য অনেক হয়েছে, তবু তো চিত্রকরের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ হারাইনি । কোথায় চিত্রকর? একবার দেখা হবে না?— বারবারার সাগ্রহ কণ্ঠস্বর মধুর বাজনার মতন বেজে উঠল । সে-কণ্ঠস্বরে ছিল উৎসুক আশা আর গভীর শ্রদ্ধা ।

চিত্রকরের সঙ্গে আজ দেখা হবে না? বারবারা আবার জিজ্ঞাসা করল ।

সংক্ষেপে বললাম, হবে । আজ রাত্রেই দেখা হবে— আপনি চলে যাওয়ার আগেই ।

বারবারার সবুজাভ চোখের তারায় প্রত্যাশার আনন্দ । ঊর্ধ্বমুখী ফুলের মতো আমার দিকে মুখ তুলে সে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় তিনি?

বললাম, এই স্টুডিওতেই তিনি আছেন ।

বারবারা অধীর স্বরে বলল, এই স্টুডিওতেই আছেন? আমার ভাগ্য ভালো দেখছি! চলুন— আমাকে এখুনি তাঁর কাছে নিয়ে চলুন ।

বারবারা আমার দিকে এক পা এগিয়ে এল ।

বাধা দিয়ে বললাম, দাঁড়ান!

আমার কণ্ঠস্বরে কী ছিল জানি না, বারবারা স্তব্ধ হয়ে থেমে গেল ।

বললাম, তার আগে একটা কথা আমার বলবার আছে । আর্টিস্ট নিশীথ সেনের সঙ্গে আপনি দেখা করতে এসেছেন বটে, কিন্তু দেখা না করে ফিরে যাওয়াই ভালো । যাবার সময় আপনার ছবিখানা আজই নিয়ে যেতে পারেন ।

বারবারা কয়েক মুহূর্ত আশ্চর্য চোখে তাকিয়ে রইল । তারপর বলতে লাগল, কেন একথা বলছেন? আর্টিস্ট নিশীথ সেনের সঙ্গে দেখা না করাটাই ভালো কেন? না-না-না, তা হতে পারে না, দেখা আমি করবই । তাঁর সঙ্গে দেখা না করে আমার সানফ্রান্সিকো যাওয়া হতে পারে না!

কেন বলুন তো? আপনার ছবিখানা কি মনোমতো হয়নি? কোনো ত্রুটি রয়ে গেছে?

না-না, মোটেই তা নয় । এমন চমৎকার পোর্ট্রেট আমি জীবনে কখনও দেখিনি । আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে, এ আমারই ছবি! আর্টিস্টকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই ।

বললাম, আপনার সে-কৃতজ্ঞতা আমি পৌঁছে দেব আর্টিস্টের কাছে ।

ধন্যবাদ । কিন্তু আমি বড় আগ্রহ নিয়েই এসেছি ।

বেশ তো, আপনি ছবি ভালোবাসেন, এই স্টুডিওতে আর্টিস্টের আঁকা আরও ছবি রয়েছে । এগুলো দেখে যান, আপনার আগ্রহ মিটতে পারে ।

অধীর স্বরে বারবারা বললে, শুধু সৃষ্টিই দেখে যাব? স্রষ্টাকে দেখে যাব না?

স্রষ্টাকে দেখতে পাওয়া যায় না । যেমন দেখতে পাওয়া যায় না বিধাতাকে । রাত অনেক হল, আপনি ফিরে যান মিস স্মিথ ।

নিজের কণ্ঠস্বর আমার নিজের কানেই রূঢ় লাগল; বারবারার সবুজাভ চক্ষু ম্লান হয়ে এল । ধীরে ধীরে শুভ্র হাত দুটি জোড় করে বুকের কাছে তুলে ধরল । তার ডান হাতের মুঠির মধ্যে ছোট্ট একখানি নীল রুমাল— নীল পদ্মের একটি কুঁড়ির মতো ।

বারবারা বলতে লাগল, আপনি কে, তা জানি না । যে-ই হোন, আপনাকে মিনতি করছি, চিত্রকরের সঙ্গে একবার দেখা করতে দিন । আমি শপথ করছি, আমি তাঁর বেশি সময় নষ্ট করব না । আপনি জানেন না, আমি আর্টিস্ট সেনের ছবির কতখানি অনুরাগিনী । তাঁর আঁকা ছবি আমার কতখানি ভালো লাগে— তা বলে আমি বোঝাতে পারব না । কলকাতা, প্যারিস, বার্লিন, রোম, পিকিং— পৃথিবীর যেখানে যেখানে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়েছে, সব জায়গায় আমি ঘুরে এসেছি । আর্টিস্ট সেন আমার কাছে দেবতা । কত রাত্রে আমি তাঁর স্বপ্ন দেখি!

বারবারার চোখ-মুখের ভাব আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম । কেননা, তার মুখের সামনে ছিল ঝোলানো আলোটা । কিন্তু আমার মুখ তার দৃষ্টির সামনে অন্ধকার অস্পষ্ট । আমি দাঁড়িয়েছিলাম ঝোলানো আলোটা পেছনে রেখে ।— আমার এই আত্মগোপন যে ইচ্ছাকৃত— তা তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ প্রতুল!

বারবারা তখনও মিনতির ভঙ্গিতে বলে চলেছে, দয়া করুন— আমাকে ফিরে যেতে বলবেন না— আর্টিস্ট সেনকে, আমার স্বপ্নের দেবতাকে একবার দেখেই আমি চলে যাব । আমি শপথ করছি— ।

উত্তেজনায় বারবারার গাল দুটি রক্তাভ হয়ে উঠেছে । ঘন নিশ্বাসে তার নাসারন্ধ্র, তার পীবর বক্ষ ফুলে ফুলে উঠছে । বারবারা, সুন্দরী— সুতনু বারবারা বলছে, 'আমি আর্টিস্ট সেনের অনুরাগিণী । আমি তাঁর স্বপ্ন দেখি?' মনে হল, আমি খুব দামি নেশা করেছি । আর সেই নেশা আমার মাথার মধ্যে রিমঝিম করছে ।

তবুও কণ্ঠস্বর আরও রূঢ় করে বললাম, স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই স্মিথ । তোমার স্বপ্নের দেবতার সঙ্গে আর্টিস্ট সেনের যদি কিছুমাত্র মিল না থাকে? যদি—যদি সে কুৎসিত হয়? যদি তার মুখের চেহারা হয় পশুর মতো, জানোয়ারের মতো কুৎসিত? তাহলে কি তুমি সহ্য করতে পারবে বারবারা? তার চেয়ে কাজ নেই দেখা করে । তোমার সুন্দর স্বপ্ন, সুন্দর ধারণা নিয়ে ফিরে যাও ।

বারবারার মুখে-চোখে সন্দেহের ছায়া দেখা দিতে না দিতেই মিলিয়ে গেল । পরম বিশ্বাসের সঙ্গে মৃদু হেসে বললে, ঈশ্বরের দোহাই, মিথ্যে দিয়ে আমায় ভোলাবার চেষ্টা করবেন না । তারপর চারপাশের ছবিগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, যে মানুষ এমন অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে, সে কখনও কুৎসিত হয়? অসম্ভব! মুখের চেহারা তার সুন্দর হোক বা কুৎসিত হোক, আমার কাছে সে সৌন্দর্যের দেবতা হয়েই থাকবে! ঈশ্বরের দোহাই— আপনি বিশ্বাস করুন। রাত বোধ করি শেষ হয়ে এল, বলুন কোথায় আর্টিস্ট সেন?

এইখানে— তোমার সামনে ।

যেন বহুদূর থেকে আমার গলার চাপা আওয়াজ ভেসে এল । ধীরে ধীরে বারবারার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল । নীল রুমালখানি সমেত ডান হাতখানি মুখে চাপা দিয়ে সে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল আমার দিকে । তারপর আনন্দিত বিস্ময়ে বলে উঠল, তুমি-তুমি আর্টিস্ট সেন? আলোয় এসো— আমাকে দেখা দাও!

আমার সামনে ছিল টেবিলের ওপর এই রিডিং-ল্যাম্প । হাত বাড়িয়ে সেটা জ্বেলে দিলাম ।

শীতের ঝোড়ো হাওয়া দেবদারু-শাখায়-শাখায় সহসা চিৎকার করে উঠে স্তব্ধ হয়ে গেল । সে-চিৎকার আসলে শীতের ঝোড়ো হাওয়ার নয়— সে-চিৎকার বারবারা স্মিথের! তাকিয়ে দেখি, তার পূর্বের ঈষৎ রক্তাভ কপোল যেন ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে । দেহবল্লরী ঝড়ে দীপশিখার মতো কাঁপছে । আর, আধো-নিমীলিত সবুজাভ চক্ষু দুটি আমারই মুখের পানে স্থির-নিবদ্ধ হয়ে ক্রমশ বিস্ফারিত হচ্ছে! অকস্মাৎ দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে উঠলে যেমন হয় ।

কয়েক মুহূর্ত মৃত্যুর মতো শীতল স্তব্ধতা ।

তারপর নীল রুমালখানি সমেত দুই হাতে চোখ ঢেকে বারবারা আতঙ্ক-বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠল, না-না-না, এ হতে পারে না— তুমি আর্টিস্ট সেন নও, কিছুতেই তুমি আর্টিস্ট হতে পারো না । আর্টিস্ট যে, সে সৌন্দর্যের পূজারি— সে সুন্দরের প্রতিনিধি । সে কখনও এমন হতে পারে না— এ আমি কী দেখলাম! কাকে দেখলাম । কাকে দেখলাম!

গলা দিয়ে আমার প্রত্যুত্তর বেরিয়ে এল, তুমি আর্টিস্ট সেনকে দেখেছ— তুমি যার অনুরাগিনী— তুমি যার স্বপ্ন দেখ, যে তোমার কাছে দেবতা...

কিন্তু—কিন্তু এত কুৎসিত মানুষ হয়?— ধীরে ধীরে বারবারা চোখ থেকে হাত নামাল । তার আঙুলগুলো ছোট ছোট প্রদীপের শিখার মতো তখনও কাঁপছে ।

বললাম, তার আগে বলো তো বারবারা, যে মানুষ এত সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে, তার দৈহিক আকৃতি যেমনই হোক না কেন, তাকে কি তুমি কুৎসিত বলবে? বলো— এ প্রশ্ন একটু আগে তুমিই করেছিলে— তুমিই এর জবাব দাও ।

কোনো জবাব এল না । বারবারার পাণ্ডুর মুখখানি সন্ধ্যার পদ্মের মতো ধীরে ধীরে নত হল ।

কেমন যেন একটা চাপা আবেগ আমার মধ্যে দুরন্ত উচ্ছ্বাসে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল । যে-কথা কোনোদিন কাউকে জানাইনি, যে-কথা গোপনে একদিন আমার তপ্ত যৌবনের রক্তের মধ্যে গুমরে বেড়াচ্ছিল, সেই কথা আজ ঝোড়ো শীত-রাত্রির অদ্ভুত অবাস্তব পরিবেশের মাঝে আমার মুখ দিয়ে অনর্গল জল-কল্লোলের মতো বেরিয়ে আসতে চাইল । আমি বলতে লাগলাম, আমি জানি বারবারা, আমায় দেখে তুমি ভয় পেয়েছ— মনে মনে পেয়েছ প্রচণ্ড আঘাত । কিন্তু আমি কি তোমাকে আগেই বলিনি যে, তুমি ফিরে যাও? বলি নি কি, আমায় দেখলে তোমার ধারণা, তোমার স্বপ্ন নিমেষে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে? তবু কেন তুমি দেখতে চাইলে? কেন তোমার সুন্দর স্বপ্ন— সুন্দর ধারণা নিয়ে এমনিই ফিরে গেলে না? বারবার নিষেধ সত্ত্বেও কেন তুমি আমাকে দেখতে চাইলে? কেন— কেন? শুধু বুকজোড়া ঘৃণা আর অবহেলা দিয়ে ফিরে যাবে বলে? কিন্তু কী আমার অপরাধ বলতে পারো বারবারা যে, তোমার মতো সুন্দরী মেয়েদের কাছে শুধু ঘৃণা আর উপেক্ষার পাত্র হয়ে থাকব? পশুর মতো আমার এই আকৃতির জন্যে আমি তো দায়ী নই? দায়ী সেই বিধাতা, যে নিষ্ঠুর খেয়ালের বশে আমাকে এমনি কদাকার করে গড়েছে— আমার ভিক্ষার অঞ্জলিতে যে কৃপণ বিধাতা রূপের একটি কণাও দান করেননি!

বলতে বলতে নিষ্ফল অভিমানের তপ্ত অশ্রুধারা কখন যে আমার গালের ওপর দিয়ে গড়িয়ে এসেছে, আমি তা টের পাইনি । বারবারা সহসা মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি কাঁদছেন?

বারবারার আতঙ্ক-পাণ্ডুর মুখ সহানুভূতিতে কোমল হয়ে এল । লক্ষ করলাম, পুরুষের অশ্রু নারীর অন্তর আজও স্পর্শ করে । বারবারা থেমে থেমে কোমল গলায় বলতে লাগল, আমি-আমি ক্ষমা চাইছি । তোমাকে দেখে আমি ভয় পেয়েছিলাম সত্যি, কিন্তু বিশ্বাস করো, ঘৃণা আমি তোমাকে করিনি । যে শ্রদ্ধা, যে অনুরাগ নিয়ে আমি এসেছিলাম, এখনও আমি তা হারাইনি ।

কিন্তু সে-শ্রদ্ধা, যে-অনুরাগ কার প্রতি?— প্রশ্ন করলাম?

তোমার প্রতি— ঈশ্বরের দোহাই বলছি—

চুপ করো! ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে মিথ্যে কথা বোলো না বারবারা ।— আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে যেমন করে লাভাস্রোত বেরিয়ে আসে, তেমনি করে আমার এতদিনের রুদ্ধ জ্বালামুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, আমি জানি— আমি জানি বারবারা, তোমার অনুরাগ, তোমার শ্রদ্ধা আমার জন্যে নয়— আর্টিস্ট সেনের জন্যে, যে তোমার পোর্ট্রেট এঁকেছে, দেশ-বিদেশের প্রদর্শনীতে যে বহু পুরস্কার পেয়েছে । তারই জন্যে তোমার মতো সুন্দরীর অনুরাগ— তারই জন্যে শীতের এই দুর্যোগ-রাত্রেও তোমার অভিসার! তাই নয় কি? আমি বুঝতে পেরেছি বারবারা, আর্টিস্ট সেনকে না দেখেই তুমি ভালোবেসেছ । আর এ-ও তুমি জেনে রাখো, ঠিক এই কারণেই আর্টিস্ট সেনকে আমি হিংসা করি— আমি তাকে ঘৃণা করি— ভয়ানক ঘৃণা করি । আর্টিস্ট সেন আমার শত্রু — পরম শত্রু । আমাকে সে চিরদিন বঞ্চিত করেছে— সুন্দরী নারীর সঙ্গ থেকে, যৌবনের কামনা থেকে, বহু অনুরাগিনীর ভালোবাসার থেকে । যা আমার হতে পারত, তা হরণ করে নিয়েছে ওই আর্টিস্ট সেন! আর্টিস্ট সেন যদি দ্বিতীয় কোনো পুরুষ হত বারবারা, আমি শপথ করে বলছি, আজ এই মুহূর্তে তাকে আমি দুই হাত দিয়ে গলা টিপে খুন করে ফেলতাম!

আতঙ্কিত বারবারা অস্ফুট আওয়াজ করে এক পা পিছিয়ে গেল । আর সেই সময় হু-হু শব্দে শীতের ঝোড়ো হাওয়া খোলা জানলা-পথে ঢুকে এল ঘরের মধ্যে । দুলতে লাগল ঝোলানো বাতিটা, সজীব হয়ে উঠল হলের দেওয়ালে-দেওয়ালে বিচিত্র সব ছায়ামূর্তি—আমাদেরই দীর্ঘ ছায়ামূর্তি ।

আতঙ্ক বিবশা বারবারা বলতে লাগল, একী বলছ তুমি?... আমি আর শুনতে পারছি না! রাত শেষ হয়ে এল, কাল ভোরে আমার জাহাজ ছাড়বে— আমায় যেতে দাও— আমি যাই—

ত্রস্ত ব্যাকুল হাতে বারবারা তার টুপি আর ফার-কোট তুলে নিল । তারপর 'শুভরাত্রি' বলে দরজার দিকে এগোল।

দাঁড়াও! —আমার গলা দিয়ে যেন একটা চিৎকার বেরিয়ে এল ।

যন্ত্রচালিতের মতন বারবারা ফিরে দাঁড়াল ।

টেবিলের ওপর থেকে দরজার চাবিটা তুলে নিলাম । তারপর তাকে পার হয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে বললাম, রাত্রি আজ শুভ নয় বারবারা— তোমার পক্ষে নয়, আমার পক্ষেও নয় ।

বারবারা যেন কান্নায় ভেঙে পড়ল,— না, না, ওকথা বোলো না । তারপর কম্পিত হাত কপালে-বুকে ঠেকিয়ে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকতে আঁকতে বললে, আমি যাই—আমি যাই—

দরজায় পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে দুই পাশে দুই হাত প্রসারিত করে বললাম, কোথায় যাবে? যাওয়া আজ তোমার হবে না বারবারা ।

বিস্ফারিত দুই চোখে তাকিয়ে বারবারা বলে উঠল, হবে না! সানফ্রান্সিসকোর জাহাজ জেটিতে অপেক্ষা করছে যে!

তুমি না গেলেও সে-জাহাজ ঠিক সময়ে ছাড়বে— আর ঠিক সময়েই সানফ্রান্সিসকোয় পৌঁছে যাবে । বৃথা চিন্তিত হোয়ো না বারবারা ।

অকস্মাৎ উৎকট একটা চাপা হাসি আমার গলা দিয়ে যেন ফেটে বেরিয়ে এল । সে-হাসি হলের খিলানে খিলানে ধাক্কা খেয়ে, ঝড়ের গোঙানির সঙ্গে মিশে ঘরময় ঘুরপাক খেতে লাগল । সেই বিশ্রী ভয়াবহ আওয়াজ সহ্য করতে না পেরে বারবারা দুই হাতে কান চেপে ধরল । তারপর ভীত কাতর স্বরে চিৎকার করে বলতে লাগল, ঈশ্বরের দোহাই, চুপ করো— তুমি চুপ করো । যেতে দাও— আমায় যেতে দাও— তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি—

নীল রুমাল সমেত হাত দুটি জোড় করে বারবারা আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল ।

আমি তার দিকে এক-পা এগিয়ে এলাম । বললাম, ভিক্ষা পেতে হলে আগে ভিক্ষা দিতে হয় বারবারা । আমিও কাঙালের মতো তোমার মুখের পানে তাকিয়ে আছি, তোমার ভালোবাসার প্রসাদে কখন আমার অঞ্জলি তুমি ভরে দেবে, সেই আশায় ।

কেন তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না?—বারবারা সঘন নিশ্বাসে যেন হাঁপিয়ে উঠল ।— আর্টিস্ট সেনকে আমি মনে মনে যা দিয়েছি, সে কি তোমারই উদ্দেশে দেওয়া নয়?

না—না—না, সে তুমি আমাকে দাওনি বারবারা । সে তুমি দিয়েছ তোমার স্বপ্নের সুন্দরকে—আমার মতো কুৎসিত পুরুষকে নয় । কিন্তু কুৎসিত হলেও আমিও কি পুরুষ নই—যে পুরুষ যুগে যুগে সুন্দরী নারীকে আপন অন্তরের সিংহাসনে রানির মতো নিরুপমা করে বসিয়ে রেখেছে? আমারও জীবনে কি সেই সাধ, সেই আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে না বারবারা? আমারও কি ভালোবাসবার আর ভালোবাসা পাবার যোগ্যতা নেই মনে করো? কুৎসিত পশুও ভালোবাসতে পারে, আর কুৎসিত মানুষ পারে না?

সঘন নিশ্বাসের সঙ্গে বারবারা শুধু এই কথাই বলতে লাগল, যেতে দাও—আমাকে যেতে দাও—

তার মুখের পানে তাকিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, প্রাণপণ চেষ্টায় সে উগরে-ওঠা ঘৃণাকে দমন করতে চাইছে—যাতে আমি টের না পাই । তবু সেই ঘৃণা—কুৎসিতের প্রতি তিক্ত ঘৃণা তার সবুজাভ চোখের তারায়, মুখের প্রত্যেকটি পেশিকুঞ্চন থেকে কালো বিষের মতো ঝরে পড়ছে । চকিতে নিজের চেহারাটা যেন অদৃশ্য আর্শিতে দেখতে পেলাম । দেখতে পেলাম গরিলার মতো মুখাকৃতি, থ্যাবড়া নাক আর বিশ্রী পুরু ঠোঁট । অকস্মাৎ মনে হল, একটি বারবারা যেন শত শত সুন্দরী বারবারা হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে তিক্ত ঘৃণাভরে উপেক্ষার হাসি হাসছে । আর দেখতে দেখতে তাদের সেই সমবেত কণ্ঠের তীক্ষ্ণ খলখল অট্টহাসি, তিক্ত ঘৃণার কুটিল ভ্রুভঙ্গি, তিক্ত বিষের ক্রিয়ার মতো আমার সর্বাঙ্গে আগুনের জ্বালা ধরিয়ে দিল ।

আমি বলতে লাগলাম—আমার নিজের কানেই আমার আওয়াজ অজগরের হিসহিস শব্দের মতো শোনাতে লাগল : শোনো বারবারা, রাত আর অল্পই বাকি আছে, তবু আজ রাত্রে তোমার যাওয়া হতে পারে না! যেতে যদি হয়, আমার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে যেতে হবে ।

বারবারা তার ফার-কোটের পকেট থেকে একটা নোট-কেস বার করলে ।

বাধা দিয়ে বললাম, থামো! আজ রাতে তোমার কাছে আমার যা পাওনা, তা টাকা দিয়ে মিটিয়ে দেওয়া যায় না । পাওনা মেটাতে হলে তোমায় নিজেকে দিতে হবে ।

এবার দলিতা সাপিনীর মতো মাথা উঁচু করে বারবারা বলে উঠল, কী বলছ তুমি?

ঠিকই বলছি ।—বাধা দিয়ে তাকে থামিয়ে বললাম, মিথ্যে হলেও আজ তোমাকে বলে যেতে হবে, তুমি আমারই অনুরাগিনী । থাক তোমার স্বপ্নের আর্টিস্ট সেন তোমার অনুরাগ-শ্রদ্ধা-ভালোবাসা নিয়ে, ওসব ভালো ভালো জিনিসের ওপর আর লোভ করব না বারবারা । শুধু জেনে রাখো, আজ রাতে আমি আর্টিস্ট নই, আমি গুণী নই, আমি শুধু পুরুষ—চিরন্তন পুরুষ—আমার প্রেম, আমার পৌরুষকে তুমি অস্বীকার করে যেতে পারবে না ।

পঙ্গুর মতো বারবারা আস্তে আস্তে সোফার ওপর বসে পড়ল ।

সেই দিকে তাকিয়ে কেমন একটা অস্থির উল্লাসে আমি বলে যেতে লাগলাম, সারাজীবন বঞ্চিত থাকার পর ভাগ্য আজ তোমাকে এনে দিয়েছে বারবারা । এ সুযোগ আমি ছাড়ব না! আমার জীবনে এ সুযোগ হয়তো এই প্রথম—হয়তো এই শেষ ।

পাথরের মতো ভাবলেশহীন চোখে বারবারা আমার দিকে তাকিয়ে ছিল । চোখে পলক পড়ছে না, দেহ স্থির । যেন মৃতদেহ কথা কইছে, এমনি করে শুধু ঠোঁট নেড়ে বারবারা হঠাৎ বলে উঠল, ভাগ্য যদি আমায় এনে দিয়ে থাকে, তবে আজ ভাগ্য-পরীক্ষা করো ।

ভাগ্য-পরীক্ষা ।

হ্যাঁ, যদি তোমার জিৎ হয়, তোমার প্রাপ্য তুমি পাবে ।

জিজ্ঞাসা করলাম, আর যদি আমি হারি?

জবাব এল, ভাগ্যকে দোষ দিয়ে আমার পথ থেকে চিরদিনের মতো তুমি সরে যাবে ।—রাজি আছ ভাগ্য-পরীক্ষায়?

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলাম। ভাগ্যের জুয়াখেলায় কী হবে আমার? হার না জিৎ? ... হার না জিৎ? ... হার না জিৎ? কেমন যেন একটা নেশা আমায় পেয়ে বসল। যদি জিৎ হয়, তবে আমার পুরস্কার ওই সুন্দরী — বারবারা—সুতনু, সুমধ্যমা, সুদীপ্তযৌবনা। আমার নিঃসঙ্গ জীবনের, আমার বঞ্চিত জীবনের—

কিন্তু ভাগ্যের পাশাখেলায় মন্দভাগ্য পাণ্ডবদের মতো যদি আমার হার হয়? না, না, হার হবে কেন? হার হবে না—আমার হার হতে পারে না। ... বারবার আমার মনে হতে লাগল, আমার জিৎ হবেই—আমার জিৎ হবেই! আবার মনটা দুলে উঠল—যদি জিৎ না হয়, যদি শেষ পর্যন্ত হেরে যাই? বারবারার পথ থেকে চিরদিনের মতো আমাকে সরে যেতে হবে? মুহূর্তে শরীরের সমস্ত রক্তস্রোত যেন ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গেল। মধুর সুধার পাত্র মুখের কাছে এগিয়ে ধরে ভাগ্য আবার তা কেড়ে নেবে? না, তা হতে পারে না। কেড়ে নিতে আমি দেব না। বারবার আমার মন, আমার যৌবনের সমগ্র চেতনা যেন লক্ষ করতাল বাজিয়ে বলতে লাগল, এ খেলায় জিৎ আমার হবেই। ক্রমশ সেই নেশাটা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে আমার শিরা-স্নায়ুতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

রুদ্ধ নিশ্বাসে বলে উঠলাম, রাজি আছি—আমি রাজি আছি।

বারবারার সবুজাভ চোখের তারা দুটি হীরার টুকরোর মতো ঝকঝক করে উঠল। দেখতে দেখতে তার আইভরির মতো পাণ্ডুর মুখ রক্তোচ্ছ্বাসে রাঙা হয়ে উঠল। কতকটা স্বগতোক্তির মতোই সে বলে উঠল, রাজি আছো! বেশ, তাহলে শুরু হোক আমাদের ভাগ্যপরীক্ষা। তাস আছে?

আছে।

আনো।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে স্টুডিয়োর দরজায় চাবি দিলাম। তারপর পাশের ছোট ঘর থেকে তাস আনতে গেলাম। তুমি তো জানো প্রতুল, অবসর যাপনের জন্যে একজোড়া তাস আমার স্টুডিয়োতে এনে রেখেছি। কতদিন সন্ধ্যায় তুমি আসোনি, একা একা পেশেন্স খেলে কাটিয়েছি।

পাইপ মুখে বসে বসে প্রতুল এতক্ষণ নিঃশব্দে স্বপ্ন-কাহিনি শুনে যাচ্ছিল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় মুখখানা তার অস্পষ্ট হয়ে গেছে। সেই ধূম্রজালের আড়াল থেকে আওয়াজ ভেসে এল, হুঁ, তারপর?

নিশীথ আবার শুরু করলে:

তারপর এই টেবিলের মুখোমুখি বসলাম দুজনে। শুরু হল ভাগ্যের জুয়াখেলা। তাসগুলো বারবারা উল্টো করে আমার সামনে বিছিয়ে দিল। তারপর নিজের একখানা টেনে নিয়ে আমাকে বললে, নাও।

টেনে নিলাম একখানা তাস—রুইতনের সাহেব। বারবারা তার হাতের তাসখানা দেখাল—ইস্কাবনের নওলা। বললে, তুমি 'ডিল' করো।

জিজ্ঞাসা করলাম, ক'দান খেলতে চাও?

বারবারা বললে, তিন দানই যথেষ্ট।

প্রথমবার আমি 'ডিল' করলাম। একখানা করে তিনবার। বারবারা তার তাসগুলি টেবিলের ওপর চিত করে মেলে ধরল। হরতন আর চিড়েতনের টেক্কা, আর রুইতনের বিবি।

এবার আমার পালা। উপুড় করা তিনখানা তাস তুলতে গিয়ে আমার আঙুলগুলো একবার কেঁপে উঠল। এ তিনখানা তাসের উল্টো পিঠে আমার ভাগ্যের কী ফলাফল লেখা আছে, কে জানে!

এক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইলাম।

বারবারা বললে, তোমার তাস দেখাও।

আঙুলে যেন জোর করে শক্তি এনে আমার তাস তিনখানা উল্টে দিলাম। ইস্কাবনের আট-নয়-দশ!

উল্লাসে চিৎকার করে উঠলাম, দান আমার!

বারবারার মুখ আবার বিবর্ণ হয়ে এল। অস্বাভাবিক শান্ত গলায় সে শুধু বললে, দ্বিতীয় দানের তাস দাও।

বাহান্নখানা তাস ভেঁজে দ্বিতীয়বার তাস দিলাম । বারবারা এবার তার তাস তিনখানা স্পর্শ করে বিড় বিড় করে কী যেন বললে । তারপর ধীরে, অতি ধীরে একখানা করে তাস উল্টে ধরল । তিনখানা বিবি—ইস্কাবন, রুইতন আর হরতন । তারপর আমার দিকে তাকাল ।

এক নিমেষে আমার বুকটা ধ্বক করে উঠল । বললাম, ভাগ্য এবার তোমার প্রতি কৃপা করেছে দেখছি । বিবির ট্রায়ো তুলেছ । কিন্তু আমিও যদি সাহেবের ট্রায়ো তুলি?

বটে! তোমার ভাগ্য আরও ভালো বলব ।—বারবারার ওষ্ঠ প্রান্তে সুতীক্ষ্ণ একটু হাসি দেখা দিল । সে কি তিক্ত ব্যঙ্গ?

আমার তাস তিনখানা তুলে সশব্দে টেবিলের ওপর মেলে ধরলাম । না, সাহেবের ট্রায়ো নয় । সাহেব মাত্র একখানা, বাকি দু'খানা পাঁচ আর চার । এবারের দান আমার নয়—বারবারার ।

সমস্ত তাসগুলো কুড়োতে কুড়োতে অত্যন্ত শান্ত গলায় বারবারা বললে, তোমার জন্যে আমি দুঃখিত, সেন ।

মাথার ভেতরটা আমার দপ দপ করে উঠল । উত্তপ্ত রূঢ় গলায় বললাম, চুপ করো! আমার জন্য দুঃখিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই তোমার ।

বারবারার ওষ্ঠপ্রান্তে সেই সুতীক্ষ্ণ হাসি আবার ঝিলিক দিয়ে উঠল । তাসগুলো ভাঁজতে ভাঁজতে আরও শান্ত গলায় সে শুধু বললে, এবার শেষ বাজির খেলা ।

সহসা লক্ষ মৌমাছির একটানা গুঞ্জনের মতো কথাগুলো আমার মাথার মধ্যে ক্রমাগত বাজতে লাগল: 'শেষ বাজির খেলা!' 'শেষ বাজির খেলা!' শেষ বাজি কার? আমার না বারবারার? শরীরের সমস্ত রক্ত উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হয়ে উঠতে লাগল ।

এক, দুই, তিন—বারবারার তাস দেওয়া হয়ে গেল । আগের মতোই সে তাসগুলি স্পর্শ করে মুদিত চক্ষে বিড় বিড় করে কী যেন বললে । তারপর তাস তিনখানা উল্টে দিল । সেই দিকে তাকিয়ে আমার চোখ দুটো পাথরের মূর্তির চোখের মতো পলকহীন হয়ে গেল । বারবারা যে দান তুলেছে, তার চেয়ে বড় দান আর হয় না । তুলেছে তিনখানা টেক্কা—ইস্কাবন, হরতন, আর চিড়েতনের ।

এক মুহূর্তের জন্য আমার হৃৎস্পন্দন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল । শেষ পর্যন্ত এই হল? শেষ বাজির খেলায় ভাগ্য আমাকেই ছলনা করল?

তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতো বারবারার শান্ত-কঠিন কণ্ঠস্বর আমার কানে এসে বিঁধল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, শেষ বাজি আমারই ।

অন্ধ আক্রোশে আমার তাসগুলো তুলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে যাচ্ছিলাম । কিন্তু একী!—আমার বরফের মতো ঠান্ডা থেমে-যাওয়া হৃৎপিণ্ড হঠাৎ যেন তপ্ত রক্তস্রোতে ফের খরবেগে চলতে শুরু করল ।

সেই শাণিত ব্যঙ্গের হাসি হেসে বারবারা বলে উঠল, তোমার তাসগুলো অনর্থক দেখে লাভ কী, সেন? তিনখানা টেক্কার চেয়ে বড় দান আর হয় না—আশা করি, তা তোমার জানা আছে । ভাগ্যের এই ঠাট্টাটুকু সহজভাবে নিতে চেষ্টা করো, সেন ।

ফার-কোট আর টুপি নিয়ে বারবারা উঠতে যাচ্ছিল । বললাম, বসো । ভাগ্য আমাকে ঠাট্টা করেনি, করেছে তোমাকে ।

বারবারা জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকাল । আমার হাতের তাসগুলো গুনে দেখলাম । এক, দুই, তিন, চার ।

এবারে হাসবার পালা আমার । বললাম, শেষ বাজির খেলাটা আসলে খেলাই হয়নি । উত্তেজনায় তাস তোমার দিতে ভুল হয়েছে বারবারা । তিনখানার বদলে আমাকে চারখানা দিয়ে ফেলেছ । সুতরাং এবারের খেলা নাকচ ।—তারপর আমার কুৎসিত মুখে বীভৎস হাসি ফুটিয়ে থেমে থেমে বললাম, ভাগ্যের এই ঠাট্টাটুকু সহজভাবেই নিতে চেষ্টা করো সুন্দরী বারবারা!

বারবারার মুখ দেখতে দেখতে সাদা হয়ে গেল। প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিয়ে সে শুধু বললে, বেশ, আবার নতুন করে খেলা শুরু হোক।

ঝড়ে যেমন দেবদারুর কচি শাখা কাঁপে, তেমনি কম্পিত হাত বাড়িয়ে বারবারা তাসগুলো কুড়িয়ে নিতে গেল। কিন্তু তার আগেই আমার কালো কর্কশ মুঠির মধ্যে তার হাতখানা ধরে ফেলে বললাম, না, আর খেলা হবে না।

বারবারার মুখ-চোখ, সমস্ত দেহ পলকের মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে উঠল। কঠিন কণ্ঠে সে বললে, শেষ খেলা খেলতেই হবে সেন, নইলে ভাগ্যের সঙ্গে বোঝাপড়া হবে না।

বললাম, তার আগে আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করো বারবারা।

হাত ছাড়ো—তাস দিতে দাও—

না।

হাত ছেড়ে দাও বলছি—

না—না—না!

ঘরের ভেতর পুরুষ ও নারীর এই চিরন্তন দ্বন্দ্বের মাঝখানে বাইরের ঝড়ের বেগ কখন যে বেড়ে উঠেছিল, খেয়াল করিনি। হঠাৎ হু-হু করে ক্ষুব্ধ আত্মার আক্ষেপের মতো শীতল দমকা হাওয়ার ঝলক খোলা জানলা-পথে এসে টেবিলের ওপর থেকে তাসগুলোকে এক ফুঁয়ে ঘরময় ছড়িয়ে দিয়ে গেল। প্রবলভাবে দুলতে লাগল ঝোলানো বাতিটা, আর বিচিত্র ঢেউয়ে প্রকাণ্ড হলটা যেন প্রেতরাজ্যের গুহার রূপ ধারণ করল।

সঘন নিশ্বাসে বারবারার পীবর বক্ষ, দুই নাসারন্ধ্র ফুলে ফুলে উঠছে। চোখের তারায় শিহরিত আতঙ্ক আর তিক্ত ঘৃণায় মেশানো অদ্ভুত দৃষ্টি। আর আমার মনে হতে লাগল, কোনো এক তীব্র উত্তেজক ওষুধের প্রতিক্রিয়ার ফলে আমার প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু যেন ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। ডাঃ জেকিল যেন মিঃ হাইডে পরিণত হচ্ছে।

কী চাও তুমি?—দম নিয়ে বারবারা জিজ্ঞাসা করল।

কালো কর্কশ মুঠির মধ্যে ধরা সুন্দর মসৃণ হাতখানা আকর্ষণ করতেই, টেবিল পার হয়ে আচমকা বারবারা আমার বুকের ওপর এসে পড়ল—একরাশ পপি ফুলের স্তবকের মতো। তেমনি সুরভিত, তেমনি মদির, তেমনি মোহময়। ললিতযৌবনা নারীদেহের চক্ষে, অধরে, মোহময় রূপে আর মায়াময় স্পর্শে চিরকালের যে বিচিত্র ইন্দ্রজাল, তার নেশায় আমার বন্য বর্বর যৌবন মাতাল হয়ে উঠল। আর সেই নেশা আকণ্ঠ পান করে মিঃ হাইড অপরূপযৌবনা বারবারার কানে কানে বলতে লাগল, কী চাই? তুমি কি জানো না বারবারা, তোমার কাছে আমি কী চাই? চাই তোমার এতটুকু ভালোবাসা, করুণা আর কোমল দৃষ্টি—পরিণামে যদি তোমার রূপের আগুনে লোভী পতঙ্গের মতো আমি নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়ে যাই, তবুও—

বারবারার সবুজাভ চোখের তারায় দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। প্রবল বিতৃষ্ণায় তার মুখের পেশিগুলো কুঁচকে গেছে। হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে সে বলে উঠল, তোমার কি নরকের ভয় নেই?

বিশ্রী বীভৎস একটা হাসির আওয়াজ আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল। বললাম, তুমি যদি নরক হও বারবারা, তবে সে আমার স্বর্গের চেয়েও—

কথা আমার শেষ হল না। তার আগেই আমার মুখময় থুতু ছিটিয়ে এক ঝটকায় নিজেকে টেনে নিয়ে বারবারা দূরে সরে গেল।

তারপর—

তারপর শুরু হল শিকারি আর শিকারে দ্বন্দ্বের খেলা। এধার থেকে ওধার, এ- কোণ থেকে ও-কোণ। কেবলই ধরতে চাওয়া—আর এড়িয়ে যাওয়া। একজনের আক্রমণ, আর একজনের আত্মরক্ষা। উল্টে গেল সোফা, ভেঙে পড়ল টেবিল, টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কত মূর্তি আর ছবি। একটা চীনে ফুলদানীর

টুকরো লেগে রক্তাক্ত হল আমার কপাল, আর নখের আঘাতে বারবারার ছিঁড়ল নীল বক্ষবাস । কনকনে শীতের রাত্রেও কপালে দেখা দিয়েছে বিন্দু বিন্দু ঘাম, সঘন নিশ্বাসে দম যেন প্রতি মুহূর্তে ফুরিয়ে আসছে । শিকারি আর শিকারের এ খেলা যেন কোনোদিনও আর শেষ হবে না!

ঝড়ের বেগ ক্রমশ বাড়ছে । বিপুল আক্ষেপে দেবদারুর শাখাগুলি যেন বুক চাপড়ে উঠছে । ঝোলানো বাতিটা বিষম দোলায় এবার বুঝি ছিঁড়ে পড়বে ।

বিপর্যস্ত পরিশ্রান্ত বারবারা তখন হলের ডান দিকের কোণে একটা ভাঙা মূর্তি ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে । ডান হাতে সেই নীল রুমালখানি দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে, বাঁ-হাতে ছিন্ন বক্ষবাস ধরা । যেন ঝড়ে ছিন্নপাখা একটি শ্বেত-কপোতী ত্রস্ত হয়ে ঘরের কোনায় আশ্রয় নিয়েছে । পুঞ্জ পুঞ্জ রূপ যেন মহাকালের অত্যাচার সহ্য করেও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ।

ক্লান্ত করুণ ভঙ্গিতে বারবারা দাঁড়িয়ে আছে ভাঙা মূর্তিটার পাশে । দেখে মনে হল, এই প্রাচীন গির্জার মধ্যে কোনো তপস্বিনী শেষ প্রার্থনার মতো তার শেষ মোমের বাতিটি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে!

দেখতে দেখতে আমার মধ্যে সেই তীব্র উত্তেজক মাদকতার প্রভাব ফুরিয়ে আসতে লাগল । শুরু হয়ে গেল তার উল্টো প্রতিক্রিয়া । মরে গেল বর্বরযৌবন পশুপ্রবৃত্তি হাইড, আবার বেঁচে উঠল আর্টিস্ট সেন— সুন্দরের উপাসক, শিল্পী! ভুলে গেলাম সব । ভুলে গেলাম এতক্ষণের দ্বন্দ্ব, কিছুক্ষণ আগেকার সেই নরকের আবহাওয়া । আমার নির্নিমেষ চোখের সম্মুখ থেকে ক্রমশ মুছে গেল পৃথিবীর যা কিছু কুৎসিত, যা কিছু অসুন্দর— জেগে রইল শুধু হলের কোণে ভাঙা মূর্তির পাশে পরিশ্রান্ত বিপর্যস্ত রূপসি বারবারার অপূর্ব করুণ ভঙ্গিমা, ক্যানভাস আর রং-তুলি । পাগলের মতো একখানা নতুন ক্যানভাস ইজেলের ওপর টাঙিয়ে ক্ষিপ্র হস্তে স্কেচ করতে করতে আমি বলে উঠলাম, ঈশ্বরের দোহাই বারবারা, নোড়ো না—যতক্ষণ না আমার আঁকা শেষ হয়, ঠিক অমনি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকো । আজ আমি যে ছবি আঁকব, সেই হবে আমার শিল্পীজীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি । এ সুযোগ আমাকে দাও বারবারা । ঈশ্বরের দোহাই, তুমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো ।

ক্ষিপ্রবেগে হাত চলতে লাগল আমার । জীবনে এত দ্রুত আমি আর আঁকিনি । প্রত্যেকটি রেখার অপূর্ব ব্যঞ্জনা ফুটে উঠতে লাগল । শিল্পী নিশীথ সেনের এই শ্রেষ্ঠ কীর্তি হয়তো অমর হয়ে থাকবে জগতে ।

রাত শেষ হয়ে আসছে । ঝড়ের বেগ এসেছে কমে । স্কেচ সম্পূর্ণ হতে এখনও আর একটু বাকি । বললাম, আর একটু—আর একটু সময় দাও বারবারা । ভোরের আগেই ছবি আমার শেষ হয়ে যাবে ।

ক্যানভাস থেকে চোখ তুলে তাকাতেই—কোথায়? কোথায় বারবারা? ভাঙা মূর্তি] পাশ থেকে কোথায় হারিয়ে গেল তার সেই অপরূপ মূর্তি?

বিভ্রান্ত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতেই ঝলমলে নীল রেশমি গাউনটা চোখে পড়ল । উত্তর দিকের খোলা জানলা টপকে বারবারা তখন পালাবার চেষ্টা করছে । চিৎকার করে বললাম, যেও না বারবারা—আর একটু সময় আমাকে দাও । বিশ্বাস করো, আর কোনো ভয় নেই তোমার । কাজ আমার সামান্যই বাকি, তারপর নিজের হাতে আমি দরজা খুলে দোব। সানফ্রান্সিসকোর জাহাজ ছাড়তে এখনও সময় আছে বারবারা—যেও না তুমি—

বারবারা তখন পালাবার জন্যে জানলার ওপর উঠে পড়েছে । হাতের তুলি ফেলে দিয়ে পাগলের মতো ছুটে যেতে যেতে ডাকলাম, ঈশ্বরের দোহাই বারবারা, তোমার দোহাই, চলে যেও না—আমার শ্রেষ্ঠ কীর্তি এভাবে নষ্ট হতে দিও না—

তার কাছে পৌঁছবার আগেই বারবারা লাফিয়ে পড়ল বাইরের বাগানে ।

আবার ডাকলাম, যেও না বারবারা—

জানলার বাইরে কুয়াশা আর অন্ধকারে মাখামাখি। তারই মধ্যে শুধু শোনা গেল পলাতকার পায়ের আওয়াজ।

মাথার মধ্যে আমার আগুন জ্বলে উঠল। পলকের মধ্যে কী ঘটে গেল জানি না। পায়ের কাছে পড়েছিল একটা ভাঙা কাফ্রীর মুণ্ড—নিরেট, কালো পাথরের তৈরি। চকিতে সেই ভারী মুণ্ডটা কুড়িয়ে অন্ধকারে পায়ের আওয়াজ লক্ষ্য করে ছুড়ে দিলাম—

হু-হু উত্তরে হাওয়া চিৎকার করে একবার ককিয়ে উঠেই চুপ করে গেল।

সে কি হাওয়ার শব্দ, না বারবারার শেষ আর্তনাদ?

ছোট ঘর থেকে টর্চটা এনে জানলা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়লাম। টর্চের আলোয় কিছুদূরে বাগানের ভিজে মাটির ওপর নীল গাউনটা ঝলমলিয়ে উঠল। পা দুটো যেন সীসের মতো ভারী হয়ে উঠল। সেই ভারী পা-দুটো টেনে টেনে টলতে টলতে কাছে গিয়ে দেখলাম, মাথার খুলির পেছন দিকটা গুঁড়িয়ে গেছে। রক্তে আর কাদায় মিশে একাকার!

খুন! ... খুন করেছি আমি!

হঠাৎ প্রচণ্ড একটা শীতের প্রবাহ আমার হাড় পর্যন্ত আড়ষ্ট করে দিল। হাত-পা সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল ঠকঠক করে, আর সেই জমাট করা ঠান্ডায় মস্তিষ্কটাও যেন অবশ হয়ে এল। তারপর ধীরে— অতি ধীরে যেন আমার চেতনা একটু একটু করে ফিরে আসতে লাগল। মনে হল, এখুনি ভোর হয়ে যাবে, বাগানের ধার দিয়ে দিনের লোক-চলাচল শুরু হবে, খবর যাবে পুলিশ-স্টেশনে, আসবে পুলিশ, খুনের চার্জে নিয়ে যাবে আমাকে। তারপর খবরের কাগজে বড় বড় হরফে ছাপা হবে: আর্টিস্ট নিশীথ সেন খুনি!

তারপর বিচার ... জেলখানার সেল ... তারপর একদিন ভোররাত্রে ফাঁসির দড়ি ...

বিদ্যুতে শক খাওয়ার মতো আমার শিরা-স্নায়ুগুলো ঝন ঝন করে উঠল। আমার আদিম চেতনা আমাকে বলে দিল, নিজেকে বাঁচাও— আগে নিজেকে বাঁচাও—যত শিগগির পারো!

পা দিয়ে ঘষে ভিজে মাটিতে রক্তের দাগগুলো নিশ্চিহ্ন করে দিলাম। তারপর ফার- কোটটা এনে বারবারার মৃতদেহকে ঢেকে তুলে নিলাম কাঁধে।

তখন ভোর হয়ে আসছে। তবু ঘন কুয়াশার চারদিক ধোঁয়াটে, অস্পষ্ট। ঠাওর করে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, কেউ কোথাও নেই। সামনে খালের ধারে ল্যাম্প- পোস্টটার নীচে কনস্টেবলটাও নেই। কে থাকবে এই ঝোড়ো শীতের ভোররাত্রে?

নিশ্চিন্ত আশ্বাসে বাগানের ফটক খুলে বেরিয়ে পড়লাম। আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ালাম খালের ওই কাঠের সাঁকোটার ওপর। নীচের দিকে তাকালাম—কালো জলস্রোত অন্ধকার মৃত্যুর মতো বয়ে চলেছে। দম-দেওয়া যন্ত্রের মতো আমার হাত দুটো কাঁধের বোঝাটিকে নামিয়ে একবার খালের ওপরে শূন্যে তুলে ধরল—

তারপর শুধু ঝপ করে একটা শব্দ। মুহূর্তের জন্যে অশান্ত হয়ে উঠল তরল মৃত্যুস্রোত। তারপর আবার স্তব্ধতা।

এতক্ষণে বোধ হয় সানফ্রান্সিসকোর জাহাজ ছাড়বার শেষ ঘণ্টা বাজছে!

সেই কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে জনহীন সাঁকোর ওপর কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম, তা জানি না। আর আমার কিছুই মনে নেই প্রতুল। এইখানে এসে আমার স্মৃতি গেছে হারিয়ে।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙল, তখন অনেক বেলা। মাথা অসহ্য ভারী, দারুণ পিপাসায় গলা উঠেছে শুকিয়ে। গতরাত্রের ঘটনাটা মনে পড়তেই মাথার ভেতরটা গোলমাল হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি হলের মধ্যে গিয়ে দেখি, না, সব ঠিকই আছে, কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলা নেই। বুঝতে পারলাম, দুঃস্বপ্ন দেখেছি—নিছক একটা দুঃস্বপ্ন! নিমেষে দেহ-মন সুস্থ হয়ে উঠল। মাথাটাও হালকা হয়ে গেল। বেরিয়ে এলাম বাগানে। প্রশান্ত দিন, উজ্জ্বল রোদ দেবদারু শাখায় শাখায় ঝলমল করছে। গতরাত্রির দুঃস্বপ্নটা ভুলে যেতে চেষ্টা করলাম।

ভুলে গিয়েও ছিলাম, কিন্তু আজ ১৩ ডিসেম্বর, এক বছর পরে সেই স্বপ্ন-কাহিনি আবার নতুন করে মনে পড়ল।

কাহিনি বলা শেষ করে নিশীথ থামল। পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরাল একটা।

পাইপের আগুনটা নিভে গিয়েছিল। তবু সেই নিভন্ত পাইপ মুখে প্রতুল বড় সোফাটায় হেলান দিয়ে পূর্ণাবয়ব ছবির মতো স্থির হয়ে বসেছিল। কপালে অল্প একটু কুঞ্চন-রেখা ছাড়া তার সারা মুখে চাঞ্চল্যের আর কোনো চিহ্ন নেই। এতক্ষণে পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, তোমার স্বপ্ন-দেখার পরের দিন বারবারা স্মিথ তার ছবিখানা ডেলিভারি নিতে আসেনি?

নিশীথ বললে, না। আর সবচেয়ে আশ্চর্য, এই দীর্ঘ এক বছরের মধ্যে বারবারা স্মিথ কোনোদিনই ছবিখানা নিতে আসেনি।

হুঁ, না আসাই স্বাভাবিক।—পাইপ ঠুকে পোড়া তামাকটা ফেলে দিতে দিতে প্রতুল বললে, ঠিক এক বছর আগে খবরের কাগজে একটা রিপোর্ট বেরিয়েছিল: বারবারা স্মিথ নামে সানফ্রান্সিসকোর একটি মেয়ে ১৩ ডিসেম্বর রাত্রে পার্ক স্ট্রিটে তার ফ্ল্যাট থেকে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছে। পুলিশ বহু চেষ্টাতেও তার কোনো সন্ধান পায়নি। তোমার স্বপ্ন-কাহিনির সঙ্গে এই ঘটনাটার অদ্ভুত যোগাযোগ রয়েছে, না নিশীথ? খবরটা তুমিও নিশচয় পড়েছিলে?

এক মুহূর্ত প্রতুলের মুখের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থেকে নিশীথ জবাব দিলে, না, আমি পড়িনি প্রতুল।—তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে ভারী ওভারকোটটা গায়ে দিয়ে বললে, যাকগে ও-কথা। রাত অনেক হল, ঝড় আজকে আর থামবে বলে মনে হয় না। চলো, যাওয়া যাক।

প্রতুলের ওভারকোটটা গায়েই ছিল, টুপিটা মাথায় গিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, চলো।

হলের আলো নিভিয়ে দুজনে বাইরে এল। স্টুডিয়োর দরজা বন্ধ করার জন্যে নিশীথ পকেট থেকে চাবি বার করতেই প্রতুল বললে, একটু দাঁড়াও, তামাকের পাউচটা টেবিলের ওপর ফেলে এসেছি।

ওভারকোটের কলার তুলে দিয়ে নিশীথ বললে, নিয়ে এসো। বেশি দেরি কোরো না কিন্তু। আজ মারাত্মক শীত পড়েছে হে, ঠান্ডায় জমে যাচ্ছি!

প্রতুল একা হলের মধ্যে ঢুকে বাতি জ্বাললে। তারপর টেবিলের ওপর থেকে পাউচটা নিয়ে পকেটে পুরলো। ফিরে আসতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল, উত্তরের জানলাটা খোলা। কী অন্যমনস্ক এই নিশীথ, বন্ধ করতে ভুলে গেছে! কিংবা এমনও হতে পারে যে, তার দুঃস্বপ্নের মধ্যে বারবারা স্মিথ এই জানলা দিয়ে পালাতে গিয়ে খুন হয়েছিল বলে নিশীথ এদিকটায় বড়-একটা আসে না। জানলাটায় গরাদ নেই, বন্ধ করে যাওয়াই ভালো। নইলে সারারাত ঝোড়ো হাওয়া আসবে, চোর আসাও বিচিত্র নয়।

প্রতুল জানলার কাছে এগিয়ে গেল। কিন্তু কপাট দুটো বন্ধ করতে গিয়ে সে স্তব্ধ হয়ে গেল। জানলার ছিটকিনির হুকে কী যেন একটা বস্তু আটকে রয়েছে না? সেটা তুলে প্রতুল আলোয় ভালো করে দেখল। দেখতে দেখতে তার প্রশস্ত কপালে আবার সেই কুঞ্চন-রেখা দেখা দিল। জীবনে এতখানি আশ্চর্য বোধ হয় আর সে কখনও হয়নি! এতখানি আঘাতও সে কমই পেয়েছে জীবনে।

উত্তরের জানলাটা আর বন্ধ করা হল না। ছিটকিনি-খোলা কপাটদুটো ঝড়ে বুক-চাপড়ানির মতো আছড়ে আছড়ে পড়ছে, সেদিকে প্রতুলের খেয়াল নেই।

কী হে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার দুঃস্বপ্নের ব্যাখ্যা ভাবছ নাকি? আর আমি বেচারি এদিকে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার দাখিল!—দরজা ঠেলে ঢুকে নিশীথ বললে।

চকিতে প্রতুল হাতের বস্তুটা পকেটে পুরে ফেললে। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, তাই বটে!

অসহিষ্ণু কণ্ঠে নিশীথ বললে, সে-কথা আর একদিন শোনা যাবে। আজকে চলো—

প্রতুল এগিয়ে গিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ-গভীর দুই চোখের দৃষ্টি নিশীথের মুখের ওপর ফেলে শান্ত গলায় শুধু বললে, না, আজই শুনে যাও।

আরও অসহিষ্ণু কণ্ঠে নিশীথ বলে উঠল, কাল শুনব'খন ।

না, আজই শোনো ।

প্রতুলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিশীথের গলা কেমন যেন দুর্বল হয়ে এল । শুধু বললে, বলো—

বারবারা স্মিথকে তুমি সত্যিই খু-ন ক-রে-ছ নিশীথ!

অন্ধকারে সাপ দেখার মতো চমকে উঠল নিশীথ । পরক্ষণেই তার গলা দিয়ে বিশ্রী বীভৎস এক অট্টহাসি রোল বেরিয়ে এসে ঘরের খিলানে খিলানে ধাক্কা খেয়ে ঘুরে ঘুরে ফিরতে লাগল । তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললে, সাবাস ডিটেকটিভ! বলিহারি তোমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা!

শান্ত-কঠিন স্বরে প্রতুল বললে, মিথ্যে স্বপ্ন দিয়ে সত্য ঘটনাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা কোরো না নিশীথ । আমি জানি, এক বছর আগে ১৩ ডিসেম্বরের রাত্রে বারবারা স্মিথ তোমার এই স্টুডিয়োতে এসেছিল, আর তুমিই তাকে খুন করেছ ।

বটে! ... প্রমাণ?

প্রতুল নিঃশব্দে কোটের পকেট থেকে সেই বস্তুটা বের করে নিশীথের সামনে ধরলে । জিনিসটা আর কিছুই নয়, নীল সিল্কের একটা রুমালের ছিন্ন অংশ । এক বছরের রোদে-জলে নীল রং অনেকখানি বিবর্ণ হয়ে গেছে । এক কোণে পুরোনো রক্তের মতো কালচে লাল সুতো দিয়ে বোনা একটি অক্ষর—B.

প্রতুল বললে, উত্তরের জানলা টপকে পালাতে গিয়ে বারবারার হাতের নীল রুমাল ছিটকিনির হুকে আটকে যায়, সে-রাত্রে তুমি তা লক্ষ করোনি নিশীথ । কিন্তু কে জানত, তারই ছিন্ন অংশ আজ এক বছর আগেকার এক হত্যা-রহস্যের সূত্র ধরিয়ে দেবে ।

নীল রুমালটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিশীথের গরিলাকৃতি মুখখানা রক্তহীন হয়ে গেল । নিচেকার পুরু ঠোঁট ঝুলে পড়ল কদাকারভাবে । তারপর দেখতে দেখতে তার চোখে এল বন্য হিংস্রতা । রোমশ দুই বাহু বাড়িয়ে ক্রুদ্ধ গরিলার মতো সে নিমেষে প্রতুলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল, কিন্তু তার আগেই প্রতুলের অপর হাতে দেখা দিয়েছে তার নিত্যসঙ্গী পিস্তল ।

এক পা-ও এগিয়ো না নিশীথ!

ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মতোই নিশীথ একটা চাপা গর্জন ক'রে উঠল ।

পিস্তলটা তার দিকে উঁচু করে ধরে প্রতুল শান্ত বেদনাহত কণ্ঠে বলতে লাগল, তোমার আমার বন্ধুত্ব আজ আঠারো বছরের । দিনে দিনে এই বন্ধুতা নিবিড় অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে । তবু, খুনি যে, তাকে বন্ধুতার খাতিরে আমি ছেড়ে দিতে পারব না নিশীথ ।— হাত তোলো! চলো—

দুই হাত তুলে পিছন ফিরে নিশীথ আস্তে আস্তে দরজা দিয়ে বেরোলে । প্রতুলের পিস্তলের নলটা তার পিঠ রইল ছুঁয়ে ।

পিছন ফিরেই নিশীথ বললে, স্টুডিয়োর দরজা চাবি বন্ধ করে দিও প্রতুল ।

মুখ ফিরে চাবি বন্ধ করতে দু'সেকেন্ডের বেশি লাগেনি, কিন্তু তারই মধ্যে কুয়াশা আর অন্ধকারে ভারী জুতোর আওয়াজ পেয়ে প্রতুল চিৎকার করে উঠল, পালি না নিশীথ—পালাবার চেষ্টা কোরো না! নিশীথ—নিশীথ—

ভারী জুতোর আওয়াজ ক্রমশ খালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে । উদ্যত পিস্তল হাতে আওয়াজ লক্ষ্য করে প্রতুল ছুটল।

পালিয়ো না নিশীথ—নিশীথ—

ভারী জুতোর আওয়াজ কাঠের সাঁকোর ওপর গিয়ে পৌঁছেছে । সাঁকোর ওপর কালো ওভারকোট মোড়া আবছা মূর্তি লক্ষ্য করে প্রতুলের পিস্তল গর্জে উঠল, দুম ... দুম ...

আবছা কালো মূর্তিটা একবার সাঁকোর রেলিঙের ধারে স্থির হয়ে দাঁড়াল । তারপর শুধু ঝপ করে একটা শব্দ হল মাত্র ।

প্রতুল ততক্ষণে সাঁকোর ওপরে গিয়ে পৌঁছেছে । নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল, তরল কালো মৃত্যুস্রোত মুহূর্তের জন্যে অশান্ত হয়ে উঠে আবার শান্তবেগে বয়ে চলেছে—ঠিক যেমন হয়েছিল এক বছর আগে এই ১৩ ডিসেম্বরের রাত্রে ।

সাঁকোর ওপর প্রতুল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল । তার এক হাতে পিস্তল, অপর হাতে আর্টিস্ট নিশীথ সেনের স্টুডিয়োর দরজার চাবি ।

সে-দরজা হয়তো আর কোনোদিনই খুলবে না!

তুমি জানো না

অমলেন্দু সামুই



তোমাকে আমি প্রায়ই চিঠি লিখি । সপ্তাহে অন্তত তিনখানা । কাজের ফাঁকে-ফাঁকে যখনই সময় পাই— তখনই মনে-মনে কথার পর কথা সাজিয়ে রাখি । তারপর বাড়ি ফিরে দরজায় খিল লাগিয়ে আমার হালকা নীল রঙের প্যাডখানা টেনে নিই। চিঠি লেখার জন্যে তুমি হালকা নীল রং খুব পছন্দ করতে । এখন তোমার পছন্দ আমারও পছন্দ হয়ে গেছে । তোমাকে সাদা কাগজে চিঠি লেখার কথা ভাবতেই পারি না । তোমার কাগজের রঙে রং মিলিয়ে লিখতে খুব ভালো লাগে । ভালো লাগে বলেই আমি হালকা নীল রঙের প্যাড ব্যবহার করি । যখনই তোমাকে চিঠি লিখতে বসি— তখনই মনে পড়ে তোমার সেই স্বপ্ন-ঘেরা বাড়ির কথা । কথাটা তুমি প্রায়ই বলতে । বলতে— বেশ সুন্দর একখানা বাড়ি হবে । শহরে নয়— গাঁয়ে । অনেক দূরে, আকাশের গায়ে দু-চারটে পাহাড় দেখা যাবে । কাছেই থাকবে ক্ষীণতনু খরস্রোতা নদী । সেই নদীর কাছে একটা একতলা বাড়ি । সামনে থাকবে ছোট একটা গেট । তার ওপর মাধবীলতার আবরণ । অর্ধচন্দ্রাকৃতি গেটের নীচে ডানদিকে থাকবে ছোট একটা সবুজ রঙের লেটারবক্স । তার গায়ে হলুদ অক্ষরে লেখা থাকবে 'শিউলিবাড়ি' । তোমার নামে বাড়ির নাম । তোমার হয়তো মনে নেই, আমি বলেছিলাম, লেটারবক্সের রং হোক হলুদ— তার ওপর নাম সবুজ রঙে । তাহলে বেশ কিছুটা দূর থেকেই বাড়ির নাম, মালিকের নাম চোখে পড়বে । তুমি বলেছিলে, না, সবুজের ওপর হলুদ লেখাই আমার ভালো লাগে । লেখা দেখার জন্যে তাহলে সবাইকে খুব কাছে আসতে হবে । কাছে এলেই দেখতে পাবে— গেট থেকে লাল সুরকির পথটা সোজা বাড়িটার পায়ের কাছে পৌঁছে গেছে । পথের একদিকে সাদা ফুলের মেলা, অপরদিকে রঙিন ফুলের বাসর । সুন্দর সাজানো-গোছানো দুটি বাগিচা । তুমি 'বাগান' বলতে না— 'বাগিচা' ।

এর আগে যে-চিঠিখানা তোমাকে লিখেছিলাম— তাতে বলেছি— তোমার স্বপ্নে-ঘেরা বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে । বাংলাদেশের মধ্যেই ছোট একটা পাহাড়ি জায়গা । কাছে নদীও আছে । কিন্তু লোকবসতি খুব কম । হোক কম— তুমি নিরালাই বেশি পছন্দ করতে । বলতে, সেখানে আমি তো কথা বলব না— শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করব । বুদ্ধি দিয়ে, বিবেক দিয়ে কোনোকিছু বিচার করব না । হৃদয়ের কাছে যা কাম্য— তা-ই হবে আমার কাজ ।

আমি তোমার কথা শুনে হাসতাম । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হয়েও তুমি বড় বেশি ছেলেমানুষি করতে। আমি কিন্তু ওগুলো প্রাণভরে উপভোগ করতাম । তাই তোমার গাম্ভীর্য আমায় ব্যাকুল করে তুলত । মনের মধ্যে নানা প্রশ্নের ঢেউ তুলে তোমার গাম্ভীর্যের কারণ খুঁজতাম— কিন্তু পরক্ষণেই তুমি হাসির ঢেউয়ে সবকিছু ভাসিয়ে দিতে । আমার খুব ভালো লাগত । ভালো লাগত তোমার স্বপ্ন, ভালো লাগত তোমার কথা, ভালো লাগত তোমার সবকিছু । আজও ভালো লাগে । গভীর রাতে ঘরের আলো নিভিয়ে যখন

বিছানার ওপর কর্মক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিই— হয়তো জানলা দিয়ে একঝলক চাঁদের আলো আলনাটার পায়ের কাছে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে— তখন তোমার পুরোনো কথাগুলো আমার কানের কাছে মধুর স্বরে যেন গান শোনাত। তোমার কণ্ঠস্বর এত মিষ্টি, উচ্চারণ-ভঙ্গি এত সুন্দর ছিল যে, তুমি কথা বললেই মনে হত গান গাইছ। অথচ তোমাকে আমি কোনোদিন গান গাইতে শুনিনি। তুমি আবৃত্তি করতে। বিশেষ করে কবিগুরুর প্রেমের কবিতাগুলো তোমার কণ্ঠে শুনতে ভারী ভালো লাগত।

আজ যদি তুমি এখানে আসতে— দেখতে তোমার স্বপ্ন-ঘেরা বাড়িকে আমি বাস্তবে রূপায়িত করেছি। ঠিক যেখানে যা চেয়েছিলে তুমি— সব সেইভাবেই সাজিয়ে রেখেছি। আলনায় নতুন কেনা আটপৌরে শাড়ি, তার পাশে আমার ধুতি— তোমার শায়া-ব্লাউজ—আমার গেঞ্জি-জামা— সব পাশাপাশি গুছিয়ে রেখেছি। যদি কোনোদিন তুমি এসে পড়ো— তাহলে অবাক হয়ে যাবে। মনে হবে—এই বাড়িতেই থাকতে তুমি। তোমার প্রয়োজনের সব জিনিসই আমি কিনে রেখে দিয়েছি। তুমি এলে তোমার এতটুকু অসুবিধে হবে না। কিন্তু তুমি আসবে কি? জানি না— আজও তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পেরেছ কি না। একটা মিথ্যাকে সত্য জেনে তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছ। অথচ আমাকে জিগ্যেস করবার প্রয়োজনও মনে করোনি। যদি জিগ্যেস করতে— তাহলে জানতে পারতে কতখানি ভুল তুমি করেছিলে। কিন্তু তুমি নিজের অভিমান নিয়েই পড়ে রইলে। আমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করলে না।

যেদিন তোমাদের বাড়ির দরজা থেকে আমাকে ফিরে আসতে হয়েছিল— সেদিন মুহূর্তের জন্যে এই পৃথিবীটাকে বড় কঠিন বলে মনে হয়েছিল। মায়া-মমতা-ভালোবাসা— সবকিছু যেন বইয়ের ভাষা— বাস্তবের এতটুকু ছাপ নেই। পাশাপাশি দুটো মানুষ যেন প্রয়োজনের জন্যেই কাছাকাছি থাকছে। অন্তরের টান এতটুকু নেই। বড্ড শক্ত মনে হয়েছিল তোমাদের বাড়ির সামনেকার সবুজ ঘাসগুলো। তোমাদের বাড়ির দরজা থেকে আমার মেস—পাঁচ মিনিটের পথও নয়— কিন্তু মনে হয়েছিল, ওইটুকু পথ পেরোতে আমার বেশ কয়েক বছর সময় লেগে গেল। সেদিন মনে হয়েছিল— আমার বেঁচে থাকাটা নিরর্থক। কার জন্যে— কীসের জন্যে বাঁচব— কথাটা আবার নতুন করে ভাবতে হয়েছিল।

তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে— আমরা কয়েকজন ছাত্র তোমার বাবার কাছে পড়তে আসতাম। তোমার বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ছিলেন। আর আমরা একটা ডিগ্রির লোভে বারবার তোমার বাবার কাছে আসতাম। তুমি বোধহয় তখন থার্ড-ইয়ারে পড়ছ। আর তোমার বোন পাপিয়া সবে কলেজে ভরতি হল।

প্রথম দিনই তোমার বাবা তোমার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, এটি হল আমার বড় মেয়ে, নাম শিউলি। এর সঙ্গে আলাপ করে রাখো। কারণ আমার লাইব্রেরির চাবি এর কাছেই থাকে।

কথাটা বলার ধরনে আমরা সবাই হেসে উঠেছিলাম। আমরা মানে— আমি, চন্দন সোম, অনিরুদ্ধ চৌধুরী আর কৌশিক গুপ্ত।

চন্দন সোম অকস্মাৎ প্রশ্ন করে বসেছিল, আপনি কী খেতে ভালোবাসেন?

প্রশ্নটা তোমাকে করা হচ্ছে বুঝতে পেরেও তুমি একটু অবাক হওয়ার ভান করেছিলে। চোখ দুটো একটু নাচিয়ে বলেছিলে, আমি?

চন্দন সোম বলেছিল, হ্যাঁ—আপনি।

তুমি বলেছিলে, কেন বলুন তো?

তাহলে রোজ সেই জিনিসটা নিয়ে আসব— আর আপনি আমাদের বেশি করে বই দেবেন।

ওভাবে আমি বই দিই না। পড়াশুনোয় যার মনোযোগ বেশি, সে-ই বেশি বই পাবে।

তোমার বাবা হেসে বলেছিলেন, আমার মেয়েটি কিন্তু খুব কড়া। বই নিয়ে খেলা করতে দেখলেই রেগে যাবে।

আরও দু-চারটে হালকা কথাবার্তার পর তোমার বাবা বললেন, এটাকে তোমরা নিজের বাড়ি বলেই মনে করো। যখনই সময় পাবে চলে আসবে, আমার লাইব্রেরিতে বসে পড়াশুনো করবে। কোনোরকম সঙ্কোচ

কোরো না।

বলা বাহুল্য, প্রাথমিক আলাপে যে-সঙ্কোচ আমাদের ছিল—দু-চারদিনের মধ্যেই সেটা আমরা কাটিয়ে উঠেছিলাম। আমাদের মধ্যে আমিই ছিলাম একটু লাজুক প্রকৃতির। তাই বোধহয় তোমার দৃষ্টি আমার ওপর আগে পড়েছিল। আরা আসতাম— কোনোদিন তোমার বাবা থাকতেন— কোনোদিন হয়তো থাকতেন না। আমরা সোজা লাইব্রেরি-ঘরে চলে যেতাম। তুমি কোমরে কাপড় গুঁজে সারা ঘরে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াতে। এখানে এ-বইটা রাখা, ওখান থেকে সেই বইটা নামানো— শাড়ির আঁচল দিয়ে বইগুলো মুছে যথাস্থানে রাখা— আমরা বইয়ের পাতা খুলে পড়ার চেষ্টা করতাম— আর তার মাঝে লীলায়িত ভঙ্গিতে তুমি ঘুরে বেড়াতে। ওদের কথা জানি না— আমি কিন্তু তোমার উপস্থিতিতে বইয়ের পাতায় মনঃসংযোগ করতে পারতাম না। তোমার আলতা-রাঙানো পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

তোমাদের বাড়িতে একটা জিনিস লক্ষ করেছিলাম— তোমার মাকে কোনোদিন আমরা দেখিনি। অথচ অনুভব করতে পারতাম— তিনি আছেন। তোমার মাকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করত। তোমাদের যাওয়া-আসায় যখন দরজার ভারী পরদাটা একটু নড়ে উঠত, সেই ফাঁক দিয়ে আমি তোমার মাকে দেখতে চেষ্টা করতাম। তুমি জানো— আমার মা খুব ছেলেবেলায় মারা গেছিলেন। তাই বোধহয় মা সম্বন্ধে অত দুর্বলতা।

একদিন— মনে আছে— সন্ধ্যার সময় আমি তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তারিখটাও আমার মনে আছে। কলিংবেলের আওয়াজে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিলে তুমি। আমার ভালোও লেগেছিল, আবার ভয়ও করছিল। ভালো লেগেছিল কারণ ভালো লাগাটা ছিল স্বাভাবিক। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা বেশি না হলেও—তোমার সম্বন্ধে আমি কেমন যেন একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। তোমাদের বাড়ি থেকে ফিরে এসে ঘরের আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়তাম বটে, কিন্তু ঘুম আসত অনেক দেরিতে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে আমি যেন তোমাকে দেখতে পেতাম। তুমি কথা বলছ, হাসছ— কিন্তু চোখ দুটি ব্যথা-মলিন। মনে হয়, কী যেন তুমি বলতে চাও— অথচ বলতে পারছ না। আমি মনে-মনে হাতড়ে মরতাম— কেন অমন সুন্দর চোখদুটি সবসময় ব্যথায় ভরে থাকে? বড্ড জানতে ইচ্ছে করত। অথচ তোমাকে জিগ্যেস করতেও ভয় হত, লজ্জা করত। আমার মনে হত— আমার দুঃখের সঙ্গে তোমার ব্যথাভরা-চোখের কোথায় যেন মিল আছে। আর সেই মিল খুঁজতে গিয়ে কত রাত আমি না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি।

সেদিন সন্ধ্যায় তোমাদের বাড়িতে আমি একাই গিয়েছিলাম। তুমি দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিলে, আমাকে সামনে দেখতে পেয়ে বললে, ভেতরে আসুন।

আমি বললাম, স্যার—।

বাড়ি নেই।

তাহলে আমি বরং যাই। পরে আসব'খন।

ওমা, চলে যাবেন কেন?— ভুরু দুটো একটু কাঁপিয়ে ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম হাসির রেশ টেনে তুমি বলেছিলে, ভেতরে আসুন।

আমি ভেতরে এসেছিলাম। বুকের ভেতরটা একটা অজানা আনন্দে থরথর করে কাঁপছিল। তোমার কাছাকাছি এলেই ওটা হত। তোমার নির্দেশমতো একটা চেয়ারে বসলাম। তুমি বললে, আপনি এসেছেন ভালোই হয়েছে— একা-একা বোর হয়ে যাচ্ছিলাম।

একা-একা কেন?

বা রে—বাবা-মা-পাপিয়া— সব চলে গেল যে!

চলে গেল? কোথায়?

বালিগঞ্জে। পিসিমার বাড়িতে।

ও—তাই বলো। আনি ভাবলাম বুঝি—।

দাঁড়ান— চা তৈরি করে আমি। চা খেতে-খেতে গল্প করা যাবে।

বলে তুমি চলে গেলে। হঠাৎ মনটা আমার খুশিতে ভরে উঠল। তোমাদের অত বড় বাড়ি। অথচ তুমি-আমি ছাড়া কেউ নেই। মনে-মনে এইরকমই একটা সুযোগ আমি যেন চেয়েছিলাম। একা-একা তোমাকে অনেকগুলো কথা বলবার জন্যে মনের ভেতরটা ছটফট করতে লাগল। অথচ ভয়ও করছিল। যদি তুমি আমাকে ভুল বোঝো! আমার স্বাভাবিক চাওয়াকে যদি হ্যাংলামো ভাবো। বলব কি বলব না— মনস্থির করতেই বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। তুমি চা নিয়ে ঢুকলে। এক পলক তাকিয়েই বুঝতে পারলাম, এই অবসরে তুমি মুখে একবার পাউডারের পাফটা বুলিয়ে নিয়েছ। চোখে আর-একবার কাজলের সূক্ষ্ম রেখা টেনেছ। বুঝতে পারলাম, আমার কাছে তুমি নিজেকে সুন্দরতর করে তোলার চেষ্টা করেছ। সেই মুহূর্তে নিশ্চিত হলাম যে, আমার প্রতিধ্বনি তোমার হৃদয়েও বাজে। যে-কথাগুলো এতক্ষণ মনের জোরে সংগ্রহ করছিলাম— সেই কথাগুলো খুব স্বাভাবিকভাবেই তোমাকে বলে ফেললাম। লক্ষ করলাম, আমার কথা শুনতে-শুনতে বারবার তুমি ওপরের দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরলে, ভুরু দুটো কী এক চঞ্চলতায় থরথর করে কাঁপতে লাগল, চোখের দৃষ্টি আরও গভীর হল— তোমার দু-গালে সূর্যাস্তের রং ধরল।

সেদিন আর পড়া হল না। নিস্তব্ধতার মধ্যে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে আমি চলে এলাম। এর আগে বহুদিন আমি রাত্রে ঘুমোতে পারিনি, কিন্তু সেদিন না ঘুমোতে পারার মধ্যে এক স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করেছিলাম। মনে হয়েছিল, এ-জীবনে বেঁচে থাকার একটা অর্থ আছে, একটা আনন্দ আছে। একজন নারীর কাছে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার মধ্যে যে এত সুখ আছে, তা কে জানত!

তারপর থেকে তোমাদের বাড়িতে আমার যাওয়াটা খুব স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে গেল। তোমার বাবা ভাবলেন, আমি বুঝি পড়াশোনায় অধিক মনোযোগী হয়েছি। কিন্তু তোমার মুখে সবসময় একটা দুষ্টু হাসি খেলা করত। সকলের চোখ এড়িয়ে তুমি ইশারায় আমাকে একটু বেশিক্ষণ থাকতে বলতে। আমি যখন রসিকতা করে তোমার সঙ্গে আমার বর্তমান সম্পর্কের কথা বলতাম, তুমি কটাক্ষ করে আমাকে শাসন করার ভঙ্গি করতে— আমার খুব ভালো লাগত। ভালো লাগত, বোধহয় তুমি বলেই।

এমনিভাবে আমরা আরও কিছু এগোলাম। বাড়ির সীমানার বাইরেও আমাদের দেখা হতে লাগল। কোনোদিন হেদুয়া, কোনোদিন কলেজ স্কোয়ার, কোনোদিন বা আরও একটু দূরে— বালিগঞ্জ লেকে। মাঝে একদিন তোমার সঙ্গে তোমার বোন পাপিয়াও এসেছিল। পাপিয়াকে আমার খুব ভালো লাগত। অমন বোন যদি আমার একটা থাকত! পাপিয়া মাঝে-মাঝে তোমার সামনে আমাকে 'জামাইবাবু' বলে সম্বোধন করত। তুমি নকল রাগে তার চুল টেনে দিতে।

একদিন তুমি বলেছিলে, সুদীপ্ত, এভাবে আর থাকতে পারছি না। একটা কিছু করা দরকার।

আমি বুঝতে না পেরে বলেছিলাম, কীসের কী করা দরকার?

অসভ্য! যেন জানে না!

সত্যি বলছি বুঝতে পারছি না।

জানি— তার মানে আমার মুখ থেকে কথাটা শুনতে চাও। বেশ বাবা— তাই বলছি। —বলে তুমি আনমনে ঘাসের শিষ চিবোতে লাগলে। সেদিনের আবহাওয়াটা ভারী সুন্দর ছিল। সকাল থেকেই দিনটা মেঘলা। দুপুরের দিকে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বিকেলে কিছুক্ষণের জন্যে সূর্যের মুখও দেখা গেছিল। আকাশে নীল মেঘের খেলা। বালিগঞ্জ লেকটাকে সেদিন সুন্দরী তরুণীর মতো মনে হচ্ছিল।

আমি বললাম, কই— বলো।

তুমি আধো-আধো স্বরে বললে, এভাবে আর তোমার অপেক্ষায় বসে থাকতে ভালো লাগে না। কখন তুমি আসবে আর আমি সারাদিন ধরে ঘড়ির কাঁটা দেখতে-দেখতে পাগল হয়ে যাই। দুপুরটাকে কী বড় লাগে!

আমি কী করব বলো। তবুও তো এখন আমি পড়াশোনার নামে রোজই যাই। আগে যে সপ্তাহে দু-তিনদিন যেতাম— তখন ভালো লাগত কী করে?

আহা— তখন আমি এসব ভাবতাম! তখন তো তুমি শুধু বাবার ছাত্র ছিলে।

আর এখন?

এখন— আমারও ছাত্র হয়েছ।

তাহলে আমাকে কী করতে হবে আদেশ করুন, মাস্টারমশাই।

তোমাকে যাতে সবসময় দেখতে পাই— সেই ব্যবস্থা করো।

অর্থাৎ?

তুমি বাবার কাছে যাও।

সেদিনই রাত্রে তোমার বাবাকে আমি সব কথা খুলে বলেছিলাম। বলেছিলাম, আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যাটিকে আমি চাই। তোমার বাবা আপত্তি করেননি। বলেছিলেন, বেশ তো— তার জন্যে এত তাড়া কীসের! পরীক্ষা হয়ে যাক— তারপর একদিন এ-বিষয়ে আলোচনা করা যাবে'খন।

কিন্তু সেই সুযোগ আর এল না। একটা মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে দিলে। একবার জিগ্যেস করবার প্রয়োজনও অনুভব করলে না। তুমি হয়তো জানতে না যে, তোমার বোন পাপিয়ার সঙ্গে চন্দন সোমের ঘনিষ্ঠতা অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়েছিল। পড়াশোনার ফাঁকে-ফাঁকে আমরা যেমন একসঙ্গে থাকবার সুযোগ খুঁজতাম— ওরাও তাই করত। কিন্তু নিজেদের নিয়ে আমরা বড় বেশি ব্যস্ত ছিলাম বলে ওদের ঘনিষ্ঠতা আমাদের চোখে পড়েনি। চোখে না পড়লেও পাপিয়া চন্দন সোমকে ভালোবাসত, ভালোবাসত গভীরভাবেই।

তোমার হয়তো ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে। গোড়া থেকেই বলি। একদিন সন্ধ্যার সময় তোমাদের বাড়িতে গিয়ে দেখি, তুমি বাড়ি নেই। পাপিয়া একটা চেয়ারে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছে। আমায় দেখে একগাল হেসে বলল, বসুন, সুদীপ্তদা— দিদি একটু বেরিয়েছে।

কোথায় গেছে?

আসবে এখুনি। বসুন না।

বসলাম। অপেক্ষা করতে-করতে ক্রমে ধৈর্যহারা হয়ে পড়লাম। পাপিয়া বুঝতে পেরে বলল, একটা গল্প বলুন, সুদীপ্তদা— গল্প বলতে-বলতে দিদি এসে যাবে নিশ্চয়ই।

একটা গল্প বলতে শুরু করলাম। গল্প বলতে-বলতে হঠাৎ টেবিলের তলায় একটা খাম নজরে পড়ল। নিচু হয়ে তুলে নিলাম। পাপিয়া দেখতে পেয়ে তড়িৎগতিতে উঠে এল : ওটা আমার চিঠি— দিয়ে দিন, সুদীপ্তদা।

মজা করার জন্যে বললাম, দাঁড়াও— কে দিয়েছে দেখি।

ভালো হচ্ছে না কিন্তু— ওটা আমার পারসোনাল লেটার— আপনি পড়বেন না।

পারসোনাল লেটার! তাহলে তো একবার পড়ে দেখা দরকার।

পাপিয়া আমার হাত থেকে খামখানা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। আমিও একবার এ-হাতে একবার ও-হাতে নিয়ে সেটাকে ঘোরাতে লাগলাম।

প্লিজ, সুদীপ্তদা— দিয়ে দিন।

কে লিখেছে বলো?

আগে দিন— তারপর বলছি।

উঁহু— অত বোকা আমি নই। আগে বলো— তারপর দেব।

কথা বলতে-বলতেই ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে খামখানা কেড়ে নিতে গেল পাপিয়া। আমি সেই মুহূর্তে হাতটা পেছনদিকে সরিয়ে নিলাম। টাল সামলাতে না পেরে পাপিয়া আমার বুকের ওপর পড়ে গেল

।

পারলে না তো! — আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম ।

আপনি ভীষণ অসভ্য! পরের চিঠি দেখতে আছে বুঝি?

ঠিক সেই মুহূর্তে তোমার আবির্ভাব হয়েছিল ঘরের মধ্যে । সেদিন বুঝিনি— কিন্তু আজ বুঝতে পারি— আমাদের ওভাবে দেখে তোমার মনে একটা নোংরা সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল । সন্দেহের সঙ্গে ছিল ঈর্ষা । তাই অস্বাভাবিক গম্ভীর গলায় বলেছিলে, পাপিয়া— আজ লেখাপড়া নেই?

আছে তো । দেখ না দিদি— সুদীপ্তদা আমার চিঠি দিচ্ছে না ।

সুদীপ্ত, চিঠিখানা দিয়ে দাও পাপিয়াকে ।

সেদিন তোমার এই আদেশকে আমি খুব স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছিলাম । তাই চিঠিটা ফেরত দিতে-দিতে বলেছিলাম, নেহাত তোমার দিদির আদেশ— তাই দিলাম— নইলে না-পড়ে কিছুতেই দিতাম না ।

পাপিয়া এক হাতে বুকের কাপড় ঠিক করতে করতে অপর হাত দিয়ে খামখানা আমার হাত থেকে নিল ।

তুমি আবার বললে, পাপিয়া— যাও— গিয়ে পড়াশুনো করো ।

পাপিয়া তোমার দিকে অপলক তাকিয়ে ঘর থেকে চলে গেল । বোধহয় তোমার কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিক রূঢ়তায় সে চমকে উঠেছিল ।

পাপিয়া চলে যেতে আমি চেয়ার থেকে উঠে এসে বলেছিলাম, কোথায় গিয়েছিলে? আমি এদিকে সন্ধে থেকে এখানে বসে আছি ।

সন্ধে থেকে এসে বসে আছ?

সন্ধে থেকেই তো! পাপিয়াকে জিগ্যেস করে দ্যাখো ।

থাক— আর জিগ্যেস করতে লাগবে না । তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি ।

আমি একটু হেসে বলেছিলাম, জানো—কাল তোমার বাবাকে বলেছিলাম— ।

তুমি উত্তর দিলে, পরে শুনব'খন, সুদীপ্ত— আজ আমি বড় টায়ার্ড ।

আমি আর তোমাকে জোর করিনি । সেদিন যদি ঘুণাক্ষরেও অনুমান করতে পারতাম যে, ওটা তোমার ক্লান্তি নয়— সন্দেহ—তাহলে হয়তো তোমাকে আমি বোঝাবার চেষ্টা করতাম । কিন্তু সেটুকু অনুমান করার মতো সুযোগ তুমি আমাকে দাওনি । তাই তোমাকে বিশ্রাম করবার অবকাশ দিয়ে আমি চলে এসেছিলাম ।

এই ঘটনার পর বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল । আপতদৃষ্টিতে তুমি আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিলে । লেকে বেড়াতে-বেড়াতে তুমি বলেছিলে, জানো— আমার ভারী ভালো লাগে ভাবতে— বেশ সুন্দর একটা এল-শেপের বাড়ি হবে । সামনে থাকবে ছোট একটা গেট । গেটের ওপর থাকবে মাধবীলতা । সেখান থেকে লাল সুরকি ঢালা রাস্তাটা সোজা চলে যাবে বাড়িটার পায়ের কাছে । রাস্তার দু-দিকে থাকবে ফুলের বাগিচা । একদিকে সাদা, আর একদিকে রঙিন ফুলের মেলা। গেটের কাছে একটা লেটার বক্স । সবুজ রঙের । তার ওপর হলুদ রঙে ঠিকানা লেখা থাকবে ।

সেদিনই মনে-মনে ঠিক করে ফেলেছিলাম, পরীক্ষাটা হয়ে গেলে তোমার মনের মতো করে একখানা বাড়ি তৈরি করব । উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া কিছু টাকা আমার ছিল । সেই টাকা দিয়ে তোমার স্বপ্ন আমি সফল করে তুলব । কিন্তু তুমি তখন সন্দেহের দোলায় দুলছ । ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলছ । পাপিয়া আর আমাকে একসঙ্গে দেখলেই তোমার চোখদুটো জ্বলে উঠত ।

তারপর একদিন সেই ভয়ঙ্কর দিনটা এগিয়ে এল । মনে আছে, কী-একটা উপলক্ষে সেদিন আমাদের সবাইয়ের নেমন্তন্ন ছিল তোমাদের বাড়িতে । হইহই করে আমরা সন্ধ্যার মধেই এসে পড়েছিলাম । তোমার আবৃত্তি, পাপিয়ার গান আসরটাকে বেশ জমিয়ে রেখেছিল । তারপর খাওয়ার সময় এল । আমরা চার বন্ধু একসঙ্গে খেতে বসেছিলাম ।

চন্দন তোমাকে বলেছিল, আপনারাও আমাদের সঙ্গে বসে পড়ুন । মিথ্যে রাত বাড়িয়ে লাভ কী ।

তুমি উত্তর দিয়েছিলে, মেয়েদের এখন খেতে নেই । সবাইকে খাইয়ে তারপর খেতে হয় ।

চন্দন বলল, আপনি দেখছি এখনও সেই পুরাকালে পড়ে আছেন ।

তুমি হেসে জবাব দিলে, ভুলে যাবেন না, খাওয়ার ব্যাপারটা সেই পুরাকালেও ছিল ।

অস্বীকার করছি না । তবে পুরাকালে তো অনেক কিছুই ছিল, তার সবগুলোই কি আপনি মানেন?

তুমি ঈষৎ কটাক্ষে বলেছিলে, যেমন?

পুরাকালে তো মেয়েরা পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলত না ।

সেটা মানতে পারলে ভালোই হত দেখছি— তাহলে এভাবে ঝগড়া করতে হত না ।

আমরা সকলে হেসে উঠলাম । চন্দন বলল, তাহলে হার স্বীকার করলেন তো?

এখনও করিনি । ঝগড়াটা মুলতুবি রইল । পরে একদিন বোঝাপড়া করা যাবে'খন ।

তোমার নিশ্চয় মনে আছে, আর আমার তো চিরকাল মনে থাকবে, সেদিন তুমি আমার সঙ্গে একটা কথাও বলোনি । ইচ্ছে করেই বলোনি । নিজেকে জোর করে কাজের মধ্যে ব্যস্ত রেখেছিলে । এমনকী, পরিবেশন করার সময় একবারও মুখ ফুটে জিগ্যেস করোনি, আমার কোনওকিছুর প্রয়োজন আছে কিনা । ব্যাপারটা সকলেরই চোখে পড়েছিল । পরের দিন পাপিয়ার মৃত্যুর খবরটা দিতে এসে চন্দনও আমাকে বলেছিল । আর সেইজন্যেই আমার সঙ্গে তোমার কথা-না-বলাটা আরও বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছিল আমার কাছে ।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে বেশ দেরি হয়েছিল । আর ঘুম ভাঙার পর তোমার কথাই প্রথম মনে পড়েছিল । এরকম প্রায়ই হয় আমার । ঘুম ভাঙার পরেও যখন বিছানায় পড়ে থাকি— তখন শুধু তোমার কথাই মনে হয় । সেদিনও হয়েছিল । আগের রাত্রে তোমার কথা-না-বলা থমথমে মুখখানা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল ।

আগের রাতে খাওয়ার শেষে যখন পাপিয়া আমায় ডাকল, সুদীপ্তদা— আসুন, আপনাকে একটা জিনিস দেখাব । তখন মুহূর্তের জন্যে তোমার চোখদুটো জ্বলে উঠেছিল । আমিনা-দেখার ভান করে পাপিয়ার সঙ্গে ওর ঘরে গিয়েছিলাম । তোমরা দু-বোন একই ঘরে শুতে । দেখেছিলাম খুব সুন্দর সাজানো-গোছানো মেয়েলি ঘর একখানা । আর ঢুকতেই নাকে একটা অপরিচিত গন্ধ এসে লেগেছিল । হতে পারে ওটা তোমাদের চুলের গন্ধ, হতে পারে ওটা পুরোনো কোনো সেন্টের গন্ধ । এমনকী শুকনো ফুলের গন্ধ হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই ।

ঘরে পা দিতেই পাপিয়া বলল, বসুন ।

আমি বসলাম । পাপিয়া দরজা ভেজিয়ে দিল । তারপর বলল, কেন ডেকেছি বুঝতে পারছেন?

বললাম, ওই যে কী একটা দেখাবে বললে ।

ছাই দেখাব ।— বলে আঙুল দিয়ে বালিশের ওপর দাগ কাটতে লাগল । আমি বেশ অসহায় বোধ করলাম । ঠিক এইভাবে এত রাতে অনাত্মীয়া কোনো যুবতী মেয়ের সঙ্গে দরজা বন্ধ করে কথা বলতে আমি অভ্যস্ত নই । নিজের চঞ্চলতা ঢাকার জন্যে পাশবালিশটা কোলের ওপর টেনে নিলাম ।

আমি চুপ করে রইলাম । মনের উত্তেজনা বাড়তে লাগল ।

পাপিয়া বলল, আমার কথাগুলো শুনে আপনি যদি আমাকে একটা খারাপ মেয়ে ভাবেন— তাহলে দোষ দেওয়ার মতো কিছু নেই । কিন্তু অনেক ভেবে দেখলাম— আপনি ছাড়া আমার কোনো গতি নেই । কথা দিন— আমাকে সাহায্য করবেন ।

ভেতরে-ভেতরে আমি ঘামতে শুরু করলাম । তবুও যথাসম্ভব শান্ত কণ্ঠে বললাম, আগে সব কথা খুলে বলো ।

আপনি বাবাকে বলে আমার আর চন্দনের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন ।

পাপিয়ার স্পষ্ট কথায় একটু চমকে উঠেছিলাম । কিন্তু ব্যাপারটা জানা ছিল বলে বেশ স্বাভাবিকভাবেই বললাম, বেশ তো— তার জন্যে এত তাড়া কেন? ধীরে-সুস্থে একদিন বললেই হবে ।

না— আর দেরি করা যায় না ।

কেন? দেরি করা যায় না কেন! আগে তোমার দিদির বিয়ে হোক— তারপর তো— ।

দিদির কথা জানি না । কিন্তু আমার এখুনি বিয়ে হওয়া উচিত ।

মনের মধ্যে একটা ছোট্ট সন্দেহ দানা বেঁধে উঠল । তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পাপিয়ার দেহটা দেখতে লাগলাম ।

পাপিয়া মাথা নিচু করল । বলল, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বুঝেছেন— আমি মা হতে চলেছি ।

বালিশ ফেলে দিয়ে তড়িদাহতের মতো উঠে দাঁড়িয়েছিলাম : কী বলছ তুমি পাপিয়া?

আপনি আমাকে বাঁচান, সুদীপ্তদা ।

চন্দন জানে?

হ্যাঁ ।

কী বলছে ও?

ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চায় ।

স্কাউন্ড্রেল ।

একটা তীব্র ঘৃণায় সারা দেহটা রি-রি করে উঠল আমার । ভাবতে লজ্জা হল— চন্দন আমারই ঘনিষ্ঠ বন্ধু । পাপিয়াকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বললাম, তুমি কিছু ভেবো না পাপিয়া, আমি এখুনি চন্দনকে ডেকে সব বুঝিয়ে বলছি ।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলে চন্দন ঘরে ঢুকল ।

আমাকে বুঝিয়ে বলার কিছু নেই সুদীপ্ত । পাপিয়া যদি আমার কথা শুনত— তাহলে এসব কিছুই হত না । আমি ওকে অনেক বলেছি— ডাক্তার সরকার আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু— কাকপক্ষীতেও টের পাবে না ।

পাপিয়া গর্জে উঠল, থাক— তোমাকে আর বীরত্ব দেখাতে হবে না । যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারতাম যে, শুধুমাত্র ক্ষণিক আনন্দের জন্যে তুমি— ।

আর বলতে পারল না পাপিয়া— ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল ।

চন্দন আমাকে বলল, তুই নীচে যা, সুদীপ্ত— আমি ওকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করি ।

চন্দনের দিকে অপলক তাকিয়ে বারান্দায় পা দিলাম আমি । ওদের ব্যাপার— ওদের মধ্যে বোঝাপড়া হওয়াই ভালো । কয়েক পা এগিয়েছি, চন্দনের কণ্ঠস্বর কানে এল, কেন তুমি সুদীপ্তকে এ-কথা বললে?

আর দাঁড়ালাম না । হনহন করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলাম । সিঁড়ির মুখে তোমার সঙ্গে দেখা । তুমি মুখ ঘুরিয়ে নিলে । আমি চলে এলাম ।

পরের দিন সকালে চন্দন এসে খবর দিল— পাপিয়া আত্মহত্যা করেছে । চমকে উঠলাম খবরটা শুনে । কয়েক মিনিট আমি কোনো কথা বলতে পারিনি । ঘৃণিত দৃষ্টিতে চন্দনের দিকে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম ।

চন্দন বলল, নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হচ্ছে, সুদীপ্ত । কিন্তু পাপিয়া যে এতখানি ছেলেমানুষি করে ফেলবে ভাবতেও পারিনি ।

গম্ভীর গলায় বললাম, পাপিয়ার আত্মহত্যাকে তাহলে তুমি নিছক একটা ছেলেমানুষি ভাবছ?

তা ছাড়া আর কী ভাবব বলো । ওর মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে— এভাবে হঠাৎ— ।

আরও অনেক কথা বলেছিল চন্দন । কিন্তু সেসব শোনার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না । চন্দনের সঙ্গে তোমাদের বাড়িতে যখন এসে পৌঁছলাম— তখন পুলিশ এসে পড়েছে । তোমার বাবা পাথর হয়ে একটা সোফায় বসে আছেন । চারিদিকে এক নিদারুণ স্তব্ধতা ।

পুলিশ গতানুগতিক পদ্ধতিতে সবাইকে কিছু-কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে পাপিয়ার দেহ নিয়ে চলে গেল শবব্যবচ্ছেদের জন্যে ।

সকলে জানল— পাপিয়া আত্মহত্যা করেছে । চন্দনের কাছেই শুনলাম, তোমার ধারণা পাপিয়ার আত্মহত্যার জন্যে পরোক্ষভাবে আমিই দায়ী । আমিই নাকি তাকে অকাল মাতৃত্বদানে কলঙ্কিত করেছি । আমাদের এতদিনের মেলামেশা— এত ভালোবাসার পর তুমি যে আমার সম্বন্ধে এরকম একটা বিশ্রী ধারণা করে বসবে বিশ্বাস করতে পারিনি । তাই সেই মুহূর্তেই ছুটে এসেছিলাম তোমার কাছে । সেদিনও তোমাদের বাইরের ঘরের দরজাটা বন্ধ ছিল । মনের মধ্যে তীব্র একটা উত্তেজনা নিয়ে কলিংবেল বাজিয়েছিলাম । তুমি এসে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিলে ।

তোমাকে দেখে একরাশ আশা নিয়ে কথা শুরু করলাম, এই যে, শিউলি— শুনলাম তুমি নাকি চন্দনের কাছে বলেছ— ।

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই তুমি রূঢ়ভাবে বলেছিলে, তোমার সঙ্গে আমার কোনো কথা নেই । বলে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল ।

দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে আমার হৃৎপিণ্ড বুঝি স্তব্ধ হয়ে গেছিল । চোখের সামনে থেকে তোমাদের বাড়িটা মুছে গিয়ে একরাশ গাঢ় অন্ধকার জমা হয়ে গেছিল । কয়েক সেকেন্ড মাত্র । তারপর পা চালালাম মেসের উদ্দেশে । তোমাদের বাড়ির দরজা থেকে আমার মেস— পাঁচ মিনিটের পথও নয়— কিন্তু মনে হয়েছিল ওইটুকু পথ পেরোতে আমার বেশ কয়েক বছর সময় লেগে গেল ।

কিছুদিনের বিরতি দিয়ে আবার আমি তোমার কাছে গিয়েছিলাম । গিয়ে শুনলাম, তুমি একটা স্কুলের চাকরি নিয়ে বিহারের কোন এক গ্রামে চলে গেছ । বুঝেছিলাম, তুমি আমাকে এড়ানোর জন্যেই ওভাবে চলে গেছ । আমার সঙ্গ তুমি চাও না— তাই তোমার এই অসহায় পলায়ন । তোমার ঠিকানায় অনেক চিঠি দিয়েছিলাম । কিন্তু একটাও জবাব আসত না । মাঝে-মাঝে তোমার বাবার কাছে যেতাম । তিনি তখন একেবারে ভেঙে পড়েছেন ।

বলতেন, বুঝলে সুদীপ্ত— শেষ জীবনে কোথায় একটু শান্তিতে দিন কাটাব ভেবেছিলাম— কিন্তু ভগবান তা চাইল না । এক মেয়ে আত্মহত্যা করল— আর-এক মেয়ে আমাকে ছেড়ে চলে গেল ।

আমি তোমার মায়ের কথা বলতে চেয়েছিলাম । কিন্তু দেখলাম, তিনি সযত্নে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলেন । পরে অবশ্য জেনেছি— কেন তোমরা তোমাদের মাকে এড়িয়ে চলতে, কেন তিনি রান্নাঘরের বাইরে আসতেন না । কিন্তু সে-কাহিনি এখানে অবান্তর । তা ছাড়া তুমি তো সবই জানো, তোমাকে নতুন করে শোনাবার মতো কিছুই নেই ।

তুমি চলে যাওয়ার পর বেশ কিছুদিন বিশ্রী এক অবসাদের মধ্যে দিয়ে সময় কাটতে লাগল । মাঝে-মাঝে ইচ্ছে হত— তোমার কাছে চলে যাই, তোমাকে সব বুঝিয়ে বলি । কিন্তু অভিমান এসে পথ আটকে দাঁড়াত । এতদিনেও আমি যখন তোমার বিশ্বাস অর্জন করতে পারিনি, তখন এই ক্ষণিক চেষ্টায় সেটা কি ফিরিয়ে আনতে পারব? তাই তোমাকে শুধু চিঠিই লিখতাম । রোজ ভাবতাম, আজ তোমার চিঠি আসবে । আজ না এলে কাল নিশ্চয় আসবে ।

তোমার চিঠির প্রতীক্ষায় থেকে-থেকে যখন একেবারেই আশা ছেড়ে দিয়েছি— তখন হঠাৎ তোমার একখানা চিঠি এল । সেটাই তোমার শেষ চিঠি । তারপর আরও একবছর কেটে গেছে । তোমার কোনো সন্ধান পাইনি ।

তুমি লিখেছিলে, তোমার চিঠিখানাই উদ্ধৃত করছি :

আমার সুদীপ্ত,

তুমি যখন আমার এই চিঠিখানা পাবে তখন আমি স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি— ছেড়ে দিয়ে কোথায় যাব— এখনও কিছু ঠিক করিনি । শুধু অনুরোধ, আমাকে খোঁজার বৃথা চেষ্টা কোনোদিন কোরো না । সন্ধান তুমি পাবে না । পেলেও আমি ধরা দেব না

। এতদিন একা-একা নিজেকে প্রশ্নে-প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত করেছি— ধিক্কার দিয়েছি— কিন্তু এতটুকু শান্তি পাইনি। মনের কথা মনে চেপে রাখলে বুঝি কোনো দিনও শান্তি পাওয়া যায় না। তাই তোমার কাছে তোমার এই স্বীকৃতি। আশা আছে, এখন বুঝি একটু শান্তি পাব। তোমরা সবাই জানো, পাপিয়া আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু আমি জানি— তাকে হত্যা করা হয়েছে। হ্যাঁ সুদীপ্ত, আমি পাপিয়াকে খুন করেছি। খুন করেছি, ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে। সেদিন যখন অত রাত্রে পাপিয়ার ঘর থেকে তোমাকে বের হতে দেখলাম তখন সারা মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। তুমি আর কাউকে ভালোবাসবে— অথচ আমার সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করবে— কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না। তাই সকলের অজান্তে পাপিয়ার জলের গ্লাসে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলাম। আমি জানতাম, রোজ রাত্রে শোওয়ার আগে ওর জল খাওয়ার অভ্যেস আছে। তাই ওকে মারার জন্যে আমাকে নতুন কোনো পথ বাছতে হয়নি। এক গ্লাস জল আর ছ'টা ঘুমের ট্যাবলেট। দেখলে তো, পাপিয়ার সে-ঘুম আর কোনোদিন ভাঙল না!

আজ আমি বুঝেছি— আমার সন্দেহ কতখানি ভুল ছিল। আমার সন্দেহ যদি সত্যি হত, তাহলে আমি এখানে চলে আসার পরও সপ্তাহে দু-খানা করে তোমার চিঠি আসত না। কিন্তু ভুল শোধরাবার আর সময় নেই।

জানতাম, আমি স্বীকার না করলে কেউ কোনোদিন বুঝতেও পারবে না যে, পাপিয়া আত্মহত্যা করেনি, তাকে খুন করা হয়েছিল। কিন্তু নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে-করে পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি। এখন তুমি ইচ্ছে করলে আমার এই চিঠিখানা পুলিশের হাতে দিয়ে আমাকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারো— আমি আর কোনও কিছুতেই ভয় পাই না। সবকিছুর জন্যে তৈরি হয়ে আছি। ইতি—

তোমার শিউলি।

না শিউলি, তোমার এই চিঠিখানা আমি পুলিশকে দেখাইনি । কোনোদিন দেখাতেও পারব না । সকলে যা জেনেছে— সেটাই সত্যি হয়ে বেঁচে থাকুক । কিন্তু তুমি আর আমাকে এভাবে কষ্ট দিও না । তোমাকে আমি আজও চাই । হ্যাঁ— তুমি খুনি জানা সত্ত্বেও আমি তোমাকে চাই । এভাবে আমার সঙ্গে আর লুকোচুরি খেলো না । যেখানেই থাকো— ফিরে এসো । ফিরে এসো আমার কাছে— তোমার স্বপ্ন-ঘেরা বাড়িতে ।

খুন-খুন খেলা

অসিত মৈত্র



রহস্যকাহিনির পাতায়-পাতায় অনেক খুনের গল্পই আপনারা পড়ে থাকেন । সেইসব গল্পের গোয়েন্দাদের দক্ষতা কী অসাধারণ! কত নিপুণ তাদের বিশ্লেষণী ক্ষমতা! যে-কোনও জটিল চক্রান্তের বেড়াজাল তারা অনায়াসে বুদ্ধির ছুরি দিয়ে কেটে দু-ফাঁক করে দিচ্ছে, তাদের অদ্ভুত ক্ষমতার তারিফ না করে পারা যায় না । মঁসিয়ে দ্যুপাঁ, শার্লক হোমস, এরকুল পোয়ারো, মিস মারপল, ব্যোমকেশ বক্সী— এঁদের কাজ-কারবার তো রীতিমতো ভেলকি বলেই মনে হয় । কিন্তু সত্যি বলতে কী, সাহিত্যের পাতা থেকে বাস্তব পৃথিবীটার ফারাক প্রায় আশমান-জমিন । এই সমস্ত খুনের গল্পের জমকালো গোয়েন্দাদের যদি বইয়ের পাতা থেকে তুলে এনে পৃথিবীর খোলা হাওয়ায় ছেড়ে দেওয়া যায়, তবে দেখবেন দু-দিনেই তাঁদের খ্যাতির ফানুস ফেটে চুপসে গেছে । দৈনিক পত্রিকার পাতায় প্রায়ই তো সেইসব বিকৃত দেহের ছবি ছাপা হয়, রেললাইনের ধারে বা জংলা মাঠের মধ্যে যাদের মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে । খোঁজ নিয়ে জানতে পারবেন, হত্যাকারীর হদিশ পাওয়া তো দূরের কথা, অনেক ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির সঠিক পরিচয়টাই খুঁজে বের করতে পারে না পুলিশ। তা ছাড়া, পথে-ঘাটে খুন তো আকছারই ঘটছে । তার মধ্যে কতগুলোর কিনারা হচ্ছে, আর কতগুলো পুলিশের ফাইলের চাপে পড়ে বিস্মৃতির অতলে ডুবে যাচ্ছে তারই বা সঠিক হিসেব রাখছে কে!

এই যেমন আমার কথাই ধরুন না । এ-পর্যন্ত ছেলে-মেয়ে, কচি-বুড়ো মিলিয়ে মোট পাঁচটা খুন করেছি আমি । রাঁচির পাগলাগারদে বসে আমি আপনাদের গল্প শোনাচ্ছি ভেবে হাসবেন না । আমি এই শহর কলকাতার একজন স্বাধীন নাগরিক । যদি জিগ্যেস করেন, আমাদের সরকার কি এতই বেহেড যে, এমন একখানা খাসা স্বীকারোক্তি পাওয়ার পরও তারা এখনও আমায় গ্রেপ্তার করছে না? অবশ্য সেদিকটাও আমি বেশ ভালো করে ভেবেচিন্তে রেখেছি । তাদের কাছে এটাকে সোজা গপ্পো বলেই চালিয়ে দেব । গপ্পো লেখার অধিকার তোআপনার-আমার সকলেরই আছে ।

তবে এমন মনে করবেন না, আমি একের-পর-এক এতগুলো খুন করে গেলাম আর পুলিশের গায়ে তার আঁচটুকুও লাগল না । প্রথম খুনটার পর তো তারা আমাকে যথেষ্টই নেকনজরে দেখতে শুরু করেছিল । জাঁদরেল দারোগা প্রকাশ মিত্তির বার-দু-তিন আমার ডেরায় এসে হানা দিল । জেরায়-জেরায় আমাকে একবারে জেরবার করে তুলতে চাইল। কেন এসেছিল? কোথায় গেল? রোজ আসত কি না? আমার সঙ্গে মেয়েটার কীরকমের সম্পর্ক? কী-কী কথা হয়েছিল আমাদের মধ্যে? এই সমস্ত সাত-সতেরো নানান ধরনের প্রশ্ন । কিন্তু আমিও তেমন কাঁচা ছেলে নাকি! সবক'টা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি হিসেব করে । শেষকালে

একসময় মুখ চুন করে আস্তে-আস্তে উঠে গেল প্রকাশ দারোগা। এর পরেও অবশ্য কিছুদিন ফেউ-এর মতো লেগে রইল আমার পিছু-পিছু, তবে তাতে কাজ কিছু হয়নি, শুধু হয়রানিই সার হয়েছে।

আমাকে যদি আপনারা সাধারণ আর-পাঁচটা পেশাদার খুনির মতো মনে করেন, তা হলেও মস্ত ভুল করবেন। দস্তুরমতো ভদ্রঘরের ছেলে আমি। লেখাপড়া শিখে বি.এসসি.পাশ করেছি। খুন করা আমার পেশা নয়। তবে ইদানীং সুবিধেমতো এবং মনের মর্জিমাফিক দু-চারটে খুন আমি করেছি। লীনাকে দিয়েই আমার খুনের হাতেখড়ি। এখন অবশ্য মাঝে-মধ্যে মেয়েটার জন্যে যে একটু-আধটু মনখারাপ না হয় এমন নয়। আমাকে আপনারা এতটা নিষ্ঠুর ভাববেন না। কিন্তু কথায় আছে, নিয়তির লিখন কে খণ্ডাবে? আমি তো ছার নিমিত্ত মাত্র! এই লীনাকেই তো একদিন বুকভরে ভালোবাসতাম আমি। কলেজ-জীবনের সেই স্বপ্নমদির দিনগুলোর কথা কি ভোলা যায়! লীনার যেদিন বিয়ে হয়ে গেল সেদিন আমার গোটা হৃদয় কি শূন্য হয়ে যায়নি? আমার বুকের ভেতরকার আকাশ-পাখিটা কী অসহ্য যন্ত্রণাতেই না ভগ্নপক্ষ হয়ে লুটিয়ে পড়েছিল বাস্তব পৃথিবীর কঠিন মাটির ওপর! তবে সময়ই সব ব্যথা মুছে দেয় মন থেকে। ক্রমে-ক্রমে আমার বুকের ওপরও বিস্মৃতির প্রলেপ বুলিয়ে দিল সে।

ছেলেবেলায় বাবাকে কবে হারিয়েছি সঠিক মনে পড়ে না। তাঁর মৃত্যুর পর প্রভিডেন্ট ফান্ড আর লাইফ ইনসিয়োরেন্সের একটা থোক টাকা এসে পড়ল মায়ের হাতে। তার ওপর নির্ভর করেই মা আমাকে মানুষ করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। দুঃখের সংসারের তিলমাত্র আঁচটুকুও কখনও আমার গায়ে লাগতে দেননি। আমার মা ছিলেন যথেষ্ট মিতব্যয়ী প্রকৃতির। তাই বাবার মৃত্যুর পর আঠারো বছর সংসার চালিয়েও সেই টাকার তখনও কিছু অবশিষ্ট রেখে যেতে পেরেছিলেন ব্যাঙ্কে।

লেখাপড়ায় কোনোকালেই আমি নেহাত খারাপ ছিলাম না। মায়ের নিজের বিদ্যের দৌড় ‘কথামালা’ আর ‘বোধোদয়’ পর্যন্ত। কিন্তু ছেলের পড়াশুনোর দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রচণ্ড সজাগ। প্রতিদিন সন্ধেবেলা আমাকে পড়তে বসিয়ে নিজেও বসে থাকতেন কাশীরাম দাসের মহাভারতখানা কোলে টেনে নিয়ে। আমি কী পড়ছি সেটা হয়তো সবসময় বুঝতেন না, কিন্তু পড়ায় আমার মন আছে কি না তা ঠিক বুঝতে পারতেন। আর পাছে নষ্ট হয়ে যাই সেই আশঙ্কায় বাইরের কোনো ছেলের সঙ্গে আদৌ মিশতে দিতেন না আমায়। তাই মা ছাড়া আমার বন্ধু বলতে বিশেষ কেউ ছিল না।

স্কুল-জীবনটা মায়ের কড়া নজরের মধ্যে দিয়েই কাটাতে হয়েছে আমাকে। তারপর স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে একসময় কলেজে এসে ঢুকলাম। ছেলে এবার বড় হয়ে উঠেছে দেখে মায়ের প্রখর দৃষ্টি একটু-একটু করে শিথিল হয়ে এল। তবুও ফার্স্ট ডিভিশনেই আই. এসসি. পাশ করলাম।

লীনা যখন আমাদের কলেজে প্রথম অ্যাডমিশন নিল তখন আমি থার্ড ইয়ারের ছাত্র। বড়লোকের মেয়ে। দেখতে-শুনতেও বেশ ভালো। তাই সকলেই একটু বুক ফুলিয়ে চলার চেষ্টা করত ওর সামনে দিয়ে। আর রূপবান ধনীর দুলালেরও অভাব ছিল না আমাদের কলেজে। কিন্তু অদৃষ্টের কী অদ্ভুত পরিহাস— হঠাৎ একদিনের আলাপের পর থেকে কেন জানি না, আমার সঙ্গেই তার সম্পর্কটা নিবিড় হয়ে উঠতে লাগল ধীরে-ধীরে।

নারী-চরিত্রের বিচিত্রতম দুর্গমতার অন্ত আমার অজানা। তাই আমার প্রতি লীনার এই আকর্ষণের কারণ খোঁজার চেষ্টা করিনি কখনও। তার এই ভালোবাসাকে সহজ, সত্য এবং স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছিলাম।

ছেলেবেলা থেকেই আমি বরাবর নিঃসঙ্গ। পৃথিবীতে সঙ্গী বলতে মা ছাড়া আমার কেউ ছিল না। লীনার সঙ্গ আমায় কোন অপার্থিব আনন্দলোকে নিয়ে গেল! সে যে কী আনন্দ, ভাষায় তাকে ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমার দিন-রাতের সমস্ত স্বপ্ন লীনাকে ঘিরে উদ্বেল হয়ে উঠল।

বুঝতেই পারছেন, আমার দেহ-মনে তখন নবীন যৌবনের জোয়ার। বয়েস কম— অভিজ্ঞতা কম। বাস্তব পৃথিবীর কঠিন মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়িনি একবারও। এই অবস্থায় কল্পনার পাখা কত না সুদূর-

বিস্তৃত হয় । আর, এই স্বপ্নগুলোর ওপর দিয়ে যেন দিনগুলো বরাবর হেঁটে চলেছে...হেঁটে চলবে, ভাবতে ভালো লাগে ।

সেবারে গরমের ছুটিতে লীনারা দার্জিলিং বেড়াতে গেল । লীনার যদিও যাওয়ার ইচ্ছে আদৌ ছিল না, কিন্তু বাড়ির সকলেই যখন যাচ্ছে তখন কোন ছুতোয় বা সে কলকাতায় পড়ে থাকবে! অগত্যা মা-বাবার সঙ্গে তাকেও যেতে হল । যাওয়ার আগের দিন লীনা নিজে থেকেই আমাকে আউটরাম ঘাটে টেনে নিয়ে গিয়েছিল । সেদিন থেকে কলেজে গরমের ছুটি পড়বে । বিকেলের ক্লাস শেষ করে লীনা আমাকে ডেকে নিয়ে গেল । গঙ্গার ধারে একটা নির্জন বেঞ্চে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম আমরা । দুজনের বুকের ভেতর এত বেশি কথা এসে ভিড় করছিল যে, সেগুলোকে ধীরে-সুস্থে প্রকাশ করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না কেউ । শুধু এক অব্যক্ত বেদনায় ছটফট করে গুমরে-গুমরে কেঁদে মরছিল মনটা । একটু-একটু করে কখন যে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নেমে এল তাকিয়ে দেখিনি । আমাদের স্বপ্নের দিনগুলোর ওপরও বুঝি নিয়তি সন্ধ্যার কালো ছায়া টেনে দিল ।

মাস-দেড়েক বাদে যখন লীনা ফিরে এল, তখন আর তাকে যেন চেনাই যায় না । আপেলের মতো টকটকে লাল হয়ে উঠেছে ওর নিটোল গালদুটো । সারা গায়ে টসটস করে ফেটে পড়ছে গোলাপি আভা । শুধু চেহারাতেই নয়, ইতিমধ্যে হাবভাব, স্বভাব-চরিত্রেও যেন এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে ওর । কলেজের করিডরে আমাকে দেখে আড়ষ্ট, ফ্যাকাশে হয়ে গেল ওর মুখ । কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে চলে গেল দ্রুতপায়ে । আমি ব্যথা-বিস্মিত দু-চোখ তুলে তাকিয়ে রইলাম ওর চলে-যাওয়া-পথের দিকে ।

এর পরের দিন থেকে লীনা আর কলেজেই এল না । শুনলাম, ওর বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে । পাত্র এক তরুণ ডাক্তার । দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি পথে আলাপ হয়েছে দুজনের । তারপর ছেলেটা সুযোগ বুঝে আত্মীয়তা পাতিয়ে নিয়েছিল ওদের পরিবারের সঙ্গে । লীনার বাবাও মৃদু হেসে প্রসন্ন মনে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তাকে । এর মাসখানেক বাদে বিয়ে হয়ে গেল ওদের ।

আমার সে-দিনগুলোর কথা আপনাদের বোঝাই কেমন করে! দুঃখে, অপমানে, লজ্জায়, হতাশায় সমস্ত বিশ্বটাই ঝাপসা হয়ে এল দু-চোখের সামনে । মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্বটাও বুঝি আর টের পাচ্ছিলাম না নিজের মধ্যে । পাগলের মতো দিনকতক ঘুরে বেড়ালাম সকাল-সন্ধে । তারপর একসময় লীনার স্মৃতিটা ঘুমিয়ে পড়ল বুকের গভীরে ।

আমি যেবার কলেজ থেকে পাশ করে বেরোলাম, সেই বছরের ডিসেম্বরে মা-ও গত হলেন । এতদিন ধরে মাকে দেখে আসছি, কিন্তু তাঁর যে মরবার মতো বয়েস হয়েছে, এ-কথা কখনও ভাবিনি । তাই প্রথমটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম । মনে হল, এই দুনিয়ায় আমার আর কোনও প্রয়োজনই নেই । সকলের মধ্যে থেকেও আমি যেন সম্পূর্ণ একা । সঙ্গীহীন, সাথীহীন একক নিঃসঙ্গ জীবন । শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যেই সময় কাটিয়ে যাওয়া ।

মনের যখন এইরকম অবস্থা সেইসময় একদিন হঠাৎ ট্রামের মধ্যে নীরেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল । শুনলাম, টালিগঞ্জে ও এখন একটা পোলট্রি ফার্ম ফেঁদে বসেছে । কী খেয়াল চাপল, নীরেনের সঙ্গে ওর পোলট্রি দেখতে গেলাম । তারপর থেকে আমার মাথাতেও পোলট্রির মতলব ঘুরে বেড়াতে লাগল । পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গেলে আমাকে একটা উপায়ের ব্যবস্থা দেখতে হবে । আর শহরের ভিড়ে চাকরি করে বেঁচে থাকার কথা ভাবতেই আমার অসহ্য লাগে । হিসেব করে দেখলাম, ব্যাঙ্কে এখনও হাজার পনেরোর মতো অবশিষ্ট পড়ে আছে । সেই টাকা দিয়েই একটা চান্স নেব ঠিক করলাম । সব যদি ডুবেও যায় তাতেই বা ক্ষতি কী? আমি এখন কোনো কিছুরই পরোয়া করি না ।

এইসব ভেবেচিন্তে দিনকতক নীরেনের সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে বেড়ালাম । পোলট্রি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হল আমার । তারপর আমার কাজ শুরু করলাম ।

এদিক থেকে ভাগ্য আমার সুপ্রসন্নই । বলতে হবে । প্রথমে টলমল করলেও আস্তে-আস্তে আমার ফার্ম নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখল । আমিও দিনরাত এই ফার্ম নিয়েই পড়ে রইলাম । শহরের এক নির্জন প্রান্তে একা-একা দিনগুলো মন্দ কাটছিল না ।

চার বছরের মধ্যে আমি আমার পোলট্রিটাকে মোটামুটিভাবে বৈজ্ঞানিক প্রথায় গড়ে তুললাম । কাঠা-ছয়েক জমি নিয়ে আমার এই পোলট্রি । চারধারে উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা । মুরগিদের জন্যে জাল দিয়ে ঘেরা দুটো বিরাট খাঁচা । এককোণে অ্যাসবেসটসের শেড দেওয়া আমার থাকার আস্তানা । বারান্দার একধারে ইনকিউবেটর, আর মুরগিদের জন্যে মাংসের কিমা বানাবার প্রমাণ সাইজের সেই মেশিনটা । যদিও আমার ছোট ফার্মের পক্ষে এত বড় মেশিনের দরকার ছিল না, তবে পার্ক স্ট্রিটের এক নিলামের দোকানে জিনিসটা খুব সস্তায় পেয়েছিলাম বলেই কিনে এনেছিলাম ।

সেটা শরৎকাল । আকাশ থেকে হিম-হিম ঠান্ডা ঝরছিল সন্ধেবেলা । আমার সারাদিনের কাজের লোক তিনকড়িও ছুটি নিয়ে চলে গেছে কিছু আগে । একা-একা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে একটা বিলিতি ক্রাইম নভেলের পাতা ওলটাচ্ছিলাম অলসভাবে । খুব বেশি আগ্রহ ছিল না বইটার ওপর । এমন সময় সদরে কলিংবেলের আওয়াজ শুনে বাইরে বেরিয়ে এলাম । এসে দেখি, ছোট একটা সুইকেস হাতে লীনা দাঁড়িয়ে । লীনা যে আবার কোনো দিন আমার কাছে আসবে, আবার কোনো দিন আমি ওর দেখা পাব, সে-কথা স্বপ্নেও ভাবিনি । আমার বিমূঢ়, বিস্মিত চোখের সামনে লীনা দাঁড়িয়ে ছিল ।

আরও কিছুক্ষণ বাদে লীনাকে আমি ঘরে এনে বসালাম । ওকে দেখে আমার মন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল, না বেদনায় নীল হয়ে গেল ঠিক বুঝতে পারলাম না । আমার সমস্ত অনুভূতি একবারে অসাড় হয়ে গিয়েছিল । লীনার সঙ্গে কোনো কথাই বলতে পারলাম না ।

আমার পেছন-পেছন লীনাও ঘরে এসে ঢুকল । প্রথমে একটু ইতস্তত করল । তারপর আমার অনুমতি নিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিল । যদিও তার কোনো প্রয়োজন ছিল না । কেননা, এই অসময়ে কেউ কোনোদিন আমার কাছে আসে না ।

প্রথম কথা কে বলবে লীনা বোধহয় তাই ভাবছিল । দু-একবার ঢোক গিলল । মুখ ফুটে কী যেন বলতে গেল । তারপরই মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ।

বিস্ময়ের প্রথম চমকটা কেটে যাওয়ার পর আমি ওকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম । এই ক'বছরে বেশ খানিকটা ভারী হয়ে পড়েছে লীনা । দু-চোখের তারায়-তারায় ঝকমকে হাসির ছটাও কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে । মুখটা আরও বেশি স্থুল । এরমধ্যে পুরোপুরিই বদলে গেছে লীনা! ওকে দেখতে এখন আমার ভীষণ বিশ্রী লাগল । ওর এই কান্নাটাও যেন রং-মাখা অভিনেত্রীর ছলাকলা । চোখের জলে মুখের প্রসাধন ধুয়ে গিয়ে ওকে আমার রীতিমতো অসহ্য লাগছিল ।

আমার তখন সময়ের কোনও হুঁশ ছিল না । কতক্ষণ ও ফুলে-ফুলে কাঁদল তা-ও জানি না । অবশেষে একসময় বর্ষণ-ক্লান্ত লীনা একটু-একটু করে থেমে-থেমে ওর নিজের কথা বলল ।

ওদের দাম্পত্য জীবনের প্রথম ক'টা বছর নিরবচ্ছিন্ন সুখের মধ্যে দিয়েই কেটেছিল । আদরে সোহাগে ওর স্বামী ওকে ভরিয়ে রেখেছিল । কিন্তু চিরটাকাল কবে কার একভাবে কেটেছে! ওদের স্বপ্ন-রঙিন প্রেমের আকাশেও অবসাদের কালো মেঘ জমে উঠল । ওর তরুণ স্বামী ডাক্তার অরুণাংশু নবাগতা এক নার্সের আকর্ষণে বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ল । প্রথম-প্রথম ব্যাপারটা সে গোপন রাখার চেষ্টা করত । লীনাকে কিছু বুঝতে দিত না । কিন্তু ক্রমশই তার সে-ভাব কেটে গেল । অরুণাংশু এখন প্রকাশ্যেই সেই নার্সকে নিয়ে ঘোরাফেরা করে । নাইট শো- তে চৌরঙ্গি পাড়ায় সিনেমা দেখতে যায় দুজনে । অনেক রাতে আকণ্ঠ মদ গিলে টলতে-টলতে বাড়ি ফেরে । লীনা মরে গেলেও কিছুতেই অমন একটা লম্পট লোকের ঘর করতে পারবে না । ইতিমধ্যে এক উকিলকে দিয়ে কোর্টে ডিভোর্সের আবেদন জানাবার ব্যবস্থা করেছে ও ।

তারপর অনেক খুঁজে আমার বর্তমান আস্তানার সন্ধান পেয়েছে । ও এখন নতুন করে আবার আমায় ফিরে পেতে চায় ।

একটু-একটু করে থেমে-থেমে লীনা ওর নিজের কথা বলছিল । ওর নিজস্ব যা কিছু অলঙ্কার সব এই সুটকেসের মধ্যে ভরে নিয়ে এসেছে । এখন এটা আমার কাছে রেখে যাবে । হপ্তাখানেক বাদে ও যখন অরুণাংশুকে সবকিছু জানিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে আসবে, তখন যদি এগুলো নিয়ে কোনো গন্ডগোল বাধে, সেইজন্যেই আগে থেকে এই সাবধানতা ।

লীনাকে দেখে, লীনার কথা শুনে, আমার ভীষণ অস্বস্তি হতে লাগল । ভাবলাম, এ কী উটকো ঝঞ্ঝাট হঠাৎ করে আমার ঘাড়ে এসে চাপল! আমার নির্জন শান্তির প্রাঙ্গণে এই স্থুল আপদটা তবে কি চিরকাল অনড় হয়ে বসে থাকবে! কিন্তু লীনাকে আমি ফেরাই কোন মুখে? বুকভরা প্রত্যাশা নিয়ে ও আজ আমার কাছে এসেছে । বিপদে পড়ে ছুটে এসেছে লীনা। কোন মুখে আমি ওকে ফিরে যেতে বলব!

ভাবতে-ভাবতে আমি খুব বিব্রত হয়ে পড়লাম । প্রথম যৌবনে ভালোবাসার যে-পাখিটা বুকের মধ্যে মরে গেছে, হাজার বসন্তের ডাকেও সে আর কখনও সাড়া দেবে না । একটা জটিল প্রশ্নের জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মতো লীনা আজ আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে । আমি এর সমাধান করব কোন পথে?

লীনা আমার মনের অবস্থা ঠিকমতো অনুভব করতে পারেনি । সেদিকে কোনো নজর-ই ছিল না ওর । ছটফট করতে-করতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি । ভাবনা-চিন্তার গ্রন্থিগুলো সব যেন জট পাকিয়ে গেল মাথার মধ্যে । অতিরিক্ত রক্তের চাপে ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল কান দুটো । আর লীনা তখনও টেবিলে মুখ গুঁজে আমার উত্তরের অপেক্ষায় বসেছিল ।

আমি যখন ঘুরতে-ঘুরতে ওর চেয়ারের পেছনে এসে-দাঁড়ালাম, তখনও লীনা আমার দিকে চোখ তুলে চায়নি । মাঝে-মাঝে শুধু বোবা কান্নার দমকে থরথর করে কেঁপে উঠছিল ওর সারা শরীরটা । কিন্তু আমি আর সে-দৃশ্য বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারলাম না । সবল পেশল দুটো হাত দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে ওর গলাটা টিপে ধরলাম ।

না...না, আমি ওকে ফিরে যেতে বলব কেমন করে?

লীনা প্রথমটা ধড়ফড় করে উঠল । ব্যাপারটা কী ঘটতে চলেছে বোধহয় বুঝতে পারেনি । তারপরই আমার হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল জোর করে । কিন্তু ওর সে-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল । দাঁতে দাঁত চেপে দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে আমি ওর গলাটা টিপে ধরেছিলাম । ধীরে-ধীরে লীনার মাথাটা নেতিয়ে পড়ল টেবিলের ওপর । আর আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে ক্লান্ত কুকুরের মতো হাঁপাতে লাগলাম দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে । আমার সারা গা বেয়ে ঘাম ঝরছিল দরদরিয়ে ।

লীনাকে খুন করার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার কোনো বোধশক্তি ছিল না । একটা চেয়ারে গা এলিয়ে নেশাচ্ছন্নের মতো বসে রইলাম চুপচাপ । তারপর ক্রমে-ক্রমে সংবিৎ ফিরে পেলাম ।

আমি যে কী করলাম আর কেনই-বা করলাম ভেবে ঠিক করতে পারলাম না । যাবতীয় ভাবনা-চিন্তা একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে গেল মাথার মধ্যে । তুহিন-শীতল ভয়ের একটা স্রোত ছড়িয়ে পড়ল দেহের শিরায়-শিরায় । লীনার মৃতদেহটা সাক্ষাৎ যমদূতের মতো ঘাড় মটকে পড়ে আছে চোখের সামনে । ওকে যতই দেখতে লাগলাম, ততই ভয়ে আড়ষ্ট হতে শুরু করল আমার সর্বাঙ্গ । একবার ভাবলাম, সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে অনেক দূরে কোথাও পালিয়ে যাই । কিন্তু কোথায় যাব? কোথায় গেলে এই বীভৎসতার হাত থেকে নিস্তার পাব? এই দুনিয়াটা যে বড়ই ছোট! তা ছাড়া, আমার মনে হল, আমি যেখানেই যাই না কেন, লীনা নিশ্চয়ই তাড়া করে ফিরবে আমার পেছন পেছন । কোনো দিনই ও আমাকে মুক্তি দেবে না ।

মার খেতে খেতে মানুষ একসময় মরিয়া হয়ে ওঠে । ভয়ের হাতে মার খেতে খেতে আমিও এবার মরিয়া হয়ে উঠলাম । যেভাবেই হোক না কেন, আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতেই হবে । দু-হাত দিয়ে ভয়কে প্রতিরোধ করে দৃঢ় পায়ে উঠে দাঁড়ালাম, আর আশ্চর্যরকমভাবে আমার সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিগুলো ক্রমশই

তীক্ষ্ণ আর সচেতন হয়ে উঠতে লাগল। একাগ্র চিত্তে আমি উদ্ধারের পথ খুঁজতে সচেষ্ট হলাম । এত রাতে আমার আস্তানায় যে কেউ বিরক্ত করতে আসবে না, তাতে কোনো সন্দেহ নেই । অতএব, এইটুকু অবসরের মধ্যেই আমার অপকর্মের সমস্ত চিহ্ন পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে হবে ।

প্রথমে ভাবলাম, লীনার মৃতদেহটা কোথাও গিয়ে পুঁতে দিয়ে আসি । কিন্তু পরে মনে হল, তাতে বিপদের সম্ভাবনা প্রচুর । শেয়াল-কুকুরের দৌরাত্ম্য তো আছেই । ওরা কোনোভাবে একবার যদি টের পায়, তবে ঠিক টেনে-হিঁচড়ে সেটাকে মাটির তলা থেকে বের করে আনবে । তা ছাড়া, লীনা বাড়ি ফিরে না গেলে ওর স্বামী অরুণাংশু নিশ্চয় পুলিশে খবর দেবে। আর পুলিশও লীনার খোঁজ করতে-করতে আমার পোলট্রি পর্যন্ত এসে হাজির হবে । এ-পর্যন্ত তারা লীনার হদিশ করতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস । কিন্তু তারপর যে লীনা কোথায় হারিয়ে গেল তার কোনো খোঁজই তারা পাবে না । ফলে ওদের সমস্ত সন্দেহটা এসে পড়বে আমার ওপর । আমি যে লীনাকে খুন করতে পারি এ-কথাও তাদের মনে হবে । আর, খুন করার পর লীনার দেহটা কাছাকাছি কোথাও পুঁতে ফেলাই আমার পক্ষে সবচেয়ে বেশি স্বাভাবিক । ওরা তখন সেটার সন্ধান করতে শুরু করবে । তাই আমি ভুলেও এ-পথ মাড়াব না বলে ঠিক করলাম ।

তবে আমার মুক্তির উপায় কি হবে না? কোন কুক্ষণেই যে লীনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল! নিজের মৃত্যু দিয়েও লীনা আমায় এ কোন বিপদের অতল গহ্বরে ঠেলে দিল! মনে হল, লীনা যেন ছল করে টেবিলে মাথা গুঁজে নিষ্ঠুরভাবে হেসে চলেছে আমাকে ব্যঙ্গ করে । আমার জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রাহুর মতো গ্রাস করে নেওয়ার জন্যেই বুঝি ওর সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীতে । বারে-বারে ও এসে আমার সব সোনার স্বপ্নকে তাসের ঘরের মতো ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে । ভাবতে-ভাবতে আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠছিল । এর প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে! আর, ঠিক সেই মুহূর্তে মেশিনটার কথা আমার মনে পড়ল । মুরগিদের খেতে দেওয়ার জন্যে মাংস কিমা করার বিরাট মেশিনটা তো আমার নাগালের মধ্যেই রয়েছে । সাতশো লেগহর্ন আর পাঁচশো রেড আইল্যান্ডের জন্যে মাসে দু-বার মাংসের ব্যবস্থা করতে হয় । ... পৈশাচিক আনন্দে আমার চোখ দুটো চকচক করে উঠল । বিপদের উত্তাল সমুদ্র পেরিয়ে আমার মনটা এতক্ষণে বুঝি কোনও নিরাপদ বন্দরের আশ্রয় পেল । নিষ্ঠুর আগ্রহে লম্বা ধারালো ছুরিটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে প্রস্তুত হলাম আমি ।

সুষ্ঠুভাবে সমস্ত কাজটা শেষ করতে ঘণ্টা তিন-চার সময় লাগল আমার । একটা বড় ঝুড়ির মধ্যে দলা-পাকানো কিমা করা মাংসের তালগুলোকে জড়ো করলাম । লীনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ওর দেহ থেকে বিছিন্ন করার সময় ঘরের মধ্যে চাপ-চাপ রক্ত জমাট বেঁধে উঠেছিল । নিজের হাতে ধুয়ে-মুছে সাফ করলাম সবকিছু ।

এতখানি অমানুষিক পরিশ্রমের পর স্বভাবতই আমার হাত-পা ক্লান্তিতে অবশ হয়ে এল । চোখের পাতা দুটোও অসহ্য ভারী-ভারী ঠেকল । আপাতত আমার কর্তব্য শেষ । বাকি কাজটুকু খুব ভোরে উঠে সেরে ফেলতে হবে । ঘড়িতে পাঁচটার অ্যালার্ম দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম । সঙ্গে-সঙ্গে আমার দু-চোখ জুড়ে ঘুমের ঘোলা বন্যা নেমে এল ।

পাঁচটা বাজার মিনিট-দুয়েক আগেই আপনা থেকে আমার ঘুম ভেঙে গেল । আমার অবচেতন মন থেকে কে যেন সজোরে ধাক্কা দিয়ে আমায় জাগিয়ে দিল । মুরগিগুলো দু-একটা করে তখন সবে ভোরের ডাক ডাকতে শুরু করেছে । বারোশো মুরগিদের মধ্যে আমি এক বিরাট ভোজ লাগিয়ে দিলাম । আশাতীত সৌভাগ্যে ওরা বেশ মশগুল হয়ে উঠল । আধঘণ্টার মধ্যে লীনার দেহের শেষ চিহ্নটুকুও অবলুপ্ত হয়ে গেল পৃথিবীর বুক থেকে ।

যাক!...এতক্ষণ পরে আবার আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম । সবচেয়ে কঠিন সমস্যার নিখুঁত সমাধান আমি করতে পেরেছি । দিনের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে আমার মন থেকেও বিপদের অন্ধকার কেটে যেতে

শুরু করল। ভোরবেলার তরুণ সূর্য নতুন করে আশার আলো জ্বালিয়ে দিল বুকের মধ্যে। এখন আর আমার কোনো ভয় নেই।

নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরে এসে লীনার সুটকেসটা খুলে দেখতে লাগলাম। একজোড়া নেকলেস, গন্ডাকতক ইয়াররিং, আংটি, চুড়ি এবং এই জাতীয় আরও অনেক অলঙ্কারে ছোট্ট সুটকেসটা পুরো ঠাসা। কমপক্ষে পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকার জিনিস তো হবেই! কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করুন, সেগুলোর ওপর বিন্দুমাত্র লোভও আমার হল না। বরং লীনার জিনিস বলে কেমন এক ধরনের বিতৃষ্ণার ভাব জাগল মনের মধ্যে। আর তা ছাড়া, পুলিশ যে লীনার খোঁজ করতে-করতে আমার আস্তানা পর্যন্ত এসে হাজির হবে সে-বিষয়ে আমি প্রায় একশো ভাগ নিশ্চিত। তখন যদি গয়না-ভরতি এই সুটকেসটা তাদের হাতে তুলে দিতে পারি, তা হলে টাকার জন্যে আমি যে লীনাকে খুন করিনি এটুকু অন্তত তারা বুঝতে পারবে। লীনাকে খুন করার পেছনে আমার আর কী মোটিভ থাকতে পারে তার কোনো হদিশই তারা খুঁজে বের করতে পারবে না। পুলিশের সন্দেহের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার এই একটা সুবর্ণ সুযোগ। এ-সুযোগ আমি হেলায় হারাতে পারি না। তাই সযত্নে লীনার সুটকেসটা আয়রন সেফের মধ্যে তুলে রাখলাম।

এরপরের দিন থেকেই আমি মনে-মনে পুলিশের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। এই একটি মাত্র বিপদের ঘাঁটি এখন আমায় পার হয়ে যেতে হবে। তারপর আবার আমি আগেকার নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবনে ফিরে যেতে পারব। বুকের মধ্যে থেকে এই অস্বস্তির কাঁটাটা যত তাড়াতাড়ি দূর হয়ে যায় আমার পক্ষে ততই মঙ্গল।

পুলিশ এসে আমায় যে-কোনো ধরনের প্রশ্ন করতে পারে, আমিই বা তার কী জবাব দেব, সে-সম্পর্কেও নিজেকে ভালো করে তালিম দিয়ে রাখলাম। অবশ্য, ওরা যে আমায় এত সহজে রেহাই দেবে না, তা আমি জানি। একবার যখন ওদের সন্দেহ আমার ওপর এসে পড়বে, তখন জেরায়-জেরায় আমাকে আরও নাজেহাল করে ছাড়বে। কথার মারপ্যাঁচে কখন যে কী করে বসব তার ঠিক কী? কিন্তু বুদ্ধির খেলায় আমায় জিততেই হবে। দক্ষ দাবাড়ুর মতো আমার প্রতিটি চালই নির্ভুল হওয়া চাই। এর ওপরই আমার জীবন-মরণ সর্বস্ব নির্ভর করছে।

এই ঘটনার সতেরো দিন বাদে বরানগর থানার জাঁদরেল দারোগা প্রকাশ মিত্তির আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। খুব সমাদর করেই তাকে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে এলাম। ঘরে ঢুকে প্রকাশ মিত্তির প্রথমে মাথা থেকে টুপি খুলে টেবিলের ওপর রাখল। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরের চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে নিল। তারপর লীনা যে-চেয়ারে বসে ধরাধাম ত্যাগ করেছিল সেই চেয়ারটা টেনে নিয়ে ধপাস করে বসে পড়ল। আমি তিনকড়িকে চা আর জলখাবারের কথা বলে দিয়ে তার সামনে গিয়ে বসলাম।

আপনি মিসেস লীনা বোসকে চেনেন? ডাক্তার অরুণাংশু বোসের স্ত্রী?

আমি চেয়ারে বসতে-না-বসতেই প্রকাশ দারোগা তার নিজস্ব পদ্ধতিতে আমায় জেরা শুরু করে দিল।

কেন বলুন তো?— আমার গলায় যুগপৎ বিস্ময় ও উদ্বেগের সুর। — দিন পনেরো আগে লীনা একবার আমার এখানে এসেছিল। আর শুধু চেনেন বলছেন কী, লীনা তো একসময় আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল! আমরা দুজনে একই কলেজে পড়তাম।

আপনার এখানে তাহলে তিনি প্রায়ই আসতেন, বলছেন?

না...না, প্রায় আসতে যাবে কেন! বিয়ের পর লীনার সঙ্গে এই আমার প্রথম দেখা।

তবে যে বললেন লীনা দেবী আপনার অনেক দিনের পুরোনো বন্ধু? তা হলে কি তিনি মাঝে-মধ্যে এখানে আসতেন না?

এবারে আমার গলায় খানিকটা রাগের সুর ফুটিয়ে তুললাম। বেশ ঝাঁজালো স্বরে বললাম, কলেজ-জীবনে আমাদের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক ছিল বটে, কিন্তু সেই সূত্রে বিয়ের পরও লীনা আমার এখানে আসত এমন আজগুবি খবর আপনি জোটালেন কোত্থেকে? তা ছাড়া, একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় সে-সম্পর্কেও দেখছি আপনার জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব রয়ে গেছে!

আমার শেষের কথাটায় বুঝি একটু আঁতে ঘা লাগল প্রকাশ দারোগার । এভাবে কথাটা বলা যে উচিত হয়নি সেটা তার মগজে ঢুকল । তাই একটু নড়েচড়ে বসে সান্ত্বনা দেওয়ার ছলে বলল, আহা...আপনি একটুতেই এত চটে উঠছেন কেন! দিনরাত চোর-ডাকাতের সঙ্গে কারবার করতে হয় কিনা, তাই আমাদের কথাবার্তার ধরন-ধারণও কিছুটা কাটখোট্টাগোছের হয়ে গেছে । ওটাকে ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করবেন না । এখন আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, হপ্তাদুয়েক হয়ে গেল লীনা দেবীর কোনো খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছে না । অনুসন্ধান করে আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, তাতে এখানে আসার জন্যেই তিনি শেষ বেরিয়েছিলেন । কিন্তু তারপর থেকেই মিসেস বোসের আর কোনো হদিশ নেই । তিনি এখানে আদৌ এসেছিলেন কি না, যদি এসে থাকেন তবে তারপরই-বা কোথায় গেলেন, এটাই হচ্ছে আমাদের আসল জানার বিষয় ।

এমন সময় চা-জলখাবার হাতে নিয়ে তিনকড়ি ভেতরে ঢুকল । চায়ের সঙ্গে ডবল ডিমের ওমলেট চিবোতে-চিবোতে প্রকাশ মিত্তির আমার কথা শুনতে লাগল ।

আগাগোড়া সমস্ত ইতিবৃত্তই তাকে খুলে বললাম । লীনার সঙ্গে আমার আগেকার সম্পর্ক, তার বর্তমান দাম্পত্য জীবনের কথা, কেনই-বা সেদিন সন্ধেবেলা লীনা আমার কাছে এসেছিল । সবকিছুই চোখ বুজে শুনে গেল দারোগাসাহেব । অবশেষে লীনার গয়না-ভরতি সুটকেসটাও এনে দেখালাম । বললাম, হপ্তাখানেক বাদে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লীনা সেদিন আমার কাছ থেকে বিদায় নিল । আমি ওকে অবশ্য অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম । অরুণাংশুর সঙ্গে গন্ডগোলটা মিটিয়ে নেওয়ার জন্যেও বারবার অনুরোধ জানিয়েছি । কিন্তু লীনা বরাবরই ভীষণ জেদি আর একগুঁয়ে স্বভাবের । আমার কোনো কথাই কানে তুলতে চাইল না । বরং উলটে আমাকেই ভয় পাইয়ে দিল । অভিমানের সুরে বলল, তুমি যদি আমায় আশ্রয় না দিতে চাও তবে আমাকে সুইসাইডই করতে হবে— এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই । ওর কথা শুনে মনে-মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম । তাই বাধ্য হয়ে শেষমেশ লীনার প্রস্তাবেই রাজি হতে হল আমাকে । ভাবলাম, আপাতত এটা না-হয় আমার কাছেই থাকুক । পরে ওর মতিগতি বদলে যেতে পারে । তখন বুঝিয়ে সুঝিয়ে গয়নার বাক্সটা ফেরত দিলেই হবে । কিন্তু এই ক'দিনের মধ্যে ওর আর কোনো সংবাদ-ই পাইনি । আমার ধারণা ছিল, ওদের দুজনের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো মিটমাট হয়ে গেছে । হাজার হোক, অরুণাংশু ওর স্বামী । তাই লীনা হয়তো লজ্জায় আমার কাছে আসতে পারছে না । কিছুদিন বাদে অন্য কাউকে আমার কাছে পাঠিয়ে সুটকেসটা নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে । এই ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলাম আমি ।— তারপর প্রকাশ দারোগাকে লক্ষ করে চোখে-মুখে উৎকণ্ঠার ভাব ফুটিয়ে বললাম, কিন্তু এখন তো মশাই, আপনি আমাকে বেশ ফ্যাসাদে ফেললেন দেখছি! লীনাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ তার গয়না-ভরতি সুটকেসটা পড়ে রইল আমার কাছে! এটা নিয়ে আমি এখন কী করি?

আমার কথাবার্তার ধরনে প্রকাশ মিত্তির একটু ঝিমিয়ে পড়ল । এখান থেকে অনেক কিছু খোঁজখবর পাবে বলে ছুটে এসেছিল, কিন্তু যে-তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল । তবু অমায়িক হেসে বলল, মিথ্যেই আপনি ভয় পেয়ে নার্ভাস বোধ করছেন । আপনার আর ফ্যাসাদের কী আছে? শুধু একটু কষ্ট করে আমার সঙ্গে একবার আপনাকে থানায় যেতে হবে । এই সুটকেসটা সেখানে আমরা জমা করে দেব । এর মধ্যে কী-কী আছে তার একটা লিস্ট করা দরকার । তারপর আপনার ছুটি ।

আমি ভয়ের সুরে বললাম, কী জানি মশাই, কোত্থেকে কী হয়ে যায়! কথায় বলে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা । আপনারাও তো বাঘের চেয়ে কিছু কম যান না ।

আমার কথার ধরনে প্রকাশ দারোগা হো হো করে হেসে উঠল । তারপর তার বাইকে চেপেই থানায় হাজির হলাম। তিনকড়িকে দিয়ে এককুড়ি ডিমও তুলে দিলাম তার ক্যারিয়ারে । দারোগাসাহেব খুশি হয়ে আমার পিঠ চাপড়ে বলল, আপনাদের মতো ইয়াং ছেলেদেরই তো এখন দরকার আমাদের দেশে । কী গভীর অধ্যবসায়েই না তিল-তিল করে গড়ে তুলেছেন এই পোলট্রিটাকে! অথচ আজকালকার সব ছেলে-

ছোকরাদের দেখুন...রকে বসে গুলতানি করছে, আর মাঝে-মধ্যে এর-ওর কাছ থেকে চাকরির জন্যে দরখাস্ত লিখিয়ে আনছে । নিজের থেকে একটা কিছু করার আগ্রহ একবারেই নেই ।

আমি তার কথায় বাধা দিয়ে বিব্রত ভঙ্গিতে বললাম, এ আর কী দেখছেন! কোনোরকমে এটাকে দাঁড় করিয়েছি মাত্র ।

থানা থেকে কাজ শেষ করে যখন বাইরে বেরুলাম তখন আমার প্রাণ মুক্তির আনন্দে ভরপুর । বিপদের কালো পাথরটা এতদিন ধরে বুকের ওপর চেপে বসেছিল । আজ সেটা নেমে যেতে মনটা হালকা হল । জলভারহীন মেঘের মতো স্ফূর্তির হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে পোলট্রিতে ফিরে এলাম । এখন ওরা অনন্তকাল ধরে লীনার খোঁজ করুক ।

খুন করাটা যে এত সহজ এ-কথা আগে কখনও ভেবে দেখিনি । সত্যি বলতে কী, খুন করার পর লোকগুলো কী করে ধরা পড়ে সেটাই এখন আমার কাছে খুব আশ্চর্যের মনে হল । আর এইসব মোটা মাথাওয়ালা প্রকাশ মিত্তিররাই তো তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পোরে!

এর পরও প্রকাশ দারোগা আমার ডেরায় বারদুয়েক এসেছিল । ঘুরে-ঘুরে সমস্ত পোলট্রি দেখল । আমার সব কাজ-কারবারও লক্ষ করল খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে । অবশেষে একদিন হাল ছেড়ে দিয়ে বিরস বদনে বিদায় নিল ।

এই ঘটনার মাসদুয়েক বাদে আমি তিনকড়িকে খুন করলাম । তিনকড়ির সেবায় মুরগিগুলো বেশ ভালোই ছিল । তিনকড়িকে সেবা করে তারা আরও পুলকিত হল । ঘাড় ফুলিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেও কার্পণ্য করল না । পরের দিন সকালে আমি নিজে থানায় গিয়ে তিনকড়ির নামে একটা ডায়েরি করে এলাম । বললাম, গতকাল রাতে তিনকড়ি আমার আলমারি থেকে হাজার-দুয়েক টাকা নিয়ে বেপাত্তা হয়ে গেছে । ডায়েরি লিখতে-লিখতে গম্ভীর গলায় প্রকাশ মিত্তির আমায় উপদেশ দিল : এখনকার দিনে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই, মশাই! কার মনে কোন মতলব খেলা করছে আগে থেকে তার কোনো আঁচ পাওয়া যায় না । এবার তো শুধু দু-হাজার টাকার ওপর দিয়ে ফাঁড়া কেটে গেছে । ও যে আপনাকে খুন করে যথাসর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে যায়নি এর জন্যে মঙ্গলময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন ।

আমি বিনীত হাসি হেসে থানা থেকে বেরিয়ে পড়লাম । প্রকাশ দারোগাকে দেখে আজ আমার খুব মজা লাগছিল ।

গত দেড় বছরে আরও তিনটে খুন করেছি আমি । তবে শেষের খুনটা আমার মনটাকে একেবারে বিষিয়ে দিয়েছে। অনেক খুঁজে-পেতে বিশুকে জোগাড় করেছিলাম । শ্যামবাজারের এক রেস্তোরাঁয় বয়-এর কাজ করত । বছর চোদ্দো বয়েস। খুব চটপটে, শরীর-স্বাস্থ্যও খুব ভালো । মুখে সবসময় একটা হাসি-হাসি ভাব । বেশি মাইনে কবুল করায় আমার পোলট্রিতে কাজ করতে রাজি হল । দেশে তার বুড়ো বাপ-মা আছে । মাসে-মাসে মানি-অর্ডার করে টাকা পাঠায় তাদের নামে । মাসদুয়েক কোনো খোঁজখবর না পেয়ে একদিন বুড়ো-বুড়ি দুজনেই সশরীরে হাজির হল আমার ফার্মে । কিন্তু আমি তো কোন ছার, আমার মুরগিগুলোও হয়তো এতদিনে বিশুর কথা বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছে । তাদের বললাম, অনেকদিন হল বিশু আমার এখান থেকে কাজ ছেড়ে চলে গেছে । তার হিসেব-পত্তরও সব কড়ায়-গন্ডায় মিটিয়ে দিয়েছি সঙ্গে-সঙ্গে ।

আমার কথা শুনে বুড়ি মা-টা তো ভেউভেউ করে কান্না জুড়ে দিল ।— তবে আমাদের বিশু কোথায় গেল...বাবু? সে কি বুড়ো-বুড়িকে কোনও খবর না দিয়েই পালিয়ে গেল?

তার এই নাকি কান্না আমার ভীষণ অসহ্য লাগল । কড়া ধমক দিয়ে দুজনকেই গেটের বাইরে বের করে দিলাম । কাঁদতে-কাঁদতে ফিরে গেল তারা । কিন্তু এরপর থেকেই আমার মনটা অস্বস্তিতে ভরে গেছে । ভাবছি, এবার থেকে খুন করার অভ্যেসটা ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করব । বড্ড বেশি ঝামেলা পোহাতে হয় । আগে থেকে হিসেব করে আটঘাট বেঁধে কাজে নামা, কোথাও একচুল ভুলচুক হওয়ার উপায় নেই—

তাহলেই একবারে আকাশ ভেঙে পড়বে মাথার ওপর । আর সত্যি বলতে কী, এতে আমার লাভও তেমন কিছু নেই । মাঝে-মধ্যে মুরগিদের পেছনে মাংসের খরচাটা বেঁচে যায় এইমাত্র! তার জন্যে মানুষ খুন করা খাটুনিতে পোষায় না । তবে প্রকাশ মিত্তিরকে দেখলেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায় । ওকে বাগে পেলে আমি ছাড়ব না । ওই গোবরগণেশ লোকটা মাসে-মাসে গভর্নমেন্টের এতগুলো করে টাকা গিলছে এটাই বা সহ্য করা যায় কেমন করে! একদিন ফাঁক বুঝে দারোগাসাহেবকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এখানে নিয়ে আসতে হবে । মুরগির বিরিয়ানি আর ঝাল-ঝাল কষা মাংসের লোভ দেখালে নিশ্চয়ই না এসে থাকতে পারবে না । তবে সেটা লোকচক্ষুর অগোচরে হওয়া প্রয়োজন । কেউ যেন তার আগমন-বার্তা ঘুণাক্ষরেও টের না পায় । পুলিশের লোক বলে কথা! কোথা থেকে কী হয়ে যায় বলা যায় না । তার জন্যে স্পেশাল কেয়ার নিতে হবে । তা ছাড়া, দারোগাসাহেব যদি আবার নিজের বাইকে চেপে আসে তবে তো আর-এক ফ্যাসাদ । বাইকটার একটা সদগতির ব্যবস্থা আগে থেকে ভেবে রাখতে হবে । কেননা, সেটা তো আর জোর করে মুরগিদের গিলিয়ে দেওয়া যাবে না ।

আঁধারে সাপ চলে

বিমল সাহা



সাধারণত ছোটগল্পের কোনো ভূমিকা থাকে না। সে নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বয়ংপ্রকাশ। কিন্তু এ-কাহিনি কোনো তথাকথিত নিয়ন্ত্রিত আঙ্গিকে বাঁধা গল্প নয়। তাই সামান্য দু-একটা কথা বলার দরকার। বছর-দুই আগে দিল্লিতে মামাতো বোনের বাড়িতে বিনতা প্যাটেলের সঙ্গে আলাপ হয়। এটি তারই জীবনের ঘটনা। কিছু তার মুখে শোনা, কিছু তার ইংরেজিতে লেখা ডায়েরির মর্মানুসরণ। সত্যি কথা বলতে গেলে, আমার ভূমিকা এই কাহিনিতে অনেকটা অনুলেখকের।— লেখক

৪ ডিসেম্বর

এ আমি কী ভাবছি? না, না, এ হতে পারে না । তাড়াতাড়ি চোখ দুটো ভালো করে মুছে নিলাম । আমি তো ঘুমিয়ে নেই । তাহলে এ আমি কী ভাবছি? ভাবছি, না দেখছি? স্পষ্ট যেন আমার চোখের সামনে চলচ্চিত্রের মতো কতগুলো ঘটনা ঘটে গেল ।

অলকাও এখন কলকাতায়, ওর স্বামী ওখানে বড় ডাক্তার । ওদের বিয়েতে বছর-দুয়েক আগে কলকাতায় গিয়েছিলাম । দে আর হ্যাপিলি ম্যারেড । তবে এ আমি কী ভাবছি! আমার মনে হঠাৎ ওদের কথাই বা ভাসছে কেন? ভালো লাগছে না । তাড়াতাড়ি উঠে রেডিয়োটা চালিয়ে দিলাম । আবার বন্ধ করলাম । স্টিরিয়োটা চালু করলাম । গমগম করে উঠল ঘর জ্যাজ-এর ঝমঝম আওয়াজে । নিজেও একটু টিউনের সাথে নাচলাম । ধুস! তবুও ছবিটা মন থেকে মুছছে না ।

এক প্রচণ্ড অস্থিরতা পেয়ে বসেছিল বিনতা প্যাটেলকে। আসল কথা, হঠাৎ একটা ফ্ল্যাশ, অর্থাৎ, বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো যে-ঘটনা ওর মানসিক পরদায় ছায়া ফেলেছিল, তাই ওকে অস্থির করে তুলছিল।

আশ্চর্য! ডক্টর ভর্মা ইজিচেয়ারে শুয়ে নিজের ঘরে কাগজ পড়ছেন, পাশেই বসে অলকা । হালকা নাইটগাউন পরা। চুলগুলো এলোমেলো । হঠাৎ একটানে ডক্টরের হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নিয়ে কী যেন বলতে লাগল । এমন সময়ে ঘরে এল সুন্দর, ফিটফাট চেহারার এক ভদ্রলোক । এসেই অলকার হাত ধরে কাছে টেনে তার স্বামীর সামনেই সজোরে আলিঙ্গন করল । ডক্টর উঠে কী যেন বলতে গেলেন । হঠাৎ তিনি পড়ে গেলেন উপুড় হয়ে । তারপরই মেঝে ভেসে গেল লাল রক্তে । খুন! খুন!

চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, পাশের ঘর থেকে মা ছুটে এলেন । বললেন, কী হয়েছে বিনী?

কিছু না মা, স্বপ্ন দেখছিলাম ।

মা তো অবাক । দিনেরবেলায় জেগে-জেগে স্বপ্ন দেখছে মেয়ে! বললেন, কীরে, আজ স্কুলে যাবি না? তুই তো একদিন না গেলেই তোর টিচার-ব্রাদাররা দল বেঁধে এসে হাজির হবে!

ঠিক বলেছ, মা । ক'টা বাজে?

৫ ডিসেম্বর

এ-ব্যাপারটা কাল স্কুলে কাউকে কিছুই বলিনি । শুনলে একদল হাসবে । আবার লতিকা, জহিরা, সুমনারা শুনলে বলবে, আমার বোধহয় মেন্টাল ডিজঅর্ডার হতে চলেছে ।

কী যে করি! আজও ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না । বিশেষ করে অলকার ঘরে আসা ওই আগন্তুক লোকটার কথা । তার চোখ-মুখ-চাউনি এত তীব্রভাবে মনে পড়ছে যে, আমি যদি শিল্পী হতাম তবে এক্ষুনি তার ছবি এঁকে ফেলতে পারতাম ।

চওড়া কপাল, ফরসা সুন্দর রং, উজ্জ্বল চোখ, কেবল ডান গালে জুলপির নীচে বেশ বড় একটা জড়ুল । ওই লোকটি কে? ওই কি খুন করল অলকার স্বামীকে? অলকাই বা ও- লোকটার কাছে অত ঘনিষ্ঠ হয়েছিল কেন?

এ তো মহা জ্বালা! অলকা এখন কত দূরে । হয়তো সব ব্যাপারটাই একটা মিথ্যে কল্পনা । সত্যিই তো, মানুষ তার নিজের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেই, এ-ধরনের হ্যালিউসিনেশন দ্যাখে । তবে কি আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি?

৬ ডিসেম্বর

কতদিন অলকাদের খবর রাখি না । কী করব, ওদের একটা টেলিগ্রাম করে দিই— ‘কেমন আছ তোমরা?’ সে-ই ভালো ।

আজ এখানে প্রচণ্ড শীত । তারই ভিতর আবার টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে । গ্রেটার কৈলাস এলাকায় বোধহয় আমিই এত সকালে উঠেছি । চারদিক কেমন ধোঁয়াটে । সূর্যের আলোর কোনো আভাসই নেই । এ-সময়টা কলকাতাকে মনে হয় সুইজারল্যান্ড । ইউনেস্কোর ট্রেনিং-এ তিনমাস ছিলাম সুইজারল্যান্ডে । তখন ওখানে গ্রীষ্মকাল । ঠিক যেন কলকাতার ডিসেম্বর ।

এই সুযোগে অলকার খোঁজ নিতে কলকাতায় গেলে কেমন হয়?

মা শুনলে বলবে, নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে । কিন্তু কী করব! আমি যে খেতে পারছি না, ঘুমোতে পারছি না। মনের ভিতর একটা যন্ত্রণার ঢেউ উথাল-পাথাল । অকারণে গা-শিরশির ভয়! বিশেষ করে ওই আগন্তুকের চেহারাটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না

আজই অলকাকে টেলিগ্রাম করব ।

৯ ডিসেম্বর

‘আমরা সবাই ভালো আছি । তুই একবার এখানে আয় ।’

একইসঙ্গে উদ্বেগের অবসান আর কলকাতা দেখার নিমন্ত্রণ । টেলিগ্রামে অলকার জবাব পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম । অলকা কোনোদিনই আমার ‘মোস্ট ইন্টিমেট ফ্রেন্ড’ ছিল না, তবে অনেকের মধ্যেই একজন বিশিষ্টা । দু-বছর পরে তার খবর পেয়ে আনন্দ হওয়ার চেয়ে আমার ওই উদ্বেগটা যে কেটে গেল, তাতেই আনন্দ হচ্ছে বেশি । আজই স্কুলে দু-একজনকে সব বলেছি । তারা তো হেসেই আকুল । বলল, তুই তো বেশি মিস্টিক, সুপারন্যাচারাল বই পড়িস, তাই যত সব বাজে ভাবনা এসে ভিড় করে ।

বাথরুমে ঢুকে কোনোদিন যা করিনি, আজ তাই করলাম । আনন্দে শাওয়ারের নীচে দু-একবার ‘শেক’ নাচলাম । অকারণেই সাবানটা নিয়ে খানিকটা লোফালুফি করলাম । আর দু-দিন পরেই স্কুল ছুটি হচ্ছে । আজই টেলিগ্রাম করে দেব : ‘কলকাতায় যাচ্ছি!’

মনের সমস্ত মেঘ কেটে গেছে মনে হয়েছিল বিনতার । কিন্তু আশ্চর্য, কলকাতায় যাওয়ার আগের দিন থেকে আবার সেই কল্পনায় দেখা লোকটার চেহারা মনের পরদায় ভেসে উঠল । মনে পড়তে লাগল অলকার লোকটাকে জড়িয়ে ধরার দৃশ্য । ওর ডাক্তার স্বামী মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে । রক্তে ভেসে যাচ্ছে গোটা ঘরের মেঝে!

বুকের ভেতরটা মাঝে-মাঝে ফাঁকা হয়ে যেতে লাগল । একটা করুণ নিশ্বাস কেঁদে-কেঁদে গলে যাচ্ছে বর্ষার মতো। আর তারই সাথে ভয়, ভয়, ভয়, ভয় । কীসের ভয়? মনকে শক্ত করার চেষ্টা করে বিনতা । কন্টিনেন্ট- ঘোরা মেয়ে! একলা-একলা কত দেশ ঘুরেছে সে । আজ এ কী এক বিশ্রী ভয়ের চাবুক তাকে এমন করে মারছে?

না। কলকাতায় তাকে যেতেই হবে। রাজধানী এক্সপ্রেসের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। আর পেছুলে চলবে না। কাল বিকেল পাঁচটায় গাড়িতে উঠলে পরদিন বেলা এগারোটা নাগাদ হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে যাবে। অলকা আসবে স্টেশনে গাড়ি নিয়ে।

অতএব আর কোনো ভাবনা নয়। কালই বিনতা রওনা হবে কলকাতা।

১৩ ডিসেম্বর

আমার সিটটা জানলার ধার ঘেঁষে । পাশের পর-পর দুটো সিটেই এসে বসলেন দুজন গুজরাটি ভদ্রমহিলা । কে একজন বলল, ফিল্ম স্টার সঞ্জীবকুমারের আত্মীয় । মনে-মনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম! কারণ রাজধানী এক্সপ্রেসে এই এক মজা । পাশে হয়তো কালো হোঁতকা কোনো দুর্গন্ধওয়ালা জাঁদরেল লোক এসে বসলেও করার কিছু নেই! ঠিক আমার পেছনের সারিটায় মাত্র একজন মাদ্রাজি ভদ্রলোক । গাড়ি চলতে শুরু করল, সুন্দর স্বাগত সম্ভাষণ দিয়ে লাইট মিউজিক বাজতে লাগল । কিছুক্ষণের মধ্যেই চা সার্ভ করল । দু-একটা ম্যাগাজিন কিনে সামনে রেখে দিলাম । তারপর সামনের খাওয়ার ট্রে-টা টেনে তার ওপর রেখে ডায়েরির পাতা লিখছি, হঠাৎ বেশ একটু গম্ভীর গলায় ইংরেজিতে পেছন থেকে আওয়াজ এল । অনুরোধ : 'আপনার ''ফেমিনা''টা একটু পেতে পারি?' পেছন দিকে একবার না তাকিয়েই বাঁ-হাতে 'ফেমিনা'টা ভদ্রলোককে দিলাম ।

তারপর কিছুক্ষণ কেটে গেছে । ডিনার এসে গেল । রাজধানীর খাবার চমৎকার! খিদেও পেয়েছিল । খাওয়া শেষ করে ন্যাপকিনে হাত মুছে মনে পড়ল 'ফেমিনা'টার কথা । পেছন ফিরে দেখি, আমার পেছনের রো-টার ঠিক পেছনের সিটে 'ফেমিনা'টা পেটের ওপর উলটে রেখে ভদ্রলোক ঘুমিয়ে পড়েছেন । কিন্তু, এ কী! এ যে অবিশ্বাস্য! সেই কপাল, সেই চোখ, সেই মুখ, হ্যাঁ—হ্যাঁ—ওই—তো ...গালের ডান দিকে জুলপির নীচে বেশ বড় একটা জড়ুল! নাইটগাউন পরা অলকাকে ইনিই তো জড়িয়ে ধরেছিলেন । ডক্টর ভর্মাকে তো এই লোকটাই খুন করেছিল! ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। ধুত্তোর! ওটা একটা বাজে কল্পনা । অলকা টেলিগ্রামে জানিয়েছে, সবাই ভালো আছে । ডক্টর ভর্মার কিছু হয়ে থাকলে ও কি আমাকে এভাবে নিমন্ত্রণ জানাত!

১৪ ডিসেম্বর

ভদ্রলোককে আজ আবার দেখলাম । বেশ ফিটফাট । চমৎকার চেহারা । আলাপ করতে সাহস হল না । কী জানি কী ব্যাপার । আর কিছুক্ষণ পরই হাওড়া স্টেশন । অলকার সাথে দেখা হলেই সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে যাবে ।

হাওড়া স্টেশন । লোকে লোকারণ্য । হাতের ব্যাগটা নিয়ে সোজা বিনতা এসে দাঁড়াল ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিংরুমের সামনে । সে-ভদ্রলোককে আর ও লক্ষ করেনি । কোনদিকে গেছে কে জানে! দূরে বিনতা দৃষ্টি মেলে দিল । কই, অলকা তো আসছে না । ঠিকানাটা অবশ্য মনে আছে । না এলে নিজেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওখানে যাবে । না, ওই তো অলকাই আসছে । বিনতা এগিয়ে গেল । অলকাও ছুটতে ছুটতে এল ।

বড্ড দেরি হয়ে গেছে ।— অলকা এসে ওকে জড়িয়ে ধরল ।

না, তোর দেরি হয়নি । রাজধানী এক্সপ্রেস একটু আর্লি এসেছে ।— তারপর অলকাকে দেখতে দেখতে বলল, বেশ সুন্দর হয়েছিস । গায়ে সামান্য একটু ফ্যাটও হয়েছে । ডক্টর ভর্মা কেমন আছেন?

ভালো আছে । খু-উ-ব ভালো আছে । — টেনে টেনে বলল অলকা ।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বিনতা ।

চল, তাড়াতাড়ি চল । আমাদের নতুন বাড়ি দেখবি ।

নতুন বাড়ি? কেন, তোরা এখন কনভেন্ট রোডে থাকিস না?

মাস-ছয়েক হল ছেড়ে দিয়েছি। এই ফ্ল্যাটটা নিউ আলিপুরের কাছে। ফার্স্ট ক্লাস জায়গা। চারদিক খোলামেলা। প্রচুর আলো-বাতাস। ফ্ল্যাটটা কিনেই নিয়েছি।

তুই আমার টেলিগ্রাম কী করে পেলি? সেটা তো পুরোনো ঠিকানায় পাঠিয়েছিলাম।— বিনতা অবাক হয়।

ওই বাড়ির লোকেরা রি-ডায়রেক্ট করে এ-ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছিল।

ডক্টর ভর্মা এখন কোন হাসপাতালে অ্যাটাচড? আমার চোখটা একটু দেখাব।

ডক্টর ভর্মার সঙ্গে তোর দেখা হবে না। কারণ, উনি ক'দিনের ট্যুরে বাইরে গেছেন। তুই তো থাকবি সাতদিন।

ডক্টর ভর্মা নেই! বিনতার মনে কে যেন সপাং করে একটা চাবুক মারল। বাড়ি পালটেছে এরা! নতুন জায়গা, নতুন ফ্ল্যাট। ব্যাপারটা কী? আবার সেই পুরোনো চলচ্চিত্র পর-পর ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। ডক্টর ভর্মা ইজিচেয়ারে শুয়ে। অলকা দাঁড়িয়ে। প্রবেশ করল সেই অচেনা ভদ্রলোক। ডক্টর মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। রক্তে ভেসে গেল গোটা মেঝে। খুন! খুন! গলা পর্যন্ত আওয়াজটা উঠেই আবার নীচে নেমে গেল স্বর। কীরকম তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল অলকার গাড়ির মধ্যে। চেতনা ফিরে এল অলকার বাড়িতে।

গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছিলি বলে তোকে আর ডিসটার্ব করিনি। শরীর খারাপ নাকি?— কাছে এসে অলকা বিনতার কপালে, গালে, হাত রাখল।

না, সেরকম কিছু না।

চল, আমরা স্নান, খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নিই। পরে বিকেলে বেরোব কলকাতা দেখাতে।— অলকা উঠে পড়ে স্নানের জোগাড় করতে গেল।

১৫ ডিসেম্বর

আজ বিকেলে বেরোনোর মুখেই দেখা হয়ে গেল সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে। আবার সেই মুখ, চোখ, নাক আর ডান গালের জুলপির নীচে জড়ুল। একেবারে সামনা সামনি। এ কী করে হয়! মনের ভিতর হঠাৎ দেখা দৃশ্যটি এমনভাবে মিলে যাচ্ছে!

কী রে! দাঁড়িয়ে পড়লি যে! ভদ্রলোককে চিনিস নাকি?— হাসতে হাসতে অলকা বলল।

আমি ওঁকে চিনেছি। রাজধানী এক্সপ্রেসে আপনার কাছ থেকেই তো আমি 'ফেমিনা'টা নিলাম। এইবার চিনতে পারছেন তো?

ও! তোমরা বুঝি একই ট্রেনে এসেছ? কিন্তু আমি তো হাওড়া স্টেশনে বিনতাকে আনতে গিয়েছিলাম। তোমাকে তো দেখলাম না!— অলকার গলার স্বরে অভিমান যেন। ব্যাপার কী? তবে কি ওরা আমার মনে ছবি দেখার মতো ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত?

এইবার আমি বললাম, অলকা, তুই এঁকে চিনিস নাকি?

কেন চিনবে না! আমি তো ওদের সামনের ফ্ল্যাটেই থাকি। ডক্টর ভর্মার অনুপস্থিতিতে আমিই তো অলকার ফ্রেন্ড, ফিলসফার, গাইড। কী বলো অলকা?— ভদ্রলোকের সেই হাসি! সেই চাউনি! সেই—!

আমরা একটু বাইরে যাচ্ছি। তুমি ফ্ল্যাটটার দিকে নজর রেখো।— বেশ অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল অলকা। আর এটাও লক্ষ করলাম, ভদ্রলোক অলকাকে নাম ধরে ডাকল, কোনওরকম 'মিসেস' সম্বোধন যোগ না করেই। অলকাও ওকে 'তুমি' বলল। ডক্টর ভর্মা জেনেশুনে চুপ করে আছেন!

১৬ ডিসেম্বর : দুপুর

আজ সকালে চায়ের টেবিলে অলকাকে হঠাৎ সব বলে ফেললাম। মনের ভিতর হঠাৎ কীভাবে স্বপ্নের মতো ঘটনাটা দেখেছিলাম। আমার উদ্বেগ, দুশ্চিন্তার কথা, সবই বললাম। অলকা তো শুনে হেসেই অস্থির। বলল, তোর সন্দেহ কাটানোর জন্যে ডক্টরকে কালই টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি। দেখবি, আমার স্বামী তোর

মতো সুন্দরীকে দেখলে হয়তো আমাকে ভুলে যাবে! বিয়ের আগে বা পরে ডক্টরের জন্যে আমার এত উদ্বেগ কোনোদিনই হয়নি ।

বা-ব্বা! বাঁচলাম । ডক্টর ভর্মাকে একবার দেখলেই আমার সব ভাবনা মিথ্যে হয়ে যাবে । আমিও নিরুদ্বেগ মন নিয়ে দিল্লি ফিরে যাব । সত্যি কথা বলতে গেলে, এইজন্যেই তো কলকাতায় আসা ।

ভদ্রলোকের নাম মণিকুন্তল সেন । বাঙালি । ওকেও আজ ডিনারে নেমন্তন্ন করেছে অলকা । তবে অবশ্য কথা দিয়েছে, আমার এইসব বাজে ভাবনার কথা কিছু বলবে না । দেখা যাক ।

১৬ ডিসেম্বর : রাত আটটা

এই অংশটি অনেক পরে ডায়েরিতে লেখা হয়েছিল

ডাইনিং হলে ঢুকতে যাওয়ার আগে অপরিচিত গলার আওয়াজে থমকে দাঁড়ালাম । মাঝের ঘরের ঝোলানো পরদার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতেই দেখি মণিকুন্তল সেন আর অলকা পাশাপাশি চেয়ারে বসে । টেবিলের ওপর আমাদের তিনজনের প্লেট, কাঁটা-চামচ, খাবার সাজানো । শুধু আমি গিয়ে বসলেই 'ডিনার' শুরু করা যাবে । মণিকুন্তলবাবু অলকার কাঁধে হাত রেখে বলছে, তুমি ভয় পেয়েছ নাকি? এসব কখনও হয়? আমাকে তোমার বন্ধু জীবনে দেখেনি, সে কী করে আমার মুখ দেখল স্বপ্নে?

না, না, স্বপ্ন নয় ।— অলকার স্বরে আতঙ্ক । বলল, বিনতা জেগে-জেগেই চোখের সামনে দেখেছে ডক্টর ভর্মার খুনের দৃশ্য । আমি তো সত্যিই সেদিন নাইটগাউন পরে তোমাকে জড়িয়ে ছিলাম । তোমার চেহারা, এমনকী তোমার ডান গালে জুলপির নীচে জড়ুলটার কথাও বলেছে! আমার ভীষণ ভয় করছে । শেষকালে ধরা পড়ে ফাঁসি হবে না তো?— বলতে বলতে অলকা নিবিড় হয়ে গেল মণিকুন্তলের কাছে ।

তোমারও দেখছি মাথা খারাপ হল! আমি যে খুন করেছি, তা প্রমাণ করতে হবে না? কোন পাগলে এসে কী বলল, তাই বুঝি আইন অমনিই মেনে নেয়? তার ওপর এ-কেস তো পুলিশ সুইসাইড কেস ধরে নিয়ে ইতিমধ্যেই ক্লোজ করেছে । তবে, তোমার বন্ধুকে যাতে আর ফিরতে না হয়, তার ব্যবস্থাও আজ করব । এই দ্যাখো ।— বলেই মণিকুন্তল সাইলেন্সার লাগানো রিভলভারটি দেখাল ।

আর একমুহূর্তও নয় । পা থেকে মাথা অবধি গা-শিরশির করে উঠল । কপাল, চোখ-মুখ ঘেমে নেয়ে উঠল । তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে এসে কিছু টাকা আর দু-একটা জরুরি জিনিস নিয়ে ওদের শোওয়ার ঘরে ঢুকলাম । ওই তো টেলিফোন । পাশেই টেলিফোন গাইড । টেলিফোনের রিসিভার তুললাম লালবাজার হেড কোয়ার্টার্সে ফোন করার জন্যে । এ কী! কোনোরকম 'রিঙিং টোন'ই তো বাজছে না! তবে? নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, টেলিফোনের তার কাটা । তবে? এখন কী করব? কী করে ঘরের বাইরে যাব? ফ্ল্যাট থেকে বাইরে যাওয়ার একটাই তো পথ!

স্পষ্ট বুঝতে পারছি অলকা-মণিকুন্তল দুজনে মিলে সমস্ত প্ল্যানই তৈরি করে ফেলেছে । ওরা কোনো দায়িত্ব নিতে চায় না । ডক্টর ভর্মার খুনের একমাত্র মানসিক সাক্ষীকে চিরতরেই ওরা সরিয়ে দেবে । তারপর আমার লাশ গুম করে দিলেই সব শেষ! আসার সময়ে বাড়ির কাউকে অলকার ঠিকানাও দিয়ে আসিনি । না, না, যে করেই হোক, পালাতে হবে।

বিনতা! বি...ন...তা!— অলকা ডাকছে ।

পাগলের মতো ঘরের মধ্যেই ছুটোছুটি করতে লাগলাম । ডাইনিং হলে ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে । হঠাৎ বারান্দার এককোণে লাইটের মেন সুইচটা নজরে পড়ল । ভগবানের নাম নিয়ে দিলাম সুইচটা অফ করে! সঙ্গে-সঙ্গে গোটা বাড়ি অন্ধকার । ভালুক-অন্ধকার । পা টিপে-টিপে মেন দরজার কাছে এসে গোদরেজের ল্যাচটা আস্তে-আস্তে খুলেই সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে এলাম সদর রাস্তায় । কানে বাজতে লাগল অলকা-মণিকুন্তলের ছুটোছুটি আর আমার নাম ধরে ডাকাডাকি ।

এরপরের ঘটনা জলের মতো সহজ গতিতে এগিয়ে গেছে। লালবাজারে বিনতা প্যাটেলের পরিচিতি আর সমস্ত ঘটনার আদ্যোপান্ত বিবরণ নথিভুক্ত হল। পুলিশি তদন্তে শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হল, মণিকুন্তল সেন-ই ডক্টর ভর্মার হত্যাকারী! আর সেই নৃশংস ব্যাপারে সাহায্য করেছে নিহত ডক্টরেরই সহধর্মিণী অলকা ভর্মা।

কিন্তু এই ঘটনার আসল জিজ্ঞাসা হল, তবে কি মানুষের সাধারণ জ্ঞানের বাইরেও মানসিক জগতের বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া রয়েছে? চেতনের গভীরে অবচেতনের আঁধারে কোনো-কোনো ইচ্ছা মানুষের মনকে ছোবল মারে বিষাক্ত সাপের মতো। সেই ইচ্ছাই হয়তো তার মানসিক পটে চলচ্চিত্রের জীবন্ত ছায়া হয়ে অজানা জগতের এক নতুন ইশারা দেয়।

খগনিশা

নির্বেদ রায়



'না না ওটা তোমরাই খাও, আমি ও জিনিস ছুঁই না।' সোমেশ্বরের এগিয়ে দেওয়া ধোঁয়া-ওঠা মুরগির রোস্টের প্লেটটাকে সাত তাড়াতাড়ি তর্জনী, মধ্যমা আর অনামিকার আঙুল দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন কুমার সাহেব। গোটা মুখ যেন একমুহূর্তে ছাই-এর মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

খাইয়ে হিসাবে কলকাতার রসিক সমাজে কুমার সাহেবের একটা বেশ চওড়া গোছের নাম-ডাক আছে। আর সেই নাম-ডাক দিনে-দিনে ক্রমশ বৃদ্ধিও পাচ্ছে। তার অন্যতম কারণ হল ভদ্রলোক শুধু নিজে খেতে নয়, অপরকে খাওয়াতেও ভালোবাসেন। তাঁর বাড়িতে নেমন্তন্ন পেলে খাদ্যরসিক মানুষ মাত্রেই কিছু-না-কিছু চমকের জন্য তৈরি হয়েই যান। বলা তো যায় না, কখন কী আসে? হয়তো প্রথম পাতে চীনে পুডিং কি শেষ পাতে ফরাসি শুক্তো। সুতরাং, এ হেন খাবার-দাবারের জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়াটি সামনে থেকে গন্ধে-তর-করে দেওয়া একনম্বর কন্টিনেন্টাল ডিশ তিন আঙুলে সরিয়ে দিয়ে শেষ পাতের পায়েসের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন, এটা চোখে দেখেও বিশ্বাস করা কঠিন।

'কেন, শরীর খারাপ করল নাকি কুমার সাহেব?' বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটুকু সামলে নিয়ে শুধোল সোমেশ্বর।

'না না শরীর খারাপ করবে কেন, আমি ঠিক আছি।' বলতে বলতে প্লেটের পায়েসটা বেশ কিছুটা বাকি থাকতেই উঠে পড়লেন কুমার সাহেব।

অদ্ভুত ব্যাপার। কী কারণ থাকতে পারে এই আতঙ্কের? তিনজনে আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম, কিন্তু তিনজনের চোখের দৃষ্টিই ফাঁকা। কেউই কিছু আন্দাজ করতে পারিনি এটা পরিষ্কার। এরপর খাওয়াটা যে একেবারেই দায়সারা গোছের ব্যাপার হল সেটা বলাই বাহুল্য। অথচ আজকের এই রাতের পাতটা বেশ ভালোরকম জমাবার কথা ছিল।

কলেজে গরমের ছুটি পড়ে যাওয়ার পর ওয়াই এম সি এ-র বিলিয়ার্ড রুমে খাওয়া-দাওয়া সেরে দুপুর দুটোর মধ্যে গিয়ে হাজির হতাম। আড়াইটের মধ্যেই একে একে সব এসে যেত— আড্ডাটা বেশ জমে উঠত, চলত সেই রাত আটটা পর্যন্ত। তার মধ্যে সোমেশ্বর, অশোক আর আমি, এই তিনজনের একটা আলাদা ছোট জগৎ ছিল। তার কারণ তিনজনই এক কলেজের ছাত্র, তিনজনেই খেলাধুলায় একটু-আধটু নাম করেছি, আর তিনজনেই সেই দক্ষিণ কলকাতা থেকে আসি। কুমার সাহেবের সঙ্গে আমাদের মধ্যে প্রথম আলাপ হয় সোমেশ্বরের বিলিয়ার্ড টেবিলে। তার আগে অবশ্য আমরা ওঁকে নামে চিনতাম।

যদিও সেটা এমন কিছু বড় কথা নয়। কারণ কুমার দীপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরিকে শহর কলকাতার অনেকেই নামে চেনে। বাবু গৌরবের কলকাতায় অধিকাংশ বাঙালি জমিদার যখন বুলবুলির লড়াইয়ে বাজি ধরে, বেড়ালের বিয়েতে লাখ-টাকা খরচা করে কি হাজার টাকার নোট বেঁধে ঘুড়ি উড়িয়ে এই গাঙ্গেয় সমভূমির পুঁজির সঞ্চয় দ্রুত সংক্ষিপ্ত করে আনছেন; তখন ভবিষ্যৎ বংশধরদের সর্বনাশের ছবিটা যে ক'জন সামান্য সংখ্যক ভৌমিক কল্পনা করতে পেরেছিলেন দীপেন্দ্রনারায়ণের পিতামহ দীনেন্দ্রনারায়ণ তাঁদের মধ্যে একজন। ফলে ওই বিরাট সম্পত্তি তিনি দেবত্র করে দিয়েছিলেন, যাতে কোনোদিন আর কোনো বংশধরকে অনাহারে কষ্ট পেতে না হয়, অন্যথায় উচ্ছৃঙ্খল হতে না পারে।

কিন্তু দীপেন্দ্রনারায়ণের শিরায়-ধমনীতে যে রক্তের ধারা বইত তার টান ছিল কিছু বেশি, ফলে দাদুর করে যাওয়া ব্যবস্থার জন্যেই হোক অথবা নিজের শিক্ষা-দীক্ষার জন্যই হোক সেই উষ্ণ স্রোত উচ্ছৃঙ্খলতার খাতে বইতে না পেরে, যে ক'টি রুচিশীল আর সম্ভ্রান্ত বিলাসের ফাঁকফোকর ভেদ করে বেরিয়েছিল সেসব ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর মিলত প্রচুর। বিলিয়ার্ডের টেবিলেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। সোমেশ্বর আমাদের ব্রাঞ্চ চ্যাম্পিয়ন হয়েও মোটামুটি তাকে দর্শক সেজে যেতে হয়েছিল। কুমার সাহেবের 'কিউ' জাদু লাঠির মতো সবুজ গালচে পাতা টেবিলের উপর বল তিনটেকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করেছিল। হেরে যাবার পর সোমেশ্বর বলেছিল 'কুমার সাহেব, আপনার কাছে হেরেছি বলে তো লজ্জা নয়, লজ্জা এইটাই যে উইলসন জোনস কি মাইকেল ফেরেরার মতো ভারতবর্ষ অন্তত আরও একজন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের জন্ম দিয়েছিল, কিন্তু আমরা তাঁকে চিনতে পারলাম না।'

উত্তরে ঘর কাঁপিয়ে প্রাণখোলা হাসি হেসেছিলেন কুমার সাহেব, তারপর সোমেশ্বরের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'ব্রাভো ইয়ংম্যান।' মোদ্দা কথাটা কী জানো? সেন্স! যে- কোনো খেলায় একবার যদি তোমার এই সেন্স-টা ডেভেলপ করে যায় তাহলে দেখবে যে-কোনো বড় খেলোয়াড়ের সঙ্গে তোমার পার্থক্য হচ্ছে শুধু প্র্যাকটিসের।'

এইভাবেই কুমার সাহেবের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়, কিন্তু সে পরিচয় হৃদ্যতায় গিয়ে ঠেকেছিল মাত্র মাস-দুয়েকের মধ্যেই। এর জন্যে কাউকে দায়ী করতে গেলে পুরোপুরি দায়ী করতে হয় কুমার সাহেবকে। বয়সের হিসাবে প্রৌঢ় প্রায় ষাটের কোঠা ছুঁই-ছুঁই। কিন্তু সে- বয়স তাঁর শরীরের কোথাও এতটুকু ছাপ ফেলতে পারেনি। টকটকে গৌরবর্ণ, ছ-ফুট মাপের বেতের মতো টানটান শরীরে জীবনীশক্তির অফুরন্ত প্রাচুর্য। আর সেই দুরন্ত জীবনীশক্তির প্রকাশ তাঁর দুটি চোখে। আয়ত, গভীর অথচ উজ্জ্বল দুটি চোখ। কথা বলেন পরিষ্কার উচ্চারণে, সংযত আভিজাত্যের ছাপ রেখে, অথচ হাসিটি একেবারে প্রাণখোলা; সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব।

আলাপ হওয়ার পর একদিন বাড়ি নিয়ে গেলেন। ঘুরে ঘুরে দেখালেন, 'এইগুলো গ্রিক অ্যান্টিক— এটা ডায়ানা, এটা ডেভিড, এটা অ্যাপোলো...এইগুলো আমার শিকারিজীবনের স্মৃতি— গৌরবের মাথা, ওই মোষগুলোকে 'ওয়াটার বাফেলো' বলে, এটা সম্বরের শিং আর চিতা-বাঘের যে খড়পোরা মূর্তিটা দেখছ ওটাকে মেরেছিলাম হরিদ্বারের কাছে এক জায়গায়... চলো এবার আর্ট গ্যালরিটা দেখিয়ে আনি।'

এ তো গেল গরমের ছুটির কথা। তার তিনমাস বাদেই পুজোর ছুটিতে এলাম রূপনারায়ণ— কুমার সাহেবের আমন্ত্রণে তাঁর বাংলোয়। নদীর পাড় থেকেই ঝাউয়ের সারি উঠে এসেছে বাংলোর বারান্দা অবধি, মাঝখানে নুড়ি-বিছানো কুঞ্জপথ। সেই পথের দুপাশে ফুলের বাগান। চার কামরার ছোটখাটো ছিমছাম বাংলো। ডানদিকে খানিকটা দূরে জেলেপাড়া, একটা বড় খাটাল-ও রয়েছে কোনো সম্পন্ন মহাজনের। গোটা পনেরো-কুড়ি গরু-মোষ। খোলামেলা সামার হাউস গোছের ব্যবস্থা, ঘেরা পাঁচিলের ব্যাপার নেই।

এখানে এসে প্রথম দু' দিন খাওয়া-ঘুম আর গল্প করেই কেটে গেল। গল্প বলে মানুষকে জমিয়ে রাখার ক্ষমতা আমাদের গৃহস্বামীটির অসাধারণ, আর অফুরন্ত তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি, বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর। তার মধ্যেই মাঝে-মাঝে সকালবেলার দিকটায় একটু কাছাকাছি অঞ্চলটায় ঘুরতে বেরোতাম! কিন্তু তিন দিনের

দিন রাতে খাবার টেবিলে আশাতীতভাবে যে ঘটনাটা ঘটে গেল সেটা আমাদের এই বর্তমান জীবনধারার সঙ্গে একেবারেই বেমানান। রীতিমতো ধাক্কা।

রোজকারের মতো সেদিনও বিকেলবেলা সরকার মশাই এসেছিলেন রাতের 'মেনু' জানতে। গৃহকর্তারই নির্দেশ। তাই গত দু'দিন ধরে নদীর টাটকা মাছে যে স্বাদটুকু আমাদের জিভে লেগে আছে তারই মাঝে একটু বৈচিত্র আনতে অশোকের ফরমাশ ছিল মুরগির। বলা বাহুল্য দু'দিন আগেও যে কিঞ্চিৎ লোকলজ্জাটুকু আমাদের ছিল সেটা এর মধ্যেই অন্তর্হিত হয়েছে। সরকারমশাই বোধ হয় একটু আমতা আমতা করে একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে অশোক পাকা ভোজনরসিকের মতো বললে, 'তবে দিশি মুরগি, ব্রয়লার বা লেগহর্ন যেন না হয় একটু দেখবেন।'

কথা শেষ করে অশোক আর দাঁড়াল না। চটি জোড়া পায়ে গলিয়ে বলল 'চল চল, নদীর পাড়ে সান সেট দেখে আসি...'

আসলে সরকারমশাই-এর পিছনে লাগার জন্য একটু নির্দোষ ডেঁপোমিমাত্র, কিন্তু সেই মুরগি নিয়েই ঘটল অনর্থ—

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে তিনজনেই এসে বারান্দায় বসলাম, কারও মুখেই কোনো কথা নেই। অন্ধকার বারান্দা— কিছুটা দূরেই রূপনারায়ণ বয়ে চলেছে অস্পষ্ট ছল-ছল আওয়াজ তুলে। কয়েকটা জেলেডিঙি পাড়ের উপর শোয়ানো। পাড়ের উপরেই একটা চায়ের দোকান, দোকান না বলে ঝুপড়িই বলা উচিত, সেখান থেকে কেরোসিনের একটা টিমটিমে আলো দেখা যাচ্ছে। পাশের গোয়াল থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে গরুর গলার ঘণ্টার আওয়াজ— টুং-টাং। পরিবেশটা ভারী শান্ত, সুন্দর, কিন্তু মনটা অস্বস্তিতে ভরে আছে, কোনো কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। একটু দূরে বারান্দার কোণে ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে নিঃশব্দে পাইপ টানছেন কুমার সাহেব। 'বলকান সভরেনি'র মিষ্টি গন্ধ হাওয়া ভারী করে তুলেছে।

নিস্তব্ধ বেশ কয়েকটা মুহূর্ত— কেটে যাওয়ার পর প্রথম কথা বললেন কুমার সাহেব, তা-ও যেন অনেকদূর থেকে ভেসে এল।

'বুঝতে পারছি তোমাদের খুবই খারাপ লাগছে, অস্বস্তি বোধ করছ, ঠিক এইভাবে তোমাদের ''ডিসটার্ব'' করতে আমি একেবারেই চাইনি কিন্তু...' একটু থামলেন কুমার সাহেব কিন্তু খাবারের ওই প্রিপারেশনটা যেন আমাকে একটা ধাক্কা মারল, আমি কিছুতেই নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারলাম না। আসলে একটা ঘটনা...' কথার মাঝে চমকে গেলেন তিনি। আবার বেশ কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। তারপর শুরু করলেন আবার :

'তোমাদের আজ বলতে কোনো বাধা নেই, তবে এই ঘটনার কথা আর কাউকে বলিনি, প্রয়োজনও হয়নি বলার—

সনটা বোধহয় ১৯৪১—

পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধ তখনও ছড়িয়ে পড়েনি। বন্ধু সতীশচন্দ্রের সঙ্গে বেড়াতে গেছিলাম পূর্ববাংলার বাখরগঞ্জে। সতীশচন্দ্ররা উত্তর শাহাবাজপুরের সম্পন্ন জমিদার। বাংলার দ্বিতীয় স্বদেশি ডাকাতি ওদের বাড়িতেই হয়েছিল। সোনাদানাসুদ্ধু যা মালপত্র স্বদেশি বিপ্লবীরা নিয়ে গিয়েছিল তার মূল্য তখনকার হিসাবেই প্রায় আশি হাজার টাকার মতো দাঁড়িয়েছিল। পুলিশ অবশ্য এই ডাকাতির নেতা হিসাবে সতীশচন্দ্রের বড় ভগ্নিপতিকে সন্দেহ করেছিল। এই মানুষটি তখন কলকাতার এক বিখ্যাত কলেজের দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু সতীশের বাবা দুর্গাপ্রসাদ-ই পুলিশের সে সন্দেহ উড়িয়ে দেন, উল্টে তাদের এই ব্যাপারে আর কোনোরকম খানাতল্লাশি করতে বারণ করে দেন। পুলিশ নিতান্ত অমূলক সন্দেহ করেছিল এমন মনে হয় না। যা হোক, এই ডাকাতির জের সামলাতে দুর্গাপ্রসাদের যে বিশেষ কষ্ট হয়নি তার প্রমাণ হিসাবে তিনি তার পরের বছরেই পর পর দুটি মেয়ের বিয়ে দিলেন চূড়ান্ত রকমের ধূমধাম করে, গ্রাম খাইয়ে। সতীশ কলকাতার হিন্দু হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করত। সেই সূত্রেই তার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ।

কলকাতার বনেদি ঘরের ছেলে বলে নদীমাতৃক পূববাংলা সম্বন্ধে আমার আগ্রহ ছিল যেমন প্রচুর, তেমনি অভিজ্ঞতা ছিল ততই কম। পৌঁছে বুঝলাম, এসে ঠকিনি। মোহানার কাছে পদ্মা-মেঘনার সে রূপ যারা দেখেনি তাদের বলে বোঝাবার মতো ক্ষমতা আমার নেই।

সতীশের বাবার সঙ্গে পরিচয় হল। আমি জীবনে এত ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষ খুব কমই দেখেছি, সেইসঙ্গে— একটা অদ্ভুত প্রশান্ত চেহারা। শহরের শিক্ষা যে অনেকদিন আগেই এ বাড়িতে ঢুকে পড়েছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম গেট পেরিয়ে ঢোকামাত্র। নাটমন্দিরের সংলগ্ন থিয়েটারের স্টেজ— ম্যারাপ বেঁধে তৈরি নয়, রীতিমতো শানবাঁধানো।

সাত-আটটা দিন ঝড়ের মতো কোথা দিয়ে কেটে গেল টেরই পেলাম না। বিকেলবেলা মাঝেমধ্যেই নদীর চরে শিকারে বেরোতাম। আমার সবচেয়ে প্রিয় শিকার ছিল বালিহাঁস, আর বালিহাঁসের মাংসের কাছে মুরগি কোথায় লাগে? সেই শিকারে বেরিয়েই আরেকটা শিক্ষা পেলাম। বন্দুকের নিশানা নিয়ে আমার একটু-আধটু গর্ব ছিল। আর সেটা যে নেহাত অমূলক ছিল না তার প্রমাণ তোমরা কিছু কিছু আমার বাড়িতেই দেখেছ, কিন্তু সে নিশানা যে সমুদ্রের কাছে ডোবামাত্র সেটা সতীশের সঙ্গে না বেরোলে বুঝতে পারতাম না। ইংরাজিতে 'স্ন্যাপ-শট' বলতে ঠিক যে-কথাটা বোঝায় সতীশ ছিল তার সার্থকতম উদাহরণ। ডোবা কিংবা জলার মধ্যে থেকে কিংবা ঝোপের মাথায় হাঁস-বক যা-হোক একটা কিছু উড়লেই হল— যে-কোনো দিকে হোক, যতটুকু অল্প সময়ের জন্য হোক বন্দুকের আওতার মধ্যে থাকলে সতীশ আর নিশানা করত না। কোমরের কাছে ধরা বন্দুকটা মুহূর্তের মধ্যে সেদিকে ঘুরিয়ে ট্রিগার টিপত, একটা ধাতব আওয়াজ, কিছু ধোঁয়া, একঝলক আগুন আর সেইসঙ্গে শিকার লুটিয়ে পড়ত মাটিতে। এই ধরনের স্ন্যাপ শুটিং-এর ব্যাপারটা ঠিক অভ্যাস করে আয়ত্ত করা যায় না, ওটা জন্মগত।

শিকার করে একদিন বাড়ি ফিরছি দুজনে; সতীশ বলল, 'এ ক'টা দিন তো শুধু শিকার করেই কাটালে, দেখার জিনিস তো কিছুই দেখলে না, চলো, কাল এক জায়গায় নিয়ে যাব...'

—'কোথায়'?

—'রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের প্রাসাদে।

—'রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য, মানে সেই বারো ভুইঞার লক্ষ্মণমাণিক্য, সে তো ষোড়শ শতাব্দীর ব্যাপার।'

—'হ্যাঁ, এখন অবশ্য নামেই প্রাসাদ, আসলে একটা ভাঙা-চোরা প্রকাণ্ড পোড়োবাড়ি। বংশধররা অন্য জায়গায় থাকেন। কিন্তু তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবার কারণ পোড়োবাড়ি দেখাতে নয়, 'সাজাকুঠরি' দেখাতে।

—'সাজা-কুঠরি! মানে?'

—'মধ্যযুগীয় বাংলার অধিকাংশ জমিদাররাই যে দুর্দান্ত প্রকৃতির ছিলেন একথাটা তোমাকে নিশ্চয়ই বলে বোঝাবার দরকার নেই, এমনকী তারা ডাকাতিও করতেন বেনামে। আর বারো ভুইঁঞাদের যে ছিপ নৌকার সারি পদ্মা-মেঘনা-ভৈরবের বুকে দুরন্ত গতিতে টহল মারত সে শুধু সীমান্ত পাহারা দেবার জন্য নয়। তাছাড়া তখন চরের বুকে, গঞ্জের ধারে যে-সব প্রজারা বাস করত তাদের মধ্যে অনেকে জমিদারের লেঠেলকে রেয়াত করত না। খাজনা চাইতে এলে উত্তর দিত লাঠি-সড়কির মুখে। তাই এতসব দিক বজায় রেখে জমিদারি টেঁকাবার জন্য তৈরি করা হয়েছিল ওই 'সাজা-কুঠরি', আর সেই কুঠরিতে লক্ষ্মণমাণিক্য আমদানি করেছিলেন বিচিত্র সব শাস্তি দেওয়ার প্রথাপদ্ধতির। তার মধ্যে বাঁশ-ডলা থেকে শুরু করে ইংরাজি 'এক্স' অক্ষরের মতো দুটো আড়াআড়ি কাঠে অপরাধীকে বেঁধে চাবুক মারার ব্যবস্থা তো ছিলই, কিন্তু এগুলো নিতান্তই সাবেকি। আশ্চর্য হচ্ছে 'লৌহভীম।'

—'লৌহভীম মানে সেই মহাভারতের লৌহভীম, যেটা কিনা ধৃতরাষ্ট্র চূর্ণ করেছিল।'

—'না বন্ধু, এ ভীম একেবারেই ভারতীয় নয়, খাস পর্তুগীজ।'

'পর্তুগীজ!' বেশ কিছুটা অবাক হলাম আমি, 'পর্তুগীজ ভীম মানে?'

উত্তরে মৃদু হাসল সতীশ, 'লক্ষ্মণমাণিক্য ছিলেন ভুলুয়ার রাজা আর তখন ভুলুয়ায় পর্তুগীজদের অবাধ যাতায়াত! সুপুরি, মশলা এইসব কিনে নিয়ে গিয়ে ব্যবসা করত তারা। হুগলি আর সপ্তগ্রামে ছিল তাদের মূল কুঠি। পরে শাজাহান তার সেনাপতি কাসেম খাঁ-কে পাঠিয়ে সেটি ভেঙে দেন। কিন্তু তার আগে এই পর্তুগীজ বণিকদের সঙ্গে লক্ষ্মণমাণিক্যের লেনদেন ছিল বলেই মনে হয়। তাদের কাছ থেকেই ওই লৌহ ভীম জোগাড় করেন তিনি। যন্ত্রটার আসল নাম 'আয়রন ভার্জিন', বাংলায় 'লৌহ কুমারী' বললেই বোধ হয় ঠিক হয়, কিন্তু লক্ষ্মণমাণিক্যের যন্ত্রটায় মেয়ের আদলের চেয়ে পুরুষের আদলটাই বেশি, তাই ওই নাম। কিন্তু আদলটা বড় কথা নয়...বলতে বলতে থেমে গেল সতীশ।

ততক্ষণে আমরা প্রায় বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছি; সূর্য অনেকক্ষণ ডুবে গেলেও সন্ধের অন্ধকারটা তখনও একটু ফিকে হয়ে আছে। মাথার উপর দিয়ে একটা ছায়া দ্রুত উড়ে যাচ্ছিল, চকিতে সেদিকে বন্দুক তুলেই সতীশ গুলি চালাল। নিস্তব্ধ মাঠের উপর গুলির আওয়াজটা প্রচণ্ড শোনাল, আর উড়ে যাওয়া ছায়া মূর্তিটা আকাশে গোটা দুই চক্কর খেয়ে ছিটকে এসে পড়ল খানিকটা দূরের মাটির উপর। অসাধারণ টিপ!

'কী মারলে ওটা!' জিজ্ঞাসা করলাম।

'জানি না, চলো গিয়ে দেখি, টিয়াগোছের কোনো কিছু হবে বোধহয়! আজ দুটো শট মিস করেছিলাম, তাই একটু প্র্যাকটিস করে নিলাম। মন্দ হয়নি, কী বলো?'

এগিয়ে গিয়ে দেখলাম টিয়া নয়, একটা পেঁচা। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে আছে। গুলিটা ঠিক পেটের কাছে লেগেছে।

'খেটে-খুটে একটা হাত বাগিয়েছ বটে।' না বলে আর পারলাম না, 'কিন্তু তাই দিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা পেঁচা...'

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ন আওয়াজে মাথা তুললাম। আমাদের মাথার উপরে আরেকটা ছায়া চক্কর মারছে। সতীশ আবার বন্দুক তুলল বটে কিন্তু তার আগেই পাখিটা বিপদ বুঝে পালিয়েছে। 'জোড়ার মদ্দাটা', বলল সতীশ।

ততক্ষণে বাড়ির সদরে আলো হাতে লোকজন বেরিয়ে এসেছে গুলির আওয়াজ পেয়ে। দূর থেকে আমরা সাড়া দিলাম।

সেদিন ঘুমোবার আগে পর্যন্ত লক্ষ্মণমাণিক্যের ইতিহাস শুনে কাটল।

পরদিন বিকেলের জলযোগ সেরে বেরোলাম প্রাসাদ দেখতে। নেহাত কম দূর নয়, হাঁটাপথে প্রায় ঘণ্টা-খানেকের পথ। অবশ্য সতীশের দোষ নেই, ও গাড়ির ব্যবস্থা করেছিল, আমিই বারণ করেছি। এখানে না হাঁটলে আর হাঁটব কোথায়।

প্রাসাদের কাছে যখন এসে পৌঁছলাম তখন সূর্য প্রায় ডুবে এসেছে। এক সময়ের প্রকাণ্ড চক-জিলানো বাড়ির কঙ্কালটাই শুধু পড়ে রয়েছে। বিরাট, বিরাট ঘর, থাম, দালান মিলিয়ে সে এক এলাহি ব্যাপার। তবে পোড়োবাড়ি একটু বেশি ফাঁকা-ফাঁকা আর প্রকাণ্ড মনে হয়। লোকজন থাকলে অতটা মনে হয় না। লক্ষ্মণমাণিক্যের রাজধানী এখানে ছিল না, তবে এই প্রাসাদে তিনি প্রায়ই এসে থাকতেন।

এখন মাঝে মধ্যে দু-চার জন লোক দেখতে আসে। সেই সুবাদে বাড়িটা সাপ-খোপের আড্ডা হয়ে পড়েনি।

'যজ্ঞেশ্বর, যা তো ক'টা মশাল জোগাড় করে নিয়ে আয় দেখি।' সঙ্গের লোকটিকে বলল সতীশ।

'দেখছি বাবু।' সে চলে গেল।

'কিন্তু এখানে মশালের কী দরকার, টর্চ তো সঙ্গেই আছে।' বললাম আমি।

'আরে মশাল মানে গাছের ডালের মাথায় জড়ানো তেল ভেজানো ন্যাকড়া। তার দরকার আছে, আনলেই বুঝবে।'

আমার হাতে বন্দুকটা দিয়ে সামনের একটা গাছ থেকে দুটো হাত দুয়েক করে লম্বা ডাল ভেঙে নিল সতীশ। আজ একটাই বন্দুক সঙ্গে করে এনেছিলাম, রোজ বিকেলের অভ্যাস।

'নাও এটা ধরো, বলা তো যায় না সাপ-খোপের ব্যাপার,' আমার হাতে একটা ডাল দিয়ে বলল সতীশ।

যজ্ঞেশ্বর মশাল নিয়ে হাজির হতে বেশি দেরি করেনি। প্রাসাদে যখন ঢুকলাম সন্ধেটা তখন উতরে গেছে। প্রাসাদ দেখার কিছু নেই। কয়েকটা খিলান, দেউড়ি পার হয়ে শেষে একটা সিঁড়ির তলায় এসে থামল সতীশ। তারপর যজ্ঞেশ্বরের হাত থেকে মশাল নিয়ে দেশলাই মেরে জ্বালাল। প্রাসাদের ভিতরে তখন অন্ধকার, টর্চ জ্বেলেই একরকম পুরো পথটা চলতে হচ্ছিল। তার মধ্যে মশালের আলো জ্বলে উঠতে দেখা গেল একটা ভারী কাঠের তৈরি দরজা, দরজার সর্বাঙ্গে লোহার গজাল পোঁতা।

শিকল খুলে জোরে ঠেলা দিল সতীশ। ক্যাঁচ করে ভারী দরজাটা হাট হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভ্যাপসা পুরনো লোহার গন্ধ এসে নাকে ধাক্কা মারল।

সিঁড়ির নীচে চোরকুঠরি। এই তাহলে 'সাজা ঘর'।

মশালটাকে প্রথমে সেই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল সতীশ, তারপর আস্তে আস্তে উপর থেকে নীচে অবধি নামিয়ে আনল। এতক্ষণে মশালের দরকারটা বুঝলাম। ঘরে কতটা অক্সিজেন আছে সেটা দেখে নেওয়া অবশ্য ঠিকই। কতদিন যে এ ঘর এভাবে বন্ধ পড়ে আছে কে জানে!

সতীশকে অনুসরণ করে প্রায় গোটা দশেক সিঁড়ি নীচে নেমে তারপর ঘরটায় ঢুকলাম। প্রকাণ্ড ঘর, ঠান্ডা আর ভ্যাপসা গন্ধে-ভরা, সেটা বোধহয় মাটির নীচের ঘর বলেই। ঘরের এককোণে মশালটাকে গুঁজে দিয়ে সতীশ এগিয়ে এল, 'এটাই সেই ''সাজা-কুঠরি'', ষোড়শ শতকের রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের শাস্তি দেওয়ার ঘর। লোকের ধারণা এ ঘর অভিশপ্ত। অবশ্য নেহাত উড়িয়ে দেওয়ার মতো ধারণা নয় কারণ বহু পাপ জমা হয়ে আছে এই ঘরে। কিন্তু সেকথা নয়, তোমাকে যেটা দেখাতে এনেছি তা হল এ ঘরের অভিনবত্ব। ওটা হল বাঁশডলার ব্যবস্থা— বুকে কি পিঠে বাঁশ দিয়ে জোয়ান লাঠিয়ালরা দু-তিনজনে মিলে ডলা দিত। বাঁশগুলো এখনও লোহার চেয়ে শক্ত রয়েছে, তবে এ হল সাবেকি ব্যবস্থা। এদিকে ''ঐ ক্রুশ-কাঠ।'' লোহাকাঠ দিয়ে তৈরি, কিন্তু এসব নয়, আসল ব্যাপারটা আছে ওইখানে, সেই লৌহভীম!'

প্রকাণ্ড ঘরটাকে মশাল বা টর্চের আলো কোনোটাই পুরোপুরি আলোকিত করতে পারেনি, তবে তার মধ্যেই চারদিক জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাঠ আর লোহার ফ্রেম, কপিকল, দড়ি, বাঁশ, সড়কি, বিভিন্ন সব যন্ত্র। সবগুলোই কেমন নিষ্ঠুর, স্থূল কলকব্জা দিয়ে তৈরি। লোহার জিনিসগুলোয় তিনশো বছরের মরচে পড়েছে, ফলে সেগুলোকে আরও রুক্ষ, আরও ভয়ংকর মনে হয়। কাল রাতে সতীশের কাছে শোনা গল্পগুলোর কথা মনে পড়ছিল আর মনে হচ্ছিল সত্যিই যেন মধ্যযুগে ফিরে গেছি। একটা বিশ্রী গা ছমছমে, ভারী হয়ে-আসা পরিবেশ!

টর্চের আলোটা সতীশের কথা অনুযায়ী বাঁ-দিকের দেওয়ালে ফেললাম। সেখানে দেওয়াল জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় আট ফুট উঁচু একটা প্রকাণ্ড লোহার তৈরি মানুষ। তবে নামেই মানুষ, মুখ-চোখ-নাকে একটা পুরুষের আদল আছে মাত্র, নিখুঁত কাজ একেবারেই নয়। তার পেটের কাছে একটা প্রকাণ্ড আংটা লাগানো আর সেই আংটা জড়িয়ে একগাছা মোটা পাটের দড়ি কিছুটা উঁচুতে উঠে ছাদ থেকে ঝোলানো কপিকলের মধ্যে দিয়ে পাক খেয়ে নেমে এসেছে জমির কাছাকাছি। দেখেই বোঝা যায়, অত্যন্ত ভারী একটা মূর্তি, নিরেট লোহার কিন্তু এ বস্তু দিয়ে কোন কাজ সে আমার মাথায় ঢুকল না। সতীশ বোধহয় আমার ধারণাটা বুঝেছিল, তাই বলল, 'মূর্তিটার স্বরূপ বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছ না, দাঁড়াও এখনি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি। যজ্ঞেশ্বর, দড়িটা ধরে জোরে টান তো।

যজ্ঞেশ্বর মানুষটা শক্তি ধরে। সে দড়িটা ধরে টানতে এবার একটু অবাক হলাম। মূর্তিটা নিরেট নয়, ভেতরে ফাঁপা। দুটো ডালার মতো কব্জা দিয়ে আটকানো। দড়ির টানে ট্রাঙ্কের মতো তার সামনের পাল্লাটা ফাঁক হয়ে গেল। 'এবার এদিকে এসো, আসল মজাটা দেখবে', সতীশ ততক্ষণে ফাঁক করা ডালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, আমাকে সেখানেই ডাকল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে যে ব্যাপারটা দেখলাম সেটা মোটেই মজার ব্যাপার নয়। সামনের ডালাটার ভেতর দিকে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত প্রায় গোটা পঞ্চাশ বিরাট বিরাট লোহার গজাল বেরিয়ে এসেছে। 'এইবার বুঝলে তো ব্যাপারখানা,' সতীশ যেন বেশ মজা পেল, 'এই নীচের ডালাটার মধ্যে মানুষটাকে হাত-পা বেঁধে ঢুকিয়ে ওই কপিকলের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে দড়িটা আলগা দিতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে গজালগুলো তার সর্বাঙ্গে ফুটতে থাকে, প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর ক্রমে জোর বাড়ানো হয়, শেষপর্যন্ত তাতেও ফল না হলে দড়িটা ছেড়েই দেওয়া হয়, ব্যস...গজালগুলো হাড় পর্যন্ত ফুটো করে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায়। পরে একসময় ভীমের গহ্বর থেকে লাশটাকে বের করে ভাসিয়ে দিলেই হল। দাঁড়াও তোমাকে ব্যাপারটা হাতে কলমে বুঝিয়ে দিই, যজ্ঞেশ্বর দড়িটা আরও টান তো, আমি ঢুকব...'

না না, কোনো দরকার নেই ঢোকার। আমি বেশ বুঝতে পারছি ব্যাপারটা, যন্ত্রটা আমাকে কেমন যেন সম্মোহিত করে ফেলেছিল, সেই সম্মোহন কাটিয়ে উঠেই তীব্র আপত্তি জানালাম আমি। আমার বলার ভঙ্গিতে শুধু সতীশ নয়, যজ্ঞেশ্বরও হেসে উঠল।

'বাবু, ভয় পেয়েছেন বুঝি, কিচ্ছু ভয় নেই...ছোটবাবু ভিতরে ঢুকবেন না।'

কিন্তু সতীশ কি আর সে মানা শোনে, হাসতে হাসতেই সে ভীমের খোলে ঢুকে পড়ল, 'নে যজ্ঞেশ্বর, এবার দড়ি ছাড়, একটু আস্তে আস্তে...'

যজ্ঞেশ্বরের শক্ত মুঠোয় ধরা দড়িটা একটু একটু করে এগোতে লাগল আর পাল্লাটাও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসতে লাগল— ক্যাঁচ, ক্যাঁচ করে মরচে ধার কব্জাটায় আওয়াজ উঠছিল কেবল।

আমার ঘোরটা বোধহয় তখনও কাটেনি, কাটল সতীশের কথায়, 'এই দ্যাখো, এবার গজালগুলো প্রায় আমার শরীর ছুঁয়েছে, বড় জোর ইঞ্চি দুয়েক বাকি, এইবার জেরা করা শুরু হয় আর...'

আর কী কী কথা সতীশ বলছিল সেগুলো আমার কানে ঢুকছিল না, কারণ আমার চোখের দৃষ্টি তখন যজ্ঞেশ্বরের পিছনে দুটো জ্বলন্ত কয়লার মতো গোল বস্তুর উপর গিয়ে পড়েছে। ও দুটো কী! চোখ, কিন্তু কীসের চোখ? বেড়ালের, না বেড়ালের চোখ তো ওরকম হয় না, তবে কী ও দুটো...

সন্দেহটার কথা আর মুখ ফুটে বেরোতে পারল না, তার আগেই তীক্ষ্ন একটা চিৎকার করে একটা ধূসর রংয়ের শরীর ছিটকে এসে পড়ল যজ্ঞেশ্বরের মুখের উপর আর সঙ্গে সঙ্গে নখ আর ঠোঁটের আঘাতে খুবলে নিল একটা চোখ।

মা গো! বলে চিৎকার করে দু হাত দিয়ে রক্তাক্ত চোখটাকে চেপে ধরল যজ্ঞেশ্বর আর তার ফলে কী ঘটতে যাচ্ছে সেটা বুঝেই আমি প্রচণ্ড আতঙ্কে লাফ দিলাম দড়িটাকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু আমার সাধ্য কী সে দড়ি ধরে! কপিকলের উপর দিয়ে একঝলক বিদ্যুতের মতো দড়িটা ছিটকে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল লৌহভীম।

একটা চিৎকার করার সুযোগ পর্যন্ত পায়নি সতীশ। পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ, তারপর চমক ভাঙল আরেকটা বিশ্রী আওয়াজে।

তাকিয়ে দেখি লোহার মূর্তিটার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই ধূসর রং-এর মদ্দা পেঁচাটা। তার চোখ দুটো তখনও জ্বলছে আগুনের গোলার মতো।

বন্দুকটা তুলে নিয়েই গুলি চালালাম। নিশানা ভুল হবার কথা নয়, হলও না। বুকে গুলি খেয়ে ছিটকে পড়ল পেঁচাটা, তারপর অনাবশ্যক হলেও আরেকটা গুলি করলাম বন্দুকটাকে একেবারে শয়তানটার গায়ে ঠেকিয়ে। কয়েকটা মাংসের ডেলা আর রক্ত ছিটকে গেল ঘরটার চারিদিকে।

একটু থামলেন কুমার সাহেব, সেই আমার শেষ পাখি শিকার, তারপর থেকে পাখির মাংসও আর কোনোদিন খেতে পারিনি, প্লেটের উপর দেখলেই মনে পড়ে যায় দুটো লাল আগুনের মতো জ্বলন্ত চোখের কথা। ওই চোখ দুটোয় যে ভয়ংকর প্রতিহিংসা আমি দেখেছিলাম সেটা এই চল্লিশ বছরেও ভুলতে পারিনি, হয়তো সারা-জীবনেও পারব না।

অব্যক্ত

অমিতাভ সমাজপতি



সমস্ত পৃথিবী এখন চলছে। ছুটে চলেছে কলেজ স্ট্রিটের ট্রাম—লাইন। শান্তনু কোনওরকমে কলেজ স্কোয়ারের গেটটা দিয়ে ঢুকে দুলতে দুলতে বাঁধানো একটা চত্বরে এসে বসে পড়ে। আজ একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। আর বাড়ি যাওয়া যাবে না।

রাত আটটা অবধি কফি হাউসে সবাই মিলে আড্ডা দিয়েছে। তারপর সুমন্ত আর শান্তনু হাঁটতে হাঁটতে হাড়কাটা গলির সেই ঝুপড়িতে বসে মদ খেয়েছে। গ্যাসট্রিকের ব্যথাটা কয়েকদিন ধরে আবার ভোগাচ্ছিল। অ্যালকোহল এখন পেনকিলারের কাজ করছে।

রাত একটা বাজে বোধহয়। কলেজ স্কোয়ারে একটিও জাগা—মানুষ নেই। শুধু সিমেন্টের বেঞ্চে কয়েকজন শয্যাশায়ী। গরমে এই পার্কের হাওয়া, গরিবের এয়ারকন্ডিশন। ঘুমিয়ে নেওয়া সহজ।

শান্তনু পাথরের মসৃণ দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে। নেশা এখন তুঙ্গে। তবুও খেয়াল করে, বিদ্যাসাগরের মূর্তিটার বেদিতে বসে রয়েছে ও। লজ্জা পায় শান্তনু। ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে বোঝে হাত—পা প্রায় অচল। ধীরে ধীরে বেদিটাকে ধরে উঠতে চায়।

তুমি বইস। লজ্জার কিছু নাই।

চমকে ওঠে শান্তনু। কে যেন কথা বলল। চারপাশটা ভালো করে দেখে। না, কেউ নেই তো! মাথাটা দু—তিনবার ঝাঁকিয়ে নিতে নিতে মা—বাপ তুলে গালিগালাজ করে সুমন্তকে। ব্যাটা পাঁড় মাতাল...আমায় গলা অবধি খাইয়ে কখন কেটে পড়েছে।

তুমি দোষারোপ করিও না। ব্যক্তি নিজকর্মে কেবলই অজুহাত খোঁজে। যেন সমস্ত অপরাধসূচক কর্মে অপরের হস্ত।

শান্তনু এবার ভয় পেয়ে যায়। নেশাগ্রস্ত হলেও মাথাটা এখনও কাজ করছে ঠিক। শেষ পেগটা গেলার সময় নিজের কবিতা গড়গড় করে আউড়ে গেছে। কথাটা এল কোথা থেকে? এদিক—ওদিক তাকাল শান্তনু।

দিশাহারা হইবার কিছু নাই। আমিই কহিতেছি। তোমরা যাহাকে বিদ্যাসাগর বলিয়া থাকো।

শান্তনু অবিশ্বাসের চোখে ধীরে ধীরে উপরের দিকে তাকায়। পাথরের মূর্তিটা যেন মুচকি হাসছে। কাঁপতে কাঁপতে শান্তনু হাতজোড় করে নমস্কার করে, বলে আপনি!

ঈশ্বরচন্দ্র। তুমি আমাকে ঈশ্বর বলিতে পারো।

কী বলছেন কী! আপনি! শান্তনুর কাঁপুনি বাড়ে।

আপনি বিদ্যা...সা...

প্রয়োজন নাই। তুমি কবি? আমি কোনওদিন কাব্য লিখি নাই। সে প্রতিভা আমার ছিল না। অনুবাদ করিয়াছি মাত্র। তুমি প্রতিভাবান। অতএব নমস্য।

শান্তনুর জোড়হাত যেন আটকে গেছে। বলে, কী বলছেন আপনি! কুড়ি বছরে বিদ্যাসাগর উপাধি। একত্রিশে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল আপনি...।

বিদ্যাসাগর খলখল করে হেসে উঠলেন, বললেন—লজ্জা দিও না। পাঠ্য—পুস্তক লেখক ছাড়া নিজেকে কিছুই ভাবি না আজ। তুমি ওইভাবে দাঁড়াইয়া কেন? বইস। কত বৎসর ধরিয়া আমি এভাবে বসিয়া আছি। আমার হাতটা ধরো। একটু নামিয়া তোমার সঙ্গে বসি।

শান্তনু দ্বিধাগ্রস্তভাবে হাত বাড়ায়। বিদ্যাসাগর বেদিটা থেকে ছোট লাফ দিয়ে শান্তনুর পাশের জায়গাটায় বসেন। শান্তনুর মুখ থেকে দেশি মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। লজ্জায় খানিকটা সরে যায় ও। বিদ্যাসাগর বুঝতে পেরে হেসে ওঠেন—লজ্জা পাইও না। না, না, লজ্জার কিছু নাই। আমার অভ্যাস ছিল। সময়কালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মধুর পাশে বসিয়া থাকিতাম। তুমি জানো বোধহয় শেষদিকে জল ছাড়া শুধু হুইস্কি খাইয়া নিজেকে শেষ করিল তোমাদিগের মধুসূদন।

শান্তনু মাথা নাড়ে। জানি। তাঁর উপর আপনার দয়ার কথা সর্বজনবিদিত। আপনি তাঁকে বড় অসময়ে সাহায্যের হাত...।

বিদ্যাসাগর হাত দিয়ে শান্তনুকে নিবৃত্ত করলেন—দয়া নয়। সম্মান বলো। আমি উহাকে সম্মান করিতাম প্রতিভার জন্য। যেমন এক্ষণে তোমাকে করিতেছি।

সহস্রবার চেষ্টা করিলেও কোনওদিনও মেঘনাদ বধ লিখিতে পারিতাম না। এমনকী প্রথমে তো তাহার ছন্দ—ই ধরিতে পারি নাই। তুমি জানো বোধহয় আমি আর দ্বারিকানাথ, রাজনারায়ণের কাছে ইংরেজি শিক্ষা করিতে গিয়েছিলাম। তখনই বুঝিয়াছিলাম মধু কী অসাধারণ পণ্ডিত!

আপনি তাঁর এই উচ্ছন্নে যাওয়া আটকালেন না কেন? ইচ্ছে করলেই তাকে বাঁচানো যেত।

বিদ্যাসাগর হো—হো করে হাসলেন। বললেন—তুমি সত্যি করিয়া বলো তো তোমাকে কে সুরা পান করাইয়াছেন। তোমার কোনও বান্ধব নিশ্চয়ই?

শান্তনু মাথা নাড়ে। হ্যাঁ, সুমন্ত।

দেখো, এখন তিনি হয়তো তোমাকেই দোষারোপ করিতেছেন। তাহার স্ত্রী তাহাকে বকিতেছেন। তিনি বমি করিতেছেন এবং তোমাকে অভিসম্পাত করিয়া তৃপ্ত হইতেছেন। আসলে আমরা যাহা করি স্ব—ইচ্ছায়ই করিয়া থাকি। পরে কুফল লাভে অন্যকে দোষারোপ করিয়া শান্তি পাই। তাহা ছাড়া তোমরা কবি, তোমাদের ভাবের জগতে বিচরণ। অতএব শাসন, বাঁধন তোমাদিগের জন্য নহে। মধুসূদনকে বাঁচাইয়া অদ্যকার সভায় কী লাভ হইত? যাহার হয় অষ্টমবর্ষেই হয়, আশির প্রয়োজন নাই।

শান্তনু কিছুক্ষণ চুপ করে মাথা নেড়ে যায়। তারপর একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে বসে, আপনার যন্ত্রণা হয় না? এই যে অবক্ষয় চলেছে বছরে বছরে, এতে আপনার ক্রোধ হয় না? আপনি তো ক্রোধের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের মুখটি যেন কেমন পাংশুবর্ণ হয়ে উঠল মুহূর্তে। কিছুক্ষণ উদাসভাবে তাকিয়ে থাকলেন সামনের দিকে। দৃষ্টিতে ইউনিভার্সিটির দেশলাই মার্কা বাড়িটি। তারপর অদ্ভুত গলায় বলেন—জানো, আমি একদিন একদিন করিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকলাপ দেখিতেছি। তোমাদের মধ্যে কে যেন বলিয়াছিলেন—বিশ্বের বিদ্যা যেখানে লয় হয় তাহাই বিশ্ববিদ্যালয়। কথাটি সত্য। তোমরা কেন যে প্রতিবাদ করিতেছ না জানি না। রাজনীতি করিতে করিতে ইহাকে এখন কোথায় লইয়া ফেলিয়াছ। জানো, আমি সাহেবের টেবিলে পা তুলিয়াছিলাম। আজ বিংশ শতাব্দীতে তোমরা পদলেহন কী করিয়া শিখিলে বুঝিলাম না। অথচ কত কী শিখিবার ছিল।

শান্তনু লজ্জা পেয়ে বলে, আমরা আজ রাজনীতি—সর্বস্ব এক আধখেচড়া জাতি। জন স্ট্র্যাচির মতে জনপিণ্ড।

বিদ্যাসাগর মৃদু হেসে বললেন, যথার্থই বলিয়াছ। তা তোমার পড়াশোনার বহর তো বেশ ঠেকিতেছে।

শান্তনুর গর্ব হল এবার। বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে কমপ্লিমেন্ট। ভাবা যায়? নম্রভাবে বলল, আচ্ছা আপনাদের সময়ের সঙ্গে এখনকার বেসিক তফাতটি ঠিক কী? মানে আমরা কি পিছিয়ে পড়ছি, না এগোচ্ছি?

গম্ভীরভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। শান্তনু ডাক দিতে গিয়েও থেমে যায়। একসময় বিদ্যাসাগরই বলে ওঠেন, তোমরা পিছাইয়া পড়ো নাই বরং অনেকটাই অগ্রসর হইয়াছ। ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া শুধু সামনে অগ্রসর হইয়া খেই হারাইতেছ।

বিদ্যাসাগর হঠাৎ উঠে পড়লেন, শান্তনু অবাক হয়ে দেখে ওঁকে। এত কম উচ্চতার লোকের এত তেজ!

তুমি বোধহয় আমার খর্বকার শরীর দেখিয়া বিস্মিত হইতেছ?

শান্তনু থতমত খেয়ে যায়। মানে আপনার ছবি দেখেছি...

উহা তো বক্ষ অবধি। আসলে আমি আমার এই আকৃতির জন্য চিরকালই হীনম্মন্যতায় ভুগিয়াছি। আইস জলের কিনারে বসি।

শান্তনু উঠে দাঁড়ায়।

নির্জন কলেজ স্কোয়ার। আকাশে চাঁদ। জলে তার ছায়া পড়ে চকচক করছে। অদ্ভুত একটা দৃশ্যপট। নিঃশব্দ চরাচর। পাশে বসে আছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ। একেবারে বন্ধুর মতো। জমি থেকে ঘাস তুলে ছিঁড়ছেন আঙুল দিয়ে। যে মানুষটা রূঢ়, স্পষ্ট কথার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, আজ যেন কেমন বিষণ্ণ। মনের ভিতরে কেমন যেন অব্যক্ত অবসন্নতার ছোঁয়া। বিদ্যাসাগর একটি ঢিল ছুড়ে মারলেন জলে, টুপ করে আওয়াজ হল। জলের চাঁদ নড়ে উঠে আবার ধীরে ধীরে স্থির হল।

আমি জলে ইস্টক ছুড়িলাম কেন বলো দেখি? শান্তনু না বুঝে মাথা নাড়ে, ওটা হয়তো স্বভাব। জলের কাছে এলেই ঢিল ছুড়তে ইচ্ছে হয়। আপনিও দেখছি এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন।

—না, আমি কোনওদিনই ব্যতিক্রম ছিলাম না। খানিকটা দৃঢ়চেতা হওয়াই কি ব্যতিক্রম?

শান্তনুর গা থেকে যেন আগুন বেরোচ্ছে গরমে। ঠান্ডা জলে স্নান করে নিলে ভালো লাগত। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, স্নান করবেন?

বিদ্যাসাগর যেন সংকুচিত হয়ে উঠলেন—না—না, আমি সন্তরণ জানি না।

শান্তনু চমকে ওঠে। ঠাট্টা করছেন বোধহয়। বাঙালি সাঁতারের অনুপ্রেরণা তো আপনার কাছ থেকেই পেয়েছে। সেই বিখ্যাত গল্প! মা—মা বলে দামোদর পেরোনো সাঁতরে? এটা কোন লোকে না জানে?

বিদ্যাসাগর যেন লজ্জিত হলেন, বললেন,—না, ওটি সর্ব্বৈব মিথ্যা। আমি সত্যিই সন্তরণ জানি না।

তা হলে ওই গল্পটা?

ওটি রটনা। সাহেব আমাকে ছুটি দিলেন না। আমার ভ্রাতার বিবাহের পত্র পাইয়া ছুটি চাহিয়াছিলাম।

শান্তনু একেবারে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। সন্দেহে মুখে ভাঁজ পড়ল ওর। চাঁদের আলোয় বিদ্যাসাগর যেন সেটা লক্ষ করলেন, বললেন, আসলে দামোদর সেইসময় শুষ্ক। অর্থাৎ যখন আমার ভ্রাতার বিবাহ হয়, তখন জ্যৈষ্ঠ মাস। গবাদিপশুরা হাঁটিয়া পার হয়। আমি তাহাই করিয়াছিলাম...।

শান্তনু বাধা দিয়ে বলে, কেন? আপনি মায়ের আদেশ তো কখনওই অমান্য করেননি। তাঁর ডাকে সেই ভয়াল নদীতে ঝাঁপ দেননি?

না, কখনওই নহে। আর একটা কথা...

বিদ্যাসাগর চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ।

আমি কেন সেইরাতে বাড়ি আসিয়াছিলাম—জানি শুধুই আমি। আর কেহ নহে। তবে একজন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি মুখে কিছুই বলেন নাই। বিদ্যাসাগর আবার চুপ করে গেলেন।

বলতে কি আপত্তি আছে? তাহলে থাক। শান্তনু প্রসঙ্গ পালটাতে চেষ্টা করে। একটা কথায় আটকে রাখলে চলবে না। যতটা পারা যায় জেনে নেওয়া যাক। এই সুযোগ আর আসবে না। রাত অনেক হল। প্রায় মধ্যরাত তো বটেই।

বিদ্যাসাগর ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে সোজাসুজি শান্তনুর চোখের দিকে তাকালেন তারপর হঠাৎ আনমনে বলেন, তুমি যাহা দেখিতেছ তাহা ঠিক নহে। তুমি যা দেখিতে চাও তাহাই হয়তো ঠিক। আমি সেই রাত্রে মায়ের ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম বলিলে ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ মিথ্যাটি রচনা হইবে। সত্যটি হইল তখন নতুন বিবাহিত জীবন। গিয়েছিলাম নববধূর অব্যক্ত ডাকে, মায়ের ডাকে নহে।

এই অবধি বলেই বিদ্যাসাগর একটা ঢিল খুঁজে নিয়ে আবার ছুড়ে মারলেন জলে। জলের চাঁদ আর একবার নড়ে উঠল। বিদ্যাসাগর বললেন, আমি তখন এবং এই মুহূর্তে কেন ইস্টকখণ্ড ছুড়িলাম জানো? কারণ, এই জল যতদিন থাকিবে ততদিন ইহার ভিতর চাঁদ দেখা যাইবে। কিন্তু ইহা—তো আসল চাঁদ নহে। চাঁদের প্রতিবিম্ব। দেখিতে অবিকল হইলেও সত্য চাঁদ দেখিতে হইলে স্কন্ধ উপরের দিকে তুলিয়া দেখিতে হইবে। সত্যের দিকে তাকানো এক্ষণে স্কন্ধ ভারাক্রান্ত করা। মানুষমাত্রেই ইহার অবহেলা করে। তাই নকল চাঁদে ইস্টক ছুড়িয়া আমার মোহমুক্তি ঘটাইতেছিলাম। যেমন আজ তোমাকে পাইয়া এতদিনকার মোহমুক্তি ঘটানো গেল।

শান্তনু অবাক হয়ে বলে, কিন্তু এই মিথ্যেটা প্রায় এক শতাব্দী ধরে সত্যি হিসেবে চলে আসছে।

বিদ্যাসাগর হাসলেন। প্রগাঢ় হাসি। জ্ঞানী লোকের অবজ্ঞা নেই সেই হাসিতে। মনের মধ্যে জমে থাকা গভীর দুঃখের একটুকরো ঝলক যেন হাসি হয়ে ঝরল, বললেন, দেখো, শতাব্দীর সব রটনাই তো সত্য নহে। সত্য হইলে পৃথিবীটা আরও অর্থপূর্ণ হইত। তুমি কি জানো, চলিয়া যাওয়া সময়ের অনেকটাই ফাঁকির মধ্যে নিমজ্জমান। ইহার অধিকাংশটাই অসত্য অথবা সত্যের অপলাপ?

শান্তনুর অপ্রস্তুত ভাবটা এখনও কাটেনি। এই মহান ব্যক্তিত্ব কত যুগ ধরে ঘরে ঘরে মহামানব হয়ে আছেন। তাঁর এই অদ্ভুত স্বীকারোক্তি!

বিদ্যাসাগর শান্তনুর অবাক হওয়াটা যেন ধরে ফেললেন। কাপড়ের খুঁটটি জড়িয়ে বাবু হয়ে বসলেন, বললেন, তুমি সংকুচিত হইও না। এসকল কথা কেহই জানে না। আমার জীবনের আরও কয়েকটি অসত্য আজ উদ্‌ঘাটিত হইতে পারিত কিন্তু তোমার চিত্তবৈকল্য দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি না সকল কথা তুমি কেমনভাবে লইবে।

শান্তনু হঠাৎই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। নিজের জীবনের একরাশ অব্যক্ত কথা যেন ওর চারপাশ ঘিরে নাচতে শুরু করেছে, যে কথা কাউকে বলা হয়নি। হবেও না বোধহয়। দেড় শতাব্দী পরে এমনভাবে বলার সুযোগ পাবে কি ও! চমক ভাঙল বিদ্যাসাগরের ডাকে।

কী ভাবিতেছ?

কিছু না। আপনি বলুন, আমি শুনব।

বিদ্যাসাগর যেন খুশি হয়ে গায়ের চাদরটা এবার একেবারে ভালোভাবে জড়িয়ে নিলেন। কপালটা চাঁদের আলোয় চকচক করছে ওর। বেশ উঁচু, কিছুটা কামানো। ওটাই বোধহয় স্টাইল ছিল তখনকার দিনের পণ্ডিতদের। তবে চটি জুতোর ব্যাপারটা ওর নিজস্ব স্টাইল। অসাধারণ স্টাইলিস্ট ছিলেন।

শান্তনু কিছু জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও চুপ করে যায়। বিদ্যাসাগর জলের দিকে তাকিয়ে আছেন। আনমনা মনটি যেন কথার খেই ধরতে চাইছে। গোপন কোনও দুঃখের কথা বলবার আগে প্রত্যেক মানুষ কিছুটা থম মেরে যায়। উনিও এখন সেইরকম রয়েছেন। খানিক পরে বললেন, তোমার সন্তান কয়টি?

দুই,—দুটোই মেয়ে।

তুমি দেখিতেছি বেশ ভাগ্যবান।

শান্তনু অবাক হয়ে বলল, সেকী? ভাগ্যবান বলছেন কেন? ছেলে নেই তাতে আমি আক্ষেপ করি না, তবে এ ব্যাপারে আমার স্ত্রী অবশ্যই দুঃখিত। কিন্তু এতে ভাগ্যবানের কী দেখলেন!

কেন বলিতেছি জানো? তোমার পুত্র থাকিলে কখনওই তোমার সদৃশ হইত না। ইহা হয় না। কখনও কখনও অবশ্য হয়, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিপরীত হয়। সেক্ষেত্রে আক্ষেপ আর, দুঃখ করা ছাড়া কী—ই বা করিবার থাকে। যেমন আমি। লোকে বিদ্যাসাগর নাম দিয়াছে, অথচ আমার পুত্রটি...। শান্তনু এই ঘটনাটি জানে। তাই অন্যপ্রসঙ্গে চলে যাওয়ার জন্য আগের কথাটারই খেই ধরে বলে, আপনি সাংসারিক জনপ্রিয়তার কথা বলছিলেন।

হ্যাঁ, ঠিকই বলিয়াছ। জনপ্রিয়তা, অর্থাৎ সবাকার মনে তুমি ভেদ্য এবং হ্যাঁ—বাচক থাকিবে, অথবা না বলিবে না। এমনভাবে চলিতে পারিলে তুমি জনপ্রিয় হইবে। ইহাতে তোমার নিদারুণ ক্ষতি হইলেও তোমার মাথাটি হ্যাঁ—র দিকে থাকিবে। যেমন মদীয় মস্তকটি যদি তোমাদিগের ভগবতীদেবীর বিরুদ্ধে লইতে পারিতাম তাহা হইলে আমার পুত্র কলিকাতাতেই থাকিত। শিক্ষা লাভ করিত। পিতার মৃত্যুর পর উইল লইয়া মামলা করিত না, বংশের নাম মসিলিপ্ত করিত না। তাহা আর হইল কোথায়।

শান্তনু বলল, এটা এমন কিছু দোষের হত না। এ ব্যাপারে আপনি যে একেবারে উদাসীন ছিলেন সেটা ভাবছেন না কেন?

বিদ্যাসাগর বাধা দিলেন, না—ইহা সত্য নয়। আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন আমার মাতৃভক্তি সুপরিচিত। সেই মোহ ভাঙিতে পারি নাই। একদিক রাখিতে হইলে অন্যদিক ছাড়িতে হয়। আমি জনপ্রিয়তাই গ্রহণ করিয়াছিলাম। সংসারে এবং জগৎসংসারে।

কিন্তু আপনার দয়ার কথা সর্বজনবিদিত, বাঙালি এখনও আপনার উদাহরণ দেয়। শুধু মধুসূদন নয়, আমরা সবাই। এটা নিছক জনপ্রিয়তার জন্য—তা তো নয়।

তুমি আবার লজ্জা দিতেছ।

সত্যি বলছি। আপনার বিধবা বিবাহ আইন ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সমাজসেবা। আমি আশ্চর্য হই আপনার সাহস দেখে। কত আধুনিক ছিলেন সেই যুগে। ভাবা যায় না। ব্যাপারটা মাথায় এল কীভাবে?

আসলে এক চৌদ্দবর্ষীয় বালিকার বৈধব্য আমাকে পীড়িত করিয়াছিল তাই হয়তো...

আপনি কি মার্কস—এ বিশ্বাস করেন?

কেন? একথা বলিতেছ কেন?

কারণ এটি হল তাঁর মতবাদ।

যদি বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বলো তবে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শান্তনু তার প্রিয় সাবজেক্ট পেয়ে খুশি হয়ে বলল, আপনি আগে বিধবার কষ্ট দেখেছিলেন তারপর তার প্রতিকার। এটি হল কার্ল মার্কসের একটি থিয়োরি, আগে বস্তু দেখি, তারপর মন তার উপর কাজ করে।

বিদ্যাসাগর মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন, বললেন, কিন্তু কখনও কখনও মনও আগে কাজ করে। পরে কার্য সমাধা হয়। দুইটিই সমানভাবে মনুষ্যের উপর কাজ করিয়া থাকে। শান্তনু মাথা নাড়ে—হয়তো ঠিকই—আপনি বলছেন হেগেলও তাহলে সঠিক।

হ্যাঁ, আমি হেগেল পাঠ করিয়াছি তিনি যেমন অর্ধসত্য, তোমার কার্ল মার্কসও অর্ধমিথ্যা।

কিন্তু মার্কস তো বলেছিলেন হেগেলের থিয়োরি ঠিকই আছে। শুধু পা উপরে মাথা নীচে।

বিদ্যাসাগর হা—হা করে হাসলেন—আসলে দুইজনকেই পাশাপাশি রাখিতে হইবে। ঠোকাঠুকি করিলে চলিবে না। আমি একবার এই পাশাপাশি চিন্তা না করিয়া জীবনে এক বিশাল পাপ করিয়াছিলাম যাহা জীবনে কাহাকেও বলিতে পারি নই।

কীরকম?

তোমার নিশ্চয়ই আমার সেই বিখ্যাত গল্পটি মনে আছে।

কোনটা বলছেন? কারমাটারে ভুট্টা বিলিকরণ?

না—না, সেই যুবকটি—জ্ঞানদানের নিমিত্তে যাহার আমি বাক্স বহন করিয়াছিলাম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা কে না জানে? ছোটবেলায় কতবার ট্রানস্লেশন করেছি। গল্পটায় আপনি 'কুলি কুলি' করে চিৎকার করে ওঠা যুবকের হাত থেকে বাক্স নিয়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, ইতিহাস সেই অবধি জ্ঞাত রহিয়াছে, তাহার পরের ইতিহাস নাই। তাহার পরদিন সেই সময় স্টেশনে যাইতেই প্রায় অনাহার—ক্লিষ্ট এক বৃদ্ধ আমাকে চিৎকার করিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিল। আমি অপ্রস্তুত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেই সে বলিল, সেই রাত্রিতে সে ওই যুবকের বাক্সটি বহন করিতে পারিলে দুই আনা পয়সা পাইত, সে আসিবার আগেই আমি তাহার গ্রাস কাড়িয়াছিলাম। আমি বারংবার তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াও পারি নাই। সেই রাত্রে তার পরিবারের কোনও খাবার জুটে নাই। তৎক্ষণাৎ তাহাকে চারি আনা পয়সা দান করিয়াছিলাম।

শান্তনু অবাক হয়ে প্রশ্ন করে এর মধ্যে পাপের কী আছে? আপনি তো তার প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর হাসলেন, বললেন, না আমি স্বনির্ভরতার শিক্ষা দিতে গিয়া প্রথমত একটি সর্বহারার রোজগারে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছিলাম। কারণ, যে যুবক একটি ব্যাগ বহিবার জন্য দুই আনা দিতে রাজি সে নিশ্চয়ই প্রয়োজনের অপেক্ষা অধিক উপায় করে। সে কখনওই পরনির্ভর নহে। অতিরিক্ত উপায়ী। স্বনির্ভরতা শিক্ষা দিতে গিয়া একজন সত্যিকারের উপায়ী লোককে ভিখারি করিয়া ছাড়িয়াছি, ইহা শুধুমাত্র অন্যায় নহে সততই পাপ, যাহা এখনও ভুলিতে পারি নাই।

শান্তনু আশ্চর্য হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। কী অদ্ভুত সৎ হলে এসব কথা বলা যায়। আত্মবিশ্লেষণের কী অসাধারণ প্রচেষ্টা! এর নাম বিদ্যাসাগর।

ধীরে ধীরে নিস্তব্ধতা জায়গা নিয়ে নেয় দুজনের মাঝখানে। কেউ কোনও কথা বলে না আর।

শান্তনুর মনের মধ্যে নিদারুণ এক লজ্জাবোধ চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরতে শুরু করছে। এতদিনকার সব অহংকার যেন তালগোল পাকিয়ে গলার ভিতর থেকে উগলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। জীবন বড়ই ভয়ানক নাটক। কত স্মৃতি—বিস্মৃতি দিয়ে তৈরি এই মানবজীবন। কত কথা মনের কুঠুরিতে আটকে থাকে। কাউকে বলা যায় না। কতবার স্ত্রীকে, সুমন্তকে বলতে চেষ্টা করেছে ও। পারেনি। পারা যায় না।

তখন কত বয়স হবে? বারো—তেরো—মেজদার গল্প লেখার খাতা থেকে দশ—বারো পাতা ছিঁড়ে কুচো কুচো করে নর্দমায় ফেলে দিয়েছিল ও। কেউ জানতে পারেনি কার কাজ। পরদিন গল্প জমা দেবার শেষ তারিখ। মেজদা সারারাত কেঁদেছিল। তিনদিন পর শান্তনু প্রাইজ পেল। প্রথম পুরস্কার। মেজদা হাসতে হাসতে বলেছিল ভালোই হল বল, আমি তো প্রত্যেক বারই পাই এবার তুই পেলি।

এক—একটি স্মৃতি সিনেমার ছবির মতো এক—এক করে উঠতে শুরু করছে চোখের সামনে—উনিশশো সত্তর সাল। প্রবীর বাগবাজার থেকে গভীর রাতে দেখা করতে এসেছিল অশোকনগরে। ছেঁড়া জামা, চুলগুলো অবিন্যস্ত। কাঁধে একটি ঝোলা। দরজার কড়া নাড়তেই বুক কেঁপে উঠেছিল। আবার হয়তো এনকাউন্টারের খবর। হয়তো আবার কেউ নেই। বুকের ভিতর হাতুড়ির শব্দ অনুভব করতে করতে খুলে দিয়েছে দরজাটা।

অন্ধকার ঘরে নিঃশব্দে ঢুকেছিল প্রবীর। দেশলাই জ্বালিয়ে, হ্যারিকেনটার খোঁজ করতে যেতেই হাত দিয়ে আটকে দিয়েছিল প্রবীর।

থাক আলো জ্বালাস না। সময় নেই। খবর আছে।

শান্তনু বালিশের তলায় সিগারেটের প্যাকেট হাতড়ায়। একটা প্রবীরকে দেয়। আবার দেশলাই জ্বালিয়ে দেখে নেয় প্রবীর কিনা। গত চারমাস কোনও খোঁজখবর নেই। বাঁকুড়ায় এক প্রত্যন্ত গ্রামে সংগঠনের কাজে ছিল।

দেশলাইয়ের আলোতে ওর গালে কাটা একটা দাগ দেখে শান্তনু।

শান্তনু বলে, আয় খাটে এসে বোস। গালে কীসের দাগ?

প্রবীর পাত্তা দেয় না কথাটার। সিগারেটে দু—চারটে জোরে টান মেরে মেঝেতে ফেলে দিয়ে বলে খেতে দে কিছু, খিদে পেয়েছে।

অন্ধকারে প্রবীরের উপস্থিতি প্রচণ্ড অস্বস্তিতে ফেলেছিল শান্তনুকে। খাটের তলা হাতড়ে দুটো রুটি আর গুড়ের ঢেলা হাতে করে দিল ওকে। গোগ্রাসে গিলে ফেলল ও। ওর খাওয়ার মধ্যে এমন একটা আদিমতা ছিল যে শান্তনু ভয়ানক ভয় পেয়ে যায়। যেন প্রবীর এরপর ওকেই খাবে। অন্ধকারে চোখ দুটো ওর জ্বলছিল।

জল খেয়ে আবার সিগারেট চায় প্রবীর। কয়েক মিনিট নীরবতা। যে—কোনও মুহূর্তে কোনও সাংঘাতিক সংবাদ বেরিয়ে আসতে পারে ওর মুখ থেকে। তাই হল। হিসহিস শব্দে বেরিয়ে এল...প্রদীপ...।

শান্তনু স্নায়ুতে ধাক্কা খেল জোর।

কী হয়েছে?

বেলেঘাটার এনকাউন্টারে শেষ...

শান্তনুর সমস্ত হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে গলা অবধি উঠে এল। কোনওরকমে হাত দিয়ে গলা চেপে ধরল ও।

প্রবীর খাটে এসে বসল। হাত দুটো শান্তনুর হাতে রেখে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, ব্যাড লাক। তুই যদি খবরটা ঠিকসময় পৌঁছোতে পারতিস...

কিন্তু আমি...

জানি—সেদিন অশোকনগর রেড হয়েছিল, তুই পালাতে পারিসনি।

এক লাফ দিয়ে প্রবীর নেমে কোমর থেকে বার করে রিভলভারটা। হাতে দেয় শান্তনুর। এটা দীপঙ্করের। শেষ দেখা হওয়ার সময় তোকে দিয়ে গিয়েছিল। ওর লাস্ট প্রেজেন্ট। তোকে খুব ভালোবাসত।

আর একটা ছোট্ট লাফ দিয়ে প্রবীর বেরিয়ে গিয়েছিল দরজা খুলে।

শান্তনু খাটে বসে রিভলভারটা নিয়ে হাউহাউ করে কেঁদেছে সেদিন। সত্যি কথাটা কেউ জানে না। প্রবীরকে বলা যায়নি। সেই রাতেই প্রবীরের দেহটা লাইনের ধারে পড়েছিল। সত্যি কথা কেউ জানবে না। কাউকে বলা হয়নি। দীপঙ্করের সেই রিভলভারটা গুলি ভর্তি এখনও শান্তনুর কাছে আছে। মাঝে মধ্যেই রাতে একা ছাদে চলে যায় শান্তনু। যখন ঘুম আসে না। যন্ত্রটায় হাত বুলোয়। এইখানে ঘুমিয়ে আছে প্রবীর, প্রদীপ, দীপঙ্কর। একসময় বুকে ঠেকিয়ে ইচ্ছে হয় ট্রিগারে চাপ দিতে। পারে না শান্তনু। চিৎকার করে কী যেন বলে দিতে ইচ্ছে হয়। আপন মনে আউড়ে যায়, অল মাই কনসেন্স হ্যাজ থাউজেন্ডস অব লেগস...।

তুমি শেক্সপিয়র খুব ভালোভাবে পড়িয়াছ বোধহয়?

চমকে ওঠে শান্তনু—এ আমি কোথায়! কলেজ স্কোয়ারের জলের ধারে কুড়ি বছর পর।

সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে। বিদ্যাসাগর স্মিত হেসে সন্তর্পণে জায়গা ছেড়ে উঠলেন। গায়ের চাদরটা ঠিক চির পরিচিত ভঙ্গিতে ভালোভাবে জড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

শান্তনু অনুনয় করল—আপনি বসুন। আমার কিছু কথা আছে।

বিদ্যাসাগর জোরে হেসে হাঁটতে শুরু করলেন। বললেন, অব্যক্ত কথা?

হ্যাঁ, আপনাকে শুনতে হবে। আমি কুড়ি বছর ধরে মনের মধ্যে জমিয়ে রেখেছি। আজ বলব। আপনি বসুন প্লিজ। শান্তনু এবার যেন আদেশ করল...

বিদ্যাসাগর মাথাটা ধীরে নাড়তে নাড়তে এগিয়ে গেলেন বেদিটার দিকে—না, অদ্য নহে। পরে বলিও।

শান্তনু চিৎকার করে ওঠে, না আজ, টু নাইট। আমার মনের কথা সব বলতে দিন। প্লিজ, দশ মিনিট।

না বৎস তাহা হইতে পারে না।

কেন? কেন হতে পারে না? আমি কত বছর ধরে জমিয়ে রেখেছি আজ অন্তত বলতে দিন—অন্তত একজনকে বলে দেব আমি—

বিদ্যাসাগর হা—হা করে হাসতে হাসতে বেদিটার উপর উঠে বললেন, দেড় শত বৎসর ধরিয়া ভাবিও, আমার মতো—যে তুমি ঠিক না...ভুল, কুড়ি বৎসর যথেষ্ট কি?

শান্তনু বিকট চিৎকার করে এগিয়ে যায় বেদিটার দিকে। বিদ্যাসাগর নড়তে নড়তে স্থির হয়ে গেলেন।

শান্তনু সমানে চিৎকার করে যায়, প্লিজ বিদ্যাসাগর, প্লিজ ঈশ্বরচন্দ্র—প্লিজ আমি আর কাউকে বলতে পারব না...পারিনি...

খানিকক্ষণ পর সম্বিৎ ফিরে আসে ওর। পাথরের মূর্তিটাকে জোরে জোরে নাড়তে নাড়তে একসময় ক্লান্ত হয় শরীরটা। ধীরে ধীরে নেমে আসে বেদিটা থেকে।

চিৎকার করে মূর্তিটাকে বারবার বলে — আমাকে বলতেই হবে। এইবারেই বলতে হবে।

পেটের ভিতরে একরাশ গ্লানি পুষে রয়েছে কত বছর। শান্তনু গলায় আঙুল ঢুকিয়ে যেন বের করে দিতে চায়। হড়হড় করে বমি বেরোয়। মাথাটা ভোঁ করে ঘুরতে থাকে। কাঁপতে কাঁপতে জলের দিকে এগিয়ে যায় ও। মার কথা মনে পড়ে বিপন্নতায়। মা বলতেন, রাতে জলের কাছে পাপের কথা বলতে হয়। পাপ দূর হয়।

শান্তনু জলের দিকে ঝুঁকে পড়ে। চিৎকার করে বলে—শোনো সেদিন অশোকনগরে আমি ছিলাম না। আমি জয়ার কাছে গিয়েছিলাম। জয়াদের বাড়িতে কেউ ছিল না। সারারাত গান শুনে শেষরাতে একসঙ্গে শুয়েছিলাম। ও এখন আমার স্ত্রী। সেদিন প্রেমিকা ছিল। এক বিছানায় আমি যখন সম্ভোগে উত্তাল তখন প্রদীপ, দীপঙ্কর ওরা মরে পড়ে আছে রাস্তার ধারে। ইচ্ছে করলে প্রয়োজনীয় সংবাদ পৌঁছোতে পারতাম আমি। যাইনি।

জলের ভিতর থেকে কে যেন হা—হা শব্দে হেসে উঠল। চমকে উঠল শান্তনু। জলে চাঁদটা নেই। ঝুঁকে পড়ে আবার দেখার চেষ্টা করল ও। নেই। অথচ আলো চকচক করছে। ঘাবড়ে গিয়ে আকাশের দিকে তাকায় শান্তনু। পুব আকাশে তখন সূর্য উঠে গেছে। প্রথম আলো কলেজ স্কোয়ারের জলে চকচক করে রাত্রির মৃত্যু ঘটিয়েছে।

হল না। রাতের জলের কাছে বলা হল না। ডুকরে কেঁদে ওঠে শান্তনু। সূর্যের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে, তুমিও বিশ্বাসঘাতক—আমারই মতো...।

যে মেয়েটি মোহময়ী হতে চেয়েছিল

স্বপ্নময় চক্রবর্তী



দুটি মানবদরদি রাজনৈতিক দলের পারস্পরিক বোমাবাজির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল কাশীনাথের বাবার প্রাচীন হারকিউলিস সাইকেলটি। ব্রেক কষার মুহূর্তে একটা বোমা ফেটেছিল তাঁর গায়ে। হাসপাতালে যখন নেওয়া হল, তখন তিনি মৃত। ময়নাতদন্তের জন্য পুরো বডি দরকার, তাই খোঁজাখুঁজি করে নয়ানজুলিতে পাওয়া গিয়েছিল তাঁর বাঁ হাত ও বাঁ পায়ের অংশ। পায়েতে তখনও স্যান্ডাকের জুতোটা আটকে ছিল।

এরপর দুটি মানবদরদি দলই দাবি করল হত্যাকারীর শাস্তি চাই। কিন্তু হত্যাকারীকে পাওয়া গেল না, ওরা বলল পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ওরা বলল পরিবারের একজনকে চাকরি দিতে হবে। রাস্তা অবরোধ হল, যা হয় আর কী, মন্ত্রী এসে জানালেন চাকরি দেওয়া হবে। কিন্তু চার বছর হয়ে গেল, কিছুই হয়নি, যদি জানতে চান।

অনাথ কাশীনাথের দিকে মদতের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল উত্তম চোংদার। উত্তম তখন হাটখোলায় নতুন মার্কেট—কমপ্লেক্স—এ ওষুধের দোকান দিয়েছে। ওই দোকানের কর্মচারী করে নিল কাশীনাথকে। কাশীনাথ তখন সবে বি কম পরীক্ষা দিয়েছে। ওর বাবা ছিল পালিশ মিস্ত্রি। হাবড়ার একটা ফার্নিচারের দোকানে কাজ করত। কাশীনাথ ওর বাবার কাজ শেখেনি। ওর ইচ্ছে ছিল চাকরি—করা—ভদ্রলোক হবে।

ও ওষুধের দোকানে চাকরি পেল। সকাল সাড়ে সাতটা থেকে রাত সাড়ে দশটা। দুপুরে একটা থেকে চারটে বন্ধ। তখন বাড়ি গিয়ে খাওয়া দাওয়া। এর মধ্যেই অন্য কাজও কিছু করতে হয়, যেমন বিকলে পাঁচটায় খাটাল থেকে গোরুর দুধ কিনে চোংদার বাড়ি পৌঁছে দেওয়া, চোংদারের চার বছরের মেয়ের বেলা এগারোটার সময় কিন্ডারগার্টেন ইস্কুল ছুটি হলে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া এইসব।

কাশীনাথের ইচ্ছে ছিল পিএসসি, এসএসসি, স্কুল সার্ভিস কমিশন ইত্যাদি পরীক্ষা দেবে। কমপিটিশন সাকসেক—টাকসেস কিনেছিল, খোলার সময় পায়নি।

কাশীনাথের একটা ভাই আছে। ফিটের ব্যারাম। মানে মৃগী রোগ। আগে টোটকা চলছিল, কাশীনাথ এখন ডাক্তার দেখিয়েছে। উত্তম চোংদার বিনে পয়সায় গার্ডিনাল সাপ্লাই করে যায়। কাশীনাথের বোনের বয়েস বারো। খুব মাথা ঘোরে। উত্তম চোংদার মাঝে মাঝে টনিকের শিশি দেয়, পয়সা লাগে না। পুজোর সময় নতুন জামা দেয় উত্তম, ওষুধের দোকানের মধ্যে একটা ডাক্তারের চেম্বার আছে, এমবিবিএস ডাক্তার বসিয়েছে, ওখানে একটা টিভি সেটও রাখা আছে। রবিবার দোকান বন্ধ। মাঝেমধ্যে কোনও রবিবারে ভিসিপি ভাড়া করে 'ব্লু' দেখা হয়, উত্তমের বন্ধুবান্ধব থাকে। কাশীনাথকেও থাকতে দেয়। কাশীকে মোটর সাইকেল চালানো শিখিয়ে দিয়েছে। এমনিভাবেই কাশীনাথের বিস্বাদ জীবনে নিমক যুক্ত করছে উত্তম। কাশীনাথ কখনও নিমকহারামি করতে পারবে না।

সোনালি গড়াই কুড়ি বছরের যুবতী মেয়ে। কিন্তু ছেলেরা ওকে নিমাই নাম দিয়েছে, সোনালি সেটা জানে। কোথাও যৌবন শব্দ চোখে পড়লে সোনালি চোখ সরিয়ে নেয়। টিভিতে যখন মেয়েরা বুক কাঁপিয়ে নাচে, কিংবা নানা ছলে বুক দেখায়, সোনালির গা জ্বলে যায়। কলেজে পড়ে ও। সালোয়ার—কামিজ পরে না আর। ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে দুটো ছেলে ম্যানচেস্টার সমাসের ব্যাসবাক্য ভেঙে ছিল—যে উওম্যানের চেস্ট ম্যানের ন্যায়। সোনালির নিজের মা নেই। একটা সৎমা আছে। ওর বাবা সকাল আটটা বারোর ট্রেনে কলকাতা যায়, রাত ন'টায় ফেরে। ওর বাবা কি জানে ও কেন সালোয়ার—কামিজ পরে না? সোনালির নিজের মা অনেক দিন আগে মরে গিয়েছে। সৎমাটা কেমন যেন। শোবার আগে পায়ে আলতা দেয়, কপালে দলা করে সিঁদুর মাখে, সোনালিকে কোনওদিন লিপস্টিক কিনে দেয় না, কোনওদিন ময়েশ্চারাইজার কিনে দেয় না। কোনওদিন ডাক্তারের কাছেও নিয়ে যায়নি। পাশের বাড়ির মাসিমা হোমিওপ্যাথির ওষুধ দেয়। একটা মোটা বই থাকে টেবিলের উপরে, চশমা পরে, মাঝে মাঝে বই দ্যাখে, আর ওষুধ দেয়। পাঁচ টাকা করে নেয়। একদিন লজ্জার মাথা খেয়ে ওই মাসিমার কাছে গিয়েছিল সোনালি। বলেছিল মাসিমা, আমার স্বাস্থ্যটা ভালো করে দিন না। মাসিমা বলেছিলেন—এমনিতে তো স্বাস্থ্য তোমার ভালোই, হাত পা তো বেশ মোটাসোটা...

সোনালি বলেছিল—না, সেটা বলছি না, বলে মাথা নিচু করে ছিল।

মাসিমা বলেছিল, বুঝেছি, বুঝেছি। তারপর চোখে চশমা লাগিয়ে বইটা খুলে ছিল।

মেনস ঠিক মতো হয়?

হয়।

শুরু হয়েছিল কবে?

সেবেন থেকে।

মাসিমা কয়েকটা পুরিয়া বানিয়ে একটা খামে ভরে সোনালির মাথায় হাত রেখে বলেছিল, চিন্তা কোরো না, যখন বিয়ে হবে, ঠিক হয়ে যাবে।

ওই ওষুধ খেয়েছিল সোনালি, কিচ্ছু হয়নি। যখন বিয়ে হবে ঠিক হয়ে যাবে বলে দিলেই হল? বিয়েটা হবে কী করে? কে করবে? কলেজের দু—একটি মেয়ে মেয়েদের পত্রিকা রাখে। ওগুলোতে মাঝে মাঝে মোহময়ী হয়ে ওঠার কথা পড়েছে সোনালি। 'পুরুষের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠুন' পড়েছে। পুরুষের চোখে নারীদেহ নামে একটা লেখায় যতসব মান্যগণ্য বিখ্যাত মানুষেরা তাদের মনের কথা বলে দিয়েছে। কিছুদিন পরে আর একটা সংখ্যা বেরোয়, স্তন সংখ্যা। সোনালি কিনে নেয়।

সোনালি টিউশনি করে। ক্লাস ফোরের দুটো মেয়ে। ওদের অঙ্ক করতে দিয়ে বইটা খোলে। লুকিয়ে লুকিয়ে একটু একটু পড়ে। কান লাল হয়, তেষ্টা পায়। চোখে পড়ে খাজুরাহোর পাথরমূর্তির ছবির তলায় লেখা স্তনই নারীর সম্পদ। তারপর একটা বিজ্ঞাপন। স্তন সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য গ্লান্ডিনার।

উত্তম চোংদারের ওষুধের দোকানের নাম নবজীবন ফার্মেসি। দোকানদার সামনে একবার দাঁড়াল সোনালি। দোকানে তখন কয়েকজন খদ্দের ছিল। সোনালি সরে গেল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখল দোকান ফাঁকা হয়েছে। তবু যেতে পারছে না। বাজারের মধ্যে যে—ওষুধের দোকানটা, ওখানে একটা বুড়ো লোক থাকে। বরং ওখান থেকে কেনাই ভাল। কিন্তু ওখানে বড্ড ভিড় থাকে। তা ছাড়া মুখও চেনা। ওদের পাড়াতেই থাকতেন। ওর বড্ড লজ্জা করে।

সোনালি রেডি হয়। একটু স্মার্ট হওয়ার জন্য নিশ্বাস নেয়। রেডি সেডি গো। শোঁ করে যেন উড়ে নবজীবনের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। গ্লান্ডিনার কত দাম?

সামনের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ছিল কাশীনাথ। ভিতরে একটা টেবিলে বসেছিল উত্তম। ওখানেই ক্যাশ। কাশীনাথ আলমারি খুলে ফাইলটা বার করে। ফাইলের গায়ের দাম দেখে বলল, সত্তর টাকা।

সোনালির টিউশনির পনেরো দিনের মজুরি। সোনালি ব্যাগ থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করে বলল, দিন।

ভিতর থেকে উত্তম চোংদার সোনালিকে দেখল। দেখে বলল, মালিশ করতে হবে কিন্তু। ভালো করে মালিশ করতে হয় জানেন তো। সোনালির কান লাল হয়ে গেল।

উত্তম কাউন্টারের দিকে এগিয়ে এল। বলল, হাবড়া চৈতন্য কলেজে পড়েন না?

সোনালি কোনও জবাব দিল না।

উত্তম প্যাকেটটা একটা কাগজে মুড়ে দিয়ে বলল, বছর খানেক ধরে ইউজ করলে উপকার হয়। গাছ—গাছড়া আজও কথা বলে।

সোনালিদের বাড়িটা গোবরডাঙা স্টেশন থেকে একটু ভিতরের দিকেই। মরা যমুনা নদীটা সামনেই। এখনও জোয়ার—ভাটা খেলে। ওখানে ছোটবেলায় স্নান করেছে সোনালি। এখনও মাঝে মাঝে করতে ইচ্ছে হয়। অনেক মেয়ে—বউরা স্নান করে যমুনার জলে, স্নান করে ভেজা কাপড়ের উপর গামছা ঢাকা দিয়ে বাড়ি ফেরে। সোনালির বোনটা, মানে সৎবোনটা, সিক্স—এ পড়ে। ও নদী নেয়ে এলে ফ্রকের উপর গামছা ঢাকা দেয়। সোনালিদের বাড়িতে একটা টিউবওয়েল আছে। ওখানেই স্নান করে। ওর গামছা ঢাকা দিয়ে ঘরে না গেলেও চলে। ওর একদিন ইচ্ছে করল নদীতে নাইবে। নদীতে স্নান করে ঘরে ফিরছিল, পাকা রাস্তা দিয়ে একটুখানি হাঁটতে হয়, তোয়ালে ঢাকা দিয়েছিল বুকের উপর। ওই রাস্তা দিয়ে বাইক চালিয়ে যাচ্ছিল উত্তম চোংদার। সোনালিকে দেখে ব্রেক কষল। বলল, ওঃ লুকিং সো বিউটিফুল! আসবেন, আর একটা দিয়ে দেব। সোনালিদের বাড়ির চারিদিকে আকাশ। আর কাছেই একটা নদী। ওদের ঘরটা গাছের ছায়ায় ঢাকা, ঘর তো নয়, কুটির। সৎমায়ের ঝি, সোনালি যেন রূপকথার মেয়ে হয়ে গেল। মায়া—সরোবরে নেয়ে এসেছে যেন। বাইকের টিকটিক এখনও শোনা যাচ্ছে, পক্ষীরাজ ঘোড়া। দর্পণে মুখ দেখতে চাইল সোনালি। ড্রেসিংটেবিলটা মায়ের ঘরে।

সোনালিদের একটা ঘর পাকা, আর একটা ঘরে এখনও টালির চাল। টালির ঘরে সোনালি থাকে, একটা টেবিলে ওর ভারতীয় দর্শন, ইউরোপের ইতিহাস, জুলিয়াস সিজার, আর কী করে মোহময়ী হয়ে উঠবেন। ওর সঙ্গে শোয় ওর সৎ বোন, সৎ ভাই। বাবা—মা অন্য ঘরে। ওর ভাইবোনরা শুয়ে পড়লে, সোনালি পড়ার টেবিলে বসে থাকে, তারপর রাত নিশুতি হলে, ও অন্ধকারে একা একা নিজের বুকে আয়ুর্বেদ মালিশ করে।

সোনালি একদিন নবজীবন ফার্মেসিতে গেল। তখন বিকেল। কাশীনাথ গিয়েছিল খাটালে। দুধ আনতে। উত্তম চোংদার একা দোকানে, এবং ডাক্তারের চেম্বারটাও ফাঁকা। সোনালির পদক্ষেপ সেদিন কী স্মার্ট, সোজা দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। উত্তম উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, আইব্বাস, এসে গেছেন। কথা আছে, এ ঘরে চলুন। ডাক্তারের চেম্বারে গিয়েই বলেছিল, এই তেল মেসেজ করার একটা নিয়ম আছে।

গর্ভপাত করার কয়েকটা নিয়ম আছে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে ভ্রূণহত্যার কৌশলও পালটাচ্ছে। শুধু ভ্রূণহত্যাই বলি কেন, সভ্যতা যত এগিয়েছে হত্যা ব্যাপারটাও তত সহজ ও সাবলীল হয়েছে। আগে ঘাতককে কাছে আসতে হত। তিরধনুকের পর দূর থেকেও হত্যা সম্ভব হল। বন্দুকে আরও দূর থেকে মেরে ফেলা যায়, কামানে আরও দূর থেকে, এখন ঘরে বসে, স্যান্ডুইচ খেতে খেতে, কমিকস দেখতে দেখতে, হাসতে হাসতে একটা বোতাম টিপে দিলেই হল। গর্ভপাতের জন্য আগে জরায়ুতে শেকড় বা কোনও সরু ডাল প্রবিষ্ট করে দেয়া হত। জরায়ু বাইরের কোনও পদার্থ সহ্য করতে পারে না, সে নিজের মাংসপেশি সংকোচন করে বাইরের জিনিসটাকে ঠেলে বার করে দিতে চায়। যত্নে রাখা ভ্রূণটিও বেরিয়ে যায় তখন। প্রচণ্ড কষ্ট হয় এতে গর্ভধারিণীর। রক্তপাতও হয়। জরায়ুতে নুনজলও ঢুকিয়ে মারা হয় ভ্রূণটিকে, যেভাবে শিঙি মাছ, মাগুর মাছকে নুন মাখিয়ে মারা হয়। নারকোল কোরাবার মতো করে ছোট ভ্রূণটিকে জরায়ুর

আধার থেকে চেঁচে কুচিকুচি করে ফেলার মতো যন্ত্রপাতিও এই সভ্যতা দিয়েছে—ডায়লেটেশন অ্যান্ড কিউরেটিং মেশিন। ওই কুচিকুচি ভ্রূণশরীরটিকে জরায়ুর আধার থেকে বাইরে বের করে আনবার জন্য রয়েছে সাকশান মেশিন।

নবজীবনের ডাক্তারের ফাঁকা চেম্বারে এই রবিবার একটা সুন্দর ছিমছাম কিউট বাক্স এসেছে। ওই বাক্সে পুরো প্যাকেজটাই আছে। ডায়লেটেশন অ্যান্ড কিউরেটিং মেশিন উইথ সাকশান। নবজীবন ফার্মেসি রবিবার বন্ধ থাকে। আজ রবিবার। বাইরে তালা ঝুলছে। ভিতরে রয়েছে হেলাবটতলার মাতৃমঙ্গল ক্লিনিকের ডাক্তার গণপতি মণ্ডল। হাবড়া, অশোকনগর, গোবরডাঙা অঞ্চলের রেলস্টেশনে, বাসটার্মিনাসে, বাজারের পেচ্ছাপখানায় এই ডা. মণ্ডলের টাইপদের গোঁপওলা ছবি দেখতে পাওয়া যায়। আর আছে সোনালি।

উত্তম চোংদার আর কাশীনাথ নবজীবনের ভিতরে বসে আছে। সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ, নবজীবনের ভিতরে টিউব লাইটের আলো। এখন বেলা এগারোটা। ঘরের ভিতর প্রচুর ধোঁয়া, কাশীনাথ ও উত্তম সিগারেট খেয়ে চলেছে। ইলেকট্রনিক দেয়াল ঘড়িটার কাঁটা নড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে, পাশের চেম্বার থেকে গণপতি মণ্ডলের গলা শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে—কোনও ভয় নেই, পনেরো মিনিটের ব্যাপার। মেয়েটার ভয়—পাওয়া কাতর কণ্ঠ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে, কিন্তু কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না। গণপতি মণ্ডল একবার বাইরে এলেন। বললেন, ও কাশীনাথবাবুকে একটু ডাকছে।

কাশীনাথ ঘরের পর্দা সরিয়ে উঁকি দিতেই তুলোর বান্ডিল থেকে এক মুঠো তুলো খামচে নিয়ে সোনালি ওর দুই ঊরুর মাঝখানে ফেলে দিল। আড়াল করতে চাইছে ও, একটু আড়াল। কাশীনাথের চোখের দিকে চাইল। কাশীনাথ ওর চোখের ভাষা পড়তে পারল। কাশীনাথ ঘাড় নাড়ল। এবং মনে মনে বলল, কথা দিচ্ছি দু'বছর পরে। সোনালি মৃদু হাসল। আবার কী যেন বলছে চোখ। কাশীনাথ বলল, কোনও ভয় নেই, আমি পাশের ঘরেই আছি। সোনালি হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। গণপতি মণ্ডল বলল, আবার কান্না? সাউন্ড বাইরে যাচ্ছে, বলেই এক দলা তুলো সোনালির মুখের মধ্যে পুরে দিল, ঠেসে দিল। কাশীনাথকে বলল, বাইরে যান।

গণপতি মণ্ডল টিউবে লুব্রিকেটিং জেলি মাখাতে মাখাতে সোনালিকে জিজ্ঞাসা করল, একচুয়ালি ফাঁসিয়েছে কে? কাশীনাথ?

সোনালি মাথা ঝাঁকাল।

উত্তমবাবু?

সোনালি চুপ।

নাকি দুজনেই কাজ করেছে?

সোনালির চোখে জল। মুখের আওয়াজ শুষে নিচ্ছে তুলোর দলা।

গণপতি মণ্ডল টিউবের মাথায় কিউরেটিং—এর যন্ত্রটা বসিয়ে দিল। ওটাই ধারালো দাঁতে ভ্রূণটা চাঁচবে। বাইরে থেকে ওই দাঁতের শক্তি বাড়ানো কমানো যায়, সরানো যায়, নড়ানো যায়। গণপতি মণ্ডল যন্ত্র বসানো টিউবটাকে ঠেলে দিলেন। দুর্গা দুর্গা।

পাশের বন্ধ ঘরে চুপচাপ বসে থাকা উত্তম দুটো ধূপকাঠি জ্বালিয়ে মাকালীর ছবির ফ্রেমে গুঁজে দিল। কাশীনাথ এসে টুলে বসল। উত্তম কাশীনাথকে বলল, তোকে এত করে বললাম, ওকে বিয়েটা করে নে, মাইনে বাড়িয়ে দিতাম, শুনলি না।

লোকে বলে আমি উত্তমদার চামচে। আমিও তাই মনে করি। উত্তমদা তখন আমাকে ডেকে চাকরিটা না দিলে না খেয়ে মরে যেতাম। উত্তমদা বলেছে একটা প্যাথলজিকাল ক্লিনিক করে দেবে। উত্তমদা এখন পার্টি করে। টাকা দেয়, পার্টির লোক আসে, আড্ডা মারে, থানাতেও খুব খাতির, ওসির সঙ্গে মাল খায়।

উত্তমদাই আমাকে প্রথম মাল খাইয়েছে, প্রথম ব্লু দেখিয়েছে, সোনালিকে ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকিয়ে আমাকে যেতে বলেছিল একদিন। বলেছিল, যা, এক্সপেরিয়েনস করে আয়। আমি যাইনি। আমার খুব ভয়।

উত্তমদা আমাকে দিয়ে বোতলটোতল আনায়, আমি এনে দি। গেলাসেও ঢেলে দি, আমাকে খেতে বলে। প্রথম প্রথম খেতাম না, এখন মাঝে মধ্যে একটু খাই। না খেলে আমার ভয় করে। উত্তমদা আমার সঙ্গে হার্গিস মালিকের মতো ব্যবহার করেনি, বন্ধুর মতো। ওর মেয়ের জন্মদিনের সব বাজার—টাজারের দায়িত্ব ছিল আমার উপর। উত্তমদা বউ আর শালি নিয়ে দিঘা গেল। পুরো দোকানটা আমিই দেখলাম। আমাকে এতটা বিশ্বাস করে। তাই আমি উত্তমদার কোনও কথা ফেলতে পারি না, কিছু করতে বললে না করতে পারি না। একবারই না করেছিলাম—যখন ফেঁসে যাওয়ার পর উত্তমদা বলেছিল, ওকে বিয়ে কর, মাইনে বাড়িয়ে দেব।

কেন করব আমি, ওর পেটে উত্তমদার বাচ্চচা, আর আমাকে বলছে বিয়ে করো। আমি বলেছিলাম, তা হয় না উত্তমদা। বিয়ে করার ছ—সাত মাসের মধ্যে বাচ্চচা হয়ে গেলে সবাই ভাববে বিয়ের আগেই আমি...।

বেশ করেছিস বিয়ের আগে করেছিস। ভাবলে তোর কী যায় আসে!

আমি তো করিনি, উত্তমদা।

করিসনি তো করিসনি। তা এখন বিয়েটা করে নে।

কিন্তু বাচ্চচাটা তো আমাকে বাবা ডাকবে। সারাটা জীবন।

ডাকুক।

না। ক্ষমা করে দিও, উত্তমদা।

তা হলে অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

এই বলে অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিল উত্তমদা। তারপর বলল, আমি এখন পুরো অফ হয়ে যেতে পারি, কিন্তু কী সব জিনেটিক টেস্ট—ফেস্ট হচ্ছে আজকাল। ওটাকে অফ করে দিতে হবে। তুই আমাকে মদত করবি তো?

আমি বলেছিলাম, করব।

করছি তো, আমি তো মদত করছি। মদত না করে কী করব? ডাক্তারখানা বন্ধ হয়ে গেলে আমার যে ভাত বন্ধ হয়ে যাবে।

আমি শালা উত্তম চোংদার, বুদ্ধু বনে গেলাম। কেন যে ফাঁসলাম। ঘরেতে শালা পারফেক্ট ফ্যামিলি প্ল্যানিং করছি, একটা মেয়ে, চার বছর বয়স হল—এখনও ফারদার বউয়ের পেট বাধাইনি, এখানেই গড়বড় হয়ে গেল।

ওকে জাস্ট বিনে পয়সায় ফাইলগুলো দিচ্ছিলাম। ওর খুব শখ হয়েছিল যৌবনবতী হবে। ভিটামিন ক্যাপসুলও দিচ্ছিলাম, পয়সা তেমন নিতাম না। ওকে বললাম, নিজে নিজে মালিশ করে লাভ হয় না। অন্যহাতে করাতে হয়, যত করাবে তত ভালো হবে। তাতেই টোপ গিলে ফেলল মেয়েটা, তো আমি কী করব?

পরপর ক'মাস ধরে রোববারের খবর কাগজে দেখছিলাম সব বিখ্যাত বিখ্যাত লোকদের কেচ্ছা বেরুচ্ছে। সবারই কত সেক্স লাইফ। আমিও কম কীসে? আমারও তো ইচ্ছে হতে পারে। আমিই বা এক বউকে নিয়ে পড়ে থাকব কেন? অনেককে ভোগ করো—এটাই তো পৌরুষ। মরদের লক্ষণ। রোববারের কাগজেই তো বক্স করে লিখেছে বহুগামিতা পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

কাশীনাথটাকে বললাম, বিয়েটা কর, খরচা আমার, শালা সেয়ানা আছে। সিধে ডিনাই করল। কেসটা মিটে যাক, ওকে হাটিয়ে দেব। একের নম্বরের নিমকহারাম।

উত্তম চোংদার কাশীনাথকে বলল, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, যা—না, একবার ওঘরে কী হচ্ছে দেখে আয়, তুই তো কখনও পুরো মেয়ে দেখিসনি।

কাশীনাথ বলল, ধুস!

উত্তম বলল, ফালতু ফালতু কত খরচা হয়ে গেল। গণপতি মণ্ডল একগাদা টাকা চেয়ে বসেছে।

গণপতি মণ্ডল হন্তদন্ত হয়ে পাশের ঘরে এল। এসেই বলল, স্যালাইন আছে, স্যালাইন, একটা বোতল বার করুন এক্ষুনি।

উত্তম বলল, কেন, স্যালাইন কী হবে?

দরকার, দরকার। স্যালাইনের সঙ্গে টিউব—নিডলও বার করুন।

উত্তমের চোখের দিকে তাকাল কাশীনাথ। চোখে সম্মতি পেল। সঙ্গে সঙ্গেই কাশীনাথ শোকেস থেকে একটা স্যালাইন বার করল। গণপতি মণ্ডল ওটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পাশের ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকে গেল। উত্তমও পিছন পিছন গেল। উত্তম ও ঘরে গেল বলে কাশীনাথও। গণপতি মণ্ডল মেয়েটার মুখের ভিতর থেকে তুলোর দলাটা বার করে নিল। মেয়েটা এখন যতটা জোরে কাতরাতে পারছে, সেই আওয়াজ বেশি দূরগামী হবে না। মেয়েটার দুই ঊরুতে রক্ত। যোনিমুখে রক্ত, রবার ক্লথে রস রক্ত ফেনা।

মাছি এসে গেছে।

গণপতি মণ্ডল ঘামছে। বলল, ফিটাসটা এমন আঁকড়ে ধরেছিল ইউটেরাসটাকে, যেন মায়ের কোল। স্ক্রাপ করতে গিয়ে ইউটেরাসটা ফুটো হয়ে গেছে।

তা হলে কী হবে!

ভিতরে ব্লিডিং হচ্ছে। কেস খারাপ।

গণপতি মণ্ডল মেয়েটির নাড়িতে আঙুল রাখে। চোখ বোজে। মেয়েটার জড়ানো কথা শোনা যায়, আমাকে বাঁচান, আর কখনও চাইব না। একটা মাছি গরিব স্তনবৃন্তের উপরে চুপচাপ বসে যায়, গণপতি মণ্ডল বলে—এখন এই অবস্থায় হাসপাতালেও যাওয়া যায় না। সবার হাতকড়া পড়বে। ডাইসিনিন ইনজেকশন আছে, ডাইসিনিন?

কাশীনাথ জানে ওটা নেই। ইশ, কেন নেই? ডাইসিনিনটা থাকলে কি মেয়েটা ঠিক হয়ে যেত! তা হলে ক্রোমোস্ট্যাট? গণপতি জিজ্ঞেস করে।

আছে। আছে। কাশীনাথ শোকেস খুলে ছোঁ মেরে নিয়ে আসে। গণপতি ইনজেকশনটা দ্রুত পুশ করে। মেয়েটার কষ্টের শব্দ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে, কিন্তু চোখ খোলা। চোখ কথা বলছে, বাঁচাও, প্লিজ বাঁচাও।

উত্তম বলে আপনার উপর বিশ্বাস ছিল, গণপতিবাবু।

গণপতি বলে, শালার ফিটাসটা এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছিল ইউটেরাসটাকে। আমি কী করব, একটু জোর পড়ে গিয়েছিল চাঁচতে গিয়ে।

কী হবে যদি...উত্তম আর কিছু বলতে পারে না।

ডেকাড্রনও দেওয়া হল। মেয়েটা চোখ বুজল।

সারাটা ঘরে নিস্তব্ধতা। একটা ছোট ফ্যান ঘুরে যাচ্ছে। গণপতির একটা হাত মেয়েটার হাতের কবজি ধরে আছে। একটু পরেই গণপতি দু'হাতে মেয়েটার বুকে চাপ দিতে থাকল, তারপর নাড়ি দেখল, চোখের পাতা তুলে চোখ দেখল, তারপর বলল, সরি।

উত্তম চিৎকার করে উঠল, শুয়োরের বাচ্চচা কোথাকার।

গণপতি আর একবার মিনমিন করে বলল, এমনভাবে খামছে ধরেছিল ফিটাসটা...। গণপতি বেসিনে লাল সাবানে হাত ধুয়ে পকেট থেকে কয়েকশো টাকা বার করে টেবিলে রাখল। বলল, যে টাকাটা অ্যাডভানস নিয়েছিলাম সেটা ফেরত দিচ্ছি।

উত্তম বলল, এসব নখরামি ছেড়ে বলুন এখন কী করব?

গণপতি বলল, আমাকে ফাঁসাবেন না। আমি ডিনাই করব। আবার সাবান ঘষতে লাগল হাতে। আমি ফেঁসে গেলে আপনাকেও ফাঁসাব আমি।

কাশীনাথ বলল, উত্তমদা, আমি তো কিছু করিনি, আমিও কি ফেঁসে যাব?

গণপতি বলল, যাতে কাউকে না ফাঁসতে হয়, সেই ব্যবস্থা করলেই তো হয়। কোনও চিহ্ন রেখো না।

কাশীনাথ তখন খুনের চিহ্ন লোপাট করছে। তুলো দিয়ে মুছে নিল ঊরুতে লেগে থাকা রক্ত। যোনিমুখে জমাট বাঁধা কালচে রক্ত, এই প্রথম কোনও যোনি স্পর্শ করল কাশীনাথ, মৃতমানুষের। উত্তমদা কিছু বলছে না, তাকিয়ে আছে শুধু, ওতেই বুঝতে পারছে কাশীনাথ, উত্তমদা বলছে, আমি তোর প্রভু, কাশীনাথ তুলো দিয়ে রবার ক্লথের রসরক্ত কাঁচিয়ে পরিষ্কার করে। উত্তম দু'হাতে মুখ ঢাকে। কাশীনাথ সমস্ত রক্তমাখা তুলো একসঙ্গে জমা করে কয়েক ফোঁটা স্পিরিট ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন নিভে গেলে কালো ছাইগুলোকে একটা নিরীহ ঠোঙায় ভরে ফেলে।

উত্তম চোংদার ওষুধের একটা খালি পেটি বার করে আনে। বলে এটায় ঢোকাতে হবে। কাশীনাথ ওটাকে দেখে। বলে ওটায় তো কোম্পানির নাম লেখা, কনসাইনমেন্ট নম্বর লেখা, ফেঁসে যাবে তো। নাকে অক্সিজেন ফিট করে দেবার পর বড়লোক রোগী যেভাবে নার্সিংহোমের নার্সকে থ্যাংকিউ বলে, সেরকমভাবেই বলল, থ্যাংকিউ। কাশীনাথ একটা মিনারেল ওয়াটারের খালি পেটি নিয়ে এল। যাবতীয় নম্বরটম্বর ছিঁড়ে ফেলল, বলল—এটায়।

উত্তম বলল, ঢুকবে না। একটা করাত ছিল না ঘরে, করাত, —পারবি?

কাশী ওর প্রভুর দিকে তাকিয়ে বলল, পারব।

কাশীনাথ, ভিতু কাশীনাথ, নিজে হাতে কোনওদিন মুরগিও কাটেনি। হাতে করাত তুলে নিল। মেয়েটার মুখের দিকে তাকাল না, ভুল করে উচ্চচাভিলাষী হতে যাওয়া বুকের দিকেও নয়, শুধু গলাটার দিকে তাকিয়ে ওখানে করাতটা চালাতে লাগল। হচ্ছে, আলগা হচ্ছে, এই প্রভু, পারলাম। চেয়ারে বসে থাকা উত্তমের দিকে তাকাল কাশীনাথ। কাশীনাথ দেখল উত্তমদার মাথাটা ঝুলে গেছে, চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছে উত্তমদা। কাশীনাথ দৌড়ে গিয়ে উত্তমকে ধরে ফেলল। উত্তম অজ্ঞান হয়ে গেছে। কাশীনাথ উত্তমকে শুইয়ে দেয় মেঝেতে। জলের ঝাপটা দেয় চোখে মুখে। উত্তম একটু পরে চোখ খোলে। বলে—হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল কাশী। তা হলে একটু মানুষ আমি এখনও আছি বল?

কাশী কি তা হলে একটুও মানুষ নেই এখন?

কাশী আবার কাজে লেগে গেল। নিপুণভাবে করাত দিয়ে হাঁটুর তলা থেকে পা দুটো কেটে ফেলল। পাঁচ টুকরো সোনালি নামের মেয়েকে আলাদা আলাদা পলিথিনে ঢুকিয়ে পলিথিনের মুখ বেঁধে বাক্সটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। দুটো ইটও রাখল বাক্সটার ভিতরে। অয়েল ক্লথটাও বাক্সটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। ফিনাইল জল দিয়ে ভালো করে মুছে নিল মেঝে। সব পরিষ্কার। পেশেন্ট দেখার বিছানা এখন শুধু বিছানা হয়েই পড়ে আছে। এবার একটা দড়ি দিয়ে বাঁধতে লাগল, তারপর দড়িটার শেষ প্রান্তদুটোকে ফাঁস লাগিয়ে একটা ফুল তৈরি করল, কোনও প্রেজেনটেশনের প্যাকেট যেভাবে বেঁধে দেয়। তারপর দু'হাত ঝেড়ে উত্তমকে বলল, নিন। যেন উপহার।

উত্তম বাক্সটার দিকে তাকাল। কাশীনাথের দিকে, তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, এত বেলা হয়ে গেছে। এবার বাড়ি চল।

কাশীনাথ শেষবারের মতো দেখে নিল কোনও চিহ্ন পড়ে আছে কি না।

উত্তম বলল, রাত দশটায় এখানে আসিস। আমিও আসব। বাক্সটা যমুনার জলে ফেলে দেব।

কাশী ঘরে গেল। ওর মা বলল, এত দেরি হল কেন?

কাশী বলল, দরকারি কাজ ছিল একটা।

ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভিতে সানন্দা ক্যুইজ দেখল, খেতে বসল, কিন্তু একটু পরেই ভাতের থালার মধ্যেই বমি করে ফেলল কাশীনাথ।

রাত্রি দশটাতেই নবজীবন ফার্মেসির সামনে পৌঁছে গেল কাশীনাথ। উত্তমও এসেছে মোটর বাইকে। ওরা তালা খুলে ভিতরে ঢুকল। আলো জ্বালাল। দেখল বাক্সটা পড়ে আছে। আর দেখল একটা লাল পিঁপড়ের লাইন বাক্সটার ভিতরে যাচ্ছে।

উত্তম বলল, কাশী, তুই আমাকে মদত করলি, জিন্দেগিতে ভুলব না। লাস্ট স্টেজেও তুই আমাকে বাঁচিয়ে দে। একটা মোটর সাইকেলে এত বড় বাক্স আর দুজন ধরবে না। আমায় সবাই চেনে। বরং তুই যা। মোটর বাইকটার পিছনে বাক্সটা বেঁধে দেব। তুই অর্জুনপুরে কাঠের ব্রিজটাতে চলে যাবি, ফেলে দিবি, দশ মিনিটের ব্যাপার। পারবি না?

কাশীনাথ মোটর বাইকের গিয়ার পালটায়। ঘটঘট ঘটঘট। হাতের একসেলারেটারে স্পিড বাড়ায়। পৃথিবী টলছে। ও এখন স্বাধীন। ওর সামনে এখন ওর প্রভু নেই। ঘটঘট ঘটঘট। এই দেহ নিয়ে এখন যেখানে খুশি চলে যেতে পারে। ও স্বাধীন। ও কাশীনাথ। কাশীনাথ শিবের আর এক নাম। ওর পিছনে বাক্সবন্দি সতী। ও এখন দক্ষয় বাঁধাতে পারে, ও এখন প্রলয় নাচন নাচতে পারে। আই লাভ ইউ সোনালি, তোমাকে ভালো বেসেছিলাম। কাউকে বলতে পারিনি, নিজেকেও নয়। সোনালি তুমি কেন মোহময়ী হতে চেয়েছিলে? ঘটঘট ঘটঘট। তীব্র হেডলাইট। আমি বাক্স খুলে একটা একটা করে অঙ্গ ছুড়ে দেব। পা—দুটো ছুড়ে দিলাম নবজীবন ফার্মেসিতে। মোহময়ী হতে চাওয়া করুণ বুকজোড়াকে ছুড়ে দিলাম গ্লান্ডিনার কোম্পানিতে। মুন্ডুটা ছুড়ে দিলাম থানায়। সব তীর্থক্ষেত্র হয়ে ওঠো, পীঠস্থান।

কাশীনাথ অর্জুনপুরের দিকে যাচ্ছে না। একদম অন্যদিকে। অন্য রাস্তায়। কাশীনাথ থানার সামনে এসে থামল। গাছে জোনাকি। কাশীনাথ থানার ভিতরে গেল। পুলিশের জামা পরে একজন তখন আধুনিক রমণীদের রমণীয় পত্রিকার একটা পুরনো সংখ্যা পড়ছে। স্তন সংখ্যা। কাশীনাথ ওখানে দাঁড়াল।

কী চাই?

উত্তর নেই।

কী চাই এখানে?

কাশীনাথ চুপ।

বলবেন তো কী চাই?

কাশীনাথ কিচ্ছু না বলে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। চোখ ফেটে জল বেরুল। কাশীনাথ দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল, আর তখন নিজেকে মানুষ মনে হতে লাগল, স্বাভাবিক মনে হতে লাগল।

পরদিন খবর কাগজে বেরল অস্বাভাবিক যৌন মানসিকতার শিকার হল একটি তরুণী। মানবদরদি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলি বলল অপরাধীর শাস্তি চাই। আর রমণীয় পত্রিকাটি বিজ্ঞাপনে জানাল পরবর্তী সংখ্যার হট কভার স্টোরি— 'অস্বাভাবিক যৌন মনস্তত্ত্ব।'

অর্ধেক পুরুষ

অনীশ দেব



সুপ্রতিম একটা ফোনের জন্য অপেক্ষা করছিল। ওর মন বলছিল, ফোনটা আসবে। যদিও স্টুডিয়োতে লাইন পাওয়া বেশ ঝকমারি, তবুও ওর মনে হচ্ছিল সেই মেয়েটি যেরকম নাছোড়বান্দা তাতে লাইন ও পাবেই।

সন্ধে ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টা— এই আধঘণ্টা ধরে 'সাইবার চ্যানেল'-এর 'মুশকিল আসান' অনুষ্ঠান টিভিতে দেখানো হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে সুপ্রতিম আর ওর অনুষ্ঠান-সঙ্গিনী মোনা। দর্শকদের নানান ধরনের সমস্যার সমাধান বাতলে দেওয়া হয় এই অনুষ্ঠানে। মাত্র চারমাসেই 'মুশকিল আসান' সকলের মন কেড়ে নিয়েছে।

দর্শকরা নানান প্রশ্ন পাঠান সুপ্রতিমদের কাছে। সুপ্রতিম আর মোনা পালা করে সেসবের উত্তর দেয়। এ ছাড়া অনুষ্ঠান চলার সময় বহু ফোনও আসে ওদের স্টুডিয়োতে। কেউ-কেউ অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন, আর কেউ-বা নিজের কোনো সমস্যা তুলে ধরেন ওদের কাছে।

চিঠিপত্রের উত্তরগুলো 'সাইবার চ্যানেল'-এর অফিসে কয়েকজন বসে ঠিক করেন। সেখানে সুপ্রতিম আর মোনাও থাকে। তবে টেলিফোনে পাওয়া সমস্যাগুলোর সমাধান সুপ্রতিম বা মোনাকেই চটজলদি করে সঙ্গে-সঙ্গে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে হয়। এর জন্য যে-বুদ্ধি এবং স্মার্টনেস দরকার, সেটা সুপ্রতিম আর মোনা দুজনেরই আছে।

সুপ্রতিমের চেহারা বেশ সুন্দর। ওর সৌন্দর্যে কীরকম যেন একটা বনেদি ঢং আছে। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা। ফরসা। স্বাস্থ্য মাঝারি। মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করা। দাড়ি সুন্দর করে কামানো হলেও ফরসা গালে, থুতনিতে, নীলচে আভা থেকে গেছে। ঠোঁটের ওপরে কালো গোঁফ যেন তুলি দিয়ে আঁকা। বয়েস পঁয়তিরিশ হলেও অনেক কম দেখায়।

সুপ্রতিম যত না সুন্দর তার চেয়েও অনেক সুন্দর করে কথা বলতে পারে। ওকে ঘিরে অনেক দর্শকেরই কৌতূহল— বিশেষ করে মেয়েদের। অনেকেই ওকে ভালোবাসা জানিয়ে চিঠি দেয়। আবার কেউ-কেউ ওকে নানান ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে বিব্রত করতে চায়। সেইসব প্রশ্নের পাশকাটানো মজার উত্তর দেয় সুপ্রতিম।

ওর ডান ভুরুর ওপরে একটা কাটা দাগ আছে। সেটা নিয়ে এক তরুণী জিগ্যেস করেছিল, 'আপনার ডান ভুরুর ওপরে ওই লাভলি কাটা দাগটা হল কেমন করে?'

সুপ্রতিম জবাব দিয়েছিল, 'ছোটবেলায় এভারেস্ট থেকে পড়ে গিয়ে।'

একজন কিশোরী চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল, 'আপনার নামটা দারুণ। ভীষণ এক্সাইটিং।'

জবাবে সুপ্রতিম বলেছিল, 'মোটেই তা নয়। সুপ্রতিম মানে হচ্ছে ভালোর মতো— কিন্তু পুরোপুরি ভালো নয়।'

একজন পুরুষের কৌতূহল: 'আপনি কি বিয়ে করেছেন?'

সুপ্রতিমের উত্তর: 'করিনি বললে আমার ছ'জন ওয়াইফ রেগে আগুন হয়ে যাবেন। আর বিয়ে করেছি বললে অনেক দর্শক দুঃখ পাবেন। তাই এই সাঙ্ঘাতিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না।'

আসল ঘটনা হল সুপ্রতিম বিয়ে করেছে। স্ত্রী নয়নার সঙ্গে ওর পরিচয় সাত বছরের। তার মধ্যে প্রথম তিনবছর ওর সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করেছে, আর বাকি চারবছর চুটিয়ে সংসার করেছে। এখনও করছে। সুপ্রতিম যা-কিছুই করে, সবসময় চুটিয়ে করতে চায়। তাই নিয়ে নয়নার সঙ্গে মাঝে-মাঝে বেশ ঝামেলাও হয়।

নয়না দেখতে বেশ সুশ্রী, মিষ্টি মেয়ে। তবে সুপ্রতিমের চেহারার পাশে নিজের চেহারা নিয়ে সবসময় ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্সে ভোগে। সুযোগ পেলেই ওই প্রসঙ্গ তুলে ঠাট্টা করে। সুপ্রতিম রোজ যখন অফিসে রওনা হয়, নয়না তখন আকুল চোখে স্বামীকে দ্যাখে।

সুপ্রতিম অবাক হয়ে বলে, 'কী ব্যাপার! এমনভাবে তাকিয়ে আছ যেন এই প্রথম চার চোখের মিলন হল!'

নয়না ঘাড় বেঁকিয়ে তাকায় ওর দিকে, বলে, 'ইচ্ছে করছে থুতু ছিটিয়ে কানের লতিতে কুট করে কামড়ে দিই।'

সুপ্রতিম ওর দিকে বাঁ-কান এগিয়ে দিয়ে বলে, 'এই নাও, তাই দাও। পারলে কপালের পাশে একটা কাজলের টিপও বসিয়ে দাও।'

নয়না ওর কানটা কষে মলে দিয়ে বলে, 'সাবধান! কারও দিকে বেশিক্ষণ তাকাবে না। কেউ যেন নজর না-দেয়। তা হলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে।'

'টিভির মধ্যে দিয়ে কারও দিকে তাকানো যায়! তবে মোনা তো পাশে থাকে, ওর দিকে না-তাকিয়ে উপায় নেই...।'

'মোনা খুব ভালো মেয়ে। বরং তোমাকেই বিশ্বাস নেই।'

মোনার সঙ্গে নয়নার পরিচয় আছে। মোনা অনেকবার সুপ্রতিমের বাড়িতে এসেছে। দরকারে-অদরকারে প্রায়ই ফোন করে। নয়না ওকে খুব পছন্দও করে।

মোনা এলাহাবাদের চৌকস মেয়ে। বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ। সুন্দর, স্মার্ট। কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা চুলে সামান্য লালচে ভাব। টানা-টানা চোখ। শুধু ওর বাংলায় সামান্য টান আছে।

ও সুপ্রতিমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। ওর কাছ থেকে প্রতিমুহূর্তেই শেখার চেষ্টা করে। কথায়-কথায় বলে, 'সুপ্রতিমদা, য়ু আর সিম্পলি লাজবাব। আপনি ''সাইবার চ্যানেল''-এর অ্যাসেট।'

'মুশকিল আসান' অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে সুপ্রতিমের দারুণ লাগে। অনুষ্ঠানের কিছুটা অংশ আগে রেকর্ড করা হয়। আর খানিকটা লাইভ। দর্শকদের নানান ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য নামী-দামি ডাক্তার-উকিল-জ্যোতিষী ইত্যাদি নানান পেশার মানুষ পালা করে এই অনুষ্ঠানে আসেন। অনেক সময় বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদেরও নিয়ে আসা হয় বিশেষ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। তবে সবশেষে থাকে মজাদার প্রশ্ন-উত্তরের পালা। তখন সুপ্রতিম আর মোনা যেন আরও স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে।

সব মিলিয়ে 'মুশকিল আসান' একেবারে সুপারহিট।

দিনকুড়ি আগে একটা খাম এসে পৌঁছয় সুপ্রতিমদের দপ্তরে। খাম খুলেই সুপ্রতিম দ্যাখে ভেতরে একটা টাটকা লাল গোলাপ, আর একটা চিঠি। খামের ওপরে কোনো ডাকটিকিট ছিল না। বোধহয় কেউ কুরিয়ারে পাঠিয়েছে।

চিঠিটা পড়েই সুপ্রতিমের কেমন অস্বস্তি হল।

প্রিয় সুপ্রতিম,

তোমাদের অনুষ্ঠান আমি সবসময় দেখি। খুব ভালো লাগে। তবে তার চেয়েও ভালো লাগে তোমাকে। শুধু তোমাকে দেখার জন্যেই অনুষ্ঠানটা প্রাণভরে দেখতে হয়। অনুষ্ঠানগুলো আমি সবসময় ভিডিয়ো ক্যাসেটে ধরে রাখি। তারপর যখনই মনখারাপ লাগে, তখনই ওগুলো চালিয়ে তোমাকে দেখি। তোমার সব সুন্দর— নাক, মুখ, চোখ, ঠোঁট, এমনকী ভুরুর কাটা দাগটাও। জানো, তোমার ওই কাটা দাগটা নকল করে আমি আমার বুকের বাঁ-দিকে একটা কাটা দাগ এঁকেছি! তোমার প্রতিটি অঙ্গের জন্যে আমার প্রতিটি অঙ্গ সবসময় কাঁদে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভীষণ ইচ্ছে করে। কিন্তু অনুষ্ঠান চলার সময় কিছুতেই স্টুডিয়োর ফোনের লাইন পাই না। তাই বলে চেষ্টা ছাড়িনি। আবার চিঠি দেব। সঙ্গে যে-গোলাপটা পাঠালাম, সেটার কথা টিভিতে বলবে তো! বললে বুঝব আমার ভালোবাসা তুমি ফিরিয়ে দাওনি। অসংখ্য ভালোবাসা নিয়ো—

ঝুমুর চৌধুরি
কলকাতা-১৪

'সাইবার চ্যানেল'-এর দপ্তরে প্রচুর 'প্রেমপত্র' আসে। তাতে মোনার সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা করতে চাওয়া চিঠিই বেশি, সুপ্রতিমের কম। মোনাকে বিয়ে করতে চেয়েও বেশ কয়েকজন 'সুপাত্রের' চিঠি এসেছে। কিন্তু সেগুলো নিয়ে ওরা কেউই তেমন একটা মাথা ঘামায়নি। কারণ, এ-ধরনের স্পন্সরড প্রোগ্রামে এসব উৎপাত খুবই মামুলি ব্যাপার। কিন্তু এই চিঠিটা যেন ঠিক মামুলি নয়। কেমন যেন একটু অন্যরকম।

মোনা চিঠিটা নিয়ে সুপ্রতিমের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ারকি করে পিছনে লেগেছিল। কিন্তু সুপ্রতিম পুরোপুরি সহজ হতে পারেনি। দু-একদিন চিন্তা করার পর ও মোনার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করেছে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চিঠিটার একটা নির্দোষ উত্তর দিয়ে দেবে।

সাধারণত অফিসের সমস্যা বাড়িতে খুব একটা আলোচনা করে না সুপ্রতিম। কিন্তু ঝুমুর চৌধুরির চিঠিটার কথা বলল।

নয়না সেটাকে কোনো গুরুত্বই দিল না। বলল, 'ওর আর কী দোষ বলো! টিভিতে অমন হেসে-হেসে সুন্দর-সুন্দর করে কথা বলবে, আর প্রেমপত্র আসবে না— এ তো হতে পারে না! তুমি বরং বেচারিকে একটা সান্ত্বনাপত্র লিখে দিয়ো। আর শোনো, তোমাকে একটা গুড নিউজ দেব। আমি একটা বই লিখতে শুরু করেছি। নাম দিয়েছি ''সুন্দর সোয়ামির সমস্যা''—।'

'ঠাট্টা কোরো না, নয়না।' কপালে ভাঁজ ফেলে বলেছে সুপ্রতিম, 'চিঠিটার মধ্যে একটা অন্যরকম ব্যাপার আছে।'

নয়না একটা হাতব্যাগে সুতোর নকশা বুনছিল, সিরিয়াস হয়ে বলল, 'হ্যাঁ,ঠিকই বলেছ। খামের মধ্যে ফুল পাঠানো, ভুরুর ওই কাটা দাগ নকল করা...। তুমি বরং একটা মামুলি উত্তর দিয়ে দিয়ো। উত্তর না-দিলে আবার যদি কিছু হয়...।'

পরের 'মুশকিল আসান' অনুষ্ঠানে উত্তর দিয়েছিল সুপ্রতিম।

'কলকাতা চোদ্দো থেকে গোলাপফুল পাঠিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানকে ভালোবাসা জানিয়েছেন ঝুমুর চৌধুরি। তাঁকে আমাদের শুভেচ্ছা জানাই। আর আপনারা, যাঁরা এখন এই অনুষ্ঠান দেখছেন, আপনাদের জানাই— আপনারা যত খুশি প্রেমপত্র পাঠান, তবে মনে রাখবেন, সেগুলো যেন শুধু এই অনুষ্ঠানের নামেই হয়। আমার বা মোনার নামে নয়। কারণ আমাদের জীবনে প্রচুর প্রেম আছে। আর বাড়তি প্রেম আমরা চাই না।' হেসে মোনার দিকে তাকিয়ে সুপ্রতিম জিগ্যেস করেছে, 'কী বলো, মোনা!'

'ঠিকই বলেছেন, সুপ্রতিমদা— এই অনুষ্ঠানের জন্যেই প্রেমপত্র দরকার। আর সেইসঙ্গে সমালোচনা। কারণ, এই অনুষ্ঠানকে আমরা আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে চাই। আমরা চাই, এই অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক আপনাদের আরও-আরও প্রিয়।'

এই উত্তর ঝুমুর চৌধুরিকে যে খুশি করতে পারেনি, বরং ব্যথা দিয়েছে, সেটা বোঝা গেল ওর পরের চিঠিতে।

প্রিয় সুপ্রতিম,

কিছু দিতেই যদি চাও, তা হলে দুঃখ দাও কেন! তোমার এড়িয়ে যাওয়া উত্তরে খুব দুঃখ পেয়েছি আমি। সারাদিন, সারারাত শুয়ে-শুয়ে কেঁদেছি। তোমাদের অনুষ্ঠানকে ভালোবেসে আমি গোলাপ পাঠাইনি, তোমাকে ভালোবেসে পাঠিয়েছি। তুমি বলেছ তোমার জীবনে প্রচুর প্রেম আছে, বাড়তি প্রেম তুমি চাও না। তোমার মতো সুপুরুষ দেবতাকে অনেকেই যে ভালোবাসবে, সে তো স্বাভাবিক! তাই এ-কথায় দুঃখ পাইনি। তবে তুমি জেনে রাখো, আমার ভালোবাসা অন্যরকম। এরকম ভালোবাসা তুমি জীবনে কখনও পাওনি। আমার বুকের কাটা দাগটায় আমি যখন আঙুল বোলাই তখন বুকের ভেতরটা কেমন শিরশির করে ওঠে। মনে হয় যেন আমি তোমার ভুরুতে আলতো করে আঙুলের ছোঁওয়া এঁকে দিচ্ছি। তোমাদের স্টুডিয়োর লাইনটা কবে পাব বলতে পারো! সবসময় খালি এনগেজড! ভাবছি, এবার থেকে বাড়ির ফোনেই তোমাকে ধরার চেষ্টা করব। টেলিফোন ডিরেক্টরিতে তোমার নাম্বারটা পাব তো! বাড়িতে ফোন করলে তুমি কি রাগ করবে? আমি জানি, তুমি রাগ করবে না— বরং খুশিই হবে। তারপর...একদিন...যখন আমাদের দেখা হবে...ওঃ! আমি আর ভাবতে পারছি না। বিশ্বাস করো সুপ্রতিম, তোমাকে না-পেলে আমি বাঁচব না— তুমিও না। আজ শেষ করছি। অসংখ্য ভালোবাসা নিয়ো—

তোমার, শুধু তোমার

ঝুমুর

চিঠিটা পড়ার পর সুপ্রতিম কিছুক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে বসে রইল। ঝুমুরকে ঘিরে এলোমেলো চিন্তা ছুটোছুটি করতে লাগল ওর মাথার ভেতরে। মেয়েটি কেমন যেন অস্বাভাবিকরকম নাছোড়বান্দা। তা ছাড়া চিঠির কোনো-কোনো জায়গায় কি পাগলামির লক্ষণ ফুটে বেরোচ্ছে? নইলে সুস্থ কোনো মেয়ে হলে প্রথম চিঠির এড়িয়ে যাওয়া উত্তরেই তো সব বুঝতে পারত, আর তার ভালোবাসার অসুখটাও সেরে যেত।

ঝুমুর বাড়িতে ফোন করতে পারে ভেবে সুপ্রতিম একটু ভয়ও পেল। যদি ও সত্যিই পাগল এবং নাছোড়বান্দা হয় তা হলে তো ফোন করে-করে জ্বালিয়ে মারবে। তখন হয়তো পুলিশে খবর দেওয়া ছাড়া গতি থাকবে না। আর পুলিশে খবর দিলেই তো যত ঝামেলা। বাজে পাবলিসিটি।

আচ্ছা, ও যদি টেলিফোন ডিরেক্টরিতে সুপ্রতিমের ঠিকানা জেনে বাড়িতে এসে হাজির হয়! তা হলে তো আবার সেই থানা-পুলিশ!

প্রায় দু-দিন নানান দুশ্চিন্তার পর সুপ্রতিমের আশঙ্কা ধীরে-ধীরে কেটে গিয়েছিল। ও নয়নাকে বলে রাখল ঝুমুর চৌধুরি নামের কেউ ফোন করলে নয়না যেন বলে দেয় সুপ্রতিম বাড়ি নেই।

পরের দু-দিনে তিনবার ঝুমুরের ফোন এল। তার মধ্যে দুবার সুপ্রতিম সত্যিই বাড়ি ছিল না। আর একবার নয়না আড়চোখে সুপ্রতিমের দিকে তাকিয়ে ফোনে বলে দিল, 'উনি তো এখন বাড়ি নেই।'

'কখন ওঁকে পাওয়া যাবে বলুন তো?'

'ওঁর তো ফিরতে-ফিরতে রাত এগারোটা মতন হবে। আপনি বরং প্রোগ্রাম চলার সময় স্টুডিয়োতে ট্রাই করে দেখুন—।'

'ঠিক আছে। স্টুডিয়োতেই ট্রাই করব।' রিসিভার নামিয়ে রেখেছিল ঝুমুর।

নয়না সুপ্রতিমের দিকে ফিরে বলল, 'মেয়েটার গলাটা কেমন যেন পিকিউলিয়ার।'

'পিকিউলিয়ার মানে?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করছে সুপ্রতিম।

'কেমন যেন আদুরে, খসখসে।'

হো-হো করে হেসে উঠেছে সুপ্রতিম। হাসতে-হাসতেই বলেছে, 'আদুরে! খসখসে! মাই গুডনেস! কী বিচিত্র অ্যাডজেকটিভ! তুমি সেলাই ছেড়ে সাহিত্য করলে পারতে।'

একটু পরে হাসি থামিয়ে সুপ্রতিম সিরিয়াস ঢঙে জানতে চাইল, 'অ্যাই, মেয়েটার বয়স কীরকম হবে বলো তো? আঠেরো-উনিশ? নাকি চল্লিশ-বিয়াল্লিশ?'

'ঠিক বোঝা গেল না। সাতাশ-আটাশ হবে বোধহয়।' ইতস্তত করে নয়না বলল।

তারপর থেকেই সুপ্রতিম কেমন এক অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটাতে লাগল। ঝুমুর চৌধুরির ছবিটা ওর কাছে কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছিল না। এ-ধরনের গায়ে-পড়া প্রেমিকাদের ও বহুবার সামাল দিয়েছে। কিন্তু এই প্রথম ও

যেন ঠিক ভরসা পাচ্ছিল না। প্রতিদিনিই অনুষ্ঠান শুরু করার পর থেকেই ও স্টুডিয়োতে ঝুমুরের ফোনের জন্য ভয়ে-ভয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

আজ ওর মন বলছে, ফোনটা আসবে। আজ ওদের স্টুডিয়োর ব্যস্ত লাইনে টুক করে ঢুকে পড়বে ঝুমুর।

এবং সুপ্রতিমের আশঙ্কাই সত্যি হল। ঝুমুর যে ফোনটা করেছে সেটা ফোনে সাড়া দেওয়ার পরই ও বুঝতে পারল।

'হ্যালো— ''মুশকিল আসান''—।'

'সু-সুপ্রতিম! আমি গো...আমি বলছি...ঝুমুর...।'

নয়না ঠিকই বলেছিল। খসখসে আদুরে গলা। কেমন যেন ফিসফিসে সুরে কথা বলছে।

নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে পেশাদারি ঢঙে কথা বলল সুপ্রতিম, 'কাইন্ডলি আপনার পুরো নাম বলুন।'

ও-প্রান্তের কণ্ঠস্বর একটু ধাক্কা খেল: 'আমায়...আমায় চিনতে পারছ না! আমি ঝুমুর চৌধুরি। কলকাতা চোদ্দো থেকে বলছি। কত কষ্ট করে তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারলাম।'

ওদের টেলিফোন-ব্যবস্থাটা এমন যে, সব কথাবার্তাই টিভির দর্শকরা শুনতে পান। সেইজন্যেই সুপ্রতিম বেশ বিব্রত হয়ে পড়ছিল। ও ভাবছিল, কন্ট্রোল প্যানেলের একটা সুইচ টিপে টেলিফোনের কথাবার্তা শোনানোর ব্যবস্থাটা অফ করে দেবে কি না। না কি রিসিভার নামিয়ে রেখে লাইন কেটে দেবে? কিন্তু পাগল মেয়েটা তো রোজ ফোন করার চেষ্টা করে জ্বালাতন করে মারবে!

এইসব ভাবতেই-ভাবতেই সুপ্রতিম কষ্ট করে পেশাদারি হাসি ফুটিয়ে তুলল মুখে। তারপর ওর নিজস্ব ঢঙে জানতে চাইল, 'বলুন ম্যাডাম, কী আপনার সমস্যা? ''মুশকিল আসান'' নিশ্চয়ই তার সমাধান বাতলে দেবে।'

'আমার... আমার প্রবলেম তুমি। আমি তোমার সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে দেখা করব। যখন...যখন আর কেউ থাকবে না। বাড়িতে তিনবার ফোন করেছিলাম...তোমাকে পাইনি। কে ফোন ধরেছিল? তোমার...তোমার ওয়াইফ?'

শেষ প্রশ্নটা দর্শকরা শুনতে পাওয়ার আগেই কন্ট্রোল প্যানেলের সুইচ টিপে কথাবার্তা শোনানোর ব্যবস্থাটা অফ করে দিল সুপ্রতিম। কিন্তু রিসিভার নামিয়ে রাখল না। ঝুমুর চৌধুরি সম্পর্কে একটা কৌতূহল ওর মধ্যে মাথাচাড়া দিল।

'হ্যাঁ— আমার বউ— নয়না। ওকে আমি ভীষণ ভালোবাসি।' কথাটা বলার সময় আড়চোখে মোনার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল সুপ্রতিম। ওকে হাত নেড়ে ইশারা করল প্রোগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য।

'হুঁঃ! জানতাম!' বিরক্তি ফুটে উঠল ঝুমুরের গলায়। কিন্তু তারপরই ও কেমন অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল। খসখসে আদুরে গলার হাসি?

একটু পরে হাসি থামিয়ে চাপা গলায় বলল, 'কাউকে আমি পরোয়া করি না। কেন জানো? কারণ, আমার ভালোবাসা অন্যরকম। এরকম ভালোবাসা তুমি জীবনে কখনও পাওনি। কবে তোমার বাড়িতে যাব বলো?' শেষ প্রশ্নটায় যেন কোনো কিশোরীর মিনতি ঝরে পড়ল।

সুপ্রতিমের মন খুব দ্রুত চিন্তা করছিল।

মেয়েটি তো মনে হচ্ছে নিশ্চিত পাগল। ওর সঙ্গে দেখা করে সামনাসামনি বুঝিয়ে বললে কি ওর এই প্রেমের পাগলামি সারতে পারে? ওকে বলবে একবার বাড়িতে আসতে? কিন্তু নয়না যদি কিছু মাইন্ড করে!

প্রতি মঙ্গলবার সন্ধেবেলা নয়না কাছাকাছি একটা সেলাই-স্কুলে এমব্রয়ডারির কাজ শেখাতে যায়। ছ'টায় বেরোয়, দু-আড়াই ঘণ্টা পর ফেরে। ওর হাতের কাজ খুব ভালো। তা ছাড়া সূক্ষ্ম সেলাই নিয়ে সময় কাটাতে ওর বেশ লাগে। মঙ্গলবার সাড়ে ছ'টা-সাতটা নাগাদ তা হলে ঝুমুরকে আসতে বলবে সুপ্রতিম! তখন ফ্ল্যাট ফাঁকাই থাকবে। ঠিকে কাজের লোক বিমলামাসিও রোজ সন্ধেবেলা বাসন মেজে, ঘর মুছে ছ'টার মধ্যেই চলে যায়।

কিন্তু ফ্ল্যাটে ওকে একা পেয়ে মেয়েটা কোনো কাণ্ড বাধিয়ে বসবে না তো! দূর, কী আর করবে! সুপ্রতিম নিজে ঠিক থাকলে আর ভয় কীসের! কিন্তু মেয়েটার বয়েস কত? সতেরো, আঠেরো, কুড়ি হলে তো ইমোশনাল প্রবলেম হতে পারে।

সুপ্রতিম কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ছিল। ঠিকমতো আর ভাবতে পারছিল না।

'কবে যাব বলো?' খসখসে আদুরে গলায় আবার জানতে চাইল ঝুমুর।

'মঙ্গলবার সন্ধেবেলা। ঠিক সাতটায়।' সুপ্রতিমের মুখ দিয়ে কেমন যেন আলতোভাবে খসে পড়ল কথাগুলো।

'তোমাদের ফ্ল্যাটবাড়িটা আমি দেখে এসেছি। কাঁকুড়গাছিতে।' সামান্য হাসল ঝুমুর। একটু থেমে তারপর বলল, 'তোমার ফ্ল্যাটটা তো একতলায়...।'

পলকে ঘাম ফুটে উঠল সুপ্রতিমের কপালে। এর মধ্যেই ওর ঠিকানা বের করে বাড়িটা চিনে এসেছে মেয়েটা! মেয়েটাকে বাড়িতে ডেকে আবার কোনো বিপদ হবে না তো! তখন হয়তো সত্যি-সত্যিই থানা-পুলিশ করতে হবে। কিন্তু আর তো ফেরার পথ নেই! তির ছিটকে গেছে হাত থেকে।

'মঙ্গলবার সন্ধেবেলায় যাব। ঠিক...সাতটায়...। দেখা হওয়ার আগে আর তা হলে ফোন করব না।' একটু চুপচাপ। তারপর: 'আমাকে একপলক দেখলেই তুমি বুঝবে কেন আমার ভালোবাসা অন্যরকম।' চাপা গলায় কথাগুলো বলে অল্প হাসল ঝুমুরঃ 'আই লাভ য়ু, লাভ। তুমি অপেক্ষা কোরো। ঠিক সাতটায়...।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল সুপ্রতিম। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে স্মার্ট ঢঙে হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু কোথায় যেন তাল কেটে গেল। তা সত্ত্বেও সুপ্রতিম মোনার সঙ্গে কথা বলে অনুষ্ঠানে সহজভাবে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করল।

'মোনা, তুমি ভীষণ সেলফিশ।'

'কেন?' মোনা দুষ্টু হেসে তাকাল সুপ্রতিমের দিকে।

'পাগলের প্রবলেমগুলো আমার ঘাড়ে চাপিয়ে নিজে দিব্যি মজায় আছ।' তারপর দর্শকদের লক্ষ করে: 'কী, আপনারাই বলুন—।'

মোনাও দর্শকদের দিকে তাকিয়ে মজার সুরে বলল, 'যারা অন্যকে পাগল করে সেইসব পাগলের প্রবলেম তাদেরই সলভ করতে হবে। এটা আপনাদের সকলের প্রতি আমার উপদেশ। আশা করি ঠাট্টা করলাম বলে আপনারা কিছু মনে করবেন না।' বড় করে হাসল মোনা। তারপর সুপ্রতিমের দিকে ফিরে বলল, 'সুপ্রতিমদা, এবার সাক্ষাৎকার-পর্ব শুরু করুন। হাতে আর সময় বেশি নেই—।'

'হ্যাঁ। আজ আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন ডক্টর পার্থসখা মণ্ডল। প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী। উনি শিশু ও কিশোরদের মানসিক সমস্যা নিয়ে আমাদের নানান প্রশ্নের উত্তর দেবেন...।'

এরপর শুরু হয়ে গেল আগে রেকর্ড করা ডক্টর মণ্ডলের সাক্ষাৎকার।

সেদিন বাড়ি ফেরার পথে সুপ্রতিম ঠিক করল ঝুমুরের বাড়ি আসার ব্যাপারটা ও নয়নাকে জানাবে না। মোনা ওকে টেলিফোনের কথাবার্তা নিয়ে বারবার প্রশ্ন করেছিল। সুপ্রতিম ওকে সবই বলেছে। শুধু মঙ্গলবার সন্ধে সাতটার 'সাক্ষাৎকার'-এর কথা বলেনি।

সুপ্রতিম হিসেব করে দেখল মঙ্গলবার আসতে এখনও ঠিক তিনদিন বাকি। সেদিন ওকে স্টুডিয়ো থেকে একটু তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে।

দরজায় কেউ 'টুং-টাং' করে কলিংবেল বাজাতেই সুপ্রতিম চমকে উঠল। চকিতে ওর নজর চলে গেল দেওয়ালে টাঙানো শৌখিন ইলেকট্রনিক পেন্ডুলাম ঘড়ির দিকে। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই ঘড়িও শব্দ করে ওকে জানিয়ে দিল এখন ঠিক সাতটা।

ড্রইংরুমের সোফায় বসে ঝুমুরের জন্য অপেক্ষা করছিল সুপ্রতিম। অপেক্ষা করতে-করতে ওর টেনশান ক্রমে বাড়ছিল। নয়না, বিমলামাসি, অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে। তখন থেকে সুপ্রতিম ফ্ল্যাটে একা। হাতে সময় পেয়ে সামান্য একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়েছে। শরীরের এখানে-ওখানে ডিওডোরান্ট স্প্রে করেছে। হয়তো অবচেতনে ঝুমুরের আসার ব্যাপারটা মাথায় ছিল।

আবার বেজে উঠল কলিংবেল।

ঘোর কাটল সুপ্রতিমের। চটপট উঠে দরজার কাছে গিয়ে 'ম্যাজিক আই'-এ চোখ রাখল।

ঝুমুর নয়, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে একজন পুরুষ। 'ম্যাজিক আই'-এর লেন্স দিয়ে যেটুকু বিকৃত ছবি দেখা গেল তাতে বলা যায় লোকটি ফরসা, দাড়ি-গোঁফ কামানো মুখে যেন একটা ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষ ভাব।

দরজা খুলল সুপ্রতিম। সঙ্গে-সঙ্গে বিদেশি পারফিউমের গন্ধ ওকে ভাসিয়ে দিল।

লোকটি, অথবা ছেলেটি, সামান্য হাসল। হাসিতে লজ্জা, সঙ্কোচ। কোনোরকমে বুকের কাছে হাত তুলে সৌজন্যের নমস্কারের ভঙ্গি করল। তারপর এক পা বাড়িয়ে ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকে পড়ল, বলল, 'একটু কথা আছে।'

উচ্চারণগুলো এতই অস্পষ্ট যে সুপ্রতিমকে বেশ কষ্ট করে কথাগুলো বুঝতে হল।

কখনও-কখনও দু-একজন যশোপ্রার্থী মানুষ সুপ্রতিমের সঙ্গে দেখা করতে আসে। কী করে টিভিতে চান্স পাওয়া যায় তার কৌশল বা সুলুক-সন্ধান জিগ্যেস করে সুপ্রতিমকে বিব্রত করে, বিরক্ত করে। ইনিও বোধহয় সেই দলের— ভাবল ও।

লোকটি বেশ রোগা, উচ্চতায় নিতান্তই খাটো, তবে মাথার চুল বেশ বড়— কষে তেল মেখে কীর্তনীয়াদের মতো পরিপাটি করে আঁচড়ানো। চোখ টানা-টানা— কেমন এক তন্দ্রার ভাব সেখানে জড়িয়ে আছে। বাঁ-গালে, চোখের সামান্য নীচে, সরষের মাপের একটা কালো জড়ুল। পুরুষটি মেয়ে হলে ওটাকে বিউটি স্পট বলা যেত। পরনে সাদার ওপরে হালকা নীল স্ট্রাইপ দেওয়া ফুল শার্ট, আর নেভি ব্লু রঙের প্যান্ট।

আর বয়স কতই-বা হবে! বড়জোর তেইশ-চব্বিশ।

'বলুন, কী দরকার?' সুপ্রতিম জিগ্যেস করল।

এর পরের ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটে গেল।

সুপ্রতিমের চোখে চোখ রেখে লোকটি ডানহাতে খোলা দরজার পাল্লাটাকে ঠেলে বন্ধ করে দিল। 'ক্লিক' শব্দে নাইট ল্যাচ আটকে গেল।

তারপর আদুরে খসখসে গলায় বলল, 'তোমাকে চাই গো, তোমাকে চাই—।'

এবং তাড়া-খাওয়া হরিণের ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ল সুপ্রতিমের গায়ে। ওকে আঁকড়ে ধরে 'চকাৎ' শব্দে এক তীব্র চুমু খেল ওর ঠোঁটে।

গায়ে আরশোলা বা মাকড়সা পড়লে মানুষ যেমন ঘেন্না, অস্বস্তিতে শিউরে ওঠে, ঠিক সেইরকম এক প্রতিক্রিয়ায় ছেলেটিকে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেলে দিল সুপ্রতিম। ওর গা ঘিনঘিন করছিল। হাতের পিঠ দিয়ে বারবার করে ঘষে-ঘষে ঠোঁট মুছল।

ছেলেটি পড়ে গিয়েছিল মেঝেতে। হামাগুড়ির ভঙ্গিতে উঠে বসে কাতর আকুল চোখে তাকাল সুপ্রতিমের দিকে। অদ্ভুত এক মেয়েলি সুরে বলল, 'আমাকে তুমি...চিনতে পারোনি! আমি...আমি...ঝুমুর...ঝুমুর চৌধুরি।'

সুপ্রতিম ভীষণ একটা ধাক্কা খেল।

এতদিন এই ছেলেটাই ওকে মেয়ে সেজে চিঠি দিয়েছে, ফোন করেছে! একটা জঘন্য বৃহন্নলা! এইজন্যই পাগলটা চিঠিতে লিখেছিল: '...আমার ভালোবাসা অন্যরকম। এরকম ভালোবাসা তুমি জীবনে কখনও পাওনি।'

সুপ্রতিমের গা গুলিয়ে উঠল। 'ওয়াক' উঠতে চাইল গলা দিয়ে।

ঝুমুর তখন পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা গোলাপ ফুল আর একটা রঙিন কাগজে মোড়া বাক্স বের করে ফেলেছে। সে-দুটো সুপ্রতিমের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'এই ফুল আর একটা পার্কার পেন...তোমার জন্যে এনেছি। তুমি ফিরিয়ে দিয়ো না...প্লিজ...।'

ঝুমুর যদি পুরুষ হয় তা হলে ওর গলাটা মেয়েলি। আর যদি ও মেয়ে হত তা হলে বলা যেত গলাটা কেমন যেন পুরুষালি। কিন্তু আসলে ও কী?

ঝুমুর উঠে দাঁড়িয়ে আবার এগিয়ে এল সুপ্রতিমের কাছে। মিষ্টি করে হসে উপহার দুটো বাড়িয়ে দিল। বলল, 'আমি একটুও রাগ করিনি গো। আমার ভালোবাসায় প্রথম-প্রথম এরকম হয়— পরে সব ঠিক হয়ে যায়। এই নাও—।'

সুপ্রতিম কেমন এক অশুভ হাওয়া-বাতাসের ঘোরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। ঝুমুরের কথায় ঘোর কাটতেই প্রচণ্ড রাগে সপাটে এক ঘুসি বসিয়ে দিল ওর মুখে।

বিশ্রী একটা শব্দ হল। ঝুমুরের ঠোঁট থেঁতলে রক্ত বেরিয়ে এল। ও আবার ছিটকে পড়ল মেঝেতে। উপহারগুলো হাত থেকে পড়ে ছড়িয়ে গেল।

সুপ্রতিম ভেতরে-ভেতরে টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছিল। একসঙ্গে অনেক কথা বলতে গিয়ে সব কথা কেমন যেন আটকে যাচ্ছিল। মাথার ভেতরে অনেক কিছু দপদপ করছে। এখুনি যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হবে।

'এইমুহূর্তে বেরোও। জানোয়ার কোথাকার! আউট!' হাঁফাতে-হাঁফাতে চেঁচিয়ে বলল সুপ্রতিম।

কিন্তু ঝুমুর ওর ধমক গ্রাহ্য করল বলে মনে হল না।

রক্তাক্ত মুখেই আবার উঠে দাঁড়িয়েছে ছেলেটা। ওর সাদা জামায় রক্তের ছিটে লেগেছে। সেই অবস্থাতেই বিচিত্র বিভঙ্গে শরীর দুলিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল ও। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'আমি কিচ্ছু মনে করিনি, হানি। তোমাকে আমি চাই— সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে চাই। হাজার টরচার করেও তুমি আমাকে টলাতে পারবে না। তোমার হাতের ছোঁওয়া আমার কাছে যে কী, তা তুমি জানো না। আর...আর এইটা দ্যাখো—।' বলে একটানে জামাটা ছিঁড়ে দিল ঝুমুর। কয়েকটা বোতাম ছিঁড়ে ছিটকে গেল। বুকের কাছটায় অনেকখানি ফেঁসে গেল জামাটা। আর তখনই ঝুমুরের খালি বুক দেখা গেল।

ওর ঈষৎ মেয়েলি ঢঙের বুকে বাঁদিকে সত্যিকারের একটা ছোট্ট কাটা দাগ। সুপ্রতিমের ডান ভুরুর দাগটার মতো।

ঝুমুর চিঠিতে লিখেছিল, ও বুকে একটা কাটা দাগ 'এঁকে' নিয়েছে। কিন্তু এ তো সত্যিকারের কাটা দাগ। ব্লেড, ছুরি অথবা ক্ষুর দিয়ে চিরে ও তৈরি করেছে!

আবার খিলখিল করে হেসে উঠল ঝুমুর। রক্তমাখা মুখে ওর হাসি কেমন অলৌকিক দেখাচ্ছিল।

হঠাৎই ও আবার ঝাঁপিয়ে এল সুপ্রতিমের দিকে।

সুপ্রতিম খপ করে এক হাতে ওর গলা চেপে ধরল। তারপর ওর পলকা শরীরটাকে পিছনদিকে ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে গেল দরজার কাছে।

'য়ু সান অফ আ বিচ! ফাকিং গে বাস্টার্ড! আর কখনও যদি আমাকে ডিসটার্ব করো তা হলে একেবারে খুন করে ফেলব!'

দরজা খুলে ঝুমুরের দেহটাকে বলতে গেলে বাইরে ছুড়ে দিল সুপ্রতিম। ওর মাথাটা সিঁড়ির রেলিঙে ঠুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটার চোখ দুটো কেমন ঘোলাটে হয়ে গেল। ও কাত হয়ে টলে পড়ে যেতে গিয়েও সিঁড়ির রেলিং ধরে কোনোরকমে সামলে নিল। ঘোলাটে নজরে তাকাল ওর ভালোবাসার পুরুষের দিকে। জড়ানো খসখসে গলায় বলল,'আমি কিছুই মাইন্ড করিনি। যতই ফিরিয়ে দাও, আবার আমি আসব। একদিন-না-একদিন তুমি আমাকে মেনে নেবেই...।'

ওর গায়ে একদলা থুতু ছিটিয়ে দিল সুপ্রতিম। তারপর দড়াম শব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

সুপ্রতিমের সারা শরীর অবসাদ আর ক্লান্তিতে কেমন ভারী হয়ে গিয়েছিল। বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে ও চোখ বুজে হাঁফাতে লাগল।

এক অদ্ভুত গ্লানি সুপ্রতিমকে জড়িয়ে ধরেছিল। বারবার 'ওয়াক' উঠে আসতে চাইছিল ওর গলা দিয়ে। এরকম গা-ঘিনঘিনে ঘটনার কথা কাউকে কি বলা যায়! শেষ পর্যন্ত কি সত্যি-সত্যিই থানা-পুলিশ করতে হবে?

ঝুমুরকে ঘুসি মেরে সুপ্রতিমের ডানহাতের পিঠটা ছড়ে গিয়ে জ্বালা করছিল। ছড়ে যাওয়া জায়গাটা ঠোঁটে লাগিয়ে জোরে-জোরে কয়েকবার চুষল ও। তারপর মেঝেতে পড়ে থাকা দলিত গোলাপ আর রঙিন প্যাকেটটার দিকে তাকাল। ঝুমুরের রক্ত-মাখা মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল আবার।

গোপনে কোনো মেয়ের সঙ্গে দেখা করলে সে-ঘটনাটা নয়নার কাছে ও অবশ্যই গোপন করতে চাইত। কিন্তু এই ব্যাপারটা এত অস্বস্তির আর এত লজ্জার যে, এটা আরও বেশি গোপন করতে ইচ্ছে করছে।

কিন্তু নয়নাকে বলতে হবেই— সে ও যা-ই ভাবুক।

সবরকম দ্বিধা কাটিয়ে টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গেল সুপ্রতিম। নয়নাকে সেলাই-স্কুলে ফোন করে এখনই বাড়ি আসতে বলবে। তারপর...।

নয়নাকে সব কথা খুলে বলতে গিয়ে সুপ্রতিমের কান্না পেয়ে গেল। একটা অসহ্য রাগ, ক্ষোভ, ঘৃণা ওর ভেতরে দলা পাকিয়ে উথলে উঠছিল। নয়নাকে জড়িয়ে ধরে সুপ্রতিম বাঁচার একটা পথ খুঁজছিল। সৌন্দর্যই শেষ পর্যন্ত ওর শত্রু হয়ে দাঁড়াল! এমনই সুপুরুষ-সৌন্দর্য যে, একজন পুরুষও তার প্রেমে পড়ে যায়!

সারাটা রাত ওদের উথালপাথালভাবে কাটল। শেষ পর্যন্ত নয়না ওকে বলল, ব্যাপারটা থানায় জানানো দরকার।

সুপ্রতিম রাজি হল। তারপর মোনাকে ফোন করে জানিয়ে দিল, আপাতত সাত-দশদিন ওর পক্ষে অফিস করা সম্ভব হবে না। না, না, তেমন সিরিয়াস কোনো ব্যাপার নয়। পারিবারিক কয়েকটা ব্যাপারে হঠাৎই চাপ এসে পড়েছে। ওরা যেন সুপ্রতিমের বদলে আর কাউকে দিয়ে ক'টা দিন কাজ চালিয়ে নেয়।

সুপ্রতিম জানে, ওরা বিপ্লব সরকার কিংবা অনির্বাণ পুরকায়স্থকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নেবে। আগেও দু-একবার এরকম হয়েছে।

মোনা অনেক প্রশ্ন করল, কিন্তু সুপ্রতিম ঝুমুরের ব্যাপারে মোনাকে বিন্দুবিসর্গও বলল না। ও চাইছিল না ব্যাপারটা বেশি জানাজানি হোক। অদ্ভুত এক লজ্জা আর সঙ্কোচ ওর গলা টিপে ধরছিল।

নয়না আর সুপ্রতিম বেলা বারোটা নাগাদ থানায় পৌঁছল।

বাইরের ঘরটায় কয়েকটা লম্বা-লম্বা বেঞ্চি পাতা। একপাশে বড় মাপের একটা টেবিল। তাকে ঘিরে চারটে চেয়ার। টেবিলে পুরোনো আমলের টেলিফোন, কিছু ফাইলপত্র, বড় কাচের গ্লাসে আধগ্লাস জল।

ঘরটা এমন অন্ধকার-অন্ধকার যে, দিনের বেলাতেও দু-দুটো টিউব লাইট জ্বেলে রাখতে হয়েছে। সিলিং-এ সাবেকি একটা বেঢপ পাখা ঢিমে তালে ঘুরছে। তার হাওয়ায় দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে-থেকে কেঁপে উঠছে।

টেবিলের ওপাশে সাদা য়ুনিফর্ম পরে একজন পুলিশ অফিসার বসে আছেন। বয়স বড়জোর পঁয়তিরিশ। ছোট করে ছাঁটা চুল। মুখে উদাসীন বিরক্ত ভাব।

টেবিলে রাখা কাঠের নেমপ্লেট পড়ে জানা গেল অফিসারের নাম টি. দাস, সাব-ইন্সপেক্টর।

সুপ্রতিম আর নয়না বসল।

দাসবাবু সপ্রশ্ন নজরে ওদের দিকে তাকালেন।

একটু ইতস্তত করে সুপ্রতিম বলল, 'আমি...আমি...একটা ডায়েরি করতে চাই।'

কথা বলতে-বলতে ও চারপাশে দেখছিল। দু-একজন লোক এদিক-ওদিক যাতায়াত করছে। তাদের চোখেমুখে ব্যস্তসমস্ত ভাব।

সুপ্রতিমের মনে হল, দাসবাবু ছাড়া আর কেউ ওদের কথা শুনতে পাবে না। তাই দাসবাবু যখন ডায়েরি-বইz নিয়ে ডটপেট বাগিয়ে বললেন, 'বলুন—।', তখন ও প্রথমে নিজের পরিচয় দিল, তারপর সহজভাবেই ঝুমুরের ব্যাপারটা বলে গেল। টেবিলের আড়ালে নয়না ওর একটা আঙুল ছুঁয়ে ওকে সাহস জোগাচ্ছিল। ও টের পেল, সুপ্রতিমের আঙুল কাঁপছে।

কিছু লেখার আগে দাসবাবু ব্যাপারটা শুনে নিচ্ছিলেন। মাঝে-মাঝে ছোটখাটো শব্দ করছিলেন, আর ডটপেনটা ডায়েরি-বইয়ের পাতায় ঠুকছিলেন।

শুনতে-শুনতে একসময় তাঁর মুখে মজা পাওয়ার ছাপ ফুটে উঠল। চাপা গলায় বললেন, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং!'

হঠাৎই একজন সাদা-পোশাকের অফিসার সিগারেট টানতে-টানতে এগিয়ে এলেন। ধপ করে বসে পড়লেন দাসবাবুরপাশের চেয়ারটায়। আড়চোখে নয়নার সৌন্দর্য চেটে নিয়ে ভাঙা গলায় বললেন, 'কী কেস, দাস?'

'হোমো কেস।' দাস মুচকি হেসে বললেন।

নয়না আর সুপ্রতিম 'হোমো' শব্দটা শুনে কেমন যেন সিঁটিয়ে গেল।

'বলুন, তারপর কী হল—' সুপ্রতিমকে তাড়া দিলেন দাস।

খুঁড়িয়ে চলা ছ্যাকড়াগাড়ির মতো থতিয়ে-থতিয়ে কথা শেষ করল সুপ্রতিম। টের পেল, ওর ঘাড়ে, গলায়, কপালে ঘাম জমছে।

ওর কথা শেষ হওয়ামাত্রই সাদা-পোশাকের অফিসারটি বলে উঠলেন, 'এ-ডায়েরি নিয়ো না, দাস— এই ভদ্রলোক ফেঁসে যাবেন।'

দাসবাবু ওঁর কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'ঠিকই বলেছেন, শঙ্করদা।'

নয়না অবাক চোখে জানতে চাইল, 'কেন? ডায়েরি নেবেন না কেন? লোকটা আমাদের লাইফ হেল করে দিচ্ছে...।'

'সবুর, ম্যাডাম, সবুর...।' সিগারেটে জোরালো টান দিয়ে সাদা-পোশাকের অফিসারটি বললেন, 'একটু মাথা খাটান, তা হলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। একটা ইয়াং ছেলে আপনার হাজব্যান্ডকে ''আমি তোমাকে ভালোবাসি'' বলে জাপটে ধরে চুমু খেয়েছে। মানছি, অন্যায় করেছে। কিন্তু তার বদলে আপনার হ্যাজব্যান্ড কী করেছেন? না ছেলেটাকে তুলোধোনা করে মুখ-মাথা ফাটিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছেন। কী, ঠিক বলছি তো?' শেষের প্রশ্নটা সুপ্রতিমকে লক্ষ্য করে।

সুপ্রতিম কোনো জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইল। নয়নাও ঠিক কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

সাদা-পোশাকের অফিসারের কথার খেই ধরে দাস সুপ্রতিমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওই ছেলেটা যদি থানায় এসে আপনার নামে ডায়েরি করে তা হলে তো আপনি ভেতরে ঢুকে যাবেন। তখন বিচ্ছিরিরকম স্ক্যান্ডাল হবে, লোকজানাজানি হবে— একটা কেলো হয়ে যাবে।' একটু সময় দিলেন ওদের। তারপর: 'তার চেয়ে বরং বাড়ি যান। ছেলেটা আবার এলে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে টাকাপয়সা দিয়ে ম্যানেজ করে নিন। ওর সঙ্গে মিউচুয়াল করে নেওয়া ছাড়া আর তো কোনো ওয়ে আউট দেখছি না। শঙ্করদা কী বলেন?' সাদা-পোশাকের দিকে ফিরে জানতে চাইলেন দাস।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে টুকরোটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিতে-দিতে শঙ্করবাবু বললেন, 'এ ছাড়া কোনো পথ নেই। এসব হোমো কেস নিয়ে ক্যাচাল যত কম হয় আপনাদের পক্ষে ততই ভালো। তবে এরপর কী হয়-না-হয় সেটা আমাদের ইনফর্ম করতে পারেন। সিরিয়াস কোনো টার্ন নিলে তখন...।'

সুপ্রতিম আর নয়না ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। অফিসাররা যে ঠিক কথাই বলছেন, সে নিয়ে ওদের মনে কোনোরকম সন্দেহ ছিল না।

এক অদ্ভুত আতঙ্কে অবশ হয়ে শোলার পায়ে ওরা বাড়ি ফিরে এল। নয়না মনে-মনে ভাবছিল, কেমন দেখতে এই ঝুমুর চৌধুরিকে?

সুপ্রতিম যখন ফ্ল্যাটের দরজায় নাইট ল্যাচের চাবি ঘোরাচ্ছে তখন শুনতে পেল ঘরের ভেতরে টেলিফোন বাজছে।

দরজা খুলে তাড়াহুড়ো করে ফোন ধরল সুপ্রতিম।

'হ্যালো—।'

'সুপ্রতিম...মাই লাভ...আই লাভ য়ু...।'

নয়না স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। দেখল ওর মুখটা চোখের পলকে কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। নয়না বুঝতে পারল, সুপ্রতিমকে কে ফোন করেছে।

ঝুমুরের টেলিফোনের উৎপাত চলতেই থাকল, কিন্তু সুপ্রতিম কিছুতেই আর বিরক্ত হল না। থানার দুই অফিসারের কথা ওর মনে ছিল। তাই ও মোলায়েমভাবে কথা বলে ঝুমুরকে নিরস্ত করতে চাইল। ওকে অনুনয় করে বলল, 'তুমি যেরকম ভালোবাসা চাও আমার মধ্যে সেরকম ভালোবাসা নেই। তুমি ভুল করছ—।'

ওকে বাধা দিয়ে আদুরে ঢঙে ঝুমুর বলল, 'না, না, ভুল নয়। তুমি আমার কাছে ধরা দিলেই বুঝবে আমি ভুল করিনি। আমি মনের মতো মনের মানুষ পেয়েছি।'

সুপ্রতিম অনেক চেষ্টা করেও গা-ঘিনঘিন-করা ভাবটা চেপে রাখতে পারেনি। এবং টেলিফোন রেখে দিয়েছে।

কিন্তু পরে আবার ঝুমুরের ফোন এসেছে।

সুপ্রতিম প্রতিবারই ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে। টাকা দেওয়ার কথা বলেছে। কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। ফোনের ও-প্রান্তে ঝুমুর কেঁদে ভাসিয়েছে। আত্মহত্যা করবে বলে ওকে ভয় দেখিয়েছে। কখনও বলেছে, গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে। কখনও বলেছে, ট্রেনের তলায় মাথা দেবে। আবার কখনও-বা বলেছে, গলায় দড়ি দেবে।

সুপ্রতিম বেশ বুঝতে পারছিল, ওর জীবনের কোথায় যেন পূর্ণগ্রাস গ্রহণ শুরু হয়ে গেছে।

ঝুমুরের নিয়মিত ফোন আর ইনিয়েবিনিয়ে প্রেম সুপ্রতিমকে অতিষ্ঠ করে তুলল। কয়েকদিন পর ওর মনে হতে লাগল ও বোধহয় পাগল হয়ে যাবে। হয়তো শেষ পর্যন্ত সত্যি-সত্যিই ঝুমুরের 'অন্যরকম' ভালোবাসার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাবে।

সুপ্রতিমের এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে মঙ্গলবার সন্ধে সাতটা নাগাদ ওদের ফ্ল্যাটের কলিংবেল বেজে উঠল।

নয়না বাড়িতে নেই। সেলাইয়ের স্কুলে গেছে। সুপ্রতিমকে একা রেখে ও যেতে চায়নি, কিন্তু সুপ্রতিমই জোর করে ওকে পাঠিয়েছে, বলেছে, 'আমি কি বাচ্চা ছেলে নাকি! তা ছাড়া ওই ঝুমুর চৌধুরিকে ভয়ের কী আছে! আগের দিন তো ওকে বেধড়ক ঠেঙিয়েছি। আজ যদি হতচ্ছাড়াটা আসে তা হলে হকি স্টিক দিয়ে পেটাব।'

সুপ্রতিম একসময় হকি খেলত। ওর হকি স্টিকটা বেডরুমের দেওয়ালের কোণে দাঁড় করিয়ে রাখা থাকে। সেটা এখন ও ড্রইংরুমের সোফার তলায় এনে রেখেছে। কারণ, ওর মন বলছিল, ঝুমুর যেরকম খ্যাপা তাতে ও মঙ্গলবার সন্ধে সাতটায় আবার ওদের ফ্ল্যাটে এসে হানা দিতে পারে— সুপ্রতিমকে একা পাওয়ার জন্য।

তাই কলিংবেলের আওয়াজ শুনেই চমকে উঠেছিল সুপ্রতিম। তারপর সতর্ক পায়ে দরজার কাছে গিয়ে 'ম্যাজিক আই' দিয়ে উঁকি মেরেছে।

না, ঝুমুর চৌধুরি নয়। দরজায় দাঁড়িয়ে ন্যাড়া মাথা গোঁফওয়ালা একজন লোক।

দরজা খুলে দিল সুপ্রতিম।

রোগা ছোটখাটো চেহারার লোকটি ঘরে ঢুকে পড়ল। তার হাতে একটা ছোট ব্রিফকেস। শার্ট, প্যান্ট, টাই পরে একেবারে ফিটফাট। মুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি।

সেলসম্যান নাকি! ভাবল সুপ্রতিম। কিন্তু এই সন্ধে সাতটায় কী বিক্রি করতে এসেছে?

সুপ্রতিম ভদ্রতা করে বলল, 'বলুন, কী চাই?'

'খুব ইম্পর্ট্যান্ট বিজনেস।' চাপা গলায় অস্পষ্টভাবে বলল লোকটি। তারপর খুব সহজ ভঙ্গিতে দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিল।

সুপ্রতিম লোকটির দিকে পিছন ফিরে সোফার দিকে একটা পা বাড়িয়েছিল, দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে ভুরু কুঁচকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

ততক্ষণে ঝুমুর ওর নকল গোঁফটা একটানে খুলে ফেলে দিয়েছে ঘরের মেঝেতে। আর হাতের ব্রিফকেসটাও একপাশে নামিয়ে রেখেছে।

'তুমি!'

'হ্যাঁ গো, আমি। তোমার কাছে না এসে থাকতে পারলাম না। ফোনেই তো বলেছিলাম, তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু যদি তুমি মুখের ওপরে দরজা দিয়ে দাও, তাই মাথা ন্যাড়া করে নকল গোঁফ লাগিয়ে আসতে হয়েছে...।'

ঝুমুর বিচিত্র ঠমক-ঠামক করে কথা বলছিল। কটাক্ষ হানছিল। ঠোঁটের কোণ কামড়াচ্ছিল।

সুপ্রতিম পাথর হয়ে তাকিয়ে ছিল অদ্ভুত এই প্রাণীটার দিকে। আর প্রাণপণে গা-ঘিনঘিন-করা ভাবটাকে সামাল দিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিল।

'তুমি রাগ করলে না তো! তোমার ওপরে আমার কোনো রাগ নেই। যাকে ভালোবাসি তার ওপরে কি রাগ করে থাকা যায়!'

কথাগুলো বলেই সুপ্রতিমের দিকে ঝাঁপিয়ে এল ঝুমুর। সুপ্রতিম ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কাটিয়ে ওঠার আগেই ও আবেগজর্জর প্রেমিকার মতো সুপ্রতিমের বুকে মুখ ঘষতে লাগল, আর ইনিয়েবিনিয়ে বলতে লাগল, 'আমায় আদর করো। লক্ষ্মীসোনা, আমায় আদর করো। আমি আর পারছি না। প্লিজ...প্লিজ...। আমার শুধু বাইরেটা পুরুষ— ভেতরটা নয়।'

সুপ্রতিম মুখ নামিয়ে দেখল একটা ন্যাড়া মাথা ছেলে ওর বুকে মুখ ঘষছে। ও এমন নির্লিপ্তভাবে দেখছিল, যেন ওটা ওর বুক নয়— অন্য কোনও পুরুষের বুক।

হঠাৎই বিকট শব্দে 'ওয়াক' তুলল সুপ্রতিম। ওর সারা শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। এবং একইসঙ্গে এক ঝটকায় ঝুমুরকে ছিটকে ফেলে দিল ও। তারপর মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। মাথা ঝুঁকিয়ে বারবার বমির হেঁচকি তুলতে লাগল।

ওর গলার পাশে শিরা ফুলে উঠল। খানিকটা জল আর লালা বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

ঝুমুর তখন মেঝেতে সোজা হয়ে বসেছে। হাসিমুখে তাকিয়ে আছে সুপ্রতিমের দিকে। আর গুনগুন করে গাইছে, '...তোমার আদর পেলে আমি স্বর্গে চলে যাই/ মর্ত্যে যে আর আমার কিছু নাই...।'

একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল সুপ্রতিমের মাথায়। ওর চোখ চলে গেল সোফার নীচে— হকি স্টিকের দিকে। হাতের নাগালের মধ্যেই রয়েছে ওটা। চুলোয় যাক দাসবাবু আর শঙ্করবাবুর হিতোপদেশ! দাঁত বের করে বসে থাকা ওই জানোয়ারটা ওঁদের তো কিছু করেনি! শুধু সুপ্রতিমের জীবনটাকে নরক করে তুলেছে।

কয়েক সেকেন্ড নিজের সঙ্গে লড়াই করল সুপ্রতিম। তারপর ডানহাত বাড়িয়ে দিল হকি স্টিকটার দিকে। ওটা আঁকড়ে ধরল শক্ত মুঠোয়।

আজ শুয়োরের বাচ্চাটার একদিন কি আমার একদিন। দাঁতে দাঁত চেপে ভাবল ও।

তারপর হকি স্টিক হাতে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। দু-পা ফেলে পৌঁছে গেল ঝুমুরের কাছে। এবং খ্যাপা দাঁতালো শুয়োরের রাগ নিয়ে হকি স্টিক চালাতে শুরু করল।

ছোটবেলায় ধুনুরিদের লেপ-তোশক তৈরি করতে দেখেছে সুপ্রতিম। শীতের রোদে ছাদে বসে জমাট বাঁধা শক্ত তুলোকে তারা পিটিয়ে-পিটিয়ে নরম করে। এখন হকি স্টিক চালাতে-চালাতে ছোটবেলার কথা মনে পড়ল। তবে ধুনুরিদের শব্দ যদি সত্তর-আশি ডেসিবেল হয় তা হলে সুপ্রতিমের আঘাতের শব্দ কম করেও একশো ডেসিবেল। তা ছাড়া ধুনুরিদের বেলায় এমন রক্তারক্তি ব্যাপারটা ছিল না।

সুতরাং মেঝেতে বসে থাকা ছোটখাটো ছেলেটাকে নিষ্ঠুরভাবে তালগোল পাকিয়ে দিল সুপ্রতিম। ঝুমুর ওর পায়ের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে কুকুরছানার মতো কেঁউকেঁউ করতে লাগল। শব্দটা কেমন কান্না মেশানো গোঙানির মতো লাগছিল। ওর মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে, জামায় রক্তের ফোঁটা ছিটকে লেগেছে, শরীরটা যেন ভাঙাচোরা 'দ' হয়ে গেছে।

উন্মত্ত রাগ কমে এলে সুপ্রতিম হকি স্টিকটা একপাশে ছুড়ে ফেলে দিল। বড়-বড় শ্বাস ফেলে হাপরের মতো হাঁফাচ্ছিল ও। ভাবছিল, এত শব্দ-টব্দ পেয়ে লোকজন না ছুটে আসে ওর ফ্ল্যাটে। তারপর থানা-পুলিশ...।

কয়েক সেকেন্ড অন্যমনস্ক হয়েছিল সুপ্রতিম। সেই ফাঁকেই ওর ঊরুতে ক্ষুর চালাল ঝুমুর।

তালগোল পাকানো ছেলেটা বিদ্যুৎগতিতে হাত চালাল। একবার, দুবার, তিনবার। প্রথম দুবার ঊরুতে, তৃতীয়বার হাঁটুর নীচে।

সুপ্রতিমের মনে হল ওর পায়ে জ্বলন্ত কয়লা ঘষে দিয়েছে কেউ। ও ঝুঁকে পড়ে পা চেপে ধরল।

আর তখনই ওর কোমরে ক্ষুর চালাল ঝুমুর।

যত না যন্ত্রণা পেল তার চেয়ে বেশি অবাক হল সুপ্রতিম। ও বিশ্বাসই করতে পারছিল না ওর পায়ের কাছে তালগোল পাকিয়ে পড়ে থাকা ক্ষীণজীবী মাংসপিণ্ডটা এইরকম ভয়ানক কাজ করতে পারে।

সুপ্রতিম পড়ে গেল মেঝেতে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই পাগলটা লাফিয়ে উঠে এল ওর শরীরের ওপরে। ডানহাতে ধরা ক্ষুরটা চেপে ধরল সুপ্রতিমের বাঁ-কানের নীচে, খসখসে আদুরে গলায় বলল, 'ভালোবাসা আর যুদ্ধে অন্যায় বলে কিছু নেই গো। তোমাকে খতম করে দিলে আমার খুব কষ্ট হবে। কিন্তু তোমার ভালোবাসা না-পেলে কষ্ট যে আরও বেশি! আই লাভ য়ু, ডার্লিং...।'

খুব কাছ থেকে ঝুমুরের মুখটা লক্ষ করে এই প্রথম ওকে ভয় পেল সুপ্রতিম। ওরা দুজনেই হাঁফাচ্ছিল। একজনের নাকমুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা কার্বন ডাইঅক্সাইড ঢুকে পড়ছিল আর-একজনের নাকে। তাই ওদের দুজনেরই শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল।

এক অজানা ভয়ে সুপ্রতিম কাঠ হয়ে গেল। ও টের পাচ্ছিল, ওর কোমর, ঊরু, পা থেকে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। নয়না এখনই এসে পড়ছে না কেন! নয়নার ফিরে আসার জন্য মনে-মনে আকুল প্রার্থনা করতে লাগল ও।

ঝুমুর হিসহিস করে বলল, 'অসভ্যতা করলে গলা ফাঁক করে দেব। আর যদি চেঁচাও, তা হলে চিৎকারটা মুখ দিয়ে বেরোবে না— গলার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাবে।'

ঝুমুর সুপ্রতিমের বুকের ওপরে উঠে বসল। বাঁহাতে টান মেরে সুপ্রতিমের জামা ছিঁড়ে দিল। তারপর নির্বিকার ভঙ্গিতে ওর বুকে ক্ষুর চালিয়ে আড়াআড়ি দাগ টেনে দিল।

সুপ্রতিম যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল।

ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করতে ইশারা করে ঝুমুর বলল, 'চুপ, সোনামণি। অনেক কষ্ট সয়ে তবেই আসল ভালোবাসা পাওয়া যায়।'

প্যান্টের পকেট থেকে নাইলনের দড়ি বের করল ঝুমুর। ডান হাতে ক্ষুর নাচাতে-নাচাতে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা সুপ্রতিমের মাথার দিকটায় গেল। তারপর উবু হয়ে বসে পড়ল। ক্ষুরটা হাতের কাছেই নামিয়ে রেখে

'নোড়ো না, লক্ষ্মীটি। নইলে বিপদ হবে।' বলতে-বলতে সুপ্রতিমের দুটো হাত বাঁধতে শুরু করল।

হাত দুটো শক্ত করে বাঁধা হয়ে গেলে দড়ির প্রান্তটা বেঁধে দিল একটা সোফার দু-পায়ার সঙ্গে। এখন অনেক চেষ্টা করে সুপ্রতিম সোফাটাকে সামান্য নাড়াতে পারবে হয়তো, কিন্তু সুপ্রতিম কোনোরকম চেষ্টা করছিল না। ও চোখ ঘুরিয়ে 'অন্যরকম' ঝুমুরকে লক্ষ করছিল, আর মৃত্যুভয়ের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিল।

দড়ির বাকি অংশটা ক্ষুর দিয়ে কেটে নিল ঝুমুর। চলে এল সুপ্রতিমের পায়ের কাছে। পা দুটো জোড়া করে শক্ত করে বাঁধল।

এমন সময় ঘরের টেলিফোন বাজতে শুরু করল।

ঝুমুর টেলিফোনটার দিকে একবার তাকাল শুধু। তারপর টেলিফোনের শব্দ কোনওরকম গ্রাহ্য না করে আর-একটা সোফা টেনে নিয়ে এল সুপ্রতিমের পায়ের কাছে। জোড়া পা বাঁধা পড়ল সোফার দু-পায়ার সঙ্গে।

ঝুমুর এবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে অদ্ভুতভাবে হাসল। ক্ষুরটা রেখে দিল সোফার ওপরে। তারপর নিজের পোশাক খুলতে শুরু করল। সুপ্রতিম ভয়ার্ত চোখে ওকে দেখতে লাগল।

বাজতে-বাজতে ক্লান্ত হয়ে টেলিফোন থেমে গেল একসময়।

ততক্ষণে সুপ্রতিমের চোখের সামনে প্রকাশিত হয়েছে প্রায়-নগ্ন ঝুমুর। ওর পরনে শুধু একটা গাঢ় নীল রঙের জাঙ্গিয়া।

ফরসা ফ্যাকাসে রোগা শরীর, ন্যাড়া মাথা, মাথায় রক্তের দাগ, গলায় সামান্য রক্তের ছিটে, মুখে চওড়া হাসি, অথচ ঠান্ডা চোখ। ঝুমুরকে কেমন যেন অলৌকিক প্রাণী বলে মনে হচ্ছিল।

এইবার ব্রিফকেসটা টেনে নিয়ে মেঝেতে বসল ঝুমুর। ওটা খুলতেই দেখা গেল মেয়েলি প্রসাধনের নানান জিনিস। একটা হাত-আয়না নিয়ে ঝুমুর সাজতে বসল। আর একইসঙ্গে গুনগুন করে গাইতে লাগল: 'ভালোবাসার তুমি কী জানো? ভালোবাসার তুমি কী জানো? উঁ...উঁ...উঁ...পায়ের উপর পা-টি তুলে/হিসাবের খাতা খুলে/বসে রও আপন ভুলে/যত বলি ঢের হয়েছে,/মানা না মানো।/ ভালোবাসার তুমি উঁ...উঁ...উঁ...।'

মুখে পাউডার-ক্রিম ইত্যাদি মাখা হয়ে গেলে চোখে কাজল পরতে শুরু করল। তারপর চোখের পাতার ওপরে রং ঘষতে লাগল। মুখ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানান দিক থেকে নিজের প্রসাধন আয়নায় পরখ করল।

প্রসাধনে সন্তুষ্ট হয়ে হাতে লিপস্টিক তুলে নিল ঝুমুর। লাল ডগাটা বের করে ঠোঁটে ঘষতে লাগল। এবং সোজা হয়ে দাঁড়াল। কয়েকবার কোমর বেঁকিয়ে-চুরিয়ে মেয়েলি নাচের ভঙ্গি করল। তারপর নাচের ভঙ্গিতে পা ফেলে এগিয়ে এল অসহায় রক্তাক্ত সুপ্রতিমের দিকে।

সুপ্রতিম শুয়ে-শুয়েই স্নো-পাউডারের গন্ধ পেল।

সুপ্রতিমের ঠোঁটে, মুখে, বুকে লিপস্টিক ঘষে দিল ঝুমুর। তারপর লিপস্টিক ছুড়ে ফেলে দিয়ে ওকে কষে চটকাতে লাগল, আর জড়ানো গলায় বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'আমি তোমায় বড় ভালোবাসি/তোমায় বড় ভালোবাসি...আমি তোমায় বড় ভালোবাসি...।'

সুপ্রতিম ভাবছিল, ও কি বেঁচে আছে? এই ঘটনাগুলো কি সত্যি? না কি দুঃস্বপ্ন!

'বলো, তুমি আমায় ভালোবাসো। একবার বলো, আমায় ভালোবাসো। তুমি আমার— আর কারও নয়। শুধু একবার বলো...।'

অসুস্থ উন্মত্ত ছেলেটা সুপ্রতিমের জামা সরিয়ে দিয়ে খোলা বুকে মুখ ঘষছে। ঠোঁটে, গালে, চোখে যথেচ্ছ চুমু খাচ্ছে। হাতড়াচ্ছে যেখানে-সেখানে। আর অনর্গল ভালোবাসার কথা বলছে।

ঝুমুর ওর প্যান্টের বোতাম খোলা শুরু করতেই সুপ্রতিম চাপা চিৎকার করে উঠল।

'কী, কষ্ট হচ্ছে?' ঝুমুর নিষ্পাপ স্বরে জিগ্যেস করল, 'তুমি শুধু একবার বলো, আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসবে...তা হলেই তোমার সব বাঁধন খুলে দেব। তুমি শুধু আমায় একটা চুমু খাও...একটা...তা হলেই আমি তোমার ক্রীতদাস হয়ে যাব।...শুধু একবার...।'

সুপ্রতিমের গলা দিয়ে বমি উঠে আসতে চাইছিল। কিন্তু গলা ফাঁক হয়ে যাওয়ার চেয়ে সেটা অনেক ভালো। ওর মনে হচ্ছিল, ও বোধহয় এখনই অজ্ঞান হয়ে যাবে। কিছু একটা করা দরকার, কিছু একটা করা দরকার...।

দাঁতে দাঁত চেপে সুপ্রতিম কোনোরকমে বলল, 'আমিও তোমাকে ভালোবাসি, ঝুমুর।'

প্যান্টের জিপার খুলতে গিয়ে ঝুমুরের হাত থেমে গেল। ও আদুরে গলায় বলল, 'কী বললে গো? আর-একবার বলো। প্লিজ...।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি। আরও ভালোবাসতে চাই।...আমার বাঁধনগুলো খুলে দাও, প্লিজ...।' কথা বলতে গিয়ে সুপ্রতিমের দম আটকে যাচ্ছিল।

ছিলে-ছেঁড়া-ধনুকের মতো চট করে উঠে পড়ল ঝুমুর। হাঁফাতে-হাঁফাতে সুপ্রতিমের বাঁধন খুলতে শুরু করল। উত্তেজনায় ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

বাঁধন খোলা হতেই সুপ্রতিমের কপালে হাত বুলিয়ে নরম সুরে ঝুমুর বলল, 'নাও, এবার ওঠো।'

ক্লান্ত শরীর নিয়ে উঠে বসল সুপ্রতিম। কাটা জায়গাগুলো ভীষণ জ্বালা করছে।

ঝুমুরের আর তর সইছিল না। ও সুপ্রতিমের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। ওর কোলে উঠে বসল একেবারে।

সুপ্রতিমের মনে হল একটা কোলাব্যাঙ ওর কোলে বসে আছে। কিন্তু বাঁচার তাগিদে ও ঝুমুরকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে-গালে চুমু খেল। বিড়বিড় করে বলল, 'আই লাভ য়ু, ঝুমুর...।'

শরীরের ভেতর থেকে উঠে আসা বমির দমক রুখে দিয়ে সুপ্রতিম ভাবল, নয়না এখনও আসছে না কেন।

আর ঠিক তখনই ঝুমুরের নগ্ন কাঁধের ওপর দিয়ে সোফার ওপরে পড়ে থাকা ক্ষুরটা ও দেখতে পেল। হাতের প্রায় নাগাল রয়েছে ওটা।

ঝুমুরকে জড়িয়ে ধরে কোনোরকমে হাঁটুগেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সুপ্রতিম। পলকা ছেলেটা সুপ্রতিমের আশ্লেষে আনন্দে টইটম্বুর হয়ে ভালোবাসার প্রলাপ বকছে শুধু। আর সুপ্রতিম নিজের প্রাণ বাঁচাতে একের-পর-এক চুমু খেয়ে চলেছে ওর স্নো-পাউডার মাখা মুখে।

ক্ষুরটা এখন পুরোপুরি সুপ্রতিমের হাতের নাগালে।

ও মুঠো করে অস্ত্রটা ধরল। তারপর ঝুমুরকে আদর করতে-করতে ক্ষুরটা নিয়ে এল ওর গলার খাঁজের কাছে।

কতক্ষণ আর সুপ্রতিমের শক্তি থাকবে কে জানে! মাথা ঝিমঝিম করছে। রক্তে চটচট করছে হাত-পা-বুক।

চুলোয় যাক ভদ্রতা, সভ্যতা, নীতি, দয়া ইত্যাদি।

আত্মরক্ষা মানুষের একটা আদিম ধর্ম।

বাঁহাতে ঝুমুরের মাথাটা পিছনে ঠেলে দিয়েই ডান-হাতে ক্ষুর টেনে দিল সুপ্রতিম।

ঝুমুরের ভালোবাসার প্রলাপ মাঝপথেই থেমে গেল। তার বদলে ঘরঘর শব্দ বেরোতে লাগল মুখ আর গলা দিয়ে।

রক্তে মুখ-গলা-বুক ভেসে গেল সুপ্রতিমের। ওর মুখ দিয়ে একটা বিচিত্র শব্দ বেরিয়ে এল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই ও জ্ঞান হারিয়ে কাত হয়ে পড়ল মেঝেতে। ঝুমুরের মৃতদেহ তখনও ওকে আঁকড়ে ধরে ছিল।

একটি অচেতন দেহ ও একটি মৃতদেহ অসাড় হয়ে নয়না অথবা আর কারও জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

রক্তের ধারা তখন মেঝেতে গড়িয়ে-গড়িয়ে সময়ের হিসেব রাখছিল।

একটি খুনের গল্প

প্রচেত গুপ্ত



কাজটা গোপালবাবু সাবধানে এবং ঠান্ডা মাথায় করবেন বলে ঠিক করেছেন । চল্লিশের কাছাকাছি বয়স হয়ে গেলে যে-কোনও কাজই সাবধানে এবং ঠান্ডা মাথায় করা উচিত । এক-পা ফেলার আগে দশবার ভাবা উচিত । এই কাজের বেলায় গোপাল সান্যাল ভেবেছেন একশোবার । তার পরও বারবার পিছিয়ে এসেছেন । তার কারণ কাজটা কঠিন । শেষ পর্যন্ত সুযোগ এসেছে । গোপালবাবু নিখুঁতভাবে সেই সুযোগ কাজে লাগাতে চান ।

গোপালবাবু প্রথমে ভেবেছিলেন, কাজ করাবেন 'প্রফেশনাল' দিয়ে । পেশাদার খুনি । সুপারি কিলার । সেইমতো একজনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন । সেই লোকের বায়োডাটা ভালো । এই লাইনে দীর্ঘদিন আছে । পয়সা বেশি নেয় তবে কাজে ত্রুটি রাখে না । গোপালবাবু তবু অতিরিক্ত সাবধান হয়েছিলেন । বড় লেভেলের চেনাজানা ধরে সেই লোকের কাছে হাজির হলেন । লোকটার নিতাই নাম । চেহারা চকচকে, গোলগাল । পরনে ধুতি, গায়ে উড়নি । পেট পর্যন্ত লম্বা পৈতে, গলায় কণ্ঠির মালা । কপালে মাটি লেপটানো চন্দন । এই ধরনের লোক ধুতি, উড়নি, মাটির টিপ পরে থাকলে মনে হয় ভান করছে । সাজানো ভক্ত । গোপালবাবু গোড়াতে সেরকম ভেবেছিলেন । পরে জানলেন, ঘটনা সেরকম নয় । নিতাই সত্যিকারের একজন ভক্ত মানুষ । বেলা পর্যন্ত পুজোআচ্চা নিয়ে থাকে । সন্ধেতে নামগান । নামগান শেষে শনিবার শনিবার করে বাতাসা বিতরণ । ঠিক বিতরণ নয়, কাঁসার জাম বাটি থেকে মুঠো করে বাতাসা নিয়ে ওপরে ছুড়ে দেওয়া হয় । একেই সম্ভবত হরির লুট বলে । না ভেঙে আস্ত বাতাসা লোফা বিশেষ পুণ্যির বিষয় ।

বিহার, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড— তিন জায়গায় নিতাইয়ের লোক আছে । সপ্তাহের মাঝামাঝি এলে তারা শনিবার পর্যন্ত থেকে যায় । একেবারে 'কাজ' সেরে হরির লুটের বাতাসা নিয়ে দেশে ফেরে । 'সুপারি' নেওয়ার সময় নিতাই পার্টির সঙ্গে চট করে দেখা করে না । সেটাই স্বাভাবিক এবং উচিত । এই কাজে রিস্ক খুব । পুলিশের খোঁচড় পার্টি সেজে ঢুকে পড়ে । তাই সোর্সের ব্যবস্থা আছে । সোর্স ধরে নিতাইয়ের কাছে পৌঁছোতে হয় । শুধু সোর্স ধরলে হবে না । সোর্সের কাছ থেকে কোড জেনে আসতে হয় । পাসওয়ার্ড । সকাল বিকেল নিতাই কোড বদলায় । গোপালবাবু সোর্স ধরলেন, বড় লেভেলের চেনাজানা ধরলেন এবং সবশেষে 'কোড' জেনে তবে নিতাইয়ের কাছে পৌঁছলেন । সেদিন সকালে কোড ছিল, 'চিনি বেশি খাই । চায়ে দু-চামচ চিনি দিতে বলবেন ।' দুপুরের পর কোড বদলে গেল । তখন কোড হল, 'চিনি খাই না । সুগার আছে । চিনি ছাড়া চা বলুন ।'

গোপালবাবু এলেন বিকেলে । নিতাই খাতির করে বসাল । খুন-জখম অপহরণ যাই হোক, পার্টি তো । পার্টি মানে লক্ষ্মী ।

‘কী খাবেন? শরবত দিতে বলি? এরা আম পোড়া শরবত ভালো করে ।’

গোপালবাবু বললেন, ‘না, শরবত নয় । চিনি খাই না । সুগার আছে । আপনি বরং এক কাপ চা বলুন । চিনি ছাড়া’ ।

চায়ের অর্ডার দিয়ে নিতাই বলল, ‘পাখির বয়স কত?’

গোপালবাবু বললেন, ‘আমার বয়স । একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম । কয়েকমাসের এদিক-ওদিক হতে পারে ।’

‘স্বভাবচরিত্র কেমন? চালাক না বুদ্ধিমান?’

গোপালবাবু প্রশ্নটা বুঝতে পারলেন না । একটু থতমত খেয়ে বললেন, ‘চালাক না বুদ্ধিমান মানে!’

নিতাই শান্ত ভঙ্গিতে বলল, ‘চালাক পাখি মারবার একরকম কায়দা, বুদ্ধিমান পাখি মারবার আরেকরকম কায়দা । চালাক পাখি আকাশে উড়তে উড়তে ভল্ট দেয় । ভাবে এতে শিকারির গুলি ফসকে যাবে । বোকা জানে না শিকারি সবসময় পাখির ভল্ট হিসেব করেই গুলি ছোঁড়ে । যাকে দুই ভল্টে মারবে তাকে সেই কায়দায় গুলি, যাকে আড়াইতে মারবে তাকে সেই কায়দায় । বুদ্ধিমান পাখি এটা জানে । তাই তার ডিগবাজি ফাজিতে না গিয়ে স্ট্রেট উড়ে যায় । শিকারির হিসেব গুলিয়ে দেয় । সে ডিগবাজির হিসেব করে গুলি ছোড়ে, সেই গুলি গায়ে লাগে না । তাই বুদ্ধিমান পাখিকে গুলি করতে হয় ভেবেচিন্তে ।

গোপালবাবু খুশি হলেন । তিনি ঠিক লোকের কাছে এসেছেন । চালাক, বুদ্ধিমানে ফারাক করা সহজ কথা নয় । খুব কম লোক পারে । এই লোক তাদের একজন । গোপালবাবু বললেন, ‘ভবেশ চালাক বা বুদ্ধিমান কোনওটাই নয় । সে বোকা । সহজ সরল প্যাটার্নের ।’

নিতাই ভুরু কুঁচকে বলল, ‘ভবেশ! পাখির নাম?’

গোপালবাবু মাথা নাড়িয়ে বললেন, ‘হ্যাঁ, ভবেশ পোড়েল ।’

নিতাই ইন্টারোগেশনের কায়দায় বলল, ‘ভবেশ পোড়েলকে আপনার সহজ সরল কেন মনে হয়?’

গোপালবাবু মুখ তুলে সামান্য হাসলেন । বললেন, ‘ভবেশ আমার শুধু ছোটবেলার বন্ধু নয়, বারো বছরের বিজনেস পার্টনার । সে বোকা না চালাক, আমি জানব না? তার মানুষকে বিশ্বাস করবার অভ্যেস আছে । বোকা অভ্যেস ।’

নিতাই গোপালবাবুর চোখের ওপর চোখ রেখে বলল, ‘আপনাকে বিশ্বাস করে?’

গোপালবাবু চুপ করে রইলেন । কী উত্তর দেবেন? ভবেশ তাকে শুধু বিশ্বাস করে না, বাড়াবাড়ি ধরনের বিশ্বাস করে । না করলে কি আর এভাবে টানা পাঁচ বছর বিজনেস থেকে লাভের অংশ সরিয়ে রাখতে পারতেন? হিসেবপত্র দেখতে বললে গাধাটা বলে, আমি ওসব হিসেব টিসেবে নেই গোপাল । বিজনেস শুরুর সময়ই তো কথা হয়ে গিয়েছিল বাপু, গায়ে গতরে খাটব আমি, অফিসে বসে কাগজপত্র নিয়ে কর্মকাণ্ড তোর । সেই মতো আমি ঘুরে ঘুরে অর্ডার আনি, তুই হিসেব করিস ।’

পার্টনারশিপ ব্যবসার শুরুতে এসব নেকা কথা হতে পারে । পরে হয় না । লাভ আসতে শুরু করলে তো একেবারেই হয় না । ব্যবসায় বাপও নিজের ছেলেকে বিশ্বাস করে না । তবে এখানে শুধু কি আর ব্যবসা? আর কিছু নেই? হ্যাঁ, আছে । আরও বিশ্বাসের ব্যাপার আছে । সেই ব্যাপারের নাম মন্দিরা । ভবেশের বউ । গোপালবাবুর সঙ্গে মন্দিরার আলাপ ভবেশের বিয়ের সময়ে । পাত্রী ফাইনালের সময় গোপালবাবু নিজে উপস্থিত ছিলেন । পরে বিয়ের যাবতীয় ব্যবস্থা, কেনাকাটা, খাটাখাটনি সবই করেছেন । এমনকী ফুলশয্যার খাট পর্যন্ত নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সাজিয়েছিলেন। সবাই বলেছিল, বন্ধুর বিয়ে দিয়ে গোপাল হাত পাকাচ্ছে । এরপর নিজে বিয়ে করবে । এখন স্টেজ রিহার্সাল চলছে ।

বিয়ের বছর খানেক পর মন্দিরা বলল, গোপালদা, এবার আপনি বিয়ে করুন ।’

গোপালবাবু বললেন, ‘কেন? তোমার সমস্যা কী বাপু । নিজেরা বিপদে পড়ে এখন আমাকে ফেলতে চাইছ?’

মন্দিরা হেসে বলল, ‘বাঃ বয়েস হয়ে যাচ্ছে না । বিয়ে না করলে চলবে?’

গোপালবাবুও হেসে বললেন, 'বেশ তো চলছে। খুব ভালো চলছে। স্বাধীন, ফুরফুরে। রোজগার করছি, খাচ্ছিদাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি।'

মন্দিরার গায়ের রং কালোর দিকে হলেও একধরনের সৌন্দর্য আছে। চোখা সৌন্দর্য। চোখে মুখে বুদ্ধির ভাব। শুধু ভাব নয়, গোপালবাবুর বিশ্বাস মেয়েটার সত্যি বুদ্ধি আছে। রূপবতী থেকে বুদ্ধিমতী মেয়ে তার সবসময়েই বেশি পছন্দ। এই কারণে গোড়া থেকেই তিনি বন্ধুর পত্নীকে বেশি নম্বর দেন। মন্দিরা চোখ কপালে তুলে, নাটকীয় গলায় বলল, 'এটা কি চলা হল নাকি? হোটেলে তেল ঝাল মশলার খাবার খাচ্ছেন, যখন খুশি বাড়ি যাচ্ছেন। অসুখ-বিসুখ করলে দেখার লোক পর্যন্ত নেই। ভগবান না করুন, যদি সেরকম কিছু হয় কী হবে একবার ভেবে দেখেছেন?'

গোপালবাবু হেসে বললেন, 'কবে অসুখ করবে তার জন্য এখন থেকে বিয়ে করে বসে থাকতে হবে? অসুখ সামলাতে মানুষ ইনসিওরেন্স করে শুনেছি। হেলথ ইনসিওরেন্স। বিয়ে করে বলে তো শুনিনি।'

'ঠাট্টা করবেন না গোপালদা। বিয়েটা সত্যি করে নিন। আপনার জন্য না করলে অন্তত আমার জন্য করুন।'

গোপালবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'তোমার জন্য আমি বিয়ে করব! কথাটার মানে কী! তোমার কি মাথা খারাপ হল নাকি!'

মন্দিরা গোপালবাবুর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নিল। বলল, 'আমার একজন সঙ্গী দরকার। আপনার বিয়ে হলে আপনার গিন্নি আমার সঙ্গী হবে। তার সঙ্গে গল্প করব, শপিং করব, সিনেমায় যাব। সারাদিন একা থাকি। আপনার বন্ধু তো মাসের আদ্দেক দিন বাইরে বাইরে ঘোরে।'

গোপালবাবু খুব একচোট হাসলেন। বললেন, 'ও এই কথা। সেটা আগে বলবে তো। আসলে ভবেশ বিজনেসের জন্য ট্যুরে যায় বলে তোমার প্রবলেম হচ্ছে। ইউ ফিল লোনলি। আজই আমি ওকে বলব, এবার থেকে তুই অফিসে থাকবি, বাইরের কাজ আমি করব। বিয়ে করা থেকে বাইরে ঘুরে কাজ করা অনেক সহজ। ভবেশকে দেখে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।'

কথাটা বলে আবার এক চোট হাসলেন গোপালবাবু।

মন্দিরা ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'দেখুন যদি পারেন। মনে হয় না পারবেন।'

মন্দিরাই ঠিক বলেছে। গোপালবাবু বন্ধুকে রাজি করাতে পারলেন না। ভবেশ পোড়েল হাত-পা ছুড়ে বললেন, 'খেপেছিস! ওসব ঘরে বসা কাজে আমি নেই। তাহলে রইল তোর বিজনেস, আমি চললাম।'

গোপালবাবু বললেন, 'আহা, তুই মন্দিরার কথাটা তো একবার ভেবে দেখবি। বেচারির একা লাগে।'

ভবেশ পোড়েল তেড়ে ফুঁড়ে বললেন, 'এ আর কেমন কথা। বিয়ের আগে জানত না, আমাকে বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়? ওটাই আমার কাজ। ওর কথা বাদ দে তো। অনেকদিন পরে বিজনেস খানিকটা স্পিড পেয়েছে। কোম্পানির নামডাক হয়েছে। এখন যত অর্ডার ধরে আনতে পারব তত লাভ। এখন ঘরে বসে বউয়ের সঙ্গে এক্কা দোক্কা খেলার সময় নয়।'

গোপালবাবু বোঝানোর চেষ্টা করলেন। বললেন, 'তবু, মেয়েটার কথা তো একটু ভাববি।'

গোপালবাবুকে থামিয়ে দিয়ে ভবেশ পোড়েল বললেন, 'ওসব ফালতু ভাবনা নিয়ে তুই বসে থাক। মন্দিরার একা লাগলে তুই সামলাবি। আমাকে টানবি না। আমাকে মন দিয়ে কাজ করতে দে।'

'তুই অকারণে উত্তেজিত হচ্ছিস। ব্যবসা তো আমিও করছি। মন দিয়েই করছি।'

ভবেশ পোড়েল হাত ছুঁড়ে বললেন, 'বলছি, তোর বিষয় তুই বোঝ। আমাকে জড়াবি না।'

গোপালবাবু নিজের 'বিষয়' নিজে বুঝলেন। শুধু গোপালবাবু নন, মন্দিরাও বুঝল। ভবেশ পোড়েল ট্যুরে গেলে গোপালবাবু মাঝে মধ্যে 'একা মন্দিরা'র কাছে চলে আসেন। গল্প করেন। ডিভিডি চালিয়ে সিনেমা দেখেন। উত্তম-সুচিত্রার সিনেমা। পথে হল দেরি, শেষ রক্ষা, শাপমোচন। মন্দিরা এটা সেটা করে এনে

গোপালবাবুর পাশে রাখে । গরম গরম বেগুনি, মাছের ডিমের বড়া, গাজরের হালুয়া । গোপালবাবু বলেন, ‘মন্দিরা তুমিও এসো না । আমার সঙ্গে সিনেমা দেখবে ।’

মন্দিরা হেসে বলে, ‘দাঁড়ান আসছি ।’

মন্দিরা ফিরে আসে । হাতে তোয়ালে সাবান । বলে ‘যান আগে বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে আসুন তো । অফিস করে এসেছেন । মাগো! গায়ে বিটকেল গন্ধ ।’

গোপালবাবু গদগদ গলায় বলেন, ‘স্নান করলে ভালো হত ।’

মন্দিরা স্বাভাবিক গলায় বলে, ‘ওমা করুন না । কে বারণ করেছে? আমাদের জলের কোনও প্রবলেম নেই । আপনি বরং এক কাজ করুন গোপালদা, আপনার বন্ধুর একটা লুঙ্গি নিয়ে যান । স্নান সেরে পরে নেবেন । হ্যাঙার দিচ্ছি নিজের প্যান্ট-শার্টটা ঝুলিয়ে রাখুন । বেরোবার সময় চেঞ্জ করে নেবেন । আর শুনুন মশাই, স্নানের পর একটু পাউডার ব্যবহার করতে শিখুন দেখি । বিয়ে করেননি বলে পাউডারও দূরে সরিয়ে রাখবেন নাকি?’

মন্দিরা হি হি করে হাসে । গোপালবাবুর ভালোই লাগে । স্নান সেরে, পাউডার মেখে তিনি বন্ধু ভবেশ পোড়েলের লুঙ্গি পরে সিনেমা দেখতে বসেন । মন্দিরা পাশে এসে বসে । নাক টেনে বলে, ‘আঃ, কী সুন্দর ।’

গোপালবাবু হেসে বলেন, ‘আমি নই, সুন্দর তোমার সাবান, পাউডার মন্দিরা ।’

মন্দিরা হাসতে হাসতে গোপালবাবুর গায়ে পড়ে যাওয়ার জোগাড় হয় । কিন্তু পড়ে না । কাঁধ, বুক, পেট, থাইয়ের ছোঁয়া লাগে । একটু নরম নরম, একটু পাপ পাপ, একটু শিরশিরানি । গোপালবাবু ভেতরে ভেতরে চমকে ওঠেন । নারী শরীর বুঝি এরকম! তিনি সরে বসবেন ভাবেন । সরেন না । ঠিক করেন, পরেরদিন হাসির কোনও সিনেমা আনবেন । মন্দিরা আবার হাসতে হাসতে গায়ে পড়বে ।

এই যে বউকে বন্ধুর হাতে রেখে ঘন ঘন বাইরে চলে যাওয়া এটাও কি ভবেশ পোড়েল এক ধরনের বিশ্বাস থেকে করে না? অবশ্যই করে । গোপালবাবু জানেন । এর জন্য মাঝেমধ্যে বন্ধুর ওপর তার রাগও হয় । তিনি মনে করেন, একে বলে গাধার বিশ্বাস ।

নিতাই বলল, ‘কী হল? বললেন না, আপনার বন্ধু আপনাকে বিশ্বাস করে?’

গোপালবাবু মুখ নামিয়ে বললেন, ‘হ্যাঁ, করে । খুবই করে । ভবেশকে কেন সরাতে চাইছি আপনি কি জানতে চান নিতাইবাবু?’

নিতাই মুখ দিয়ে চুকচুক ধরনের আওয়াজ করে বলল, ‘না । তাতে কাজের কোনও হেরফের হয় না । কারণ হাজারটা হতে পারে, কাজ একটাই । ধরুন, আপনি আপনার বন্ধুর বউকে নিয়ে ভাগতে চান সেই কারণে বন্ধুকে শেষ করতে চাইছেন । অথবা ব্যবসা থেকে দীর্ঘদিন টাকা সরিয়ে এখন ভয় পেয়ে গেছেন । বুঝতে পারছেন এবার পার্টনারকে ছিক করতে না পারলে বিপদ । সে ধরে ফেলবে ।’

কথাটা বলার সময় গলার কাছে হাত তুলে গলা কাটার ভঙ্গি করল নিতাই । তারপর আবার শুরু করল । ‘কিছু মনে করবেন না গোপালবাবু । কিছু না জেনে, দুটো কারণ বানিয়ে বললাম । এরকম আরও হাজারটা কারণ বলতে পারি । একে পুলিশের ভাষায় বলে মোটিফ । কজ অব ক্রাইম । আমাদের কজ জেনে লাভ নেই । কারণ বানানো হোক, কল্পনা হোক, সত্যি হোক, কাজের কোনও তফাত হবে না । গুলি চালালে গুলি, ছুরি চালালে ছুরি । সুতরাং আমরা কখনোই কারণ জানতে চাই না ।’

গোপালবাবুর চোখ কপালে ওঠার জোগাড় । তার বুকের ভেতরটা ধকধক করছে । নিতাই কারণ জানল কী করে! মনের কথা পড়তে পারে নাকি লোকটা? হয়তো পারে । এরা ভক্ত মানুষ । ধম্মকম্ম করে । কত রকম ক্ষমতা আছে কে জানে! একটা নয়, নিতাই যে দু-দুটো কারণ বলল, দুটোই ঠিক! তবে মন্দিরাকে নিয়ে পালানোর কোনও পরিকল্পনা নেই । রয়ে সয়ে বিয়ে করার পরিকল্পনা আছে । পরিকল্পনার কথা মন্দিরা কিছু জানে না । তাকে বলাও হয়নি । স্বামীর মৃত্যুর পর বছরখানেক শোকের মধ্যে থাকুক । তারপর ঝোপ

বুঝে বললেই চলবে। তাড়াহুড়ো করলে মন্দিরা সন্দেহ করবে। তবে ঘটনার কয়েকমাস পরই ওকে ব্যবসায় পার্টনার করে নেওয়ার কথা ভাবা হয়ে গেছে। ভবেশ পোড়েলের জায়গায়। সহানুভূতি পার্টনার। বাইরের লোক খুশি হবে। বলবে, মানুষটা বন্ধুকে সত্যি ভালোবাসত। চিন্তা একটাই। মন্দিরা বিজনেসের কাজ কতটা পারবে? কেনই বা পারবে না? মেয়েরা আজকাল সব পারে। তাছাড়া মন্দিরা বুদ্ধিমতী। তার সবকাজেই ইন্টারেস্ট আছে। ব্যবসাতেও আছে। ইতিমধ্যেএকটু-আধটু জানতে শুরু করেছে। লাভ কত? লোকসান কত? এইসব।

গোপালবাবু একদিন জিগ্যেস করলেন, 'ব্যবসার লাভ-লোকসানের খবর নিয়ে তোমার লাভ কী মন্দিরা?'

মন্দিরা দু-হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙে। তার আড়মোড়া ভাঙা নিয়ে গোপালবাবুর আগে কখনও মাথা ব্যথা ছিল না। আড়মোড়া ভাঙা কোনও মাথাব্যথার জিনিস নয়। কেন জানি ইদানীং হয়েছে। মন্দিরা দু-হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলেই আড়চোখে দেখতে ইচ্ছে করে।

মন্দিরা বলল, 'বাঃ, সতীন কেমন জানব না?'

গোপালবাবু বোকার মতো হেসে বললেন, 'সতীন! সতীনটা আবার কে?'

'আপনাদের ওই পোড়ার ছাই ব্যবসাই তো আমার সতীন। যার জন্য স্বামী হারিয়ে বসে আছি।'

এই কথায় গোপালবাবু মজা পেয়েছিলেন।

নিতাই বলল, 'নিন চা খান।' গোপালবাবু চায়ের কাপ হাতে নিলেন, কিন্তু মুখে দিলেন না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে নিতাই বলল, 'এই কাজের খরচখরচা সম্পর্কে কিছু জানা আছে আপনার? কোনও আইডিয়া?'

গোপালবাবু দুপাশে আলতো মাথা নাড়লেন। নিতাই বলল, 'তা তো ঠিকই। আইডিয়া হবে কী করে। এ তো কাগজে, টিভিতে বিজ্ঞাপন হয় না। যাক ওসব কথা। আপনি জানাশোনা ধরে আমার কাছে এসেছেন। সাধারণ জানাশোনা নয়। হাই লেভেল জানাশোনা। আগেই খরচাপাতির কথা আপনার জেনে রাখা ভালো। দেখুন গোপালবাবু, এইসব কেসে খরচ অনেক। যারা বলে আজকাল কম পয়সাতেই মানুষ মারা যায় তারা ফালতু কথা বলে। ঠাকুরের কৃপায় সব ভালোয় ভালোয় হয়ে গেল তো ঠিক আছে, গোলমাল কিছু হলে কিন্তু খরচ ডবল।'

গোপালবাবু বললেন, 'গোলমাল মানে?'

নিতাই চোখের পাতা না ফেলে তাকিয়ে বলল, 'ধরুন, শিকারি ধরা পড়ে গেল। তখন পুলিশ কান টানতে টানতে মাথা পর্যন্ত যাবে। একসময় আপনাকে ধরেও ফেলবে। সেই মামলা আপনাকে লড়তে হবে। তার জন্য টাকা আলাদা করে রাখতে হবে। আপনি তো তখন বলতে পারবেন না, নিতাইবাবু আমাকে আগে বলেনি, আমিও টাকা সরিয়ে রাখিনি। এখন আমার টাকা নেই, আমি মামলা লড়তে পারব না। আমি জেলে পচে মরব। কি পারবেন বলতে?'

গোপালবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'ভয় দেখাচ্ছেন?'

নিতাই বলল, 'হ্যাঁ।'

'তাহলে কী করতে বলছেন।'

এবার চায়ের কাপে চুমুক দিলেন গোপালবাবু। চা ঠান্ডা জল হয়ে গেছে। সেই জলই গোপালবাবু খেতে লাগলেন ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে। যেন খুব গরম।

নিতাই স্বাভাবিক গলায় বলল, 'কাজটা নিজে করুন।'

হাত কেঁপে উঠল গোপালবাবুর। চা চলকে পড়ল টেবিলে। বললেন, 'নিজে করব!'

নিতাই ঠান্ডা গলায় বলল, 'হ্যাঁ, নিজে করবেন। শিকার বিশ্বাস করলে এবং বোকা হলে কাজ অনেক সহজ। জলের মতো। খরচও বেঁচে যাবে। সব থেকে বড় কথা কী জানেন গোপালবাবু?'

'কী?'

নিতাই সামান্য হেসে বলল, 'নিজে কাজ করলে ধরা পড়বার রিস্ক কমে যায় । মাঝখানে কান থাকে না । টান দিয়ে মাথা পাওয়া যাবে না । তদন্তে নেমে পুলিশ জলে পড়ে । একজনও সঙ্গে না থাকলে সব থেকে ভালো । আপনি হাই লেভেলের চেনাজানা ধরে আমার কাছে এসেছেন । তাই এত কথা বলছি । ছোট লেভেলে চেনাজানা হলে বলতাম না । নিজের ব্যবসা নষ্ট করতাম না । দেখুন, দুদিন ভাবনাচিন্তা করুন । যদি না পারেন, যদি সাহসে না কুলোয় আবার আমার কাছে আসবেন । আমি তো রইলাম । আর হ্যাঁ, আসার আগে নতুন কোডটা জেনে আসবেন । মাপ করবেন, আজ আমায় উঠতে হবে । আমার নামগানের সময় হয়ে গেল ।'

গোপালবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'আবার কোড লাগবে কেন? আমার মুখ তো চিনে রাখলেন ।'

নিতাই উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে হাসল । বলল, 'মুখ এক থাকে, কিন্তু মানুষটা বদলে যায় । সেই কারণে কোড লাগবে ।'

দুদিন নয়, গোপালবাবু একদিন ভেবেই সিদ্ধান্ত নিলেন, কাজ তিনি নিজে করবেন । কিন্তু কীভাবে? গুলি করে মারবেন? কোথায় নিয়ে গিয়ে গুলি করবেন? ময়দানে? দূর এসব নাটক, সিনেমায় হয় । আচ্ছা, মন্দিরাকে কাজে লাগালে কেমন হয়? ধরা যাক বিষের ব্যবস্থা করা হল । ভবেশের খাবারে মন্দিরা মিশিয়ে দেবে । না, এটাও গোলমালের । মন্দিরা সাক্ষী থেকে যাবে । তাছাড়া কথাটা মন্দিরা কীভাবে নেবে কে জানে! 'গোপালদা'র সঙ্গে ফাঁকা বাড়িতে হালকা পলকা ঘনিষ্ঠতা আছে ঠিকই, কিন্তু 'গোপালদা' যে তার স্বামীকে সরিয়ে তাকে বিয়ে করে সংসার পাতবে এখবর তার জানা নেই। জানার পর যদি বেঁকে বসে । যদি স্বামীকে বলে দেয়? থাক, মন্দিরা বাদ । তাহলে কীভাবে?

'কীভাবে' নিয়ে বেশি ভাবতে হল না গোপালবাবুকে । ভবেশ পোড়েল নিজেই পথ করে দিলেন । এক বিকেলে অফিসে বসে বললেন, 'গোপাল, এবার পাটনার ট্যুরটায় তুই আমার সঙ্গে যাবি ।'

গোপালবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'আমি ট্যুরে যাব! কেন?'

ভবেশ পোড়েল বললেন, 'আমাদের যে অর্ডার দেয়, তার সঙ্গে আলাপ করবি । ফেরার সময় রাঁচি হয়ে আসব । সেখানেও আলাপ করিয়ে দেব ।'

গোপালবাবু বললেন, 'আমি আলাপ করে কী করব?'

'শুধু পাটনার কোম্পানি নয়, এক-এক করে সবার সঙ্গেই তোর পরিচয় করিয়ে দেব । শিলিগুড়ি, আসানসোল, গুয়াহাটি ।'

গোপালবাবু চিন্তিত গলায় বললেন, 'কী ব্যাপার বল তো ভবেশ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না ।'

ভবেশ পোড়েল হেসে বললেন, 'দুম করে যদি মরে যাই তখন কী হবে? কীভাবে ব্যবসা চলবে? তার আগেই তোর সঙ্গে পার্টিদের আলাপ করিয়ে দিতে চাইছি ।'

গোপালবাবু চমকে উঠলেন । ভবেশ মরার কথা বলছে কেন! কিছু বুঝতে পেরেছে? নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'ছিঃ, এসব কী কথা । খামোকা মরবি কেন?'

ভবেশ পোড়েল আরও জোরে হাসলেন । বললেন, 'বাঃ, দুম করে মরতে পারি না? হার্ট অ্যাটাক কি আর বলে কয়ে হয়? তারপর ধর যদি অ্যাক্সিডেন্ট ট্যাক্সিডেন্ট কিছু ঘটে । সবসময়ই তো ট্রেনে যাতায়াত করছি । কতদিন মাঝরাতে গার্ডকে ম্যানেজ করে লুকিয়ে লুকিয়ে চলন্ত ট্রেনের দরজা খুলে সিগারেট টানি । হঠাৎ যদি পড়ে যাই । হা হা... ।'

গোপালবাবুর শরীর ঝিমঝিম করে উঠল । তিনি মাথা নামালেন । তার কি ভেতরে ভেতরে ঘাম হচ্ছে? চলন্ত ট্রেন থেকে পড়া... সত্যি যদি এমন ঘটে...যদি ফেলে দেওয়া হয় ...সবাই বলবে অ্যাক্সিডেন্ট... । মন্দিরা কী বলবে?

ভবেশ পোড়েল এগিয়ে এসে বন্ধুর কাঁধে হাত রাখলেন । বললেন, 'ঘাবড়ে গেলি নাকি?'

গোপালবাবু ঢোক গিলে বিড় বিড় করে বললেন, ‘এসব কী আজেবাজে বকছিস ভবেশ! মন্দিরা যদি শোনে?’

ভবেশ পোড়েল হেসে বললেন, ‘মন্দিরার জন্যই তো ভাবছি । ভাবছি, এবার ক’টাদিন ট্যুর থেকে সরে অফিসে বসে কাজ করব । বাড়িতে মন্দিরাকে টাইম দেব । ঘোরাঘুরির কাজ তুই সামলাবি । তুই বলেছিলি না?’

গোপালবাবু নিশ্চিন্ত হলেন । চওড়া হেসে বললেন, ‘এ তো খুব ভালো কথা । আগে:থেকেই তোর করা উচিত ছিল। কিছুদিন বাইরের কাজ তুই অফ কর । আপাতত আমি করে দিচ্ছি পরে অন্য কাউকে শিখিয়ে নেওয়া যাবে । আমাদের বিজনেসের তো এখন একটা গুড উইল তৈরি হয়ে গেছে । পাটনার টিকিট কাট । প্লেনে যাবি? চল প্লেনে যাই । তাড়াতাড়ি হবে ।’

ভবেশ পোড়েল নাক মুখ কুঁচকে বলল, ‘না, না, প্লেন-ফ্লেন নয়, ট্রেনে যাব । এসি টু-টায়ারে দুজনে আড্ডা মারতে মারতে চলে যাব ।’

দুই বন্ধুর ট্যুরের কথা শুনে মন্দিরা ঠোঁট ফোলাল । গোপালবাবুর সামনেই আবদার ধরল, ‘আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব ।’

ভবেশ পোড়েল রেগে গিয়ে বললেন, ‘পাগলামি কোরো না মন্দিরা । আমারা বেড়াতে যাচ্ছি না । কাজ করব ।’

মন্দিরা বলল, ‘তোমরা কাজ করবে, আমি বেড়াব ।’

ভবেশ পোড়েল আরও রেগে গেলেন । বললেন, ‘বোকার মতো কথা বলছ কেন? পাটনা শহর বেড়ানোর মতো কিছু জায়গা নয় । আমরা আগ্রা যচ্ছি না যে তুমি তাজমহলের সামনে গিয়ে বসে থাকবে ।’

গোপালবাবু বানিয়ে হাসলেন । বললেন, ‘আমরা তো দু-তিনদিনের মধ্যে চলে আসছি মন্দিরা । তাছাড়া এরপর থেকে তুমি তোমার পতিঠাকুরকে সবসময় পাশে পাবে । আমরা তার প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছি । উনি আমাকে কাজ বুঝিয়ে দেবেন । আগে যখন বলেছিলাম তখন শোনেনি । এখন বউয়ের জন্য মন কেমন করছে ।’

গোপালবাবু বোকা বোকা রসিকতা করে হাসলেন । মন্দিরা গজগজ করতে লাগল । এই রসিকতা তার পছন্দ হয়নি ।

দুই

রাত একটা বেজে দশ মিনিট । দশ না, বারো মিনিট । ট্রেন ছুটছে । ছুটছে দিগবিদিগ জ্ঞান হারিয়ে । দুই বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে খোলা দরজার সামনে । দুজনের হাতেই সিগারেট । হাওয়া ঢুকছে ঝড়ের মতো । কাচের ঘেরাটোপের ওপাশে এসি কোচের যাত্রীরা কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে । এমনকী কম্পার্টমেন্টের গার্ড পর্যন্ত । ফলে তাকে আর আলাদা করে ম্যানেজ করতে হয়নি । ভবেশ পোড়েলের পাঞ্জাবি উড়ছে ।

‘মনে আছে গোপাল, কলেজ জীবনে কেমন লোকাল ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকতাম?’

গোপালবাবু অন্যমনস্ক । বললেন, ‘মনে আছে । তখন এত রেসট্রিকশন ছিল না । এখন কত নিয়ম কানুন ।’

ভবেশ পোড়েল এক হাত দিয়ে দরজা ধরে আছেন । মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে আছেন বাইরে । অন্ধকারের দিকে । ট্রেনের সঙ্গে তার শরীরটা হালকা দুলছে । সিগারেট ধরা হাত দিয়ে মাথার চুল ঠিক করতে করতে বললেন, ‘রাখ তোর রেসট্রিকশন, মাঝরাতে ট্রেনের খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানার মতো আরাম আর কিছুতে নেই । আমি তো প্রতিবারই নিয়ম ভাঙি । একবার দু-হাজার টাকা ফাইন পর্যন্ত দিতে হয়েছিল । ট্যুর বন্ধ করলে এই একটা দুঃখ থাকবে ।’ একটু থামলেন ভবেশ, ফের গলার স্বর বদলে চাপা উত্তেজনা নিয়ে বললেন, ‘গোপাল, এইবার একটা ব্রিজ আসবে...দেখবি হাওয়াটা ঝট করে কেমন ঠান্ডা হয়ে যাবে... ।

নদীর হাওয়া তো । মিনিট দুয়েক অপেক্ষা কর । শেষ টান দিয়ে ব্রিজের ওপর থেকে নদীতে সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দেব... ।'

ঠিকই । দু-মিনিট মধ্যে ঝোড়ো বাতাস ঠান্ডা করে নদীর ওপর ট্রেন উঠে পড়ল । লোহা ইস্পাতের গমগম আওয়াজ ভেঙে ছুটতে লাগল স্পিড কমিয়ে । অন্ধকারে একটার পর একটা বিম সরে যাচ্ছে নকশার মতো । গোপালবাবু মনকে শক্ত করলেন । মনে মনে দ্রুত হিসেব কষে নিলেন । একটা বিমের পর অন্যটা আসছে সেকেন্ডেরও কম ব্যবধানে। এর অর্থ, একটা বিম লক্ষ্য করে কাজটা করতে হবে । তবেই পরেরটায় গিয়ে ধাক্কা লাগবে । ভালো হয় সরাসরি মাথাটা লাগলে । মুখ থেঁতলানো, ছিন্নভিন্ন বডি উদ্ধারের পরও চেনা যাবে না । বেশিরভাগ সময় বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে চালান হয়ে যায় । এই দেশে ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যুর ঘটনা রোজ বিশটা করে ঘটছে । তার বেশিও হতে পারে । কেউ খবর রাখে না । এখানে অবশ্য খবর রাখতে হবে । মন্দিরাকে এনে রেল পুলিশের মর্গে বডি আইডেনটিফাই করতে হবে । সরকারি খাতায় মৃত ঘোষণা না হলে পরে বিয়েতে ফ্যাকড়া হবে ।

সিগারেটে শেষ অংশ ঘন ঘন টান দিতে লাগলেন গোপালবাবু । কাজ হয়ে গেলে কি মন্দিরাকে একটা ফোন করা যাবে?

'মন্দিরা, আমি গোপালদা বলছি । ঘুমোচ্ছিলে? শোনো একটা খারাপ খবর আছে । মন শক্ত করো...খানিক আগে চলন্ত ট্রেনের দরজা খুলে ভবেশ সিগারেট খাচ্ছিল...ও নাকি প্রায়ই এই ছেলেমানুষিটা করত...মন শক্ত করো মন্দিরা...আমি তো আছি... ।'

ভবেশ পোড়েল খোলা দরজার দিকে একটু ঝুঁকে পড়লেন, 'ওই যে নদী, দেখ দেখ, ওই যে... ।'

এক হাতে দরজার শিক ধরে এক পা এগোলেন গোপালবাবু ।

আওয়াজ হল । ভারী কোনও জিনিস ছিটকে পড়লে যেমন হয় । তবে ব্রিজের গমগম আওয়াজের তলায় সেই চাপা আওয়াজ চাপাও পড়ল খুব সহজে ।

শান্তভাবে লোহার ভারী দরজাটা আটকালেন ভবেশ পোড়েল । লক তুললেন । ছিটকিনি লাগালেন । রুমাল বের করে হাত মুছলেন । তারপর মোবাইলের নম্বর টিপলেন ।

'হ্যালো, মন্দিরা? ঘুমিয়ে পড়োনি তো? হ্যাঁ, কাজ হয়ে গেছে ।'

বোবা রাজপুত্র

সৈকত মুখোপাধ্যায়



জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল মুনিয়া। ঘরে এখন সে একা। কৌশিক বিকেল হতেই সেই যে কোথায় টহল মারতে বেরিয়েছে, এখনও ফেরার নাম নেই। অবশ্য বিয়ের পর থেকে গত চারবছরে একা থাকতেই সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। রাতে শোয়ার সময়টুকু ছাড়া কৌশিকের সঙ্গে তার দেখা হয় না, তা সে আসানসোলে নিজের বাড়িতেই হোক বা এই তুষকাঠি গ্রামের বাপের বাড়িতে। কৌশিক এইরকমই। নির্মম। ধান্দাবাজ।

জানলা দিয়ে অজয় নদের বালির চড়া দেখতে পাচ্ছিল মুনিয়া। রাত বেশি হয়নি, হয়তো সন্ধে সাতটা হবে। তবু এর মধ্যেই নদীর বুকে ঘন হয়ে উঠেছিল কুয়াশার চাদর।

হঠাৎ কানের কাছে বীভৎস এক চিৎকারে মুনিয়ার বুকটা কেঁপে উঠল। উঃ, বাবা গো, বলে সে তাড়াতাড়ি জানলার সামনে থেকে পিছিয়ে এল। খুব কাছেই কোথাও ডাকছে শিয়ালগুলো। এখন জন্তুগুলোকে দেখা যাচ্ছে না, তবে কাল ওদের দেখেছিল মুনিয়া। কাল গভীর রাতে।

সেই কথা মনে পড়তেই আবার একটা তীব্র অস্বস্তি তার বুকে পাথরের মতন চেপে বসল। কাল পাশের বাড়ির রঞ্জুদা শিবাভোগ দিচ্ছিল। এই জানলায় দাঁড়িয়েই মুনিয়া চাঁদের আলোয় ওকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। মুনিয়ার বাড়ি আর রঞ্জুদাদের বাড়ির মাঝখানে যে বাগানটা, সেটার বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে রঞ্জুদা প্রসাদের মন্ড ছুড়ে দিচ্ছিল অন্ধকারে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকা শেয়ালগুলোর দিকে। হুটোপাটি লেগে গিয়েছিল জন্তুগুলোর মধ্যে। জোড়ায় জোড়ায় জ্বলন্ত চোখ ছুটে বেড়াচ্ছিল ওকে ঘিরে। আজকেও রঞ্জুদা শিবাভোগ দেবে নিশ্চয়। রাতচরা জন্তুগুলো ওর প্রতীক্ষাতেই ঘোরাফেরা করছে ওদের বাড়ির আশেপাশে, আর মুনিয়ার বুক কাঁপিয়ে দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ ডেকে উঠছে উল্লাসে।

জানলার ধার থেকে সরে গিয়ে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মুনিয়া। চোখটা বার বার জলে ভরে উঠছিল তার। মনে মনে সে ভাবছিল— এ কী হল! রঞ্জুদা সন্ন্যাসী? খ্যাপা? উদাসীন? রঞ্জুদা পাগল হয়ে গেছে?

মুনিয়ার মনে পড়ল, ছোটবেলায় তার ঠাকুমাকে প্রায়ই একটা কথা বলতে শুনত। মেয়েরা বিয়ের পর প্রথমবার বাপের বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সময় যে আকুল কান্নাটা কাঁদে, তার মধ্যে না কি আসলে অনেকগুলো কান্না আলাদা-আলাদাভাবে মিশে থাকে। একদম ঠিক। মুনিয়া যখন এই তুষকাঠি ছেড়ে কৌশিকের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে আসানসোলের দিকে রওনা হয়েছিল, তখন সে-ও কেঁদেছিল। মায়ের বুকে মুখ গুঁজে দিয়ে ফুলে ফুলে কেঁদেছিল অনেকক্ষণ ধরে। আর কেউ না জানুক, সে নিজে তো জানে, সেই

কান্নার মধ্যে অনেকটাই ছিল রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মুখচোরা ছেলের জন্যে, যে কোনোদিন তাকে সাহস করে বলে উঠতে পারল না, ভালোবাসি । সেই ছেলেটার নাম রঞ্জন ভট্টাচার্য, ডাকনাম রঞ্জু ।

মুখচোরা রঞ্জুদা সময় থাকতে তাকে বলতেই পারল না ভালোবাসার কথা । না বললে মুনিয়া বুঝবে কেমন করে? অথচ কত সুযোগ ছিল ওর । একদম পাশের বাড়ির ছেলে, তাই ছোটবেলা থেকেই মুনিয়াদের বাড়িতে রঞ্জনের অবাধ যাওয়া-আসা । গাঁ-গঞ্জে একটা কাঁচা-বয়সের মেয়ের কাছাকাছি পৌঁছনোর মধ্যে যে হাজারটা বিধি নিষেধ থাকে, রঞ্জনের ক্ষেত্রে তা তো একবারেই ছিল না । তবু ও কিছু বলতে পারল না ।

এত কেয়ারিং ছিল রঞ্জুদা । এত আগলে আগলে রাখত মুনিয়াকে ছোটবেলা থেকে ।

আর তার বদলে ও কী করেছে?

এত দুঃখের মধ্যেও ছোটবেলার সেই সব বদমায়েশির কথা ভেবে মুনিয়ার ঠোঁটে একটা আলগা হাসি ফুটে উঠল। রঞ্জুদার সঙ্গে তার মেলামেশার ইতিহাস আসলে লাগাতার অ্যাডাম-টিজিং-এর ইতিহাস । খুব ছোটবেলায় পিঠে কালি ছিটিয়ে দেওয়া, চুলে বাঘনখ ফল কিংবা চুইংগাম চিপকে দেওয়া । আর একটু বড় হলে, গ্রামের অন্য মেয়েদের সামনে ওকে আজেবাজে নাম ধরে ডাকা, কিংবা সাইকেলের পাম্প খুলে দেওয়া । ও কিন্তু কোনোদিন মুনিয়ার নামে কাউকে নালিশ করেনি । বরং মুনিয়াই করেছিল ওর নামে নালিশ । অতিচালাকের ছদ্মবেশের আড়ালে সে নিজে যে আসলে কী ভীষণ কী ভীষণ বোকা, সে কথা ভেবে আজ এতদিন বাদেও কানদুটো লাল হয়ে উঠল মুনিয়ার ।

নালিশ করেছিল কেন? রঞ্জুদা তার ফোটো চুরি করেছিল বলে । একটা গ্রুপ ফোটো । বন্ধুদের সঙ্গে কলেজ পিকনিকে গিয়ে তোলা । খাটের ওপর রেখে গিয়েছিল, তারপর থেকে আর খুঁজে পাচ্ছিল না । প্রায় ভুলেই গিয়েছিল ফোটোটার কথা । হঠাৎই একদিন রঞ্জুদার পড়ার ঘরে ঢুকে দেখে সেই ছেলে টেবিলে বসে মাথা ঝুঁকিয়ে মন দিয়ে কী যেন দেখছে । পেছন থেকে পা টিপে টিপে গিয়ে উঁকি মেরে মুনিয়া দ্যাখে তাদের সেই গ্রুপ ফোটোটা । মুনিয়া তৎক্ষণাৎ চেঁচিয়ে তাদের বাড়ি এবং রঞ্জনদের বাড়ি দুটো বাড়িই মাথায় তুলেছিল ।

রঞ্জন সে দিন ওর হাতে পায়ে ধরতে বাকি রেখেছিল । কিন্তু মুনিয়া ছাড়বে কেন? সে অনেকদিন ধরেই সন্দেহ করছিল ওর বন্ধু তপতীর প্রতি রঞ্জুদার বেশ একটু দুর্বলতা আছে । এইবার হাতে নাতে প্রমাণ পাওয়া গেছে । ওই গ্রুপ ফোটোর একদম মাঝখানেই তো তপতী দাঁড়িয়ে আছে, তাই না? ইসস! কী বকুনি আর প্যাঁক-ই না সেদিন খেতে হয়েছিল রঞ্জুদাকে!

অনেকদিন বাদে মুনিয়ার খেয়াল হয়েছিল, শুধু তপতী কেন, সে নিজেও তো ছিল ওই ফোটোটার মধ্যে । তখনই জীবনে প্রথমবার সে রঞ্জনের চোখের দিকে সত্যিকারের চোখ মেলে তাকিয়েছিল, আর সেখানে যা দেখেছিল তাতে তার মন অসাড় হয়ে গিয়েছিল । কোনো মানুষের চোখে এতটা কষ্ট জমে পাথর হয়ে থাকতে পারে?

কিন্তু তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে । বাবা আসানসোলের ব্যবসায়ী-পাত্র কৌশিকের সঙ্গে তার বিয়ের কথা পাকা করে ফেলেছেন । অন্যদিকে রঞ্জন এক অল্পশিক্ষিত বেকার ।

স্মৃতি থেকে হঠাৎই মুনিয়াকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনল অদ্ভুত এক আওয়াজ । চিৎকার নয়, শেয়ালগুলো এখন খুশিতে মুখ দিয়ে কেমন একটা কুঁক কুঁক শব্দ করছে । মুনিয়া বিছানা ছেড়ে আবার জানলার কাছে গিয়ে দেখল যা ভেবেছিল, ঠিক তাই । রঞ্জন শিবাভোগ দিচ্ছে । কী ভীষণ রোগা হয়ে গেছে মানুষটা! সাদা ধুতি আর সাদা উড়নিতে একটুকরো জমাট বাঁধা জ্যোৎস্নার মতনই মনে হচ্ছিল ওকে ।

কাজ শেষ করে রঞ্জন ফিরে যাচ্ছিল বাড়ির দিকে । হঠাৎ কী মনে হতে চোখ তুলে তাকাল পাশের বাড়ির দোতলার জানলার দিকে । দেখল মুনিয়া দাঁড়িয়ে রয়েছে । অনেকক্ষণ নড়তে পারল না রঞ্জন । তার পা দুটো যেন মাটিতে গেঁথে গেল । মুনিয়ার বুকটা ধক করে উঠল । এ তো সন্ন্যাসীর দৃষ্টি নয় । উন্মাদের তো

নয়ই । মুনিয়া পরিষ্কার বুঝতে পারল, রঞ্জনের দুটো চোখের কাজলকালো মণি ওকে আদর করছে । বলছে, কতদিন বাদে এলি মুনিয়া!

মুনিয়া রঞ্জনের চোখ থেকে চোখ সরাল না । সেও মনে মনে বলল, আমি তোমার জীবনটা নষ্ট করে দিলাম রঞ্জুদা। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমিও ভালো নেই । একদম ভালো নেই । আমার বরটা মানুষ নয় ।

বলল, তোমাকে সব কথা বলতে ইচ্ছে করে, কিন্তু তুমি কী বুঝবে?

বলল, কত ভালো হত, যদি আমাদের দুজনের বিয়ে হত? সে তো এজন্মে আর হবে না, তাই না রঞ্জুদা?

কিছুক্ষণ মুনিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে রঞ্জন নিজের বাড়ির দিকে চলে গেল । মুনিয়া শুনল কাজের মাসি কমল তাকে নিচ থেকে ডাকছে । ও দিদি, রাতে কী রান্না হবে একটু বলে দিয়ে যাও না ।

আঁচল দিয়ে ভালো করে চোখদুটো মুছে নিয়ে মুনিয়া সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল ।

কৌশিক হালদারের স্নায়ুগুলো কেমন যেন অবশ হয়ে আসছিল । মাথার মধ্যে নানান চিন্তা তালগোল পাকিয়ে একাকার । এখানে খবরের কাগজ পৌঁছয় বিকেলে । সেই কাগজ পড়বার জন্যই দেড় কিলোমিটার হেঁটে সে পাণ্ডবেশ্বরের বাসরাস্তায় গিয়েছিল । সেখানে একটা ঝুপড়ি চায়ের দোকানে বসে চায়ের ভাঁড়টা সামনে রেখে কাগজের দ্বিতীয় পাতাটা ওল্টাতেই তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল । কেসটা রাজ্য পুলিশ ট্রান্সফার করেছে সি আই ডি-কে ।

তার মানে মেয়েটার সেই পলিটিশিয়ান জ্যাঠা আসরে নেমে পড়েছেন । সুতো টানছেন পেছন থেকে । ঠিক এই ভয়টাই পাচ্ছিল কৌশিক ।

এমনিতে ব্যাপারটা যে বেশিদূর গড়াত না, সে ব্যাপারে কৌশিক নিশ্চিত ছিল । জেট-এজের এই একটা সুবিধে । কেউ বেশিদিন কিছু মনে রাখে না । মিডিয়া মনে না রাখলে পুলিশের দায় পড়েছে ব্যাপারটা নিয়ে বেশি নাড়াঘাটা করার । আর এ ক্ষেত্রে দেবযানীর বাবা-মাও বোধহয় চাইত স্ক্যান্ডালটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধামাচাপা পড়ুক, কারণ ওদের আরেকটা মেয়ে আছে । কিন্তু এখন ব্যাপারটা সহজে মিটবে না ।

যদিও কৌশিক যতটা সম্ভব পেছনের সমস্ত প্রমাণ লোপাট করতে করতে এগিয়েছে, তবু, কোথাও কি সে কোনো সূত্র ফেলে আসেনি?

বেকার এই টেনশন নিতে গেল সে । শালা, শয়তান ভর করেছিল মাথায় । চায়ের খালি ভাঁড়টাকে এক লাথিতে ছিটকে দিয়ে রাস্তায় নামল কৌশিক । কোনো ক্ষতি তো করেনি তার দেবযানী । কেন যে শুধু শুধু দেবযানীকে সে . . . ।

বুকের ভেতর একটা ছোট্ট কাঁটার খোঁচা টের পায় কৌশিক । ও ছিল মেয়েটার প্রথম প্রেম । ওঃ! ভাবা যায়? কী আকুলতা, কী তীব্র প্যাশন সেই আঠেরো বছরের হৃদয়ের! কৌশিককে দেখলেই ওর মুখে যেন একশো - আট প্রদীপের আলো জ্বলে উঠত ।

কৌশিক আবার ভাবল, কেন অমন পাপ সে করল? সে কি রাগের মাথায়?

নাঃ । দালালি করে যাকে পয়সা রোজগার করতে হয় তার রাগলে চলে না । যে তাকে শুয়োরের বাচ্চা বলে, তাকেও কৌশিক সেলাম বাজায়, যদি সে তার ক্লায়েন্ট হয় । কাজেই রাগের অনুভূতিটা তার অনেকদিন আগেই ভোঁতা হয়ে গেছে ।

তাহলে?

এই তাহলে'র জবাবটা কৌশিক খুব ভালো করে জানে । ইচ্ছে করলেও সেটাকে সে এড়িয়ে যেতে পারছে না । উত্তরটা এই যে, সেদিন কৌশিক যা করেছে, নেশার ঝোঁকে করেছে ।

খুব বেশিদিন কোডেনের শট নিলে যে নিজের অ্যাকশনের ওপর থেকে কন্ট্রোল চলে যায় এই কথাটা সে এতদিন কানে শুনেছিল । রিসেন্টলি, তার নিজের কেসে ঠিক সেটাই হচ্ছে । হরদম নানান বাওয়ালি করে

ফেলছে সে । কৌশিক জানে আর কিছুদিন পরে বাওয়ালিগুলোকে বাওয়ালি বলে চেনার ক্ষমতাটুকুও তার চলে যাবে । তারপর? তারপর সে একটা ঘুমতা-ফিরতা লাশ হয়ে যাবে, যেরকম জ্যান্ত-লাশ মাঝে মাঝে দেখা যায় পার্কস্ট্রিট কবরখানার সামনে কিংবা ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের ফুটপাথে — আকাশের দিকে ফাঁকা চোখ তুলে বসে আছে ।

আপাতত চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে কৌশিক দেখল তাঁর হাতের আঙুলগুলো থরথর করে কাঁপছে । কিছুতেই সে সেই কাঁপুনি থামাতে পারছে না । কৌশিক নিজের মনেই হাসল । সে জ্ঞানপাপী, তাই জানে যে এই কাঁপুনিকে পাতাখোরদের ল্যাঙ্গুয়েজে বলে 'টার্কি' । বেশিক্ষণ ড্রাগ না পেলে নার্ভের এই খিঁচুনি শুরু হয়ে যায় ।

আর যদি বেশ কয়েকদিন অ্যাডিক্টদের হাতে ড্রাগ দেওয়া না হয়?

কৌশিক শুনেছে রিহ্যাবিলিটেশন- সেন্টারের দেয়াল নখ দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে দশটা আঙুল রক্তাক্ত করে ফেলে সেখানকার ইন-মেটস-রা । দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মাথা ফাটিয়ে ফেলে এক পুরিয়া চরস কিংবা হেরোইনের একটা শট-এর জন্যে ।

কৌশিক বুঝতে পারে তার জন্যেও সেই দিন আর খুব বেশি দূরে নেই । কিন্তু আপাতত মাথার ভেতরের ধোঁয়াটে ভাবটা কাটাবার জন্যে চাই... ।

কৌশিক রাস্তার ধারে একটা রাঙচিতার ঝোপের পেছনে গিয়ে বসল । তারপর কাঁধের ব্যাগ থেকে একে একে বার করল ট্যাবলেট, জলের বোতল, তুলোর টুকরো । ট্যাবলেটটা অল্প জলে গুলে তুলোর টুকরোর মধ্যে দিয়ে ছেঁকে নিল। সবশেষে বার করল ছোট একটা ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ । অভ্যস্ত হাতে সল্যুশনটাকে কনুইয়ের একটু ওপরে মাসলের মধ্যে ইনজেক্ট করে দিল ।

আঃ! এবার শান্তি । ক্রমশ কৌশিকের হাতের কাঁপুনি থেমে গেল, কিন্তু বুকের কাঁপুনিটা তখনই থামল না । খবরের কাগজে যা পড়ল, তাতে সে বেশ বুঝতে পারছে, এখন কিছুদিন তাকে এখানেই থাকতে হবে । শ্বশুর যতক্ষণ আছে খাওয়াদাওয়ার অসুবিধে হবে না । কিন্তু খাওয়াদাওয়ার চিন্তা সে করেও না । যত দিন যাচ্ছে তার খিদে কমে আসছে। সব রকমের খিদে । ভাত দেখলে গা গুলোয় । মেয়েমানুষ দেখলেও গা গুলোয় । শুধু একটা জিনিসের জন্যেই মনপ্রাণ আকুল হয়ে থাকে । ট্যাবলেট । কিন্তু বড় দাম শালা ট্যাবলেটের । পয়সা থাকলে এই অজগ্রামেও সাপ্লাই ঠিক চলে আসবে । ওই পাণ্ডবেশ্বর মোড়ে গিয়ে দাঁড়ালে আসানসোল থেকে হকার এসে মাল দিয়ে চলে যাবে । কিন্তু পয়সাটাই তো ফুরিয়ে আসছে । মুনিয়ার কাছে চাইবে? বলবে, তোমার বাবাকে বলো ধার দিতে? হারগিস দেবে না মুনিয়া । মহা ঠ্যাঁটা মেয়েছেলে । তার ওপর এখন নিজের জায়গায় আছে ।

কিন্তু আর বেশিক্ষণ এসব জাগতিক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে পারল না কৌশিক । তার মাথার ভেতর রঙিন আলোর নাচানাচি শুরু হয়ে গেল ।

বেসামাল পায়ে কৌশিক উঠে দাঁড়াল, তারপর ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে পা দিল রাস্তায় । আকাশে এখনো আলো আছে । এখনই বাড়ি ফেরার কোনো মানেই হয় না । বাড়ি ফেরা মানেই তো সেই মুনিয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়ানো ।

নিজের বউ হলেও এই মেয়েটাকে দেখলে কেমন যেন অস্বস্তি হয় কৌশিকের । ও পরিষ্কার বুঝতে পারে মুনিয়া তাকে ঘেন্না করে, ভীষণ ঘেন্না করে । মুশকিল হচ্ছে, মুনিয়া ঘেন্না ছাড়া আর কিছুই করে না । ও যদি চিৎকার করত, ঝগড়া করত, গড়পড়তা মেয়েরা যেমন করে, তাহলে কৌশিকও একটা প্রতিক্রিয়া দেখাবার সুযোগ পেত । সে মুনিয়ার কব্জি মুচড়ে দিতে পারত, চুলের গোছা টেনে ছিঁড়ে দিতে পারত, এমনকী তার পিঠে সিগারেটের ছ্যাঁকাও দিতে পারত । কিন্তু কৌশিক কিছুই করতে পারে না । মুনিয়া তাকে কোনো সুযোগ দেয় না ।

কৌশিক তাই যতক্ষণ পারে মুনিয়াকে এড়িয়ে চলে ।

আর সেইজন্যেই কৌশিক তখনই বাড়ি ফিরল না। সে হাঁটা লাগাল নদীর দিকে। কিছুটা যাবার পর তার চোখে পড়ল নদীর চরে সারি সারি হোগলা আর দরমার ছোট ছোট ঝুপড়ি। নেশার ঘোরে পুরো ব্যাপারটাই তার একটা স্বপ্নের মতন মনে হচ্ছিল, যেন একটা রূপকথায় পড়া বামনের দেশ। ওটা কী? কারা থাকে ওখানে?

কিছু না বুঝেই মেলার দিকে হাঁটা লাগাল কৌশিক।

কৌশিক বাড়ি ফিরল রাত বারোটায়। মুনিয়া দরজা খুলে দিল।

নেশা করে এসেছে। সেটা নতুন কিছু নয়। আসানসোলেও ও প্রতিদিন ড্রাগ নিয়েই বাড়ি ফিরত। মাঝে মাঝে কাঁদত, মাঝে মাঝে হাসত, তবে ঘুমিয়ে পড়ত খুব তাড়াতাড়ি।

এ সব নোংরা ব্যাপার নিয়ে খুব বেশিক্ষণ মাথা ঘামাতে চায় না মুনিয়া। সত্যি কথা বলতে কি, কৌশিক নামে ওই লোকটার অস্তিত্বই সে ভুলে যেতে চাইছে।

এমনিতে তাতে খুব একটা অসুবিধে ছিল না, কারণ কৌশিকের সঙ্গে তার সারাদিনে কতবার দেখা হয়, ক'টা কথা হয়, তা হয়তো হাতের একটা আঙুলে গুনেই বলে দেওয়া যায়। কিন্তু কৌশিকের অস্তিত্ব ভুলতে দেয় না তার পাওনাদারেরা। সারাদিনের মধ্যে চোদ্দোবার তাদের ফ্ল্যাটের কলিংবেল বাজে আর মুনিয়া দরজা খুলে পাওনাদারদের গালাগাল শোনে। রান্না নয়, খাওয়া নয়, সেলাই নয়, ফোঁড়াই নয়, সংসারের কোনো কাজই নয়— একেকদিন নির্জন দুপুরে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে মুনিয়া ভাবে— তার একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে পাওনাদার ঠেকানো। কী বিচ্ছিরি কথা যে বলে যায় গুন্ডার মতন লোকগুলো সে বলার মতন নয়। যাবার সময় তারা প্রায় সকলেই দেয়ালকে শুনিয়ে বলে যায়, শুয়োরের বাচ্চা হালদার যদি এমনিতে টাকার জোগাড় না করতে পারে তো এমন ছমকছল্লু বউটাকে বাজারে নামিয়ে দিক না। দুদিনে ধার শোধ হয়ে যাবে।

বিয়ের আগে মুনিয়ারা শুনেছিল, কৌশিক ইঞ্জিনিয়ার। বিয়ের পরে শুনল ঠিকাদার। আরো পরে জানল, জমি-বাড়ির দালাল। কিন্তু আসলে কৌশিক হালদার নামে লোকটা যে কী, তা মুনিয়া এই চার বছরেও বুঝতে পারল না। যেটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যায় তা হল সে ড্রাগ-অ্যাডিক্ট, জুয়াড়ি এবং সপ্তাহে অন্তত দুবার লছিপুরের ঢালে না গেলে তার চলে না। বেশ্যাবাড়ি যাওয়ার অভ্যেসটা অবশ্য ক্রমশ কমে আসছে। মুনিয়া বুঝতে পারে পাতা খেয়ে খেয়ে কৌশিক ক্রমশ ঢোড়া হয়ে যাচ্ছে। আরো একটা ব্যাপার বুঝতে পারে মুনিয়া। এইসব কাজে যে টাকার দরকার হয় তা জোগাড় করবার জন্যে কৌশিক ভিক্ষে থেকে শুরু করে যে-কোনো পথ নিতে পারে। লোকটা কতটা নিচে নামতে পারে তার কোনো লিমিট নেই।

মুনিয়া নিজের এই হীন জীবন নিয়ে নিজের মধ্যে গুটিয়ে গিয়েছিল। কাউকে কিছু বলত না, কোথাও যেত না। বিয়ের একবছরের মধ্যে মা মারা গেল। তাতে একদিক দিয়ে সুবিধেই হল। মা যতটা খুঁটিয়ে সন্তানের খোঁজ নেয়, তার মুখের রেখা থেকে খুঁজে বার করে সুখ-দুঃখের কথা, তেমনটা তো আর কেউ পারে না। অতএব মুনিয়া আসানসোলের সেই দু-কামরার ফ্ল্যাটেই বন্দিজীবন বেছে নিয়েছিল। তুষকাঠি যেত বছরে একবার, পুজোর পরে। যেদিন যেত সেদিনই ফিরে আসত। বাবা হাজার বললেও থাকত না বেশিক্ষণ। আর কৌশিক তো বিয়ের পর থেকে কোনোদিনই শ্বশুরবাড়ির রাস্তা মাড়ায়নি।

তাই দুদিন আগে কৌশিক নিজেই যখন তুষকাঠি যাবার কথা বলল, তখন মুনিয়া দারুণ অবাক হয়েছিল। সাধারণত যে সময়ে ও বাড়ি ফেরে সেদিন তার থেকে অনেক আগেই কৌশিক বাড়ি ফিরে এল। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল অসম্ভব টেনশনের মধ্যে রয়েছে। ঘরে ঢুকেই মুনিয়ার পা দুটো জড়িয়ে ধরে আর কি। খালি বলে, 'তুষকাঠি যেতে হবে। চলো, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি।

ব্যাপারটা কী? ভারী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মুনিয়া। শ্বশুরবাড়ির ওপর হঠাৎ এত টান?

এখানে থাকলে মারা পড়ে যাব।

কেন? জিজ্ঞেস করল মুনিয়া।

ন্যাটা দুলাল-কে অনেকদিন ধরে ঘোরাচ্ছি। এইমাত্র শুনলাম ও সুপারি কিলার ফিট করেছে আমাকে মারার জন্যে। পালাই ... চলো পালাই। হাঁফাচ্ছিল কৌশিক।

ওর কথাটা বিশ্বাস করেছিল মুনিয়া।

আধঘণ্টার মধ্যে ফ্ল্যাটের দরজায় তালা দিয়ে, স্টেশন থেকে একটা প্রাইভেট-কার ভাড়া করে বর্ধমান আর বীরভূম জেলার সীমানায় গাছপালার মধ্যে লুকিয়ে থাকা এই গ্রামে পৌঁছেছিল ওরা।

তুষকাঠি পৃথিবীর সেই বিরল কয়েকটা জায়গার মধ্যে একটা, যেখানে মোবাইলের টাওয়ার নেই। আসলে মাইল মাইল বালিয়াড়ির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মাত্র দু-তিনটে গ্রামের কয়েকশো মানুষের জন্যে অত হাঙ্গামা করে টাওয়ার বসানোর ব্যাপারটা কোনো সার্ভিস প্রোভাইডারই বাণিজ্যসফল মনে করেনি।

বলাই বাহুল্য, তুষকাঠিতে বিদ্যুতও পৌঁছয়নি।

বছরের মধ্যে তিনশো পঞ্চান্ন দিন তুষকাঠি তার নিজের অন্ধকার একাকিত্বে ডুবে থাকে, আর দশদিন অদ্ভুত আদিম এক জনসমাগম ঘটে এখানে। সময়টা হেমন্ত মাসের শুক্লপক্ষের শেষ দশদিন। তুষকাঠির ধর্মবাবার থানে সেই ক'দিন এক মেলা বসে, ধর্মরাজের মেলা।

ধর্মরাজ অনার্য দেবতা। তার ভক্তরাও অন্ত্যজ। এই মানুষগুলো নিজেদের জন্যে তৈরি করে নিয়েছে ভারী গোপন সব সাধনপদ্ধতি। দেখা যায়, যে মানুষটা সারাবছর অজয়ের ধু ধু বালুর চরে একা একা চাষ করে, তারও রয়েছে এক বীজমন্ত্র। যে অল্পবয়সি বিধবাটি নদীর স্রোতে সারাদিন মাছ খোঁজে, রাত হলে সে-ই এলোচুলে শ্মশানচারিনী। এরকম হাজার হাজার তান্ত্রিক, উদাসী, অবধূতের জন্যে তীর্থের সার তীর্থ হল তুষকাঠি নামে এই গ্রাম, যা নাকি আসলে এক কূর্মপীঠ। গোপন সাধকদের গোপন তীর্থ।

হেমন্তের শুক্লপক্ষের ওই ক'দিন সারা রাত ধর্মরাজের থানে পুজোআচ্চা চলে। কুয়াশা এবং তারার আলোর নীচে কিছু ছায়াশরীর অজয়ের জলে অবগাহন সেরে নিয়ে মিলিয়ে যায় তীরভূমির জঙ্গলে। কে জানে, সেখানে কেমন তাদের হঠযোগ?

ওই ধর্মরাজের যানকে ঘিরেই মেলাটা বসে। একেবারেই গ্রামীণ মেলা। চারিপাশে চোদ্দোমাইলের মধ্যে তেমন পয়সাওলা লোকজন নেই বলে বড় বড় দোকানিরা কোনোদিনই এই মেলায় আসতে আগ্রহ বোধ করেনি, আজও করে না। বিদ্যুৎ নেই বলে বৈদ্যুতিক নাগরদোলা বসে না, আলো ঝলমল সার্কাসের তাঁবুও দেখা যায় না। আসে কেবল কাঠ আর লোহার গেরস্থালি জিনিস, খাজা আর কদমার হালুইকর, মাটির বেহালা, তালপাতার পাখা, জলভরা রঙিন হাঁস, মাটির পুতুল, টিনের কামান — বছর বছর বাংলার অতীত ফিরে আসে এই মেলায়।

কাকতালীয়ভাবে মুনিয়ারা এখানে এসে পৌঁছেছে সেই মেলার মাঝখানে।

যেদিন এখানে পৌঁছল তার পরদিন সকালের দিকে মুনিয়া হাতে একটা ঝাড়ন নিয়ে ঘুরে ঘুরে বাপের বাড়ির ফার্নিচারগুলো থেকে ধুলো ঝাড়ছিল আর গুনগুন করে গান গাইছিল। হ্যাঁ, সত্যি। কী যে রয়েছে তুষকাঠির এই লাল ধুলোর পথ, ক্যানালের ধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সোনাঝুড়ির সবুজ বন আর মৌরির শরবতের মতন সোনালি মিষ্টি রোদ্দুরের মধ্যে, কী যে ম্যাজিক রয়েছে বাবার ওই মুন্নি-মা ডাকটার মধ্যে, মুনিয়ার বুকের ভেতর জমে থাকা পাথরটা এক রাত্তিরেই একটু হালকা হয়ে এসেছিল।

মুনিয়া ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে মেলার কথাই ভাবছিল।

কোনো এক সিদ্ধপুরুষের পত্তন করা এই মেলার বয়েস না কি দেড়শো বছরের কাছাকাছি। ক্রেতা এবং বিক্রেতা সকলেই বহু বছর ধরে বংশ পরম্পরায় এখানে আসছে। আজ যে ছেলেটা নাগরদোলার বাঁ পাশে বসে মাটির বেহালা বিক্রি করছে, পঁচিশ বছর আগে ওর বাবা ঠিক ওইখানটাতেই বসে মাটির বেহালা বিক্রি

করেছিল। আজ যে বাচ্চাটা ছেঁড়া প্যান্টুলুনের পকেট থেকে পয়সা বার করে ওর কাছ থেকে বেহালা কিনল, পঁচিশ বছর আগে তার বাবা ওইখানে দাঁড়িয়ে, ঠিক ওইভাবে বেহালা কিনেছিল।

মুনিয়াও জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই মেলার জন্যে সারাবছর হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। এত আনন্দ আর কিছুতেই ছিল না। ছোটবেলায় ওদের মতন কমবয়সি ছেলেমেয়েরা ঘুরে ঘুরে বড়দের কাছ থেকে চারআনা আটআনা পার্বণী আদায় করত। তারপর সেই পয়সা নিয়ে দৌড় দিত মেলার দিকে। মাটির বেহালা, চুলের ফিতে, বাদামতক্তি, জলভরা কাচের হাঁস কিনত। নাগরদোলা ঘোরদোলায় চাপত।

তবে মুনিয়ার সবচেয়ে ভালো লাগত পুতুলনাচ।

বড় হয়ে মুনিয়া এদিক-ওদিক আরো অনেক মেলা দেখেছে — রানিগঞ্জে পিরবাবার মেলা, জয়দেবের মেলা, পৌষমেলা। কিন্তু তাদের তুষকাঠির মেলায় যে পুতুলনাচের দল আসে, এমনটা সে আর কোনো মেলায় দেখেনি।

প্রচলিত পুতুলনাচ থেকে একটু অন্যরকমের এই নাচ। এরা ওপর থেকে সুতোর টানে ছোট ছোট পুতুলকে নাচায় না; মানুষপ্রমাণ বড় বড় পুতুলকে কোমরের নীচ থেকে তুলে ধরে ঘোরায় ফেরায়। নিজেরা থাকে মঞ্চের নীচে টিনের শিট দিয়ে আড়াল করা অংশে। সেখান থেকে পুতুলগুলোকে মাথায় ওপর তুলে ধরে নাচায়।

পুতুলগুলো বোধহয় হালকা কাগজের মণ্ডের মতন কোনো জিনিস দিয়ে তৈরি, অনেকটা জামাকাপড়ের দোকানের প্লাস্টিকের ম্যানিকিনের মতন করে বানানো। চরিত্র অনুযায়ী সেইসব ন্যাড়া বোঁচা পুতুলের মুখে চুল দাড়ি লাগানো হয়। রাজা সাজালে বাবরি চুল আর পাকানো মোচ। ঝলমলে শেরোয়ানি চুড়িদার। একই পুতুলকে অন্য পালায় প্রয়োজন মতন জটাজুট লাগিয়ে গেরুয়া পোশাক পরিয়ে সন্ন্যাসী বানিয়ে দেওয়া যায়। এমনকী শাড়ি, লম্বা পাটের চুল আর বুকে দুটো নারকোলের মালা ফিট করে রানি।

পুতুলের কোমরের নীচে একটা বাঁশের লাঠির মতন কিছু গোঁজা থাকে, যেটা ধরে তাদের নাচানো যায়। দর্শকরা সামনে থেকে দেখতে পায় টিনের শিটের ওপরে জেগে থাকা কোমরের ওপরে অংশটুকু।

পুতুলদের হয়ে কথাবার্তা গান টান যা কিছু, সেসব ওই বেদেরাই আড়াল থেকে চালিয়ে যায়।

নিতান্তই গ্রাম্য বিনোদন। এক কালে যখন টিভি সিনেমা এইসব ছিল না তখন এই পুতুলনাচ লোক টানত। এখন শহরাঞ্চলে নিশ্চয় পাত্তা পায় না। তবে তুষকাঠির মতন অজ গ্রামে এখনো কিছুটা চাহিদা আছে এই সমস্ত বিনোদনের।

এ সব দুদিন আগের কথা।

আজ কৌশিক রাত দুপুরে বাড়ি ফিরে আসার পর মুনিয়া ওকে জিজ্ঞেস করেছিল কিছু খাবে কি না। ও মাথা নেড়েছিল। আসানসোল হলে মুনিয়া হয়তো কিছু বলত না। কিন্তু এটা তুষকাঠি বলেই সে আর দুয়েকবার কৌশিককে খাওয়ার জন্যে সাধাসাধি করল। কৌশিক সে-সবের উত্তর না দিয়েই বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পাশে শুয়ে মুনিয়ার ঘুম আসছিল না। বিছানায় শুয়ে শুয়েই সে পায়ের কাছের জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছিল নদীর তীরে মেলার সারি সারি গ্যাসের আলো টিপ টিপ করে জ্বলছে। পৃথিবীটা এখন কেমন মায়াময় হয়ে আছে। অনেকদিন বাদে আবার তার মনে হচ্ছে কী সুন্দর এই বেঁচে থাকা! সে কি ওই সাদা ধুতি আর উড়নি গায়ে মানুষটার জন্যে, লোকে যাকে ইদানীং খ্যাপা সাধু বলে?

বহুক্ষণ ধরে একটা কথা মুনিয়া মনে মনেও উচ্চারণ করতে পারছিল না। এখন তার বুক ভেঙে সেই কথাটা বেরিয়ে এল। মুনিয়া ফিস ফিস করে বলল, ও কি আমার জন্যেই পাগল হয়ে গেল?

প্রশ্নটা সে কাকে করল, কে উত্তর দেবে, কিছুই জানে না মুনিয়া।

আসানসোল সদর থানার পেছন দিকের একটা নির্জন ঘর । ঘরটার সবক'টা জানলার পাল্লা শক্ত করে আঁটা । দরজার সামনেও সজাগ পাহারায় একজন কনস্টেবল ।

ঘরের মধ্যে একটা ছোট টেবিল । তার ওপরে ফাইলপত্র বিশেষ কিছু নেই, কেবল একটা ডেস্কটপ কম্পিউটার । সি.আই.ডি-র সাইবার-ক্রাইম ব্রাঞ্চের ইনভেস্টিগেটিং অফিসার মৃদুল মুস্তাফি সেই কম্পিউটারটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে গুম হয়ে বসেছিলেন । তার দুই হাতের মুঠো শক্ত, কপালে বিনবিনে ঘাম জমেছে ।

মৃদুলবাবুর বয়েস সাতান্ন । পুলিশের চাকরিতে বেশ নীচুতলা থেকে ঘষটে ঘষটে এতদূর উঠেছেন । স্বাভাবিকভাবেই মানবশরীর নিয়ে বীভৎসতা তিনি কম দেখেননি । বোমা বিস্ফোরণে হাত পা উড়ে যাওয়া মৃতদেহ দেখেছেন, রেপ-ভিকটিমের ক্ষতবিক্ষত শরীর দেখেছেন, অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ মৃতদেহের সারি দেখেছেন । কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি ল্যাপটপের স্ক্রিনে যা দেখছেন, তা বোধহয় বীভৎসতায় ওই সমস্ত দৃশ্যকে হার মানায় ।

অথচ তা কোনো মৃত্যুদৃশ্য নয়, বরং নিরপেক্ষ বিচারে তাকে জীবনের উৎসবই বলা যায় । একটি অত্যন্ত প্রাণোচ্ছল কিশোরীর নগ্ন শরীর — 'ভিডিও ক্যামেরা নানান অ্যাঙ্গেল থেকে ঘুরে ঘুরে সেই শরীরের ছবি দেখাচ্ছে ।

এই ছবি দেখে যে মৃদুলবাবুর মতন দুঁদে পুলিশ অফিসারেরও গা গুলোচ্ছে তার কারণ, এটা কোনো সাধারণ ব্লু-ফিল্ম নয় । ওই মেয়েটিও নয় কোনো প্রস্টিটিউট ।

'মেয়েটার বাড়ি এই আসানসোলেরই মহিশীলা পার্কে । ওর নাম দেবযানী মিত্র । বয়েস আঠেরো বছর সাত মাস । সবেমাত্র বি এ ফার্স্ট ইয়ারে অ্যাডমিশন নিয়েছিল ।

দেবযানী তিনদিন আগে সুইসাইড করেছে । কারণ ওর ওই ছবিগুলো কেউ একটা জনপ্রিয় সোশ্যাল নেটওয়ার্কে অ্যাটাচ করে দিয়েছিল ।

দেবযানী কোনো সুইসাইড নোট লিখে যায়নি । সেটাই স্বাভাবিক । সম্ভবত কোনো বান্ধবীর কাছ থেকে নেটে ছবি চালাচালির খবর পাওয়ামাত্রই সে আগে নিজের ল্যাপটপে খবরটার সত্যতা যাচাই করেছিল । ওর সার্চ- মেশিনের হিস্ট্রি মেনুতে এখনো স্ক্রল করলে দেখা যাচ্ছে সেই ছবি । নিজের গোপনতম মুহূর্তগুলোকে এইভাবে বাজারের মাল হয়ে যেতে দেখে মেয়েটা প্যানিকড হয়ে পড়েছিল । যে-ই এ কাজটা করে থাকুক সে যে কতবড় শয়তান তার একটা প্রমাণ যে, সে শুধু ভিডিয়োগুলো অ্যাটাচ করেই ক্ষান্ত হয়নি, তার সঙ্গে দেবযানীর পুরো প্রোফাইল দিয়ে দিয়েছিল — ওর নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর সব । ফলে সঙ্গে সঙ্গেই দেবযানীর মোবাইলে ফোন আসতে শুরু করেছিল । ভাষা বিভিন্ন হলেও কলগুলোর বক্তব্য মোটামুটি এক । তোমার শরীর খুব সুন্দর । তোমাকে বিছানায় পেতে চাই । রেট কত?

এরপরেই মেয়েটা ওদের ফ্ল্যাটের সাততলার ছাদ থেকে ঝাঁপ মেরেছিল । এ ক্ষেত্রে গুছিয়ে লেখা সুইসাইড- নোট আশাই করা যায় না । তাছাড়া এটা কি নিছক সুইসাইড? এর চেয়ে নিষ্ঠুরভাবে কোনো মেয়েকে খুন করা যায় কি?

অতএব প্রশ্ন থেকেই যায়? কে সেই খুনি? কী ছিল তার মোটিভ?

মৃদুলবাবু শখের গোয়েন্দা নন, পুলিশ । তাই তিনি খুব প্রথাগত পথে তদন্ত শুরু করলেন । প্রথমে জানবার চেষ্টা করলেন, কোন মেল-অ্যাড্রেস থেকে ওই নগ্ন ছবিগুলো নেটে ছড়ানো হয়েছে । উত্তর এল, আসানসোলেরই একটা সরকারি অফিসের ই-মেল অ্যাড্রেস থেকে । সময়টা রাত সাতটার পর, যখন ওই অফিস তালাবন্ধ থাকে । স্পষ্টতই অ্যাড্রেসটা হ্যাক করে বার করা হয়েছে । ইন্টারন্যাশনাল পাসওয়ার্ডটাও ওই অফিসের । অতএব ওইদিকে তদন্তের পথ বন্ধ হয়ে গেল ।

এরপর মৃদুল মুস্তাফি দেবযানীর বাবা-মা এবং দিদির সঙ্গে দেখা করলেন । তাদের যা যা প্রশ্ন করলেন, এবং যা উত্তর পেলেন তার সারমর্ম হচ্ছে পরিবারটার মধ্যে কোনো বাঁধন বা শৃঙ্খলা কিছুই নেই ।

দেবযানীর বাবা, মা আর দিদি তিনজনেই চাকরি করেন । বাবার চাকরিটা কর্পোরেট ম্যানেজারের, কোটিপতি লোক । দেবযানী কোথায় যাচ্ছে, কী করছে তার ওপরে কারুরই নজর রাখার সময় ছিল না । ভিডিওতে যে ঘর, যে বিছানা দেখা যাচ্ছে তা দেবযানীর নিজের ঘর, নিজের বিছানা । এই কথাটা জানার পর মৃদুলবাবু লুকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন । হোটেল হলে খোঁজখবর নেওয়া যেত । হোটেলের কর্মচারীদের কাছে মেয়েটার ছবি দেখিয়ে পুরুষ-সঙ্গীটির একটা ডেসক্রিপশন বার করে নেওয়া যেত । কিন্তু আপাতত সে আশাতেও চিটেগুড় ।

দেবযানীর মোবাইলের কলবুকে একটা নম্বর থেকে প্রচুর কল এবং এস.এম.এস এসেছে । সেই নম্বরটাতেই দেবযানীও অনেক কল করেছে । স্পষ্টতই এই সেই প্রেমিকের নম্বর । সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, নম্বরটা সিকিমের । সেন্ডুপ লামা নামে জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নামে সিমকার্ডটা কেনা হয়েছিল । শিলিগুড়ির পানের দোকানগুলোতে পয়সা দিলে যে এরকম জাল নাম-ঠিকানার সিমকার্ড পাওয়া যায় সে কথা মৃদুলবাবুর জানা ছিল । অতএব ওদিকেও তিনি আর পণ্ডশ্রম করলেন না । আরো একটা জিনিস জানা গেল — কলগুলো সব এই আসানসোলের টাওয়ার থেকেই করা । তবে এটা তো আন্দাজ করাই যাচ্ছিল । এমন শারীরিক প্রেম তো দূরে বসে করা যায় না । অতএব সেই গোপন প্রেমিক এই আসানসোলেরই বাসিন্দা, পার্মানেন্ট অথবা টেম্পোরারি ।

দেবযানীর মা একটা তথ্য দিলেন । যেদিন দুর্ঘটনাটা ঘটেছে তার থেকে ঠিক একসপ্তাহ আগে দেবযানী কলেজ-এক্সকার্সনের নাম করে ওনার কাছ থেকে চারহাজার টাকা নিয়েছিল । দেবযানীর নিজস্ব একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিলেন ওর বাবা, যাতে ওনাদের অনুপস্থিতিতে হঠাৎ কোনো প্রয়োজনে দেবযানী ডেবিট কার্ডে টাকা তুলে নিতে পারে । সেখানে প্রায় হাজার পঁচিশেক টাকার ব্যালেন্স সবসময়েই থাকে । তবু মেয়ে তার কাছে টাকা চাইছে কেন ভেবে ওর মা একটু অবাক হয়েছিলেন । মেয়েকে জিজ্ঞেসও করেছিলেন সে কথা । তাতে দেবযানী না কি উত্তর দেয়, এ টি এমে বড় নোট, মানে পাঁচশো হাজার টাকার নোটে পেমেন্ট দেয় । অথচ কলেজ কর্তৃপক্ষ ওদের বলেছে একশো টাকার নোটে ফিজ জমা দিতে । ওর মা আর কিছু না বলে টাকাটা দিয়ে দিয়েছিলেন ।

দেবযানীর কথাটা একটা তাড়াতাড়িতে বানানো হাস্যকর মিথ্যে অজুহাত সেটা বুঝতে মৃদুলবাবুর অসুবিধে হল না। তিনি দেবযানীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে খোঁজ নিলেন এবং যখন দেখলেন যে সেখানে এক পয়সাও ব্যালেন্স নেই তখন একটু নিশ্চিন্ত হলেন । তাহলে ব্ল্যাকমেইলড হচ্ছিল মেয়েটা । এবং যে মুহূর্তে ছেলেটাকে আর টাকা জোগাতে পারেনি, সেই মুহূর্তেই ছেলেটা ওর সর্বনাশ করে দিয়েছে । মোটিভ পাওয়া গেল । কিন্তু কালপ্রিটকে খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে তো এখনো হাতে রইল পেন্সিল ... থুড়ি, কি-বোর্ড ।

থানার বাইরের চায়ের দোকানের ছেলেটা গ্লাসে চা দিয়ে গিয়েছিল । সেই চায়ে একটা চুমুক দিয়ে মৃদুলবাবু আবার নতুন করে ভিডিও-টা দেখতে বসলেন । একটা অদ্ভুত চিন্তা তার মাথার মধ্যে উঁকি দিয়ে গেল । মানুষের যৌনতা ব্যাপারটা কী ভীষণভাবে মনের সঙ্গে জড়িত । তিনি যেহেতু জানেন যে মেয়েটা মরে গেছে, সুইসাইড করেছে, তাই তার নগ্ন ছবি তাকে এতটুকুও উত্তেজিত করছে না । যদি না জানতেন, তাহলে বাকি যে একলক্ষ কতহাজার পুরুষ যেন ভিডিওটায় লাইক দিয়েছ তিনিও নিশ্চয় তাদের মতনই ওটাকে চোখ দিয়ে চাটতেন ।

কম্পিউটারের কিছু অ্যাডজাস্টমেন্টের ফলে ছবিগুলো এখন খুব ধীর গতিতে একটার পর একটা ফ্রেম হিসেবে তার চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে । প্রত্যেকটি ফ্রেমকে তিনি খুঁটিয়ে দেখছেন, যদি কোনো তথ্য পাওয়া যায় ব্ল্যাকমেইলারটার সম্বন্ধে । নাঃ । অত্যন্ত ধূর্ত এই ফোটোগ্রাফার । কোথাও সে নিজে ধরা দেয়নি । একটা রুমাল, একটা সানগ্লাস, ছেড়ে রাখা জামা, এমন কিচ্ছু নেই কোনো ফ্রেমের মধ্যে যার থেকে তাকে কোনোভাবে আইডেন্টিফাই করা যায়। ক্রমশ হতাশা গ্রাস করছিল সি.আই.ডির পোক্ত

অফিসারটিকে । হঠাৎ একটা ফ্রেম তার চোখের সামনে দিয়ে চলে যেতেই খাড়া হয়ে বসলেন মৃদুলবাবু । মাউসের একটা ক্লিকে আবার ফ্রেমটাকে ফিরিয়ে আনলেন মনিটরে । তারপরে ফ্রিজ করে দিলেন সেটাকে ।

আঃ, এই তো! এই তো তিনি যা চাইছিলেন । একটা হাত । পুরো হাতও নয়, কব্জির ওপর থেকে বাহু অবধি সামান্য অংশ । ডানহাতে ভিডিও ক্যামেরাটা ধরে বাঁ হাত দিয়ে লোকটা নিশ্চয় মেয়েটার অবস্থান ঠিক করতে গিয়েছিল । সেই সময়েই বাড়িয়ে ধরা বাঁ হাতের কিছুটা অংশ এই ফ্রেমটার মধ্যে চলে এসেছিল । মৃদুলবাবু মনিটরের ওপর ঝুঁকে পড়লেন । পাওয়া যাবে না? কোনো সূত্রই কি পাওয়া যাবে না এই ছবিটা থেকে? কোনো আইডেন্টিফিকেশন মার্ক? কোনো ক্ষতচিহ্ন? জরুল?

নাঃ, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না । মৃদুলবাবু ফ্রেমটাকে জুম করে শুধু হাতটাকে অনেকগুণ বর্ধিত করে তুললেন । আরেঃ! ওই দাগগুলো কীসের? কনুইয়ের একটু ওপরে খুব ছোট ছোট লালচে ফোটাগুলো? আশেপাশে একই রকম ছোট ছোট দাগ, একটু কালো হয়ে এসেছে । সিরিঞ্জের পাংচার মার্ক । কোনো ভুল নেই এতে । বার বার ছুঁচ ফোটানোর ক্ষতচিহ্ন ওগুলো । কোনোটা টাটকা, আবার কোনোটা লুকিয়ে এসেছে । ছেলেটো ড্রাগ অ্যাডিক্ট ।

মৃদুলবাবু টেবিল থেকে ফোনটা তুলে এক্সটেনশন নাম্বার ডায়াল করে সদর থানার ও.সি. বিপুল সরকারকে ডাকলেন । একটা জিনিস দেখে যান মিস্টার সরকার । মজার জিনিস । তার গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছিল এখন তিনি অনেক রিল্যাক্সড ।

সন্ধের মধ্যে সদর থানার লক-আপে শহরের ন'জন ড্রাগ পেডলারকে ঘাড় ধরে বসিয়ে দিলেন বিপুল সরকার । হাতে দেবযানীর একটা ছবি নিয়ে সেখানে ঢুকলেন মৃদুল মুস্তাফি ।

ন'জনের মধ্যে তিন জন পেডলার ফোটো দেখে দেবযানীকে চিনতে পারল । বলল, মেয়েটাকে একজন খরিদ্দারের সঙ্গে ঠেকে আসতে দেখেছে । সেই তিনজনের কাছ থেকে যা ডেসক্রিপসন পাওয়া গেল তাতে খরিদ্দারটি লম্বা, রোগা, গায়ের রং ফর্সা । বয়েস চৌত্রিশ- পঁয়ত্রিশ হবে । তবে তাকে চেনার সবচেয়ে সহজ উপায় মাথার চুল । একদম স্প্রিং-এর মতন কোঁকড়া চুল ছিল ছেলেটার ।

আরো জানা গেল, গত তিন দিন ছেলেটা মালের সাপ্লাই নিতে আসেনি ।

মৃদুল মুস্তাফি পেডলারদের থেকে যা জানবার জেনে নিয়ে বিপুলবাবুকে বললেন, এদের ছেড়ে দিন মিস্টার সরকার । তারপর একটু আমার সঙ্গে বেরোবেন ।

জিপটাকে থানার বাইরে বার করে ও.সি. বিপুল সরকার বললেন, কোনদিকে যাবেন স্যর?

ছেলেটা যদি ট্রেনে বা বাসে করে কোথাও পালিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে লোকেট করতে সময় লাগবে । তবে যদি গাড়ি ভাড়া করে গিয়ে থাকে ... আচ্ছা এখানকার ট্যাক্সি স্ট্যান্ডটা কোথায়?

স্টেশনেই ম্যাক্সিমাম গাড়ি দাঁড়ায় ।

তাহলে চলুন, স্টেশনের দিকেই যাই ।

ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনের ঘরে অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি রতন কোঙার দুই পুলিশ অফিসারকে মহা সমাদর করে ডাবের জল টল খাওয়ালেন । মেম্বারদের কাছে কোঁকড়া চুল ফর্সা মতন প্যাসেঞ্জারের খোঁজটাও তিনিই করে দিলেন । পনেরো মিনিটের মধ্যে বছর পঁচিশের একজন ড্রাইভারকে নিয়ে মৃদুলবাবুদের সামনে হাজির করলেন সেক্রেটারিসাহেব । মুখে সাপল্যের হাসি । বললেন, এই যে স্যার শ্যামল । উনচল্লিশ শূন্য ছয় গাড়িটা চালায় । ওই-ই নিয়ে গিয়েছিল । কী জিজ্ঞেস করবেন ওকে জিজ্ঞেস করুন । না, না, কিচ্ছু লুকোবে না স্যর । ওর কী স্বার্থ বলুন ।

একটু পরে থানার দিকে ফিরতে ফিরতে মৃদুলবাবু বললে, আজ রাত হয়ে গেছে । কাল সকালেই তাহলে আমরা রওনা হয়ে যাব তুষকাঠি । শ্যামল, তুমি আজ তোমার গাড়ি নিয়ে থানা কম্পাউন্ডেই থাকো । আর তোমার মোবাইল ফোনটাও আমাকে দিয়ে দাও । কিছু মনে কোরো না, সামান্য সাবধানতা আর কী?

হেমন্তের পূর্ণিমা আজ । মেলার শেষদিন ।

মুনিয়া দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পরে কিছুক্ষণ নীচে বাবার কাছে বসেছিল । বাবা চেয়ারে, ও লাল সিমেন্টের মেঝের ওপর থেবড়ি কেটে । বাবা ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিলেন, এত রোগা হয়ে গেছিস কেন বল তো মুন্নি-মা? তারপরে একটু ইতস্তত করে এমন একটা প্রশ্ন করেছিলেন, যেটা বাবাদের নয়, মায়েদের প্রশ্ন । — কৌশিকের সঙ্গে তোর মিলমিশ আছে তো?

মনের দুঃখ মনে লুকিয়ে রেখে মুনিয়া বাবার হাঁটুতে চিবুক রেখে জিজ্ঞেস করেছিল, হঠাৎ এই কথা?

না, দুজনে কীরকম যেন ছাড়া ছাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছিস ।

ওসব কিছু না, বর-বউয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে মন কষাকষি তো হবেই । তোমাকে অত ভাবতে হবে না ।

বিপত্নীক, হৃদরোগে জর্জরিত মানুষটাকে কোনো দুঃখের কথাই জানাবে না মুনিয়া । এ ব্যাপারে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । জানালে মানুষটা বাঁচবে না ।

একটু বাদে বাবা ঘুমিয়ে পড়লে মুনিয়া দোতলায় নিজের ঘরে উঠে এসেছিল । কৌশিক যথারীতি কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে । একবার ফিরেছিল । স্নান করল না । ভাতের থালার সামনে নাম কে ওয়াস্তে একবার বসল । মুখে প্রায় কিছুই তুলল না । মুনিয়ার বুক ভেঙে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল । এই মানুষটাকে সে কিন্তু ভালোবাসার কম চেষ্টা করেনি । একে জড়িয়ে ধরেই রঞ্জনের শোক ভুলতে চেয়েছিল । কিন্তু কিছুই হল না । বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে মুনিয়া ভাবছিল, তার মতন কপাল ক'টা মেয়ের হয়? একদিকে এক সন্ন্যাসী, আর এক দিকে মাদকাসক্ত । দুজনের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে তার সমস্ত অস্তিত্ব ।

বালিশের নীচে কী যেন গোঁজা আছে, শক্ত জিনিসটা মুনিয়ার গালে বিঁধছিল । সে হাত গলিয়ে বুঝল কৌশিকের সেল-ফোন । মুনিয়া ওটাকে বালিশের নিচ থেকে বার করে আনল । এই তুষকাঠি গ্রামে জিনিসটার কোনো উপযোগিতা নেই । সেইজন্যেই কৌশিক এটা ফেলে গেছে । বালিশে মাথা রেখে মুনিয়া অন্যমনস্কভাবেই ফোনটার মেনু বাটন-এ হাত দিল । সে অন্যমনস্কভাবেই ক্লিক করল ক্যামেরা অপশনে । সেখান থেকে আর এক ক্লিকে পৌঁছে গেল ফোটো অ্যালবামে । মোবাইলে স্টোর করে রাখা ছবিগুলো এক এক করে দেখতে লাগল ।

বেশিরভাগ ছবিই নির্মীয়মাণ ফ্ল্যাটের ছবি । ক্লায়েন্টদের দেখাবার জন্যে বোধহয় তুলে রেখেছে কৌশিক । একটা ছোট হাই তুলে ফোনটা রেখে দিতে যাচ্ছিল মুনিয়া । হঠাৎ শেষ ছবিটায় চোখ পড়তেই সে ধড়মড় করে উঠে বসল । মনে হল তাকে যেন সাপে ছোবল মেরেছে । আরে! এই মেয়েটার মুখটা তো চেনা । কে যেন? কে যেন?

দেবযানী । দেবযানী মিত্র । সেদিন দুপুরে কৌশিক যখন ঝড়ের মতন ঘরে ঢুকেছিল, বলেছিল প্রাণ বাঁচাতে ও তুষকাঠিতে গিয়ে লুকোবে, সেই মুহূর্তে টেলিভিশনের প্রত্যেকটা চ্যানেলে ব্রেকিং-নিউজ হিসেবে এই মেয়েটার আত্মহত্যার খবর দেখাচ্ছিল ।

হ্যাঁ, কোনো ভুল নেই । সেদিন আরো লক্ষ লক্ষ মানুষের মতন শোকে আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ ধরে এই মুখ দেখেছে মুনিয়া । মনে মনে ভেবেছে, কী ভুল যে করতে পারে এই অ্যাডোলোসেন্ট মেয়েগুলো! আর পুরুষগুলোও কম জানোয়ার হতে পারে না । অনেকক্ষণ ধরে অনেক আগ্রহ নিয়ে দেখেছিল বলেই মুনিয়ার বুকের মধ্যে মেয়েটার ছবি আর তার করুণ পরিণতি গাঁথা হয়ে গিয়েছিল । এই মুহূর্তে তার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে সেই মেয়েটারই অন্য একটা ছবি, একটু পাশ থেকে তোলা । উজ্জ্বল হাসিতে ভরে আছে দেবযানীর মুখ । বেপরোয়া প্রাণশক্তি যেন উপচে পড়ছে মুখের প্রত্যেকটা রেখা থেকে । ও জানত না, ওই বেপরোয়া স্বভাবের জন্যেই ও মরবে ।

দেবযানীর মৃত্যু আর কৌশিকের ঊর্ধ্বশ্বাসে আসানসোল ছেড়ে পালানো — এই দুটো ঘটনাকে এক সুতোয় গেঁথে ফেলতে ঠিক এক সেকেন্ড সময় লাগল মুনিয়ার । কৌশিক ... কৌশিকই তার মানে দেবযানীর

হত্যাকারী।

মুনিয়া তারপর অনেকক্ষণ ধরে ভাবল, সে কী করবে? সে কি সকলকে জানিয়ে দেবে ওই খুনিটার স্বরূপ? তাহলে তার নিজের জীবনটা শেষ হয়ে যাবে। সেটা বড় কথা নয়। শেষ হয়ে যাবে বেচারা বাবা-ও। সেটা মুনিয়া ভাবতে পারে না।

তাহলে কি সে গোপন করে যাবে পুরো ব্যাপারটাই? তার বদলে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত এক খুনি বদমাইশের সঙ্গে দিনযাপনের যন্ত্রণা সহ্য করবে?

কে তাকে বলে দেবে কোনটা ঠিক রাস্তা?

একজনের কথাই মনে পড়ল মুনিয়ার।

রঞ্জন আজকাল খুব শান্তি খোঁজে, কিন্তু পায় না। তার মাথার ভেতরটা সবসময়ে কেমন যেন জ্বালা করে। কখনো কখনো সে তুষকাঠি গ্রাম পেরিয়ে চলে যায় অজয়ের তীরে। সেখানে গভীর রাতে যারা আসে তারা কেউ মুনিয়াকে চেনে না। তারা কেউ মানুষী ভালোবাসার কথা বলে না। বলে অনেক দূরের রহস্যময় জগতের কথা। তারা রঞ্জনকে নিয়ে তন্ত্রের মণ্ডলের ধারে বসিয়ে রাখে। সেখান থেকে রঞ্জন আবার উঠে যায় অন্য কোনো ছায়াশরীরের কাছে, সেখান থেকে আবার আর এক জায়গায়। কেউ একা বসে থাকে, আবার কোথাও দুজন নারীপুরুষ। দলবদ্ধভাবেও সাধকেরা দাঁড়িয়ে থাকেন কোথাও কোথাও। কেউ নারী নিয়ে সাধনা করে, কেউ শবদেহ নিয়ে। নিভন্ত হোমের কুণ্ডের মধ্যে ফটাস শব্দ করে ফেটে যায় শ্মশান থেকে তুলে আনা করোটি। কোথাও আগুনে দেশি মদের আহুতি পড়লে দপ দপ করে জ্বলে ওঠে নীল শিখা।

এই সবই রঞ্জনের ভারী পছন্দ। তার মাথার মধ্যে নিরন্তর অর্থহীন যে ছবিগুলো ভেসে যায়, তাদের সঙ্গে অজয়ের তীরের এই কায়াসাধকদের সাধনপদ্ধতির ভারী মিল। এদের মনের ভেতরেও তার মতন একটা জ্বালা আছে। এরাও মনে হয় শান্তির খোঁজেই এত সব করে বেড়াচ্ছে। এরাই তাহলে তার আত্মীয় — ভাবে রঞ্জন।

সে খুব একটা ভুল ভাবে না। ওইসব হঠযোগীরাও রঞ্জনকে ভালোবাসে, কাছে ডাকে। কেউ কেউ বলে, তুমি বাবা আমাদের থেকে অনেকটা এগিয়ে গেছ। তারাই কেউ কেউ রঞ্জনকে নানারকম ক্রিয়াকরণের কথা বলে। রঞ্জন ঘরে বসে হোম করে, শিবাভোগ দেয়। কিন্তু সবকিছুর মধ্যেও থেকে থেকে তার মনকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায় অলকা-তিলকায় সাজানো মিষ্টি এক কনেবউয়ের মুখ — মুনিয়ার মুখ।

ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ওই মেয়েটা। বাড়ির পেছনের বাগানে ছায়াচ্ছন্ন এক কোণে বসে রঞ্জন ভাবে, মুনিয়াকে ভুলতে না পারলে সে পরম আনন্দকে পাবে কেমন করে?

লেবুগাছের ঘন ডালপালার আড়ালে চিড়িক-পিড়িক করে একটা টুনটুনি ডেকে চলে। আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। রঞ্জন ভাবে পুতুলনাচ দেখানো সেই বেদেদের দলটার কথা। তার মুখ থেকে দুর্ভাবনার মেঘটা একটু একটু করে সরে যায়। সে ভাবে, বেদেরা যদি পারে তাহলে আমিই বা পারব না কেন? ওরাও তো সাধক। তাই বলে কি সংসার ছেড়েছে? সংসারকে সঙ্গে নিয়েই ওরা কেমন গ্রাম থেকে গ্রামে, দেশ থেকে দেশে ঘুরে বেড়ায়। তাহলে?

বেদেদের ব্যাপারে রঞ্জনের ভাবনাটার ভেতরে পাগলামি নেই। সত্যিই এই পুতুলনাচ দেখানোটা একইসঙ্গে বেদেদের জীবিকা এবং ধর্ম। ধর্মীয় নিষ্ঠায় ওরা এই কাজ করে।

হাজার জমিজিরেত দিলেও ওরা চাষ করবে না, পাকা ঘর বাঁধবে না; ওরা যাযাবরের জীবনই যাপন করবে। মেলা থেকে মেলায় ঘুরে ঘুরে খেলা দেখিয়ে বেড়াবে।

বছরের পর বছর কেটে যায়, যুগের পরে যুগ । কত লোকশিল্পে কতরকমের বেনোজল ঢুকে যায় । কিন্তু ওদের পুতুলের পালাগানে কোনো বদল আসে না । বদল আসে না পুতুলগুলোর চেহারায় কিংবা সাজপোশাকেও । অদ্ভুত কিছু প্রেম, প্রতিহিংসা আর পুনর্মিলনের গল্প । নায়ক-নায়িকাদের নামগুলো হিন্দু পুরাণ বা রূপকথার কোনো চরিত্রের সাথে মেলে না ।

যাঁদের পড়াশোনা বেশি, তাঁরা বলেন ইরানী তুরানী লোককথার গল্প ওসব । এই বেদেরাও আদিতে ইরানী । মনে হয় কথাটা সত্যি । এত দারিদ্রের মধ্যেও এই বেদে নারী-পুরুষদের শরীরের সৌন্দর্য দেখবার মতন । ওদের পাকা গমের মতন গায়ের রং, টানা টানা নাক চোখ, আর ঈষৎ বাদামি চুলের মধ্যে মধ্য-এশীয় লক্ষণাবলি ভারী স্পষ্ট । অবশ্য ওদের এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করলে ওরা বলে, ওরা না কি রাজা ভোজের বংশধর — সেই রাজা ভোজ, যাঁর নাম থেকে ম্যাজিকের আরেক নাম ভোজবাজি । সেই অর্থে পুতুলনাচ দেখানোটা ওদের ধর্ম । ওরাও একধরনের সাধক । এবং তুষকাঠিতে আগত অন্যান্য গৌণ ধর্মের লোকেদের মতন ওরাও ভারী রহস্যময় ।

যেমন ধরা যাক এই ব্যাপারটাই যে, শরীর নিয়ে ওদের কোনো ছুঁৎমার্গ নেই ।

বেদে পরিবারের যুবতীরা মেলায় আগত রসিক পুরুষদের কাছে বহুদিন ধরেই আনন্দের উৎস । অবশ্য শুধু রসিক হলেই হবে না, অর্থবানও হতে হবে । সুন্দরী এবং কামকলায় নিপুণা ওই মেয়েদের একধরনের স্বর্গবেশ্যা বলা চলে। ওদের জন্যে বিগত যুগে বহু শ্রেষ্ঠী এবং সামন্তরাজা রাতের অন্ধকারে ছদ্মবেশে মেলায় এসেছে বলে শোনা যায় । যারা সোনার মোহরে তাদের মূল্য চোকাতে পারে তেমন কেউ কেউ আজও আসে ।

রঞ্জন অবশ্য শরীরের টানে আসে না, আসে মনের টানে । তার ভালো লাগে, বসে বসে বেদে বুড়োর মুখে অস্পষ্ট ভাষার নানান অলৌকিকের কথা শুনতে । শুনতে শুনতে তার মনে হয় এই দৃশ্যমান জগতের বাইরে সমান্তরাল অন্য এক জগৎ আছে । এই দুই জগতের মধ্যে বেদেদের হামেশাই যাতায়াত । মাঝে মাঝে রঞ্জন সন্ধেবেলা অবধি থেকে যায় বেদেদের তাঁবুতে । পালা শুরু হলে সেও বেদে পুরুষদের সঙ্গে পুতুলগুলোকে মাথার ওপর চাগিয়ে তুলে এদিক-ওদিক ছুটে ছুটে তাদের নাচিয়ে বেড়ায় । তখন তার মধ্যে পাগলামির কোনো লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় না । এই সব কারণে রঞ্জন বেদেদের দলের দারুণ প্রিয় । সাধারণত ওরা গৃহী সমাজকে এড়িয়ে চলে । তবে রঞ্জনকে দেখেই ওরা বোঝে যে এ ঘরে থাকলেও গৃহী নয় । এর ঘর পুড়ে গেছে । নেহাত দুবেলা দুমুঠো ভাতের টানে বাঁধা পড়ে আছে তুষকাঠিতে । না হলে এই ছেলেটাও মনে মনে তাদেরই মতন যাযাবর ।

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন রঞ্জনের কাঁধে হাত রাখে । রঞ্জন চমকে ওঠে । ফিরে তাকায় । দেখে, যার কথা ভাবছিল সে-ই এসে দাঁড়িয়েছে—মুনিয়া ।

রঞ্জন দেখে, মুনিয়ার মুখটা কাগজের মতন সাদা । চোখদুটো বিস্ফারিত । এক মুহূর্তে রঞ্জনের মাথার মধ্যে থেকে মেঘ কেটে যায় । সে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে মুনিয়াকে জড়িয়ে ধরে । বুঝতে পারে, মুনিয়া থরথর করে কাঁপছে । রঞ্জন দুহাতে মুনিয়াকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে মুনিয়া? এত ভয় পেয়েছিস কেন? কী হয়েছে?

মুনিয়া তার আঁচলের আড়াল থেকে কৌশিকের সেল-ফোনটা বার করে । তারপর দেবযানীর ছবিটা রঞ্জনকে দেখায় । বলে যায় কৌশিক নামে এক অমানুষের কাহিনি ।

শুনতে শুনতে রঞ্জনের মাথার মধ্যে মেঘটা আবার ফিরে আসে । তার চিন্তাশক্তি আবিল হয়ে যায় । এত জটিলতা তার ভালো লাগে না । তার ভালো লাগে অজয়ের বিস্তীর্ণ বালুচরে দুটো কাদাখোঁচা পাখির ভালোবাসাবাসি দেখে দুপুর কাটাতে । তার ভালো লাগে রাতের অন্ধকারে তুষকাঠির কূর্মপীঠে ঘুরে ঘুরে হঠযোগীদের ক্রিয়াকলাপ দেখতে । কিন্তু এসব কোন পৃথিবীর কথা বলে যাচ্ছে এই মেয়েটা? ল্যাংটো ছবি!

আত্মহত্যা! রঞ্জনের মাথার মধ্যে এক জ্বলন শুরু হয় । সে বেশ জোরেই বলে ওঠে — মুক্তি চাস? মুনিয়া, তুই কি তোর বরের হাত থেকে মুক্তি চাস?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে মুনিয়াকে এক মুহূর্তও ভাবতে হল না । সে উত্তর দিল — চাই ।

রাতের মেলার সঙ্গে দুপুরবেলার মেলার চেহারার মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ।

আলোয়, গানে, হাজার গলার চিৎকারে, নাগরদোলার ক্যাঁচকোঁচ শব্দে, ভেঁপুর ফুঁ-য়ে, জিলিপির কড়াই থেকে ওঠা সস্তা তেলের গন্ধে, কার্বাইড ল্যাম্পের গ্যাসের গন্ধে, আর সর্বোপরি মানুষের পায়ে পায়ে ওড়া ধুলোর মেঘে সন্ধে থেকে রাত যে মেলা ভরে থাকে, এখন এই দুপুরে তার কিছুই নেই ।

মুনিয়ার শেষ কথাটা মাথায় নিয়ে ভরদুপুরের সেই ঘুম-ঘুম মেলার মাঠ ধরে হেঁটে যাচ্ছিল রঞ্জন — একাই ।

একটা উন্মাদ ক্রোধ তাকে একরকম ছুটিয়ে নিয়ে চলেছিল । মনে মনে সে জপছিল — খারাপ লোক, খারাপ লোক ওই কৌশিক হালদার । ও আমার মুনিয়াকে কষ্ট দিচ্ছে । ও মুনিয়াকে মেরে ফেলবে ।

কীভাবে সে কৌশিকের হাত থেকে মুনিয়াকে রক্ষা করবে, তার কোনো ধারণা রঞ্জনের ছিল না । তবে যে-কোনো সংকটে সে যার কাছে যায়, এখনও সে তার কাছেই চলেছিল । তার হয়ে যা কিছু করার সেই করবে । সেই মুনিয়াকে রক্ষা করবে, মুক্তি দেবে সব অপমান আর কষ্টের হাত থেকে ।

রঞ্জনের হেঁটে যাওয়াটা তাই দিশাহীন ছিল না । দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল, লক্ষ্য স্থির রেখেই সে হাঁটছে ।

হাজার পাগলামির মধ্যেও সে যেমন জল খেতে ভোলে না, খিদে পেলে ভাত খেতে ভোলে না, সেরকমই ভোলে না এই মেলার পথঘাট ।

অতএব নির্ভুলভাবে সে হেঁটে চলল মেলার পূর্ব-সীমানার দিকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল বিরাট এবং অদ্ভুত এক তাঁবুর সামনে । এমন নানান রঙের কাপড়ে বোনা তাঁবু গোটা মেলায় আর একটাও নেই, যদিও বয়সের ভারে রংগুলো জ্বলে গেছে । তাঁবুটার বাইরে, সামনের দিকে, উঁচু একটা স্টেজ বাঁধা রয়েছে ।

রঞ্জনের ডাকে দুজন মানুষ তাঁবুর দরজার পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল । একজন বুড়ো, মুখের চামড়ায় তার অজস্র ভাঁজ, চুলগুলো তুলোর মতন সাদা, কিন্তু শরীরটা পাকা বাঁশের মতন ছিপছিপে আর সটান । আরেকজন বুড়ি । বুড়োর সম্বন্ধে যা যা বলা হল সেই সবই এর সম্বন্ধেও বলা যায় । অর্থাৎ বয়েস হয়েছে প্রচুর, কিন্তু বয়সের ভার কাবু করতে পারেনি ।

দুজনেরই জামাকাপড় নানা রঙে ছোপানো । বুড়ির পরনে ঘাঘরা জাতীয় পোশাক । বুড়োর লুঙ্গি আর ফতুয়া । দুজনেরই গলায় ছড়ার পর ছড়া রঙিন পাথরের আর পুঁতির মালা । বুড়োর কানে মাকড়ি, বুড়ির গায়ে মোটা মোটা রুপোর গয়না । উপরন্তু বুড়ির হাতে, পায়ে এমনকী গালে আর চিবুকে অবধি অজস্র উলকির ছাপ ।

ওরা বেদে আর বেদেনি । বেদেদের তাঁবু এটা ।

বুড়ো আর বুড়ি দলের সর্দার সর্দারনী । রঞ্জনকে যেমন আদর করে ওরা তাঁবুর ভেতরে নিয়ে গেল, তাতে বেশ বোঝা গেল ওদের আলাপ এক-আধ বছরের নয় ।

বাইরের উজ্জ্বল আলো থেকে তাঁবুর ভেতরে অন্ধকারে ঢুকেই রঞ্জনের চোখে ধাঁধা লেগে গেল । কিছুক্ষণ চোখ পিটপিট করে দৃষ্টিকে সইয়ে নেওয়ার পর সে দেখতে পেল ভেতরের সুপরিসর মাটির মেঝেয় ছেঁড়া কার্পেটের ওপর শুয়ে আছে আরো আট-ন'জন নারী-পুরুষ । সকলেই নিদ্রাতুর । এদের পক্ষে এত বেলা অবধি ঘুমনোটা অস্বাভাবিক নয় । ওরা পেশাগত কারণেই অনেক রাতে ঘুমোয় ।

রঞ্জন ভয়ঙ্কর উত্তেজিত গলায় বেদেবুড়োর কাছে বলে চলল মুনিয়ার কথা, কৌশিকের বদমাইশির কথা। বুড়ো রঞ্জনের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করে প্রশ্ন করল, তুমি কি মুনিয়াকে চাও?

রঞ্জন সংক্ষেপে সম্মতি জানাল।

বেদেবুড়ির মুখ হাসিতে ভরে উঠল। সে বলল, চিন্তা কোরো না। ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

রঞ্জন বেদেদের তাঁবুতেই রয়ে গেল। সন্ধে নামল। আগামী বছরের তিনশো পঞ্চান্নখানা অন্ধকার একঘেয়ে সন্ধের কথা ভেবেই যেন মেলার শেষ সন্ধ্যায় দ্বিগুণ তেজে জ্বলে উঠল হ্যাজাক বাতি, গ্যাসের আলো, কুপি আর লণ্ঠন। তবু হেমন্তের কুয়াশা আর পান্ডুর জ্যোৎস্না সমস্ত আলোকেই কেমন যেন নিষ্প্রভ করে দিল। আলোর চেয়ে অনেক বেশি ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছিল মেলার মাঠ জুড়ে — মানুষের ছায়া, গাছের ছায়া, দোকানঘরের চতুষ্কোণ ছায়া, নাগরদোলার ঘূর্ণ্যমান ছায়া।

সেই অগণিত ছায়ার মধ্যে ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কৌশিক হালদার। সে খুঁজছিল রঞ্জন নামে ওই গাধাটাকে, যে তার বউয়ের সঙ্গে আজ দুপুরে আশনাই করছিল। বাগানের লেবুগাছের নীচে কেমন জোড়া-পায়রার মতন বসেছিল দুটোতে। ওর কাঁধে মাথা রেখে বসেছিল মুনিয়া। কী আমার সাধের নাগর রে! শালা চুমুটা খেল না কেন? সাহস পেল না?

কৌশিক পকেট থেকে হাতের মুঠোর মাপের ছোট্ট ডিজিটাল-ক্যামেরাটা বার করল। তারপর একটু ফাঁকা জায়গা খুঁজে নিয়ে চোখ রাখল স্ক্রিনে। পেছনদিক থেকে তোলা মুনিয়া আর রঞ্জনের ছবি। আঃ, চুমুটা খেলে কত চমৎকার হত গল্পটা। কপালটাই খারাপ।

কৌশিক ভিডিও রেকর্ডিং-এর সাউন্ডটা একটু বাড়িয়ে কানের সঙ্গে স্পিকারটা সেঁটে ধরল। পরিষ্কার শুনতে পেল কথোপকথন—মুনিয়া, তুই কি কৌশিকের হাত থেকে মুক্তি চাস?

— চাই।

খ্যাঁক করে কিছুক্ষণ আপনমনে হাসল কৌশিক হালদার। আরে বাবা, মুক্তিপণ না দিয়েই মুক্তি চাইবি? তাই কি হয়?

এই কথাটাই ওই রঞ্জনকে জিজ্ঞেস করবে বলে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে কৌশিক। তার বউয়ের প্রেমিককে। সে একটা প্রস্তাব দেবে রঞ্জনকে ...

কিছুক্ষণের মধ্যেই কৌশিক রঞ্জনকে দেখতে পেল। বেটা একটা বড় রংচঙে তাঁবুর পেছনদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সঙ্গে অবিকল আরব্যরজনীর বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসা একটা হুরি। সেইরকমই ঢোলা পাজামা, যার পায়ের গোছের কাছটা চাপা; সেইরকমই খাটো কামিজের নীচে বেরিয়ে থাকা সরল তলপেট আর গভীর নাভি; সর্বোপরি সেইরকমই ছুরির ফলার মতন ঝিকমিকে দুই চোখের মণি।

কৌশিক নিজের মনে বলল, ওরে বাবা! গুরুদেব তো দেখছি অনেক ওপর তলার মাগিবাজ। দুপুরে মুনিয়া, সন্ধেবেলায় ইরানী বুলবুলি!

আরে, গুরুদেব নিজেই তো আমাকে হাত নেড়ে ডাকছে দেখছি। সঙ্গে মেয়েটাও চোখ মারল মনে হল না? জয় গুরু। দেখা যাক লাক আজকে কোথায় নিয়ে যায়। — কৌশিক ওই বেদে মেয়েটা আর রঞ্জনের পেছনে পেছনে মাথা নিচু করে তাঁবুর ভেতরে ঢুকল।

তাঁবুতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝালো একটা গন্ধ যেন হিংস্র জন্তুর মতন কৌশিকের ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এ যাবৎ চেনা সমস্ত গন্ধের থেকে আলাদা সেই গন্ধ। কীসের গন্ধ এটা? কোনো ফুল? আতর? যাই হোক, সেই গন্ধের দাপটে কৌশিক কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ল। যেভাবে রঞ্জনকে খেলিয়ে ডাঙায় তুলবে বলে ভেবেছিল, কৌশিক সেভাবে কথা শুরু করতেই পারল না। সে সরাসরি ভিডিও ক্যামেরার

স্ক্রিনে রঞ্জন আর মুনিয়ার ছবিটা দেখিয়ে রঞ্জনকে প্রশ্ন করল, এই ছবিটা তুষকাঠির লোকেরা দেখলে তোমাকে আর সাধক বলে ভক্তি করবে?

না। করবে না। — ঘাড় নাড়ল রঞ্জন।

কৌশিক বুঝতে পারল কোথাও একটা গোলমাল হচ্ছে। রঞ্জনের তো এতটা নির্বিকার থাকবার কথা নয়। তার তো ভয় পাবার কথা ছিল। তার জায়গায় ওর চোখে মুখে যে ভাবটা ফুটে উঠেছে সেটা ঘেন্নার, রাগের।

অপ্রস্তুত ভঙ্গিতেই কৌশিক রঞ্জনকে ফের প্রশ্ন করল, কিনতে চাও এই ভিডিও ক্লিপ টা?

কৌশিকের এই কথার উত্তর না দিয়ে রঞ্জন তার দিকে প্রতিপ্রশ্ন ছুড়ে দিল — ওই ক্যামেরাতেই আরো একটা ক্লিপ রয়েছে, তাই না কৌশিকবাবু?

রঞ্জনের এই আচমকা প্রশ্নে থতমত খেয়ে গেল কৌশিক। মুখে জবাব এল না। রঞ্জন একই সুরে বলল — দেবযানী বলে একটা মেয়ের ছবি? রয়েছে না ওই ক্যামেরার মেমারিতে?

কৌশিকের কান থেকে সহসাই মেলার সমস্ত চিৎকার মুছে গেল। মনে হল আকাশ ফাটিয়ে রঞ্জন তাকে প্রশ্ন করছে — সুযোগ পেলে নিজের স্ত্রীর নগ্ন শরীরের ছবিও তুমি বিক্রি করতে পারো, তাই না?

একটা সরু ফিতে পেছন থেকে কৌশিকের গলাকে ঘিরে ধরল। একটা ফাঁস পড়ল রেশমি ফিতেটায়। কৌশিকের চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল সেই আরব্য-রজনীর হুরি তার চুলের ফিতের দুটো প্রান্ত দু-হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ফিতের আচমকা এক টানে কৌশিকের মাথাটা পেছনদিকে হেলে পড়ল।

পৃথিবীতে কৌশিকের শেষ মুহূর্তগুলো ভালো কাটেনি।

সেই সন্ধেবেলায় মুনিয়া দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। তার ঠোঁটের কোণে একটা তেতো হাসি।

সে ভাবছিল, আজ দুপুরে কে তাকে মুক্তির কথা জিজ্ঞেস করল?

না, রঞ্জন ভট্টাচার্য। যার নিজেরই আচার-আচরণের কোনো স্থিরতা নেই।

কিন্তু কত ভালো হত যদি সত্যিই ওই কৌশিক হালদার নামের ঘৃণ্য লোকটাকে কেউ হাপিশ করে দিত।

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই মুনিয়ার চোখে পড়ল কতগুলো মোটরগাড়ি তুষকাঠি গ্রামে ঢুকছে। চারটে গাড়ির আটটা হেড-লাইটের আলো লাফাতে লাফাতে দুলতে দুলতে ভাঙাচোরা রাস্তা ধরে তাদের বাড়ির দিকেই এগিয়ে আসছে। রেলিং দিয়ে ঝুঁকে পড়ে মুনিয়া দেখল একদম প্রথমে যে কালো টাটা-সুমোটা আসছে সেটা তার চেনা। ওই গাড়িটায় চড়েই সেদিন তারা আসানসোল থেকে তুষকাঠিতে এসেছিল। পরের তিনটে গাড়িই জিপ। পুলিশের জিপ। প্রত্যেকটাতেই কয়েকজন করে খাকি পোশাকের মানুষ বসে আছে।

মুনিয়ার আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না। সে প্রায় পাখির মতন উড়ে নীচে নামল, এবং দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে রাস্তার মোড়েই পুলিশের কনভয়ের সামনে দুহাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় জিপে ড্রাইভারের পাশেই বসেছিলেন মৃদুল মুস্তাফি। তিনি গাড়ি থেকে নেমে এলেন। মুনিয়া তার সামনে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আমি সব জানি। আগে জানতাম না। আজ একটু আগেই জেনেছি। আপনারা ওকে ধরুন, যা ইচ্ছে তাই করুন। কিন্তু দোহাই আপনাদের, আমার বাবা যেন কিছু জানতে না পারেন। মুনিয়া মৃদুলবাবুকে তার বাবার শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়ে কাকুতি মিনতি করতে লাগল।

মৃদুল মুস্তাফির চোখের দৃষ্টি সমবেদনায় নরম হয়ে এল। তিনি বললেন, তাহলে আপনার হাজব্যান্ডকে চুপচাপ বেরিয়ে আসতে বলুন। ও গন্ডগোল না করলে আমরাও করব না।

কিন্তু ও তো এখন বাড়িতে নেই।

মৃদুল মুস্তাফি এবং তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ও.সি. বিপুল সরকার দুজনেই মুনিয়ার এই কথায় সচকিত হয়ে উঠলেন । প্রশ্ন করলেন, বাড়িতে নেই? কোথায় পালাল?

মনে হয় মেলার দিকে গেছে । সন্ধের পর ওখানেই ঘোরাঘুরি করে তো ।

দ্রুত পায়ে গাড়িতে উঠতে উঠতে মৃদুল মুস্তাফি ও.সি.-কে বললেন, কাজটা ডিফিকাল্ট হয়ে গেল মিস্টার সরকার। মেলার মধ্যে থেকে একটা মানুষকে খোঁজা এবং পাকড়াও করা ... এর চেয়ে তো খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজা সহজ ছিল ।

বিপুল সরকার একটু ইতস্তত করে বললেন, কাজটা অতটা কঠিন হবে না স্যার ।

কেন? একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলেন মৃদুলবাবু ।

আমি আপনাকে জিজ্ঞেস না করেই একটা কাজ করে ফেলেছিলাম । গতকালই দুজন প্লেন ড্রেসের ইনফর্মারকে তুষকাঠি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম কৌশিক হালদারকে শ্যাডো করবার জন্যে । আসলে আমি ভেবেছিলাম আমরা আসার আগেই যদি স্কাউড্রেলটা এখান থেকে ভাগবার চেষ্টা করে ... ।

মৃদুল মুস্তাফি নিজের বিরাট হাতের মুঠোর মধ্যে বিপুল সরকারের হাতটা জড়িয়ে ধরে বললেন, ওঃ, বাঁচালেন ভাই । কীভাবে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব ।

মুনিয়াদের বাড়ির সামনে থেকে রওনা হয়ে পুলিশের গাড়িগুলো মেলার পরিধি ধরে ধীরে এগিয়ে চলল । চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে বিপুল সরকার বললেন, দাঁড়ান স্যার । গোষ্ঠ আর শিবু আমাদের দেখতে পেয়েছে । ওই যে, হাত নেড়ে ডাকছে । তারপরে দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে তিনি দৌড়লেন বেদেদের তাঁবুর দিকে । পেছন পেছন বাকি আটজন পুলিশ এবং মৃদুল মুস্তাফি । একজন রোগা মতন লোক উল্টোদিক থেকে দৌড়ে এসে বিপুল সরকারকে স্যালুট করে কিছু বলবার জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেল । তারপর জিজ্ঞাসু চোখে মৃদুলবাবুর দিকে তাকাল ।

বিপুল সরকার তার ইশারা বুঝে বললেন, আরে গোষ্ঠ, উনিই সি. আই. ডি.র অফিসার, মুস্তাফিসাহেব । যা বলবে ওনার সামনেই বলো ।

স্যার, অদ্ভুত ব্যাপার । সেই সন্ধের মুখে আমাদের পাখি ওই তাঁবুতে ঢুকেছে । তা প্রায় তিন ঘণ্টা হয়ে গেল । তখন থেকে আমি এই তাঁবুর সামনে আর শিবু পেছনে পাহারা দিয়ে বসে আছি । পাখির কিন্তু বেরোবার নামটি নেই ।

এইরে । তাঁবুর ফাঁকফোকর দিয়ে পালাল না তো?

কী যে বলেন, স্যার? পেছনে তো ধু ধু মাঠ । ওই মাঠ পেরিয়ে মানুষ কেন, একটা বেড়াল হেঁটে গেলেও নজরে পড়ে যাবে । আর শিবু তো ঠায় ওই পেছনের মাঠের দিকে তাকিয়ে বসে আছে ।

বিপুল সরকারের ইশারায় আটজন কনস্টেবল তাঁবুর চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল । বিপুল আর মৃদুল মুস্তাফি ঢুকলেন তাঁবুর ভেতরে । দেখা গেল বুড়ো আর বুড়িই কেবল বসে বসে তামাক টানছে । বাকি সবাই পুতুল নাচাতে ব্যস্ত । বুড়ো আর বুড়ি বহুদর্শী । দুই প্লেনড্রেসের অফিসারকে দেখে চিনতে পারল এবং সম্মান জানিয়ে বসতেও বলল । তবে খুব একটা যে ভয় পেয়েছে এমন ভাব দেখাল না ।

কৌশিক হালদার বলে একটা ছেলে এই তাঁবুতে ঢুকেছিল । সে গেল কোথায়? সরাসরি প্রশ্ন করলেন মৃদুল মুস্তাফি ।

বেদে বুড়ো শান্তভাবে জবাব দিল, আমাদের দলের বাইরে আর একজন লোকই এখানে আছে । তার নাম কৌশিক নয়, রঞ্জন । ওই যে, বোবা রাজপুত্রের পুতুল নিয়ে খেলা দেখাচ্ছে । এ ছাড়া আর কোনো বাইরের লোক এই তাঁবুতে ঢোকেনি । আপনি ইচ্ছে করলে সার্চ করে দেখে নিতে পারেন ।

অগত্যা তাই-ই করতে হল দুই পুলিশ অফিসারকে । তারা দুজনে মিলে তন্ন তন্ন করে তাঁবুর প্রতিটি কোণা, প্রতিটি প্যাকিং বাক্সের অভ্যন্তর, পর্দার আড়াল খুঁজে দেখলেন । তাঁবুর ভেতর থেকে সরাসরি টিনের ঘেরাটোপের ভেতরেও ঢোকা যায় — যেখানে দাঁড়িয়ে আটজন বেদে আর রঞ্জন পুতুল নাচাচ্ছে । সেখানেও

ঢুকলেন দুই অফিসার। ভালো করে চেয়ে দেখলেন প্রত্যেকের মুখের দিকে। না, কোথাও নেই কৌশিক হালদার।

মৃদুল মুস্তাফি বাইরে বেরিয়ে এলেন। দর্শকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে কিছুক্ষণ পুতুলনাচ দেখলেন। অদ্ভুত এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে এই মঞ্চের সামনে। হেমন্তের মাঠের মধ্যে থেকে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে ঘন কুয়াশা। সেই কুয়াশা ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে মঞ্চের ওপরে। হ্যাজাকের হালকা সবুজ আলোয় সেই কুয়াশা এক অতল দিঘির সবুজ জলের মতন নড়াচড়া করছে; মনে হচ্ছে জলের নীচেই যেন অভিনীত হচ্ছে ইরানী রাজকুমারীর দুঃখের পালা।

সবথেকে আশ্চর্য লাগছে পুতুলগুলোকে। বার্নিশ দিয়ে পালিশ করা তাদের মুখ হ্যাজাকের আলোয় চকচক করছে। নিষ্পলক চোখগুলো সুখে-দুঃখে হর্ষে-বিষাদে সমান বিস্ফারিত। যেহেতু বেদেদের তেমন কারিগরি দক্ষতা নেই তাই পুতুলদের হাত পায়ের জোড়ও ভালো করে বানাতে পারেনি ওরা। অতএব নাচের পুতুলদের মুভমেন্ট বলতে কেবল দেহকাণ্ডের ঝটকা মেরে ঘুরে যাওয়া — যেভাবে নিচ থেকে তাদের ঘোরানো হচ্ছে আর কি। তারা ঠোঁট না নেড়েই কথা বলে। টিনের আড়াল থেকে তাদের হয়ে কথা বলছে বেদে নারী- পুরুষেরা।

শুধু বোবা রাজপুত্রের কোনো ডায়ালগ নেই। আড়ষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে, বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি নিয়ে, ঝলমলে আলখাল্লা আর একমাথা কোঁকড়া চুলের বোঝা নিয়ে সে কেমন করুণভাবে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে মঞ্চের একটা কোনায়। তার মানে দাঁড়িয়ে রয়েছে রঞ্জন নামে সেই ছেলেটাও, যার হাতে ওই পুতুলের শরীর। মৃদুল মুস্তাফি তার লোকেদের হাতের ইশারায় গাড়িতে ফিরে যেতে বললেন। মুখে বললেন, চলো গোষ্ঠ। এখানে কেউ নেই। তোমরা ভুল লোককে ঢুকতে দেখেছ।

দুদিন বাদে বিকেলবেলায় মুনিয়ার আসানসোলের ফ্ল্যাটের দরজায় কলিং- বেল বেজে উঠল। দরজা খুলে মুনিয়া দেখল, মৃদুল মুস্তাফি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সে তাঁকে ভেতরে এনে বসাল।

রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে মৃদুলবাবু একবার ছন্নছাড়া ঘরটাকে চোখ দিয়ে জরিপ করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কৌশিক হালদার কোথায় গিয়েছে আপনি জানেন?

মুনিয়া ঘাড় নাড়ল।

সত্যিই জানেন না? রঞ্জনবাবু আপনাকে কিছু বলেননি?

মুনিয়া সচকিত হয়ে তাকাল মৃদুল মুস্তাফির দিকে। তারপর আবার ঘাড় নাড়ল।

মৃদুলবাবু তার অ্যাটাচির মধ্যে থেকে একটা ছোট ডিজিটাল-ক্যামেরা বার করলেন। বললেন, সেদিন বেদেদের তাঁবুর ভেতর থেকে এটা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। কাউকে জানাইনি। তবে এখান থেকেই জানলাম, আপনি রঞ্জনবাবুর কাছে মুক্তি চেয়েছিলেন।

মুনিয়া মাথা নিচু করল।

রঞ্জনবাবু আপনাকে মুক্তি এনে দিয়েছেন। কৌশিক হালদার আর কোনোদিনই ফিরবে না। জানেন সেকথা?

মুনিয়া দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল। বলল, আমি জানি না, সত্যিই কিছু জানি না।

মৃদুলবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমি বিশ্বাস করি আপনার কথা। সেই মুক্তি কীভাবে এসেছে তা রঞ্জনবাবু কোনোদিনই আপনাকে জানাবেন না। জানাবার মতন নয় সে কথা। বড় বীভৎস ... বড় বীভৎস ...।

মৃদুলবাবুর কথা মাঝপথেই থেমে গেল। তিনি হঠাৎই যেন মনে-মনে অন্য কোনো জায়গায় চলে গেলেন।

নিস্তব্ধ ঘরে শুধু মুনিয়ার ফোঁপানির শব্দ শোনা যাচ্ছিল ।

মৃদুলবাবু একটু বাদে গা-ঝাড়া দিয়ে বসলেন । তারপর বললেন, এই কেসটা আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি । রিপোর্টে বলব, দ্যা কালপ্রিট ইজ অ্যাবস্কন্ডিং । দুটো জীবন নষ্ট হয়েছে । এখন এটাকে নিয়ে নাড়াঘাটা করা মানে আপনার জীবনটাও নষ্ট করা । আশা করি আপনি তুষকাঠিতে ফিরে যাবেন । চারবছর আগে যে ভুলটা করেছিলেন সেটাকেও এবার শুধরে নেবেন । মনে হচ্ছে রঞ্জনবাবুর সন্ন্যাসের পথ খুব সহজেই ঘরের দিকে ফিরে আসবে । আর আমার একটা পরামর্শ মনে রাখবেন । কৌশিক কোথায় সেটা কখনোই জানার চেষ্টা করবেন না । আপনি সহ্য করতে পারবেন না ।

হতবাক মুনিয়াকে দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখে মৃদুল মুস্তাফি আসানসোলের ভিড়ে ঠাসা রাস্তায় নেমে এলেন । আপনমনে হাঁটতে হাঁটতে ভাবলেন, এই মুহূর্তে বেদেদের দল হয়তো পৌঁছে গেছে কোনো ধু ধু প্রান্তরের মধ্যে এক জলার ধারে । সন্ধে নামছে । শরঘাসের জঙ্গলের আড়ালে, কালো নরম মাটির বুকে, বেদে যুবকদের কোদালের কোপে কোপে একটা কবর খোঁড়া হচ্ছে ।

সেই কবরে ওরা শুইয়ে দেবে বোবা রাজপুত্রের পুতুলটাকে ।

মর্তুকাম

বাণী বসু



দীপ্তটা মারা গেল। আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু দীপ্ত, আজকাল যাকে বলছে 'ভালো বন্ধু'। কোনো অসুখে—বিসুখে স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, এমনকী দুর্ঘটনাও নয়। মার্ডার। কোনো মৃত্যুরই কোনো সান্ত্বনা নেই। কিন্তু মাত্র বছর দুয়েক আগেই দীপ্তর ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হয়েছিল। এমনও হয়েছে ছ—সাত রাত ওর জন্যে নীলরতনে ঠায় বসে আছি। মশার কামড় খাচ্ছি আর চমকে চমকে উঠছি। এই বুঝি কোনও খারাপ খবর এল...এই বুঝি...। এক এক সময় এমন হয় না? বাড়িসুদ্ধু আপনজন বন্ধুবান্ধব ভেতরে ভেতরে কাঁটা হতে হতে মড়াকান্না কাঁদতে তৈরি হয়ে যায়? তখন যদি দীপ্তটা সত্যি—সত্যি মারা যেত, বোধহয় তৈরি ছিলাম বলেই মেনে নিতাম। বুকের ভেতরটা কিছুদিন হা—হা করত, চায়ের দোকান, ধাবা, মাঠ—ময়দান যেসব জায়গায় দুজনে কত ঘুরেছি সেখানে স্মৃতি হাঁ করে থাকত। ওর বাড়িতে থেকে থেকে খোঁজখবর নিতাম—মাসিমা কেমন আছেন? কোনও দরকার হলে নিশ্চয়ই বলবেন...ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু দীপ্ত দিব্যি ফিরে এল। সেই হালকা—পলকা দীপ্ত, কথায় কথায় হঠাৎ চুপ করে যাওয়া, নিচু গলায় খিস্তি।

দুর্ঘটনায় মারা যাওয়াও ওর অসম্ভব ছিল না। কেননা শ্যামবাজার—শ্রীরামপুরে বাসে ও বালি থেকে উঠত, একদিন জি.টি. রোডে সেটা একটা লজঝড়ে বাসের সঙ্গে লেগে যায়। ঘ্যাচাং। ডান সাইডে যারা ছিল তাদের মধ্যে দু—তিনজন স্পট ডেড, বেশ কয়েকজন মারাত্মক জখম। দীপ্ত বসেছিল ডান দিকেই, শেষ সিটে। তেমন কিছুই হয়নি। একটু ফার্স্ট এড দিয়ে ছেড়ে দিল। সবাই বলল— লগনচাঁদা ছেলে, মঙ্গল খুব স্ট্রং, তা নয়তো আগে জখম, পাশে জখম, ওইভাবে বেঁচে যায়? ভাবাই যায় না।

আজকাল লোকে বাসে—মিনিবাসে ওঠে প্রাণ হাতে করেই। ভালো করে চালাতে না শিখেই লাইসেন্স পেয়ে যাচ্ছে সব, হাত দুরস্ত হতে না—হতেই বাস—ট্রাকের স্টিয়ারিং ধরছে। তা তখন যদি মারা যেত, বিরাট একটা কান্নাকাটি, দৌড়াদৌড়ি, বুক চাপড়ে ভাগ্যকে অভিসম্পাত, মর্গ... এইভাবে শেষ হয়ে যেত ব্যাপারটা। বাস কোম্পানি থেকে ফ্যামিলিকে ক্ষতিপূরণ দিত কিংবা দিত না। ফ্যাক্টরিতে ওর বোনকে একটা চাকরি পাওয়াবার জন্যে তদবির করতাম। মেয়েটা সবে সাবালক হয়েছে, কোনও ট্রেনিং নেই বলে ওরা গাঁইগুঁই করত। আমরা লড়ে যেতাম। কিন্তু মঙ্গল স্ট্রং। বেঁচে গেল। সবাই বলল—ছেলেটা দীর্ঘায়ু হবে। আমার মনে আছে, দীপ্ত বলেছিল — দীর্ঘায়ু না দ্রিঘাংচু? মাঝেমাঝেই মাসিমাকে বলত—অত হাঁকপাক করো কেন বলো তো? দেখলে তো শালা ম্যালিগন্যান্ট আমার কিস্যু করতে পারল না। অ্যাকসিডেন্ট? সিনে নেই। কী রে জয়, কী বুঝছিস গুরু?

মুখে কিছু আটকায় না? মাসিমা রাগ করে বলতেন—ওভাবে বলতে নেই। গ্রহ কুপিত হন।

মাসিমার সামনে এই। আমাদের সামনে আবার দীপ্ত অন্য মানুষ। তখন বলত—কী করা যায় রে জয়, কিছু বল?

—কীসের কী?

—দেখছিস তো চারদিকে কী অবস্থা একেবারে নো—হোয়্যার হয়ে আছি। এক মুহূর্ত ভাল্লাগছে না। শালারা বাবাটাকে ফুটিয়ে দিলে। মাথার ওপরে কেউ থাকার সোয়াস্তি কী জীবনে জানলাম না। মুখ—শুকনো বিধবা মা, বোনটা কালো, কত দূর পড়াতে পারব, পারলেও কোনও হিল্লে হবে কি না...তুই কিছু ভাবিস? তোর অবশ্য বাপ আছে।

—তেমনি দুটো বোন, একটা ভাই এখনও স্কুলে। তবে কী জানিস, আমরা যা হোক করে চালিয়ে নিচ্ছি। চারপাশে লোক দ্যাখ—ধুঁকছে। তাদের তুলনায়...

এটুকুই আমাদের সান্ত্বনা। ধরুন চৌরঙ্গি এলাকায় সার সার গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। জ্যাম—জমাট একেবারে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। সড়সড় সড়সড় করে কিছু ভিখিরি এঁকেবেঁকে গাড়িগুলোর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়। কার কোলে রিকেটি ছেলে, কার একটা হাত কাঠের মতো, কার গাল এমন ভাঙা, চোখ এমন গর্তে ঢোকা যে মনে হয় এই বুঝি শ্মশান থেকে উঠে এল। বাচ্চা ছেলে, করুণ মুখে পয়সা চাইছে, একটা গাড়ির কাচ নেমে গেল, কোনও মহিলা কিছু দিলেন। গাড়ি চলে যেতেই ছেলেটা ষাট—বছুরে বুড়োর মতো মুখ করে ভেঙালে, ভিক্ষে পছন্দ হয়নি।

এই দৃশ্যগুলো আমরা লোলুপ চোখে দেখতাম, ঠিক যেমনভাবে কাঙালরা সুখাদ্য দেখে— শিককাবাব, গলদা চিংড়ির কালিয়া, মটন দো পিঁয়াজা। দীপ্ত বিড়বিড় করত—ঠিকই, এর চেয়ে বোধহয় ভালো। আমি বিড়বিড় করতাম—আমাদের চেয়েও খারাপ।

দীপ্ত বলত—টপ করে লাল আলোটা সবুজ হয়ে গেলে আর সব গাড়িগুলো একসঙ্গে ছেড়ে দিলে, এইসব ভিখিরিগুলো তো পিষে যাবে রে জয়!

আমি বলতাম—রাস্তা ভর্তি ধর থকথকে রক্ত...

—রাস্তা ভর্তি ধর থ্যাঁতলানো মড়া...

—কেউ কি বাঁচবে?

—অসম্ভব। কেউ না।

—আর গাড়িগুলো?

—কয়েকটা পড়ি—মরি করে পালিয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু বাকিগুলোতে জনগণ নির্ঘাত আগুন ধরিয়ে দেবে। টেনে নামাবে ড্রাইভারগুলোকে। মার মার বেদম মার।

পুলিশ আসার আগেই ফুটে যাবে।...হাসতাম আমি।

—শুধু ড্রাইভার? মালিকগুলো!

—ঘাবড়াচ্ছিস? বেশির ভাগই নিজেরা ড্রাইভ করে। আর পিছনে হেলান দেনেওয়ালারা? পার পাওয়া অত সোজা নয়! রেমন্ডের সুট, এক্সকালিবারের শার্ট, নাইকির শু...কিস্যু করতে পারবে না। গণ—পিটুনির পর কে বড়সাহেব আর কে ছোটসাহেব ধরতেই পারবি না। পেট্রল ট্যাংকে কেউ ধর একটা বিড়ি ফেলে দিল। ব্যস সব কাঠকয়লা। ছুঁ মন্তর ছুঁ মন্তর ছুঁ মন্তর/ছুঃ।

দুজনে খ্যা খ্যা করে হাসি।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ওরকম কিছু ঘটে না। ভিখিরিগুলো ম্যাজিক জানে, কিংবা ওদের বডিগুলো হাওয়া দিয়ে তৈরি। এ গাড়ির বনেট, ও গাড়ির বাম্পার, সে গাড়ির বডির পাশ দিয়ে ভানুমতীর খেল দেখাতে দেখাতে ঠিক বেরিয়ে আসে সব। গাড়িগুলোও এঁকেবেঁকে, কায়দা করে পাশ কাটিয়ে আবার অন্য কোনও মোড়ে সিগন্যাল খাবার জন্যে হুশ হয়ে যায়। ঠিক যেমন ম্যালিগন্যান্ট বা অ্যাকসিডেন্ট টপকে বেঁচে থাকে দীপ্ত, বেঁচে থাকি আমি।

দীপ্ত আসে শ্রীরামপুর থেকে, আমি শ্যাওড়াফুলি। নিজেদের মধ্যে আমরা বলি বিশ্রীফুলি, আর শ্যাওড়াপেতনিপুর। কারখানায় যাই, খোঁচা—দাড়ি খাড়া চুল হাজিরাবাবুর খেরোর খাতায় সই করি—দীপ্ত সমাদ্দার, রফিক আসলাম, বিহারীলাল পাণ্ডে, মহম্মদ বেণু, ইসমাইল ফাকির শেখ...।

এই মাসে মান্থলি আমার, পরের মাসে দীপ্তর। একজনই পকেট থেকে একটু বার করি, বলি—আমরা একসঙ্গে দাদা, ডেলি।

এখন চিনে গেছে। কেউ আর ওসব দেখা—টেখার ঝামেলায় যায় না। দীপ্ত বলে 'পুরনো পাপী' বুঝলি তো? দাগি হয়ে গেছি।

ট্রেনে কারও হাতে বাংলা কাগজ থাকলে তাক বুঝে ছোঁ মারি। —দাদা ওই মাঝের পাতাটা, পাঁচ নম্বর, পাঁচের পাতা।

বিরক্ত হয়, তো হোক, বয়ে গেল। কাগজ খুলে খুঁজে খুঁজে দেখি—জমজমাট খবরাখবর আছে কি না। যেমন ধরুন নস্কর লেনে দোতলা বাড়িতে গৃহিণী—হত্যা, রক্তগঙ্গা, আলমারি খোলা, উদ্দেশ্য ডাকাতি। কিংবা বেহালা পর্ণশ্রীতে গৃহবধূর আত্মহত্যা, গলায় দড়ি। দড়ির দাগ বসেনি, জিভ ঝোলেনি, সন্দেহ—খুন। মহিলার স্বামী ও তাঁর বান্ধবীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। বোবা—কালা কিশোরী পুলিশব্যারাকে ধর্ষিত, ডাক্তারি পরীক্ষা হচ্ছে। অপরাধী বলে এখনও কাউকে শনাক্ত করা যায়নি। নিরুদ্দিষ্ট ডাক্তারের মৃতদেহ পুকুরধারে, কাদায় মধ্যে পোঁতা, আগের রাতে সহকর্মীর বাড়ি নেমন্তন্ন ছিল। শালবনিতে ডাকিনী সন্দেহে বৃদ্ধাকে খুন। কালাহাণ্ডিতে অপহৃত বালকের ছিন্নমুণ্ড দেহ রঘুনাথপুরে, সন্দেহ নরবলি। প্রকাশ্য রাজপথে গণধর্ষণ ও হত্যা। ফোর্ট উইলিয়ামের পাশে যুবতীর মৃতদেহ, সন্দেহ ধর্ষণ ও হত্যা, বালক—চাকরকে চোরের মার দিয়ে, ঘরে বন্ধ করে রেখে দম্পতি হাওয়া বদলাতে উধাও। প্রোমোটার খুনের চক্রান্তে জড়িত সন্দেহে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি ফেরার হবার চেষ্টায় ছিলেন।

দীপ্ত আমাকে কনুই দিয়ে ঠেলা মারে—কী রে জয়, খুন—টুন করলেও তো বেশ আপনি—আজ্ঞে পাওয়া যায় রে! খবরের কাগজওয়ালারা তো খুব খাতির করে!

—যা বলেছিস। মহিলার স্বামী ও 'তাঁর' বান্ধবীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, 'তিনি' ফেরার হবার চেষ্টায় 'ছিলেন'।

আমাদের উল্লাস দেখে পাশের লোক বিরক্ত হয়ে তাকায়। —কাগজটা কি আপনাদের দেখা হয়ে গেছে? —শুকনো গলায় বলে।

—নিশ্চয়, নিশ্চয় সার। চুম্বুক মানে চুম্বকটুকু পড়ে নিয়েছি, নিন, ধনিয়বাদ দাদা।

—ঠিকাছে, ঠিকাছে।

সেই দীপ্তই খুন হয়ে গেল।

খবরটা কাগজেই পড়ি। লোকাল চায়ের দোকানে গিয়ে জম্পেশ করে একটা ডবল—হাফ আর একটা সর্ষের তেলে ভাজা ওমলেট আমার রোববারের মেনু। সঙ্গে কাগজ। কাগজটা হাতবদল হতে থাকে। এই কাগজের লোভেই যে অনেক খদ্দের তার ধরা দুধের চা খেতে আসে চা—ওয়ালা তারক তা বিলক্ষণ জানে। রোববার কাগজে কাগজে ছয়লাপ। লোকে বলে 'পেপার'। একখানা 'পেপার' পেয়ে যাবার কোনও অসুবিধে নেই। প্রথম পাতার বাঁ দিকে লম্বা কলমটায় দেখি 'ব্যান্ডেল লোকালে যুবা খুন'। আবার 'যুবা'! আমি শব্দ করে হাসি। যুবাই বটে, যুবা কি এখনও আছে না কি? এখন সব ছেলে—ছোকরা ছ্যামরা মদ্দ, আধবুড়ো, সিকিবুড়ো। 'যুব্বা!' তা তিনি কেমন খুন হয়েছেন দেখি। যদি নতুন কিছু হয়।

লাস্ট ট্রেন সাইডিংয়ে নিয়ে যাবার সময়ে কিছু কিছু কর্মী লক্ষ করেন একটি কামরা থেকে লালজল বেরিয়ে আছে। বড্ডই লাল, জমাট মতো, তখন কামরায় উঠে দেখা যায় এক যুবা, পরনে ছাই রঙের শার্ট এবং খাকি প্যান্ট, গলার নলি ও কবজির শির কেটে দেওয়া হয়েছে কোনও সূক্ষ্মধার অস্ত্র দিয়ে। অস্ত্রটি ঘটনাস্থলে

পাওয়া গেলে এটি আত্মহত্যার কেস বলে সাবুদ হত। কিন্তু অস্ত্রটি পাওয়া যায়নি। কবজি, গলা কেটে অস্ত্রটা জানলা গলিয়ে ফেলে দেবার সম্ভাবনা অবশ্য উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ। বডি পোস্টমর্টেমে যাচ্ছে। আশ্চর্য, যুবাটির পকেটে কিছুই পাওয়া যায়নি, টিকিট—দৈনিক বা মান্থলি, কোনও টাকাপয়সা বা মানিব্যাগ, হাতে ঘড়ি নেই। কোনো ভাবেই শনাক্তকরণের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। দেখে মনে হচ্ছে না, কিন্তু সে কি কোনও কারণে অনেক টাকা নিয়ে যাচ্ছিল?

চিহ্ন পাওয়া যায়নি তো ছবি দে! বিরক্ত হয়ে বলি। একটা কাজ যদি এরা সুষ্ঠুভাবে করতে পারে! যখন পচে—গলে যাবে তখন দিবি বোধহয়। আরও কতকগুলো খুন, সুইসাইড, ধর্ষণের ঘটনা পড়ি নিয়মমাফিক। তারপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ি চলে যাই। কেননা যাবার পথে বাজারটা করে নিয়ে যেতে হবে। বেশি সকাল সকাল গেলে মাছ আগুন, বেশি বেলা করে গেলে বেগুন। অর্থাৎ পচা—পাচকো।

দেখেশুনে গোটা দুই ফলুই মাছ কিনি। কড়া করে ভাজলে কাঁটা টের পাওয়া যায় না। রোজ রোজ মাছের তেল—কাঁটার চচ্চড়ি কিংবা তেলের বড়া খেতে খেতে মুখ পচে গেছে।

আপিসের দিনে কাক—চান, জলও থাকে না তেমন। আজ একেবারে গলির মোড়ে টিউবওয়েলের তলায় বসে পড়ি, লাল সাবান মেখে জব্বর চান। বাড়ি গিয়ে এখন একটু আয়েশ করব, গায়ে পাউডার ছড়িয়ে একটা ফতুয়া আর লুঙ্গি, তেল—মাখা চুলে যত্ন করে টেরি কাটব। তারপর ফলুই মাছের কড়া করে ভাজা মাখো—মাখো ঝাল দিয়ে মুসুর ডাল আর আলুপোস্ত দিয়ে একথালা ভাত, তারপর বাড়ির একমাত্র তক্তপোশটা দখল করে নিয়ে দিবানিদ্রা। তা সেই দিবানিদ্রারই আয়োজন করছি এমন সময়ে রুখু চুল, শুখো মুখ, লাট খাওয়া সালোয়ার—কামিজ আর হাওয়াই চপ্পল পায়ে শিপ্রা এসে হাজির।

ভাই খুলে দিয়েছিল। এসে বলল—দাদা, কে এসেছে, একজন মেয়ে, বাইরে এসে দেখে যাও!

মেয়ে? আমার কাছে? মেয়ে—টেয়ে আমার কাছে আসবার মতো তো কেউ নেই! আওয়াজ—ফাওয়াজ দিলে অনেক সময়ে মেয়েরা খুব পটে যায়। ওটা এক ধরনের খোসামোদ। ওরা জানে। আমার তোমাকে খাসা লাগছে, বুঝলে মেমসাব, তো সেই পুলকটাই এইভাবে ঘুরিয়ে নাক দেখিয়ে দেখাচ্ছি। এটা বোঝে বলেই রাগতে রাগতে ঠোঁটের কোণে একটু প্রশ্রয়, চলাফেরার একটু ময়ূরী ময়ূরী ভাব ফুটে ওঠে। তো আওয়াজ—ফাওয়াজ দেওয়া তো অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি। এখন আবার রোববারের দুপুরটা মাটি করতে কোন মাধুরী এলেন!

উঠে দাঁড়িয়েছি, শিবানী আমার বড় বোন, শিপ্রাকে নিয়ে ঢুকল।

—আরে শিপ্রা? কী ব্যাপার? হঠাৎ? এখন?

শিপ্রা লালচে চোখ মেলে বলল—দাদা কাল বাড়ি ফেরেনি।

—বাড়ি ফেরেনি? দীপ্ত? সে কী! কালকে ওর ওভারটাইম ছিল অবশ্য, তা কোনও খবরও দেয়নি?

—আপনি...মানে আপনারও তো ওভারটাইম...আমরা ভেবেছিলাম আপনার কাছ থেকে কোনও খবর পাব।

—আমি কালকে ওভারটাইম করিনি শিপ্রা। ছুটি হতেই ডাক্তারখানা, এইসা ভিড় না। মায়ের জ্বর হচ্ছিল...। দ্যাখো, আরও কিছুক্ষণ...হয়তো কোথাও আটকে গেছে। হয় এসে যাবে, নয় খবর দেবে।

—কী করে খবর দেবে? পাশের বাড়ি থেকে আজকাল আর আমাদের মেসেজ দেয় না। আর আটকে কোথায় যেতে পারে! তেমন কোনও জায়গা আছে? বলুন না, তাহলে খোঁজ নিই।

কী করে আর বন্ধুর বোনকে বলি রাত্তিরে আটকে যাওয়ার একটাই জায়গা আছে আমাদের মতো আত্মীয়—বন্ধুহীন ছোকরাদের। হয়তো দীপ্তটা সেখানেই...

—আমার বড্ড ভয় করছে জয়দা, আমার সঙ্গে একটু যাবেন?

ঘড়িতে দেখি দেড়টা। এখনও পর্যন্ত ফিরবে না? যে চুলোতেই যাক!

—মা বড্ড কান্নাকাটি করছে, যদি একটু...যদি পুলিশে খবর দিতে হয়...

—বিকেল অবধি অপেক্ষা করবে না?

—কখনও এরকম হয় না জয়দা। কখনও...এটা কিন্তু একদম শতকরা শতভাগ সত্যি। আমরা একশো ভাগ ভদ্রবাড়ির ছেলে, যেমন করেই হোক বি.এ—টা পাস করেছি। দীপ্তর বাবা ছিলেন লোকাল স্কুলের হেডমাস্টার। শুনেছি ওঁর বিরোধী গ্রুপ ওঁকে কায়দা করতে না পেরে ওঁর বিরুদ্ধে টাকা তছরুপের অভিযোগ আনে। জামিন পাবার আগে দু'দিন হাজতবাস করতে হয় ওঁকে, হাই ব্লাডপ্রেশার ছিলই, স্ট্রোক হয়, এক ঘায়েই শেষ। যখন এ ঘটনা ঘটে, দীপ্ত তখনও স্কুলে। কাজেই যেভাবে লেখাপড়ার কথা ছিল, সেটা হয়ে ওঠেনি, মা—ও খুব শোকগ্রস্ত ছিলেন বহুদিন। তাই বলে ভদ্র হোয়াইট—কলার ছাপটা যাবে কোথায়? আমার বাবা আবার সরকারি আপিসে কলম পেষেন। যতই হোক সরকারি চাকরি। একটা খাতির আছে। সন্তান সংখ্যা একটু কম রাখলে আর একটু স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতেন। তবে আমার বোনেরা, ভাই, সব—পড়াশোনা করে, বাজে সঙ্গে মেশে না। একটা নিয়ম—নীতি আছে চালচলনের। যেমন আমরা মা—বাবাকে তুমি করে বললেও অন্যদের কাছে যখন উল্লেখ করি 'আপনি' করে বলি। দীপ্ত বলে আমার 'বাবা মারা গেছেন' আমি বলি 'মা ডাকছেন'। খিস্তি—ফিস্তি সব চৌকাঠের বাইরে রেখে বাড়ি ফিরি। বাজার করি, আত্মীয় কারও অসুখ—বিসুখ করলে মা খোঁজ নিতে পাঠান। মুখ মুছে ভিজে বেড়ালটির মতো যাই। বাড়ি ফেরার নির্দিষ্ট সময় আছে। বড়দের সামনে ফুঁকি না। কাজেই শিপ্রা বলতেই পারে—'কখনও এ রকম হয় না জয়দা, কক্ষনো।' এবং আমিও ওর উদ্বেগ চিন্তা বুঝতেই পারি।

মাকে বলে চটপট জিনসটা গলিয়ে নিই, আর সেই সময়ে হঠাৎ কেন যেন একটা কথা মনে আসে। 'শিপ্রা—আ' ঘর থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করি—'দীপ্ত কী পরে গিয়েছিল রে কাল?'

—কেন, আপনার মনে নেই?

আছে। কিন্তু রোজ রোজ নিজেদের খাড়া—বড়ি—থোড় জামকাপড় কে—ই বা অত খেয়াল করে। তাই নিশ্চিত হবার জন্যে জিজ্ঞেস করি।

—বলই না।

—খাকি প্যান্ট, আর ছাই—ছাই রঙের শার্ট।

ঠিক, আমারও তাই মনে হচ্ছিল। খাকি প্যান্ট, আর ছাই রঙের শার্ট।

ভেতরটা গুড়গুড় করছে, হঠাৎ কেমন শীত করে কাঁপুনি এল। কাঁপা কাঁপা গলায় শিপ্রাকে বললাম—চল!

সেদিন সন্ধের খবরেই দু—তিনটে চ্যানেলে ছবিটা দেখাল। চোখ বুজে শুয়ে আছে দীপ্ত। গলত্রার কাছটা জমাট রক্ত। মুখটা ইতিমধ্যেই একটু ফুলে গেছে। যেন মৃত্যুর মধ্যেই দীপ্তর স্বাস্থ্য ফিরে গেছে।

ছোট্ট সাদা—কালো টিভিতে ছবিটা দেখাতেই আঁক করে উঠলেন মাসিমা আঁক—দ্বিতীয়বার, তারপর একেবারে অজ্ঞান। শিপ্রা যেন পাথরের মূর্তি, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে। ইতিমধ্যে আমি শিপ্রাকে নিয়ে লোকাল থানাতে ঘুরে এসেছি। ও.সি. আশ্বাস দিয়েছেন—খোঁজখবর করছেন, কতকগুলো রুটিন প্রশ্ন করে নিয়েছিলেন।

—কোনও পার্টি, মানে পলিটিক্যাল পার্টিতে...

—না স্যার, ফ্যাক্টরিতে থাকলে একটা ইউনিয়নে চাঁদা দিতে হয়, ব্যস।

—কোনও শত্রু?

আমার অত দুঃখেও হাসি পেয়ে যায়, দীপ্তর শত্রু? আমার শত্রু? তার চেয়ে যদি জিজ্ঞেস করতেন—কোনও বন্ধু আছে? —তাহলে সহজে উত্তরটা দেওয়া যেত।

—শুনুন স্যার, আমাদের মতো চুনোপুঁটিদের শত্রুও থাকে না মিত্রও থাকে না।

দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কান খোঁচাচ্ছিলেন অফিসারটি, এমনিতে মুখটা বিকৃত হয়ে ছিল, এখন একেবারে খিঁচিয়ে উঠলেন—যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দেবে ছোকরা।

হাসি পায়, এই তো পথে এসেছ, যুবা—টুবা তরুণ—ফরুণ নয়। ছোকরা। স্রেফ ছোকরা। শিপ্রা থাকায় আমি যথেষ্ট সংযত থাকি।

—রাগ করছেন কেন স্যার, আমরা বড্ড উদ্বিগ্ন।

—উদ্বিগ্ন লোকেরাই এখানে আসে। খিঁচোতে হলে পাড়ার এম.এল.এ—কে খিঁচোও, কাউন্সিলরকে খিঁচোও। আমরা তোমাদের কাছে ভোট চাইতে যাব না, বুঝলে হে? ছ্যাঁচড়া একটা চাকরি করি। মাইনে পাই, ডিউটি করি, ডিউটি মাঝরাত্তিরে কলার ধরে টেনে আনে। বুঝলে?

—বুঝেছি, স্যরি স্যার।

শিপ্রার দিকে তাকিয়ে বললেন—লভ অ্যাফেয়ার! পিরিত নাকি? ট্রায়াংগুলার?

শিপ্রা কেঁদে ফেলে। আমি বলি— ও নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির আপন বোন, বাড়ি ফেরেনি বলে আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে। আর কেউ তো নেই!

এমন করে বলি, যেন আমার অস্তিত্বের জবাবদিহি দিচ্ছি। তাতে লোকটি খুশি হয়।

যাই হোক, দীপ্তর মুখটা দেখব আশঙ্কা করেই টিভি—টা খুলেছিলাম। সন্দেহ ভঞ্জন হয়ে গেল। খাকি প্যান্ট আর ছেয়ে শার্ট হাজারও লোক পরতে পারে, কিন্তু এই খাকি—ছেয়ে নির্ভেজাল আমাদেরই।

জমাদারদের নগদ পাঁচশো টাকা দিয়ে লাশ ছাড়াতে হল। কী অদ্ভুত যুক্তি ওদের। জিনিসপত্তরের দাম হু হু করে বাড়ছে বাবু, দিতে বলছি ভালয় ভালয় দিয়ে দিন।

—আ রে। এটা তো তোদের পাওনা—ই নয়।—জয়ন্তদা বলল?

পাওনা? পাওনার কপালে ঢ্যাঁড়া।

—খুশি হয়ে দ্যান সবাই।

—খুশি হয়ে? ঘনিষ্ঠ আত্মীয়—বন্ধু অপঘাতে মারা গেছে, খুশি হয়ে? বলছিস কী?

—ওই হল। জেবন আজ আছে কাল নেই। জেবনদারদের তো পেটে খেতে হবে। চাঁদা তুলে কোনওক্রমে পাঁচশো জোগাড় হল। কিছুটা আমার পকেট থেকে। ওই গড়ের মাঠ থেকে যে কী করে এত মাল বেরোল সে আমি জানি, আর আমার পকেট জানে।

কাজ—কর্ম হয়ে গেল। শিপ্রার জন্যে চেষ্টা করছি, তবে নেহাত শুকনো কারখানায় ও কী—ই বা চাকরি পেতে পারে। সবে উচ্চচ—মাধ্যমিক পাস করেছে। এখনও কলেজ—টলেজ শুরুই হয়নি।

একটাই ভালো সব মন্দর মধ্যে। পুলিশ হাল ছাড়েনি। খুনিকে ওরা খুঁজ বার করবেই। আমাদেরও মধ্যে কথা হয়—শিপ্রা, আমি, শিবানী, পাড়ার শঙ্কর, জয়ন্তদা—দীপ্ত? দীপ্তকে কে মারবে? কেন মারবে? জয়ন্তদার উদ্যোগ—উৎসাহ বেশি, বললে—পুলিশ করছে পুলিশের মতো। আমরা ইনভেস্টিগেশন চালাব আমাদের মতো। রাজি জয়?

—রাজি।

তবে আমার এটাই আশ্চর্য লাগে, দীপ্তটা যখন জলজ্যান্ত ছিল, তখন ওর সেই জ্যান্ত শরীর—মনের খবরাখবর কেউ রাখত না। এখন, যে মুহূর্তে ছেলেটা মার্ডারের লাশ হয়ে গেল—দরদ, হাহাকার, বিস্ময়, ন্যায়বিচার পাবার রোখ সব যেন প্রতিযোগিতা করে করে বেড়ে যাচ্ছে এদের মধ্যে। লাশ ছাড়ানোর সময়ে বিশ—পঁচিশ টাকা দ্যাখ না দ্যাখ বেরিয়ে এল এ—পকেট ও—পকেট থেকে। যেন লাশটা দেখবার জন্যে সব হন্যে হয়ে আছে। ব্ল্যাকে টিকিট কাটছে। আমার মনে আছে, দগদগে হয়ে মনে আছে। এই মস্তানরা কখনও একটা চা কি সিগারেটের দাম চুকিয়ে দিয়ে, কিংবা পাঁচটা টাকা ধার দিয়েও আমাদের উপকার করেনি। বলতে কী আমাদের ছোট্ট এরিয়ায় দীপ্ত সমাদ্দার স্রেফ খুন হয়ে একটা সেলিব্রিটি হয়ে গেল। শিপ্রা, মাসিমার শোকে ফোলা মুখের ছবি বেরিয়েছে মেলাই কাগজে। কোনোটাতে কোনোটাতে আমিও এক কোণে আছি, মুখ দেখানোর কমম্পিটিশনে প্রায়ই গোহারান হেরে গেছি। পাশের বাড়ির জবা বউদি, ছায়া মাসিমা, পাড়া—মস্তান মিঠুন, কয়লা, প্রতিবেশী শঙ্কর, জয়ন্তদা—সবাইকার মুখ দিব্যি ফোকাসে এসেছে। শোক

থমথম ফটো সব। মহিলারা কেউ মাসিমাকে জড়িয়ে আছেন, কেউ শিপ্রাকে বুকে টেনে নিয়েছেন, ফলে শিপ্রার চুল আর হাত ছাড়া কিছুই আসেনি, এসেছে ছায়া না ফায়া মাসিমার পুরো গোল মুণ্ডুখানা। ঠিক সিরিয়ালের মতো পোজ দিয়েছেন। কাঁধে শিপ্রা মুখ—লুকোনো, ছায়া ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে, ক্লোজ—আপ।

হাসিও পায়। কান্নাও পায়। দীপ্তটা মার্ডার হওয়ার আগে যদি জেনে যেত, এত লোকে ওদের ফ্যামিলির বন্ধু, একটু নিশ্চিন্তে মার্ডার হতে পারত।

মাস তিনেক কেটে গেছে। হাঁফ ছাড়া গেছে একটু কেননা, রেল, ভারতীয় রেল স্বয়ং কী মনে করে শিপ্রা সমাদ্দারকে চাকরি দিয়েছে। মাইনে সামান্যই, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি তো! মাসিমা একটা রান্নার কাজ ধরেছেন। আর কী—ই বা একজন আটচল্লিশ—উনপঞ্চাশের গরিব বিধবা করতে পারেন। আমি একটু ক্ষীণ আপত্তি করেছিলাম। মাসিমা বললেন—তুমি বললে ভালো লাগল, কিন্তু ওঁর নামে মিথ্যে অপবাদ যখন রটল, যখন উনি দুম করে চলে গেলেন সেই অকূল পাথারে দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি একা। ওঁর পাওনা—গণ্ডা পেতে পেতে পাঁচ বছর! তখন কী করেছি আর কী না করেছি জয়! দুঃখ—ধান্দা করেও যেমন করে হোক দিনগুলো চলে যাচ্ছিল। ছেলেমেয়ে বুকে আছে, মস্ত বড় বলভরসা। তা ভগবানের সইল না। কে যে এমন কাজ করল, কেন যে করল!

মাঝে অবশ্য ফলো—আপ নিউজ বেরিয়েছিল পুলিশ নাকি কিছু সূত্র পেয়েছে। তদন্তের স্বার্থে সেসব গোপন রাখা হচ্ছে। কিন্তু ভরসা রাখতে পারছি না। প্রতিদিন হুদো হুদো লোক মার্ডার হচ্ছে। কাগজ ছবি দিয়ে খবর দিয়ে স্টোরি করেই খালাস। মাঝেমাঝেই দেখি বেশ ভারীভুরি লোকদের হত্যারও 'এখনও কিনারা হয়নি', 'অপরাধী শনাক্ত হয়নি', 'তদন্ত চলছে'। এবং অবধারিতভাবে 'তদন্তের স্বার্থে' সূত্রগুলো গোপন রাখা হল।

ইদানীং মাসিমা বলতে শুরু করেছেন—ও তদন্ত হলেই বা কী! না হলেই বা কী! আমার যা যাবার তা তো গেলই। কে খুনে শাস্তি পেল কি না পেল তাতে কী—ই বা আসে যায়! ফিরে তো পাব না।

—বলেন কী মাসিমা! একটা রাগ, নিদেনপক্ষে শোধ নেওয়ার প্রশ্নও তো রয়েছে।

শিপ্রা বলে—নেই জয়দা, নেই। আমাদের মতো নিরুপায় লোকের নিরাপদে বেঁচে থাকাটাই তো আশ্চর্য। ধরুন মশার ঝাঁক, মাছি, পিঁপড়ে, আরশোলা, হাজারে হাজারে জন্মাচ্ছে। একটা চাপড়, আঙুল দিয়ে একটু পিষে দিন, চটি দিয়ে এক চাপড়— ব্যস থেঁতলে যাবে, কে তার তদন্ত করে বলুন! এই পিঁপড়েই কি আর এক পিঁপড়ের দিকে ফিরে তাকায়? পিঁপড়েজীবন চলতেই থাকে, চলতেই থাকে...চা খাবেন তো?

—নাহ একটু জল দিও বরং, ভেতরটা তেষ্টায় কাঠ হয়ে আছে। মাসিমা বললেন—দুটো বাতাসাও দিস শিপ্রা।

আসল কথা রাগ, প্রতিশোধস্পৃহা এসবের জন্যে একটু জীবনীশক্তি লাগে। সেটুকুও এদের নেই। আমারই কি আছে? জ্বলে উঠতে পারছি কি? অফিস যাই, নাম সই করি, পরেই দীপ্তর নামটা কাটা রয়েছে একটা লাল কলম দিয়ে, হাজিরা খাতার পাতায় যেন মার্ডার। ফেরবার সময়ে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে, ট্রেনে উঠে একটু ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেলেই মনে হয় এই কি সেই কামরা...যেখানে আততায়ীর হাতে প্রাণ দিয়েছিল দীপ্ত? এই কামরাতেই কি আমার বন্ধুর রক্ত লেগে আছে! ও আগে নেমে যেত—শ্রীরামপুর, কাচের মুখে ফিরে তাকাত একবার—আবার কাল, জয়। আবার...

—আবার কাল দীপ্ত...আবার...আমি ফিরে জবাব দিতাম। কতটা জবাব দেবার ইচ্ছে থেকে আর কতটা অভ্যেস...বলা মুশকিল। ঝাঁকে ঝাঁকে লোক নামছে। ঝাঁকে ঝাঁকে লোক উঠছে, একভাবে প্রতিদিন একভাবে —এই যে দাদা...ঝাল মুড়ি, কড়াক কড়াক কড়াক ঝাল মুড়ি....ছুরি নিয়ে নিন সাত ফলা ছুরি...নখ কাটুন, পাঁউরুটি কাটুন, কোকাকোলার বোতল খুলুন চ্যাঁক করে কাগজ ফাঁড়ুন, চিঠি খুলবেন তো দাদা...চিঠি খুলবেন না? ... ইমপরট্যান্ট চিঠি—চাকরির চিঠি, বাপের অসুখ, শুভবিবাহ, হোল খুলবেন দাদা, হোল,

বাড়িতে ডাকাত এলে স্রেফ পেটটা ফাঁসিয়ে দিন—সাত ফলার মাল্টি পারপাস ছুরি দাদা...চা...চা...লেবু চা...দুধ চা..., দুধ চা, লেবু...চা।

আমার ভেতরেও ইচ্ছেটা আস্তে আস্তে মরে আসছে। মাসিমার মতো বা শিপ্রার মতো করে ভাবছি। কী হবে? ফিরে তো পাব না! তবু রুটিন করে থানায় হাজিরা দিয়ে যাই। কী স্যার, হল কিছু?

ও.সি. কান খোঁচাতে খোঁচাতে বলেন—হলেই হল দীপ্তবাবু, স্যরি জয়বাবু? —এ যে কী ছ্যাঁচড়ার চাকরি! ডিউটি করো, বাড়ি যাও, একটু পেট আলগা করে খেতে বসেছি...বাস কল, এখুনি যেতে হবে। এ—শালার চাকরি তো আর করেননি!

সেদিন ওইরকমই গেছি। ও.সি. পাশের চেয়ারে বসা এক সাদা শার্ট আর কালো জিনস পরা ভদ্রলোককে বললেন—এই যে এঁর কথাই বলছিলাম স্যার। মা ছাড়ল, বোন ছাড়ল, ইনি কিন্তু লেগেই আছেন, এই দীপ্ত চম্পটি, মৃত জয় সমাদ্দারের প্রাণের বন্ধু। স্যরি জয় চম্পটি আর দীপ্ত সমাদ্দার।

বিবরণ শুনে আমি একটু হাসি। শুকনো, বিরস কঠিন হাসি।

—আর জয়বাবু, ইনি আই.বি. থেকে আসছেন। কেসটা হ্যান্ডল করছেন। কানাইলাল সামন্ত।

ভদ্রলোক ইয়াং ম্যানই বলা যেতে পারে। মেরেকেটে পঁয়ত্রিশের এদিক—ওদিক। আমাদের থেকে বড় হলেও তেমন কিছু নয়। মুখটা ভালমানুষ—ভালমানুষ।

—মাফ করবেন, জয়বাবু কেমন কাঁচুমাচু হয়ে বললেন কানাইলাল—আপনাদের মতো ঘনিষ্ঠ ক'জনের সহযোগিতা না পেলে...আই মিন...মুখ দেখাতে পারছি না ডি.আই. জি—র কাছে।

আমি অবাক হয়ে বলি—সহযোগিতা ছেড়ে, আমি তো জোঁকের মতো লেগে আছি দাদা। তা এনারা তো যে তিমিরে সে তিমিরেই। এক বছর পুরো পার হয়ে গেল।

—মার্ডার জয়ন্তী—ও.সি. বললেন।

ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাই। কোনো লাভ নেই অবশ্য। যেমন অসাড় তেমন অসাড়ই থেকে যাবে এই লোকগুলো।

কানাই সামন্ত বললেন—কোথায় একটু বসা—টসা যায় বলুন তো?

ও.সি. বলেন—ওই তো ওদিকের ঘরটা খুলে দিচ্ছি। জেরা ঘর। চলে যান। এখানেও বসতে পারেন, তবে এখানে নানান কিসিমের লোক তো অনবরত আসছেন, আপনাদের ব্যাঘাত হবে।

—না, না। এখানে একেবারেই নয়।

আমি বললাম—এখানে ছোটখাটো চায়ের দোকান আছে, কাছাকাছি দেখে আমরাও বসতাম...আমি দীপ্ত...

—না, না। ওখানে একেবারেই নয় জয়বাবু। আপনাকে সবাই চেনে, আমার আইডেনটিটি সম্পর্কে একটা কৌতূহল...না, না তাতে আমার অসুবিধে আছে।

—দীপ্তর বাড়িতে যাবেন?

—কে কে আছেন?

—ওর বোন তো চাকরিতে বেরিয়ে গেছে। মা হয়তো ফিরে এসেছেন...

—না, না।

সবেতেই যদি এত না—না তাহলে উনিই বলুন। আমি চুপ করে যাই। ভেবে—চিন্তে উনি বললেন—কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে যাতায়াত আছে?

—নাহ এখন আর...

—আইডিয়াল প্রেস বুঝলেন। আপনি কাল বিকেলে ধরুন সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ওখানেই চলে আসুন। অফিসের পর। কী, ঠিক আছে? আমি তিনতলাটাতে অপেক্ষা করব, ওখানে আমাকে বা আপনাকে কেউ চিনবে না।

চারটে—পাঁচটা নাগাদ ইদানীং আমার শরীরটা ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে। কেন জানি না। গরম প্রচণ্ড। ঘামে যেন গঙ্গাজল বয়, — বড্ড ঘামছ—মদন শূর বলে—একটু নুন—চিনির শরবত খেয়ে নাও বুঝলে? শরীর থেকে নুনটা বেরিয়ে যায় তো! বিরাট গোল হাঁড়ি লাল ভিজে কাপড়ে জড়িয়ে শরবতঅলারা দাঁড়িয়ে থাকে।

আশেপাশে থাকে লেবু, চিনি লবণ। সব মিলিয়ে বেশ ঠান্ডা—ঠান্ডা গা—জুড়ানো শরবত করে দেয়। খেয়ে সত্যিই একটু আরাম পাই। মদন শূর বলে—কে জানে আবার কলেরা খাচ্ছি, টাইফয়েড খাচ্ছি না হেপাটাইটিস বি খাচ্ছি।

—কেন, ইনজেকশন নেন না? আজকাল হেপটাইটিস বি—র তো ভ্যাকসিন বেরিয়েছে।

—তুমিও যেমন। আমি নেব ভ্যাকসিন? তুমি নিয়েছ? নাও?

—আমি না নিলেও কিছু হবে না। আমি হাসি—আমাদের কিছু হয় না। হবে না...যতক্ষণ না খুন হচ্ছি, অনন্ত আয়ু শূরদা।

—যা বলেছ, মদর শূর তার গেলাসে চুমুক দেয়।

তারপরেই মনে পড়ে যায়—আরে আজ কফি হাউজ যাবার কথা নয়?

গুচ্ছের পয়সা খরচা করে কে আবার বাসে যায়! আর একটু সময় থাকলে হেঁটে মেরে দিতাম। কিন্তু সময় নেই হাতে। ট্রামগুমটি থেকে গুঁতোগুঁতি করে ট্রাম ধরি। রাস্তাময় থিকথিকে পিঁপড়ের মতো দলা পাকিয়ে আছে মানুষজন। কিংবা চিটে গুড়ে আটকে থাকা ভিনভিনে মাছি। কেমন ঘেন্না করে। ঘিনঘিন মতন। এমন নয় যে আমি এর বাইরে, কোনো মহান বিশিষ্ট। নিজেকেও দেখতে পাই ওইসব মাছি—ভিনভিনে ঘিনঘিনে ভিড়ে। বাসে—ট্রামে একটু পা রাখার জন্যে গুঁতোগুঁতি, বাজারে আনাজ—তরকারি একটু কম পয়সায় পাবার জন্যে ঝুলোঝুলি, হাসপাতালে পেচ্ছাবখানার পাশে মেঝেতে একটু জায়গা করে দেওয়ার জন্য ওয়ার্ড মাস্টারকে ধরাধরি, আপিস—ফ্যাক্টরিতে বাদুড়ঝোলা ঝুলতে ঝুলতে প্রাণ হাতে করে লেটে পৌঁছন, গালাগাল খাওয়া, ইউনিয়ন—সর্দারদের গা—জ্বালানি চালবাজি শুনতে শুনতে প্রাণপণ চেষ্টায় ভুরু সোজা করে রাখা...টিউবওয়েল থেকে জল আনতে ঠেলাঠেলি, রাত্রে মশারির মধ্যে চটাস—চটাস...ঘেন্না, খুব ঘেন্না... দীপ্তটা বেঁচে গেছে এক রকম, মরে বেঁচে গেছে।

একটা পা ট্রমের পা—দানিতে। এইভাবে হাওড়া ট্রামগুমটি থেকে মহাত্মা গাঁধী রোড হয়ে কলেজ স্ট্রিট পৌঁছই। মহান ইউনির্ভাসিটি পাড়া, শতবার্ষিকী বিল্ডিং, মহান প্রেসিডেন্সি কলেজ, মহান হিন্দু স্কুল—হেয়ার স্কুল, সংস্কৃত কলেজ, আর মহান মহান সব দোকান, ফুটপাতে, বারান্দার রেলিং—এ, স্টল—এ দোকানে শিক্ষার্থী, বিদ্বান। ইনটেলেকচুয়েলদের পাড়া। মাড়িয়ে চলে যাই। পাঠমন্দির, এঁরা আবার অধ্যাত্মচর্চা করে থাকেন। সমর্পণ করো, প্রশ্নহীন বিশ্বাস, ফেথ...কিছু আশা কোরো না, শুধু ডেকে যাও, কিছু চেও না প্রে, প্রে, প্রে। কফি হাউজের সিঁড়ি দিয়ে উঠতি ইনটেলেকচুয়েলদের সঙ্গে প্রায় ধাক্কাধাক্কি করে উঠতে হয়। ইনটেলেকচুয়েলও শালা একসেস হয়ে যাচ্ছে। ভাবিসনি সবাই ইনটেলেকচুয়েল হবি, যদ্দিন আসতে পারছিস এসে নে, হেসে নে, যেন পৃথিবীটা কিনে নিয়েছিস এমনি করে গলাবাজি কর। তারপর উট। আড়াই পোঁচ কাটা, বাকি গলা দিয়ে কালো রক্ত পড়ছে, পড়ছে, পড়ছে।

—এই যে ভাই এদিকে। খুব নিচু গলা কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পেলুম—কানাইলাল সামন্ত। লোকটাকে এমন সাধারণেও সাধারণ দেখতে যে কালই দেখেছি, আজই ভুলে মেরে দিয়েছি। সত্যি কথা বলতে কী সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে মনে হচ্ছিল— লোকটাকে খুঁজে বার করব কী করে? চিনিই তো না। তা সে সমস্যাটা রইল না। কানাইলাল আমাকে খুঁজে নিয়েছে।

গুছিয়ে বসি।

—একটু লেট হয়ে গেল। রুমালে ঘাম মুছতে মুছতে কৈফিয়ত দিই—বড্ড ভিড়।

—আমি বুঝতে পেরেছি জয়বাবু, টাইমিংটা...আমি দুঃখিত। এত ট্রাবল। খিদে পেয়েছে তো খুব?

—ও তেমন কিছু না...।

—আমি অলরেডি চিকেন স্যান্ডউইচ, চিজ—ওমলেট, আর পেঁয়াজ—পকোড়া অর্ডার দিয়েছি। আর কিছু?

আমি হেসে বলি—ইনাফ। আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাব এটা বলেন—'ইনাফ'।

খাবার আসে। লোকটি দুটো আলাদা প্লেটে খাবার সাজায়। আমার দিকে একটা এগিয়ে দেয়—এই যে ভাই—বেয়ারাকে ডাকে—পকোড়াটা কফির সঙ্গে দিও।

—ঠিক আছে স্যার।

—নিন শুরু করুন। নিজে একটা কাঁটা দিয়ে ওমলেট কেটে মুখে পোরে কানাই সামন্ত। আমি একটা স্যান্ডউইচ তুলে নিই, একটু জল খেয়ে নিই। ভীষণ তেষ্টা। তেষ্টাটাই এতক্ষণ জ্বালাচ্ছিল প্রচণ্ড।

বেশ কিছুক্ষণ দুজনেই নিজের নিজের খিদে মেটাতে থাকি। কানাইলাল একবার বোকা—লাজুক চোখে আমার দিকে চেয়ে বলে—কিছু মনে করবেন না জয়বাবু, বড্ড খিদে পেয়েছিল।

—ঠিকাছে, ঠিকাছে—আমি ওঁকে নিশ্চিন্ত করি।

—আমি আসলে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি।

গ্রোপিং ইন দা ডার্ক, বুঝলেন? নিহত মানুষটির চারপাশটা কেমন ছিল, কাদের সঙ্গে মিশত সেইসব...আমি চেয়ে থাকি।

—দেখুন সম্ভাবনা নাম্বার ওয়ান, আপিসে কারও সঙ্গে গণ্ডগোল। ছোটখাটো হলেও বলবেন কিন্তু স্যার। তুচ্ছ বলে গোপন করে যাবেন না, কোনও ছোটখাটো কাজিয়া? তুচ্ছ কারণে লোকে আজকাল খুনোখুনি করছে।

—দেখুন, আমি ওমলেট ছিঁড়ে মুখে দিই—সেই যে বলে না তৃণাদপি তৃণ! আমরা সেই রকমই। তুশ্চু একেবারে। একটা চাকরি পেয়েছি, সেটাই আমাদের যথেষ্ট। না পেলে, না পেতেই পারতাম, জানি না কী করতাম, হাত পেতে ভিক্ষে নিতেও পারতাম না, আবার গুণ্ডা—হুলিগান হয়ে বোমাবাজি...তা—ও আমাদের দ্বারায় হত না।

—আপনি আমরা—আমরা করছেন কেন? দীপ্তবাবুর তো আলাদা সার্কল, আলাদা মন থেকে থাকতে পারে! ধরুন কোনও ড্রাগ—পাচারকারীর সাগরেদ হয়ে গেছেন পাকেচক্রে। এটা কিন্তু আমি একটু ভাবি, তারপর বলি—আপনি বললেন তাই ভাবলাম, ভেবে দেখলাম, খুব হচ্ছে।

—নাহ। ছোটবেলা থেকে বন্ধু, ইস্কুলে, কলেজে, দুজনেই পি ডিভিশন। দুজনের এক চাকরি, ঝগড়া—কাজিয়া এড়িয়ে চলতাম, বোথ অভ আস। এ নিয়ে আমাদের অনেক কথাও হয়েছে। ও আমার সঙ্গে একমত ছিল উই ক্যানট অ্যাফোর্ড টু প্রোটেস্ট, টু কোয়ার্ল। উই ক্যানট অ্যাফোর্ড টু পাচার ড্রাগ।

—ইউনিয়নের দিক থেকে কোনও প্রেশার? আমার এবার হাসি পেয়ে যায়। তেতো হাসি।

—আরে দাদা—ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের কী? ইউনিয়ন প্রেশার দেবে আমাদের মতো চুনোপুঁটিকে? আমরা প্রেশারের মধ্যেই বাস করতাম। বুঝলেন? জলে মাছ যেমন জলের প্রেশারে বাস করে!

—আপনি জয়বাবু ভারী চমৎকার কথা বলেন। এত সুন্দর কথা বলতে আমি অনেকদিন কাউকে শুনিনি। অথচ...অথচ...

—অথচ কী? আমার কিছু হল না?—আমি হো হো করে হাসি।

—দেখুন কানাইদা, আপনার কতটুকু অভিজ্ঞতা আমি জানি না, ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন—কিন্তু একটু লাগসই কথা বলার ক্ষমতা, লাগসই কাজ করা ক্ষমতা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের আছে। তো কী?

খুব অপ্রস্তুত হয়ে যায় ভদ্রলোকের মুখ।

—ঠিক। ঠিকই বলেছেন জয়বাবু। একটা লাক—ফ্যাক্টর থেকে যায়। না থাকলে...ক্যাঁচাল ভাল লাগে না সন্ধে ঝোঁকে। পাখাটা ওপরে বাঁই বাঁই করে ঘুরছে কিন্তু গরমে গ্যাদগেদে হয়ে যাচ্ছি।

বললাম—কী যেন বলছিলেন সম্ভাবনা নাম্বার ওয়ান...

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সরি। সম্ভাবনা নাম্বার টু—লাভ—মানে লভ—অ্যাফেয়ার। ধরুন কারও সঙ্গে লভ হয়েছে, কিন্তু তার একটি আগের লাভার আছে, ধরুন স্বামীই। এই এক্সট্রা ম্যারিটাল বা দাম্পত্য—বহির্ভূত প্রেম বলুন, প্রেম, সম্পর্ক বলুন, সম্পর্ক...এটা এখন রাজনৈতিক খুনেরপরেই প্রায়রিটি পাচ্ছে মোটিভে...বুঝলেন? স্যাটিসটিক্স বলছে।

এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনছিলাম, এবার ঠান্ডা গলায় বলি—আপনার বন্ধু ওসি বাবুও এই সন্দেহটির কথা বলছিলেন। যটুকু জানি বলছি সামন্তবাবু, সরি, মিঃ সামন্ত।

—আরে না না, সামন্তবাবু ইজ অল রাইট। মিস্টার—টিস্টার নয়। বলুন বলুন, কী বলবেন!

—যদি বলি হ্যাঁ। বাস—স্ট্যান্ডের পাশে দোতলা বাড়িটার আড়তদার বরটার রসবতী বউটার সঙ্গে দীপুর আশনাই ছিল...বিশ্বাস করবেন?

—কোন বাড়ি? কোন আড়তদার? কোন বউ? যদি কাইন্ডলি একটু ডিটেল বলেন।

—কোন বাড়ি, কোন আড়তদার, কোন বউ জানি না। ওরকম হরদম আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আপনি যেমন সম্ভাবনার কথা বলছিলেন আমিও তাই বলছিলুম। কিন্তু আপনিই বলুন এই আমার দিকে তাকিয়ে বলুন—গালে ব্রণর গর্থ, চোখে মাছ, বুকে পায়রা, গলায় বেড়াল আর পকেটে বিরাজ করছেন সাক্ষাৎ মা ভবানী। আপনার গোয়েন্দা মনটা কী বলে? এরকম ফেকলু পার্টি দিয়ে এক্সট্রা—দাম্পত্য হয়?

খুব লজ্জা পেয়ে সামন্ত বিড়বিড় করে বলতে লাগল—বড্ড বিনয়ী আপনি জয়বাবু। বড্ড বিনয়ী! ওসব ফেকলু টেকলু...নাঃ—দ্যাট ইজ টু মাচ। আফটার অল ইয়াং ম্যান! যারা এক্সট্রা—দাম্পত্য করে তাদের দেখেছেন? কেউই ময়ূরছাড়া কার্তিকটি নয়। কেউই একেবারে তাগড়াই ভীম পালোয়ান বীরসিংগিও নয়।

—বেশ তো, তাহলে এই থিয়োরিটাই বসের কাছে পেশ করুন। উনি পিঠ চাপড়ে দেবেন।

—আপনি জানেন না জয়বাবু, এভাবে কেসহাজির করলে...আমার চাকরিটা চলে যাবে। যতক্ষণ না আড়তদার বা রসবতী...কোনও সবুদ হাজির করতে না পারি...আমার নিস্তার নেই।

—তাহলে আপনি খুঁজতে থাকুন। আমি উঠি।

—আর একটু টাইম যদি দয়া করে দেন জয়বাবু, নইলে আবার আর একদিন বসতে হবে। কোথায় বাড়ি গিয়ে মাথায় দু'ঘটি জল ঢালবেন, তা না একটা টিকটিকির টিকটিকুনি শোনা। —খুব চিকচিকে চোখে চেয়ে মন্তব্যটি করে সামন্ত, ওর ধারণা একটা দারুণ মজার কথা বলেছে।

আমার যে সত্যিই বাড়ি গিয়ে মাথায় জল ঢালতে ইচ্ছে করছে সেটা ব্যাটা বুঝতে পেরেছে ঠিক।

বলল—ধরুন এ—ও তো হতে পারে জয়বাবু, দীপুবাবুর যে বোনটি আছে কোনও মস্তান তার পিছনে লেগেছে, দীপুবাবু তাকে ঠান্ডা করে দেবেন বলে শাসিয়েছেন...

আমি এবার হেসে ফেলি—শুনুন সামন্তবাবু, এই মস্তান—টস্তানরা একটু রক্তমাংস চায় বুঝলেন? দীপুর বোন শিপ্রাকে একবার দেখে আসুন। তারপর এ বিষয়ে কথা হবে। দ্বিতীয় অধিবেশন।

—প্লিজ প্লিজ দীপুবাবু, স্যরি জয়বাবু আর এ—কটু। তাহলে কি আপনি বলছেন সেদিন দীপুবাবুর পকেটে বাই চানস অনেকগুলো টাকা ছিল? ট্রেন ডাকাতি?

—শুনুন দাদা, পকেটে একটা মাদুলি আর দু—পাঁচ টাকা ছাড়া আমাদের পকেটে আর কিচ্ছু থাকত না। হাতঘড়িটা ডিজিট্যাল, ফুটপাত থেকে উনপঞ্চাশ টাকায় কেনা।

—সে ক্ষেত্রে এ—ও হতে পারে, দীপুবাবু ডিপ্রেশনে ভুগতে ভুগতে, নিজেকে অযুগ্যি ভাবতে ভাবতে, একঘেয়েমির শিকার হতে হতে আত্মবিনাশ...মানে জিঘাংসা একটা...নিজেরই ওপর...?

এইবারে আমি বসে পড়ি। এতক্ষণ পাতি বকবকানির পর এটা তো লোকটা খারাপ বলেনি। সত্যিই তো! নিজেকে ঘেন্না করতে করতে, আরও তিরিশ চল্লিশ কি পঞ্চাশ বছর এইভাবে বেঁচে থাকতে হলে...এ কথা মনে করে...এ তো আমারও কথা। আমারও। সামন্তর মতো একটা পাতি টিকটিকির মাথায় এটা আসতে পারে ভাবিনি তো!

—কী হল? সামন্ত ঝুঁকে বসেছে, চুপ করে রইলেন যে?

—এটা ভাবা যেতে পারে—আমি অন্যমনস্কভাবে বলি।

—এটাই ভাবতাম জয়বাবু...যদি না দীপ্তবাবুর ভিসেরায় একটু স্ট্রং বার্বিচ্যুরেটের সন্ধান পাওয়া যেত। নিজেকে ঘুম পাড়িয়ে কি ব্লেড দিয়ে নিজের গলার নলি কাটা যায়? সেইজন্যে সব দিক ভেবে—চিন্তে আমরা এক দ্বিতীয় ব্যক্তির খোঁজ করছি, সে ঠিক দীপ্তবাবুর মতো, যার পরিস্থিতি ঠিক দীপ্তবাবুর মতো, দীপ্তবাবুর মতোই যার আত্মবিনাশ করতে প্রবল ইচ্ছে হয়, কিন্তু যে... আসলে আপনি নিজেকে মারতে চেয়েই দীপ্তবাবুকে মেরেছেন, তাই না জয়বাবু?

—এগজ্যাক্টলি—আমি ক্লান্ত গলায় বলি এবং হা—ক্লান্ত চোখে কানাইলাল সামন্তর মুখের দিকে তাকাই। তাকিয়ে থাকি।

পাগলাবাবার কুঠি

শুভমানস ঘোষ



চিতাবাঘটা এল রাত এগারোটা নাগাদ । ছাদের ওপর থেকে ক্ষয়া চাঁদের আলোয় শঙ্খ স্পষ্ট দেখল, লেজ নাড়াতে নাড়াতে কাঁটাতারের বেড়া টপকে বাঘটা হুশ করে চলে এল পাগলবাবার কুঠির হাতায় । বাঘ নয়, বাঘিনী । এর ভয়ে কিছুদিন হল আশপাশের গ্রামের আদিবাসীদের চোখ থেকে ঘুম উবে গেছে । গৃহপালিত প্রাণীর সংখ্যা বাদ দিলেও এ পর্যন্ত কাচ্চাবাচ্চা সমেত হাফডজন মানুষ এর পেটে গেছে । চোখের পলকে শঙ্খদ্যুতি হেভি রাইফেলখানা তুলে নিল । ৩৭৫ ম্যাগনাম রাইফেল । ঠিকমতো লাগাতে পারলে এক গুলিতে হাতিকে পর্যন্ত শুইয়ে দেওয়া যায় ।

শঙ্খদ্যুতি সরকারি শিকারি । শ্যুটিংয়েও তার নাম আছে । এখানকার বিট অফিসার শুভ্রকান্তি শঙ্খর বন্ধু । চিতাটাকে গুলি করে মারার সরকারি অনুমতিপত্র নিয়ে কাল সকালে সে আসছে । কিন্তু তার আগেই এটাকে নিকেশ করে কাজ হালকা করে ফেললেই তো হয় । ট্রিগারের ওপর আস্তে আস্তে বেঁকে যাচ্ছিল শঙ্খর হাতের আঙুল । কিন্তু ট্রিগারের ওপর তা চেপে বসার আগেই আচমকা একটা চাপা গর্জন করে বাঘটা নেমে গেল খাদের মধ্যে ।

মিনিট দুই । হাতে হ্যাজাক নিয়ে পাগলাবাবা দেখা দিলেন । নীচে থেকে গলা তুলে শঙ্খকে বললেন, দেখলে তো? এ বার নেমে এসো বাছাধন । তোমার দৌড় বোঝা গেছে ।

উত্তেজনায় শঙ্খর হাত দু'টো তখনও থরথর করে কাঁপছিল । বাংলোর হাতার নীচেই খাদের বিকট গড়ান । জঙ্গলের শুরু সেখান থেকে । স্থানীয় লোকেরা বলে চৈতলবিলের জঙ্গল । এক সময় দুর্ভেদ্য ছিল । এখনও ফুরিয়ে যেতে যেতে যা আছে তা বিশাল । একটু আগে চিতাবাঘটা ওখান থেকেই উঠে এসেছিল ।

সিঁড়ির নীচে আলো ধরলেন পাগলাবাবা । এ সব এলাকায় ইলেকট্রিক লাইন থাকলেও সারাদিন এক ঘণ্টাও কারেন্ট থাকে কি না সন্দেহ । পাগলাবাবা এই রাতে মাথায় একখানা তালপাতার টুপি পরে বসে আছেন । গলায় রুদ্রাক্ষের মালা । কোটরের ভেতর ধকধক করছে একজোড়া চোখ । হট করে দেখলে ভয় ধরে যায় । লোকটি নিদ্রাহীনতার ক্রনিক পেশেন্ট । রোগের জ্বালা থেকে বাঁচবার জন্য তিন-তিন বার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু প্রতিবারই অবিশ্বাস্যভাবে প্রাণে বেঁচে যান । একবার তো লাইনের মধ্যে শুয়ে পড়েছিলেন, এক্সপ্রেস ট্রেন চলে যায় ওপর দিয়ে, গায়ে আঁচড়টি লাগেনি তাঁর ।

পাগলাবাবা হ্যাজাকটা ঘরের দেওয়ালের শিকে ঝুলিয়ে ধপাস করে বসে পড়লেন চেয়ারে । শঙ্খকে দেখতে দেখতে বললেন, শোনো হে ছোকরা, আসল কথাটা তোমায় খুলেই বলি । যাকে দেখলে, ও কিন্তু মোটেই বাঘ নয় । ও আমার ফিয়াসেঁ । ফিয়াসেঁ মানে জানো তো?

আবার শুরু হল পাগলামি। এই জন্যই এখনকার লোকেরা এঁকে পাগলাবাবা নাম দিয়েছে। সেই সূত্রে এটার নাম পাগলাবাবার কুঠি। পাগলামির সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক কিছু কিছু সমাজসেবাও করে থাকেন। রোগে-অসুখে গ্রামবাসীদের তাবিজটা-কবজটা ধরে দেন, এক-আধ দাগ ওষুধও মেলে।

শঙ্খ ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল। হাই উঠছে।

পাগলাবাবার নাক কুঁচকে গেল, হাই তুললে হবে না, ব্রাদার। সোজা কথা, ও রাক্ষসীকে মারা তোমার কর্ম নয়। তবে তুমি যদি আমার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে বসো, আমি নেই। চ্যালেঞ্জের নাম করে আর একটা রাত এখানে থেকে যাবে সেটি হচ্ছে না, বাবা।

পাগলাবাবা অনেক দিন হল কলকাতার পাট চুকিয়ে দিয়ে এই আধাপাহাড়ি জঙ্গলে ডেরা পেতেছেন। ভদ্রলোকের ছেলেপুলে নেই, স্ত্রীও মারা গেছেন। একজন আদিবাসী বুড়ো তাঁর দেখাশোনা করে।

—বাঘটা কি আপনার এখানে রোজ আসে? বন্দুকটা বিছানায় শুইয়ে শঙ্খ প্রশ্নটা ছুড়ে দিল।

পাগলাবাবা খুকখুক করে হাসলেন, না এসে যাবে কই সোনা? আসলে ওই রাক্ষসীর স্বভাবচরিত্র ভালো ছিল না। বটে তুমি আমার অনেক জুনিয়ার, তবু তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, তাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতাম। তার একটু সুখের জন্য কী না করেছি আমি? উদয়াস্ত মুখে রক্ত তুলে খেটে মরেছি। ঘরে ক'দিন থাকতাম? এক মাস, দু' মাস, কখনও কখনও টানা তিন মাস বাইরেই পড়ে আছি। কী চমৎকারই না তার প্রতিদান দিয়েছিল মহিলা!

মনে মনে বিরক্ত হলেও শঙ্খ না বলে পারল না, আমি আপনার ছকটা ঠিক ধরতে পারছি না। চিতাবাঘিনীটা আপনার আগের জন্মের কেউ ছিল?

—এগজ্যাক্টলি! পাগলাবাবা চেঁচিয়ে উঠলেন, তবে মাইন্ড ইট, আমার নয়, ওর। মরে গিয়ে আমার বউ চিতাবাঘ হয়ে জন্মেছে। হবে না? খিদের তো শেষ ছিল না মহিলার। এত এত এনে দিয়েছি, তবু তার খিদে মেটেনি। তাই মরে ডাইরেক্ট বাঘ। নে, এ বার কত খাবি খা। পেট ভরে রক্ত খেয়ে মর।

বলতে বলতে গলার স্বর বদলে গেল পাগলাবাবার, ইয়াংম্যান, ওটাকে যে করে হোক নিকেশ করতে হবে তোমায়। আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

—আমি? শঙ্খ মাথা দোলাল, এই তো বললেন, কেউ ওকে মারতে পারবে না।

—বলেছি না কি, অ্যাঁ? পাগলাবাবার চেহারা বদলে গেল চোখের নিমেষে, বেশ করেছি বলেছি। আমার সঙ্গে চালাকি? বাড়াবাড়ি করবে তো ঘাড়টি ধরে বাইরে বের করে দিয়ে আসব।

সর্বনাশ, যত রাত বাড়ছে ভদ্রলোক তত ফেরোসাস হয়ে উঠছেন। ইশ, কী কুক্ষণে যে আজ সকালে এখানে একটা আস্তানা খুঁজতে বেরিয়ে বেছে বেছে এই বাড়িটাই তার পছন্দ হয়ে যায়! পছন্দ হওয়ার কারণ, পাগলাবাবার কুঠির ছাদটা। একটা মানুষখেকো বাঘকে জন্মের মতো ঘুম পাড়িয়ে দিতে একজন শিকারির কাছে এর চেয়ে লোভনীয় জায়গা আর হয় না।

সকালে ভদ্রলোককে তো ভালোই লাগছিল। মন দিয়ে তার প্রস্তাব শুনে মুচকি হেসে বলেছিলেন, আমার এখানে? বেশ তো। কিন্তু আগেই বলে রাখছি, আমি লোক সুবিধের নই। এখানকার কেউ তোমায় বলেনি?

—বলেছে। আমি কেয়ার করিনি।

—বটে? ব্রেভ ইয়ংম্যান, তুমি স্বচ্ছন্দে এখানে থেকে যেতে পারো। তোমায় আমার ভালোই লাগছে। মোর ওভার, কেমন চেনা চেনাও ঠেকছে।

শঙ্খ একদৃষ্টে দেখছিল পাগলাবাবাকে। ঘাড় দুলিয়ে বলল, আমারও। আপনাকে আগে কোথায় যেন দেখেছি।

—বটে? পাগলাবাবা অন্য কথা পেড়েছিলেন, তবে মাইন্ড ইট ব্রেভ ইয়ংম্যান, তুমি কত বড় শিকারি আজ রাতে তার পরীক্ষা দিতে হবে তোমায়। রাজি?

—আনন্দের সঙ্গে। বুক ঠুকে বলে দিয়েছিল শঙ্খ।

একে পরীক্ষায় ডাহা ফেল, তার ওপর পাগলাবাবাকেও দিল চটিয়ে । শঙ্খ জড়সড় হয়ে গেল । বাইরে খটাস করে একটা আওয়াজ হল । পাহাড়ে-জঙ্গলে অনেক ঘুরেছে শঙ্খ, তবু চমকে গেল ।

পাগলাবাবা একটু যেন নরম হলেন । গলা নামিয়ে বললেন, ও পাতা পড়ার আওয়াজ । তুমি শিকারি না ছাই । খালি বড় বড় কথা ।

শঙ্খ চেয়ে রইল । আর মুখ খুলছে না ।

পাগলাবাবার গলার স্বর খাদে নেমে এল, বললাম তো, ও রাক্ষসী পিশাচিকে মারা তোমার সাধ্য নয় । আমাকে না খাওয়া পর্যন্ত ওর শান্তি নেই । সারারাত ধরে দরজা আঁচড়ায়, বারান্দায় ওত পেতে বসে থাকে । একদিন রাতে দরজাটা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল আর কী! পরের দিন কোলাপসিবল গেট লাগিয়ে তবে হাঁফ ছাড়ি ।

শঙ্খ তা-ও মুখ খোলার দিকে গেল না । তবে যত অদ্ভুতই লাগুক, পাগলাবাবার কথাগুলো শুনতে মন্দ লাগছে না।

—একটা পুরোনো হিসেব মেটানো এখনও বাকি আছে । বলতে বলতে হঠাৎ পাগলাবাবা কেমন উদাস হয়ে গেলেন, তার জন্যই বেটি এখনও ছোঁকছোঁক করে মরছে । হয় ও মরবে, নয় আমি ।

আচমকা ফোঁস করে হ্যাজাকের আলোর পিণ্ড থেকে একটা আগুনের জিব বেরিয়ে এসে মিলিয়ে গেল । সঙ্গে সঙ্গে পাগলাবাবা আবার বদলে গেলেন । এগিয়ে এসে শঙ্খর হাত চেপে ধরে ভেঙে পড়লেন, তুমি আমায় বাঁচাও! আমার এক্ষুনি মরে যেতে ইচ্ছা করছে না । বলো বাঁচাবে আমায়? বলো বলো!

—আরে, এ কী করছেন! মুখ খুলতেই হল শঙ্খকে, হাত ছাড়ুন!

—না, ছাড়ব না । আমার কী দোষ? চোখের সামনে ওরকম একটা দৃশ্য দেখলে কার মাথার ঠিক থাকে?

—দৃশ্য!

—হ্যাঁ । সেদিন আমি হঠাৎই বাড়ি ফিরে এসেছিলাম । ঘরে ঢুকে ওই দৃশ্য দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারিনি। একটা হাতুড়ি দিয়ে—।

থেমে গেলেন পাগলাবাবা । পরক্ষণেই শঙ্খকে ছেড়ে ছিটকে গিয়ে গলা চড়িয়ে দিলেন আবার, অ্যাই অ্যাই এ কী কাণ্ড, একফোঁটা ছেলে, হাঁ করে বসে বসে বড়দের কথা গিলছ? আবার বলছ, দৃশ্য? কেমন ছেলে হে তুমি? খবরদার, যা শুনেছ শুনেছ, কারুর কাছে বলেছ কি, একদম খুন করে ফেলব ।

প্রলাপ! পাগলের প্রলাপ । কিন্তু সবটাই কি প্রলাপ? শঙ্খর কেমন চেনা চেনা লাগছে কথাগুলো । এই লোকটা যে সত্যি সত্যি খুন করে ফেলতে পারে সেটাও যেন বিশ্বাস করে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে । কিন্তু কেন?

শঙ্খ হঠাৎ বন্দুকটা টেনে নিল কোলে ।

অনেক রাতে পাগলাবাবার ঠেলায় ঘুম ভেঙে গেল শঙ্খর । বাইরে সোঁ সোঁ আওয়াজ হচ্ছে । খটাখট করে পাতা ঝরে যাচ্ছে । সেই সঙ্গে বিশ্রী একটা আঁশটে গন্ধ । টেনে ধরা গার্টারের মতো বিছানায় সিধে হয়ে বসল শঙ্খ । তার পর খুব সাবধানে জানলার একটা পাল্লা ফাঁক করে একেবারে আঁতকে উঠল ।

এসব এলাকায় কারেন্ট থাকাটাই আশ্চর্য । সেই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটিয়ে দিয়ে বাইরের বারান্দার ডুমটা জ্বলছে । বারান্দার ঠিক সিঁড়ির নীচে গুটিসুঁটি মেরে বসে আছে চিতাবাঘিনীটা । কানদুটো তার খাড়া হয়ে আছে । জ্বলজ্বলে চোখ দরজার দিকে স্থির । যেন কারুর বাইরে বেরোনোর অপেক্ষা, চক্ষের নিমেষে তুলে নিয়ে চলে যাবে মুখে করে ।

—সাহসখানা দ্যাখো একবার! আবার এসেছে । পাগলাবাবা ফিসফিস করে উঠলেন ।

কাল রাতে একটু বিগড়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত মহা গোলমাল কিছু করেননি ভদ্রলোক । তবে বকবক করে গেছেন অনেক রাত অবধি । পাগলের কথার তো মাথামুণ্ডু নেই । একবার এই বলছে, পরক্ষণে আর এক । তবে তার মধ্যে একটা কথা শুনে শঙ্খ ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল । স্ত্রীকে রিয়েলি ভালোবাসলেও তাকে

পাগলাবাবা নিজের হাতেই খুন করেছিলেন । যে ভালোবাসার জন্য তিনি মুখে রক্ত তুলে খেটে মরেছিলেন, সেখান থেকে এত বড় আঘাত তিনি সহ্য করতে পারেননি ।

—মার মার! চালিয়ে দে! সোজা চালিয়ে দে! পাগলাবাবা শঙ্খর কাঁধ চেপে ধরলেন ।

শঙ্খ কেঁপে উঠল । যতই লোকটা পাগল সেজে থাকুক, আদতে তো একটা খুনি । ফেরারি আসামি । বন্দুকটা খপ করে আঁকড়ে ধরে চট করে সরে গেল সে ।

—আরে কী করছ! পাগলাবাবা হুমড়ি খেয়ে পড়ে শঙ্খর রাইফেলের নল চেপে ধরলেন, দাও । আমায় দাও বন্দুকটা ।

সর্বনাশ, এ লোক দেখছি একটা অঘটন না ঘটিয়ে ছাড়বেন না । তাড়াতাড়ি বন্দুকটা পাগলাবাবার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে শঙ্খ নলটা দিয়ে জানালার পাল্লাটা পুরো খুলে দিল । হু হু করে ঠান্ডা ঢুকছে ভেতরে । ঝিঁকি ডাকছে অবিশ্রাম । বাঘটা আগের মতোই হাঁ করে তাকিয়ে বসে আছে দরজার দিকে ।

হঠাৎ তড়াক করে উঠে পড়ল বাঘটা । গন্ধ পেয়েছে নির্ঘাত । আর এক সেকেন্ড দেরি করা যায় না । নিপুণ হাতে ক্যাচটা সরিয়ে ট্রিগারটা টেনে দিল শঙ্খ । লেগেছে । বাঘিনীটা বিকট গর্জন করে ছিটকে গেল দূরে । কিছুক্ষণ ফোয়ারার মতো ধুলোবালি উড়িয়ে কাঁটাতারের বেড়া ছিঁড়েখুঁড়ে গড়িয়ে পড়ল খাদে । গাছে গাছে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা পাখিদের চিৎকারে মুখর হয়ে উঠল পাগলাবাবার কুঠি ।

শঙ্খ বিছানা থেকে নেমে ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিল । এবার সে পরীক্ষায় পাশ করেছে । কিন্তু এ কী! পাগলাবাবা যে মাথার চুল ছিঁড়তে আরম্ভ করেছেন!

—ওরে শয়তান, এ কী সর্বনাশ করলি আমার! পাগলাবাবা চিৎকার করে উঠলেন, কেন মারলি ওকে? ও তোর কী ক্ষতি করেছিল? আমার জন্য বেচারি ঘুরে ঘুরে আসত, আর আসবে না ।

পাগলাবাবা টান মেরে ছিঁড়ে ফেললেন গলার রুদ্রাক্ষের মালা । হাহাকার করে বলতে থাকলেন, কতদিন ভেবেছি দরজাটা খুলে চলে যাই, সাহস হয়নি । যদি না ও আমাকে মারতে পারে, আবার যদি বেঁচে যাই । এ পাপের বোঝা নিয়ে দিনের পর দিন না ঘুমিয়ে আমি বাঁচতে চাই না ।

পাগলাবাবা চোখের পলকে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিল থেকে তুলে নিলেন বন্দুকটা । তখনও তার নল থেকে সরু সুতোর মতো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে । আবার সেই পাগলামি ।

শঙ্খ ঝাঁপিয়ে পড়ে চেপে ধরল পাগলাবাবার হাত । তৎক্ষণাৎ অদ্ভুত একটা অনুভূতি তার সারা শরীরে কাঁটার মতো বয়ে গেল । এইরকম রোমে ভরা হাত আর একবার সে চেপে ধরেছিল না? সে হাতে রাইফেলের বদলে ছিল বড় একটা হাতুড়ি ।

শঙ্খ থরথর করে কেঁপে উঠল । সঙ্গে সঙ্গে আলগা হয়ে গেল তার হাতের আঙুলগুলো । রাইফেলটা কেড়ে নিয়ে পাগলাবাবা ছিটকে গেলেন দূরে ।

—আরে কী করছেন? দিন ওটা! শঙ্খ চেঁচিয়ে উঠল ।

পাগলাবাবা নিঃশব্দে রাইফেলের নলটা ঘুরিয়ে দিলেন শঙ্খর দিকে । দেখতে দেখতে বদলে যাচ্ছিল তাঁর চেহারা । চোখের ভেতরে গনগন করে উঠল আগুন । চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, দৃশ্য, অ্যাঁ? কাল জানতে চাইছিলে না? তোমাকে কাল দেখেই দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল । আমার ঘরে বিছানায় তুমি শুয়ে আছ আমারই স্ত্রীর সঙ্গে ।

শঙ্খর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল । হুঁ, মনে পড়েছে এতক্ষণে । অনেক দিন আগের কথা । শঙ্খ তখন স্কুলের পাট চুকিয়ে কলেজে ঢুকেছে । কাছেই থাকতেন পাগলাবাবারা । ফিল্ম কোম্পানির রিপ্রেজেন্টিটিভ হিসেবে পাগলাবাবা বছরের অর্ধেক সময় বাইরে বাইরেই ঘুরতেন । মাঝে মাঝে পাশ দিতেন শঙ্খকে । তা দিয়ে সে বিনা পয়সায় হল থেকে ছবি দেখে আসত বন্ধুবান্ধব নিয়ে ।

পাগলাবাবার স্ত্রীর বয়েস খুবই কম ছিল । বাচ্চাকাচ্চাও হয়নি তার । ফলে শেষের দিকে সময় কাটানোই মুশকিল হয়ে পড়েছিল মেয়েটির । তারই সুযোগ নিয়েছিল শঙ্খ । সেই দুপুরে পাগলাবাবার হাত থেকে শঙ্খ

পালাতে পারলেও তাঁর স্ত্রী পারেনি। হাতুড়ি দিয়ে তার মাথা ফাটিয়ে পাগলাবাবা ফেরার হয়ে যান।

শঙ্খর গলা কাঁপতে আরম্ভ করল, হুঁ, মনে পড়েছে। আপনি ফিল্মবাবু।

—অ্যাই অ্যাই এতক্ষণে হয়েছে! পাগলাবাবা প্রচণ্ড জোরে হেসে উঠলেন, বেড়ে একখানা নাম আমায় দিয়েছিলে। আমার বউও আমায় এই নামে মাঝে মাঝে ডেকে ফেলত। বয়েসটা নেহাতই কাঁচা ছিল, একদম ইনোসেন্ট। অথচ তাকেই কিনা আমি টাকা দিয়ে ভোলাতে চেয়েছিলাম! একজন নারী তো পুরুষের কাছে কেবল টাকা চায় না।

পাগলাবাবার বন্দুকের নল আস্তে আস্তে নেমে এল। গলা বুজে আসছিল তাঁর, আমি আমার স্ত্রীকে শুধু প্রাণে মারিনি, আমারই জন্য সে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমি জানি আমাকে না মারা পর্যন্ত সে জন্মজন্মান্তর আমাকে তাড়া করে ফিরবে।

পাগলাবাবা বন্দুক ফেলে দিলেন। বসে পড়ছেন নীচে। আবার মাথা কুটছেন। পাগল পাগল! একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে লোকটা।

—উঠে পড়ুন। শঙ্খ এগিয়ে গিয়ে পিঠে হাত রাখল তাঁর, মিছিমিছি আপনি কষ্ট পাচ্ছেন। মেন কালপ্রিট তো আমিই। আমিই আপনার স্ত্রীকে নীচে নামিয়েছিলাম। মহাপাপ মহাপাপ। আমার জন্য আপনার স্ত্রী অকালে প্রাণ হারিয়েছিল শুধু নয়, আপনার জীবনটাও নষ্ট হয়ে গেছে। দেখছি তো কী কষ্টে আছেন আপনি!

পাগলাবাবা কেঁদে ফেললেন, বড় কষ্ট, বড় কষ্ট! স্ত্রীকে খুন করে বছরের পর বছর তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো আমি পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি, অনুশোচনায় জ্বলেপুড়ে মরেছি দিনের পর দিন। সুইসাইড করতে গিয়েছি, সেখানেও ব্যর্থ হয়েছি বারবার। কেন মারলে ওকে? ও-ই হয়তো আমাকে চিরমুক্তি দিতে পারত।

এর পরেই একটা অতি স্বাভাবিক ঘটনা ঘটল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ছেয়ে গেল ঘর। লোডশেডিং। অন্ধকারে ঠান্ডাটা কি একটু বেশিই লাগে? গা'টা শিরশির করে উঠল শঙ্খর। পাগলাবাবা তো তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ করেই এনেছেন একরকম। কিন্তু তার নিজের তো এখনও পর্যন্ত শুরুই হল না। ওই মহাপাপের তো একটাই বেতন হয়, মৃত্যু।

—পাগলাবাবা, পাগলাবাবা, আপনি কোথায়? শঙ্খ চিৎকার করে উঠল, হ্যাজাকটা একবার জ্বালান না!

পাগলাবাবার সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বাইরে সমানে পাতা খসে পড়ার খটাস খটাস শব্দ। কিন্তু তার মধ্যে ও কীসের শব্দ আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠছে? চিতাবাঘিনীর গলার। ও কি চৈতলবিলের জঙ্গল থেকে আবার উঠে আসছে? গুলিটা ঠিক মতো লাগাতেই পারেনি শঙ্খ, অ্যাঁ?

বন্দুকটা কোথায় গেল? কোথায়? শঙ্খ বসে পড়ল। পাগলের মতো হাতড়াচ্ছে সারা ঘর। বন্দুকও নেই, পাগলাবাবাও নেই ঘরে। কোথায় গেলেন ভদ্রলোক? দরজা খুলে বাইরে চলে গেলেন না তো? চিরমুক্তির জন্য সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গিয়েছিল লোকটা।

পাগলাবাবার কুঠি কাঁপিয়ে বাইরে হুঙ্কার দিয়ে এসে পড়ল চিতাবাঘিনী। আগের জন্মে চরম সুখের মুহূর্তে তাকে মাথায় করে নিতে হয়েছিল হাতুড়ির ঘা। তাই পাগলাবাবা নয়, আসলে সেই অসমাপ্ত সুখকে পূর্ণ করবার জন্যই সে আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু একটা জখম নরখাদকের জন্মান্তরের অতৃপ্ত খিদে একটা ছাব্বিশ বছরের যুবকের পক্ষে মেটানো কি সত্যি সম্ভব?

শঙ্খর গায়ের লোম একটা একটা করে দাঁড়িয়ে যেতে লাগল।

হন্তারক

উল্লাস মল্লিক



আজ বিজুকে মার্ডার করব। তারপর ওর মুণ্ডুটা ছিঁড়ে লম্বা একটা হাই কিক মেরে পাঠিয়ে দেব পার্কের ওদিকে।

আমার পকেটে ন'ইঞ্চি ফলার একটা ছুরি। কোমরে গোঁজা ওয়ান শটার। আগে কোনোদিন মেশিন চালাইনি। ক্ষুর-টুর দু-একবার চালিয়েছি বটে, কিন্তু মেশিন এই প্রথম। বিজুকে দিয়েই বউনি হবে। ফার্স্ট বুকে নল ঠেকিয়ে দানা ভরে দেব। দানা খেয়ে ওর চোখমুখ যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাবে, বুক ধরে ঝুঁকে পড়বে সামনে; তখন চকচকে ফলাটা পেটে ঢুকিয়ে এদিক থেকে ওদিকে টেনে দেব একবার।

পার্কের এই কোণে ক'টা ঝাঁকড়া ঝাউগাছ। সামনে পোস্টের মাথায় একটা বাল্ব ঝুলছিল। একটু আগেই ইট মেরে সেটার গতি করে দিয়েছি। ফলে জায়গাটা অন্ধকার গুহার মতো। সন্ধে থেকে সেই গুহার মধ্যে পজিশন নিয়ে বসে আছি। সঙ্গে একটা ডাবল এক্সের নিপ আর কাগজে মোড়া চানাচুর। চন্নোমেত্ত খাওয়ার মতো অল্প অল্প চুমুক দিচ্ছি। নেশা লেগে গেলে চলবে না। খুব বিউটিফুল একটা হাওয়া দিচ্ছে। এইরকম হাওয়ায় চড়ে যাওয়ার চান্স থাকে। আজ কিন্তু হাত পা মাথা ঠিক রাখা খুব দরকার।

সামনে একটা ফাঁকা ঘাস-জমি। বাচ্চারা খেলে খেলে টাক ফেলে দিয়েছে। শেষ প্রান্তে দুটো স্লিপ আর দোলনা। ধারে ধারে ক'টা সিমেন্টের বেঞ্চ ধৈর্য ধরে ওয়েট করছে। বাতিকগ্রস্ত কয়েকটা বুড়ো হাঁটাহাঁটি করছে ফাঁকা জমিটায়। ওদের কেটে পড়ার সময় হয়ে গিয়েছে। একটা, দুটো করে হাজির হচ্ছে রাধাকেষ্টর দল। এরপর পার্কটা ওদের আন্ডারে চলে যাবে। মোটামুটি শান্তিপূর্ণ বখরা। বিকেলটা বাচ্চা আর মায়েদের, সন্ধেটা বুড়ো-বুড়িদের, সন্ধের পর থেকে রাত আটটা-সাড়ে আটটা পর্যন্ত কুঞ্জবন। তারপর রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে বসে আমার মতো কিছু হরিপদ মাল। জলটল খায়, গাঁজা টানে।

আমাদের এই ছন্নছাড়া এলাকায় পার্কটা ঝি-এর নাকে হিরের নাকছাবির মতো। অনেকদিন ভেস্টেড হয়ে পড়ে ছিল জমিটা। বনতুলসী, গাবজ্যারেন্ডা আর কুলেকাঁটার জঙ্গল। সেকেন্ড ব্রিজটা হতে কলকাতা শহর হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল আর সঙ্গদোষে বখে গেল আমাদের এলাকাটা। বড় বড় বাড়ি উঠল আর ফ্যামিলিগুলো সব ছোট ছোট হয়ে গেল। ঘরে ঘরে ঢুকে গেল হট ছবি আর কোল্ড ড্রিংক্স। ফিরিওলার মতো চার পাশে ছোঁক ছোঁক করে প্রোমোটারের দল। সবুজ মাঠগুলোয় এখন ঝকঝকে ফ্ল্যাটবাড়ি। পাড়ার কয়েকপিস মাথা একটা মালদার প্রোমোটারকে ধরে এই পার্কটা বাগিয়ে নিয়েছে।

একটা ছেলে আমার সামনে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। এগুলো ফেকু পার্টি, এই সময় জোটে। বেঞ্চে কোনো জোড়ের পাশে বসে উদাস মুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে কিংবা বারবার ওদের সামনে দিয়ে হেঁটে যায়। ভাবখানা এই, যেন হাওয়া খাচ্ছে। বিজুও এই দলে। শালা ভদ্দরলোক। মাল খাই না,

গাঁজা টানি না, কিন্তু কেউ প্রেম করলে লুকিয়ে কথা শুনি । আমরা মালখোর, আমাদের মন পরিষ্কার । কাউকে ঝাড়ার হলে সামনা সামনি ঝাড়ব । আর বিজু হারামির বাচ্চা পিছন থেকে বাম্বু গুঁজবে ।

আমার পিছন দিকে কিছুটা রেলিং কেউ হাওয়া করে দিয়েছে । সেই ফাঁক গলে একটা কুকুর ঢুকে পড়েছে । আমার সামনে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছে কুকুরটা । বিজুও মানিকবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে এমনি করে ল্যাজ নাড়ত । আমি দুটো চানাচুর ছুড়ে দিই কুত্তাটার দিকে ।

মানিকবাবুর মারুতি ভ্যান রোডে ভাড়া খাটে । আমিই চালাতুম গাড়িটা । মানিকবাবু সরল-সিধে আদমি ছিল । হারামির বাচ্চাটা নাগাড়ে চুকলি কেটে বিষিয়ে দিয়েছে ওকে । চাকা এক কিলোমিটার গড়ালে মালিকের সাত টাকা চাই । কেউ পার্টির সঙ্গে বেশি রফা করলে সেটা তার । মালিককে তার হক বুঝিয়ে দিলেই হল । এটাই লাইনের নিয়ম । বিজু শুয়ারটা প্রথম থেকে মানিকবাবুর কান ভারী করত । এ লাইনে কোন শালা দু নম্বরি করে না, বুকে হাত দিয়ে বলুক দেখি।

বিজুকে অনেকবার সাবধান করে দিয়েছি । তবু শালা কথা শুনল না । মরণ নেহাতই ওর কপালে আছে । সবারই পয়সার দরকার । তোর পেট আছে, আমার নেই? কবজির জোর থাকলে কাজ জুটিয়ে নে । অপরের আহার ছিনিয়ে নিতে গেলে সে থাবা মারবেই ।

দুটো বুড়ো সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে । একজন তেড়ে নিন্দে করছে ছেলের বউয়ের । উল্টো দিক থেকে আসছে একজোড়া লায়লা-মজনু । মেয়েটা মাথা হেঁট করে ওড়নার খুঁট আঙুলে জড়াচ্ছে । ছেলেটা হাত-পা নেড়ে কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করছে মেয়েটাকে । দেখেই বোঝা যায় নতুন তুলেছে । কাছে আসতে দেখি মেয়েটার সাইড ফেসটা অনেকটা চুমকির মতো । চুমকির কথা মনে পড়তেই মাথার মধ্যে রাগটা চড়াক করে ওঠে । বোতল থেকে একসঙ্গে অনেকটা গলায় ঢেলে দিই ।

চুমকি ছিল আমার শান্তির জায়গা । সারাদিন গাড়ি চালিয়ে, ইঞ্জিনের হিটে শরীর সেঁকে, প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে খিটিমিটি করে সন্ধেবেলা চুমকির কাছে যেতুম । ব্যস, তখন সব কিছু ভ্যানিশ । চুমকির কাছাকাছি থাকলে কী শান্তি! কিন্তু খুব বেশি কাছে যেতে দিত না ও । আসলে হেভি নীতিবাগীশ তো । তা ছাড়া ওকে তো আমার মনের কথাটা জানানোই হয়নি । এই সিচুয়েশনে কোনো মেয়েই বেশি অ্যালাও করবে না । ওরা ইনসিওরেন্সের মতো নিরাপত্তার গ্যারান্টি চায় । চুমকিকে বহুবার বলতে গিয়েও খেই হারিয়ে ফেলেছি । আসল কথাটা জানানো হয়নি । কীভাবে শুরু করব? আমি তোমাকে ভালোবাসি । পেয়ার করি । লাভ করি! নাঃ, হচ্ছে না । যাই বলি না কেন কেমন যেন পাতি হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। শালা, আমার মতো ছেলে, কত লোককে চমকাচ্ছে, কত খিস্তি ছোটাচ্ছে, সে এই সামান্য কথাটা বলতে পারছে না ।

চুমকির বাবা-মা আমাকে ঠিক গিলতে পারছিল না । আমি নেহাত মস্তান টাইপ, যেখানে- সেখানে ঝাড়পিট করে বেড়াই, তাই মুখের উপর কিছু বলতে পারেনি । বাপটা তো হেঁপু রুগি, সারাদিন ফুসফুসে বাড়তি একটু বাতাস নেওয়ার জন্যে খাবি খাচ্ছে । একদিন আমাকে ধরল,— তা তুমি কী ঠিক করলে, গাড়িই চালাবে? বলতে বলতে কাশির দমক এসে গেল । একটু সামলে নিয়ে ফের শুরু করে,— আসলে লাইনটা তো ঠিক... । এই পর্যন্ত বলে ফের কাশে । মনে হল এবার ইচ্ছা করে কাশছে । বলতে চাইছে— লাইন তো ঠিক ভদ্দরলোকের নয় ।

আমি বললুম, দেখি কী করা যায় ।

দেখো, দেখো । এখন কত ভালো ভালো লাইন বেরোচ্ছে । তা তুমি কম্পিউটার শেখো না কেন! চারদিকে তো দেখছি সবাই খুব কম্পিউটার শিখছে ।

পার্কে এখন বুড়ো-বুড়ো কেউ আর নেই । কংক্রিটের বেঞ্চগুলো নওজোয়ানদের পেয়ে চনমনে হয়ে উঠেছে । ওদিকে ছাতিম গাছটার নীচে দু'পিস এসে বসেছে । পুরনো পাপী । প্রায়ই দেখি এখানে । মনে হচ্ছে জোর খিচাইন লেগেছে ওদের । কথা শুনতে পাচ্ছি না, কিন্তু হাত-পা নাড়া দেখে বুঝতে পারছি মেয়েটা খুব তোড় করছে ছেলেটাকে । ছেলেটা একটু ভেবলু টাইপের । কেসটা হ্যান্ডেল করতে পারছে না

। চুমকি একদিন একটা ব্যাপারে এমনই খচে গিয়েছিল আমার উপর । কিন্তু আমিও শালা ওস্তাদ ড্রাইভার । ঠিক পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলুম । আধ ঘণ্টার মধ্যে চুমকি গলে জল। বলল, সরি ।

আমি বললুম, ঠিক আছে, আমি কিছু মাইন্ড করিনি ।

চুমকি বলল, সত্যি বলছ!

বললুম, মা কালীর দিব্যি । তোমার উপর রাগ করতে পারি না ।

কেন, রাগ করতে পারো না কেন?

নিখুঁত পাস দিয়েছে চুমকি । বলটা শুধু ফাঁকা গোলে ঠেলে দেওয়া । কিন্তু ক্যালাস স্ট্রাইকারের মতো অমন সুযোগটা উড়িয়ে দিলুম । কোনওরকমে তুতলে মুতলে বললুম, আসলে আমি তোমাকে খুব...

চুমকি খুব আগ্রহ নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল—আমাকে খুব কী!

তখন ঘাবড়ে গিয়ে আমি কথা হারিয়ে ফেলেছি । এদিকে চুমকি বার বার তাগাদা দিচ্ছে, কী হল বলবে তো!

শেষে মরিয়া হয়ে বলে ফেলি, আমি তোমাকে একদিন গাড়ি করে বেড়াতে নিয়ে যাব ।

চুমকি খানিকক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে । ক্রমশ থমথমে হয়ে ওঠে ওর চোখমুখ । একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে, যদি কোনোদিন তোমার নিজের গাড়ি কেনার মুরোদ হয় তো চাপব ।

বিজু যে পিছনে লেগেছে বুঝতে পারি মাসখানেক আগে । সেদিন হোল-ডে প্যাসেঞ্জার নেই । সারাদিন গাড়ির মধ্যে বসে ভেপে যাচ্ছি । এদিকে সন্ধেবেলা আমার চুমকির সঙ্গে প্রোগ্রাম; 'ম্যায় হুঁ না' দেখতে যাব । তারপর 'নিরালা' রেস্টুরেন্টে মোগলাই চিকেন কষা খাব । চুমকিকে বলে দিতে হবে কথাটা । আর ফেলে রাখা ঠিক হবে না । শুনছি দেবু লাইন লাগিয়েছে চুমকির পিছনে । সত্যদা পার্টির ঘ্যাম নেতা । সেই সত্যদার পাতা চাটে দেবু । কোনো প্রোমোটারই সত্যদার পারমিশন ছাড়া এলাকায় ঢুকতে পারে না । দিন দিন লাল হয়ে যাচ্ছে সত্যদা । সেইসঙ্গে দেবুর গায়েও লাল না হোক গোলাপি আভা লাগছে । দেবুর গায়ে পার্টির স্ট্যাম্প আছে, দেবুর বাড়িতে এক্সট্রা ঘর আছে, দেবুর ঝকঝকে মোটর সাইকেল আছে । আমার বাড়িতে বাতের ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে ঠাকুরের নাম নেওয়া মা, সিন্থেটিক শাড়ি পরে পাড়ার কে জি ইস্কুলে 'ব্যা ব্যা ব্ল্যাক শিপ' শেখাতে যাওয়া বোন, আর পোলিও-পা নিয়ে ল্যাকপ্যাক করা ভাই । এসব ভাবলেই টেনশন বাড়ে । ঠিক করেছি, যা থাকে কপালে, বলেই দেব । আর চুমকিকেও বলি, সবই তো বুঝিস! তবু মুখ দিয়ে বলাবে । শুনে কী শান্তি কে জানে! তো সেদিন বসে বসে দু'বান্ডিল বিড়ির ছাদ্দ করে সন্ধেবেলা মানিকবাবুকে গিয়ে বললুম, টাকা দিন, ব্রেক-শুগুলো নষ্ট হয়ে গেসল, নতুন লাগিয়েছি ।

মানিকবাবু বলল, দেখি পুরনোগুলো ।

আন্দাজ করেছিলুম মানিকবাবু চাইতে পারে । ব্যবস্থা করাই ছিল, গ্যারেজ থেকে জোগাড় করা পুরনো মাল গছিয়ে দিলুম ।

মানিকবাবু ভুরু কুঁচকে একটু দেখল । শালা বমকে গেছে । কিন্তু টাকাও দিল না । বলল, কাল টাকা নিয়ে যাস ।

পরে শুনি বিজু রাত্তিরবেলা গ্যারেজে গাড়ি নিয়ে গিয়ে ব্রেক-শু-গুলো টেস্ট করিয়েছিল ।

মানিকবাবুকে ভালো বলতে হয়; এর পরও আমাকে গাড়ি চালাতে দিয়েছে । কিন্তু সেদিন পুরো প্ল্যানটা ধসে গেল। হেভি গোঁসা খেয়ে গেল চুমকি । স্ট্রেট জানিয়ে দিল ঠ্যালাচালক, রিকশাচালক, মারুতিচালক সব একই ক্যাটাগরির ।

হঠাৎ দেখি বিজু পার্কে ঢুকছে । শিরদাঁড়া টান টান করে বসি । কিন্তু সঙ্গে ওটা কে! হ্যাঁ ঠিকই দেখেছি; একটা মেয়ে । শুনেছিলুম বটে বিজু নাকি একটা মাল তুলেছে । খবরটা তাহলে সত্যি । মেয়েটা না কি একটা উকিলের মেয়ে, পাড়ায় নতুন আমদানি । মেয়েটাকে দেখে মাথার মধ্যে রাগটা ফের চড়াক করে ধাক্কা দেয় । বোতল থেকে বেশ বড় একটা চুমুক মারি ।

বিজু মেয়েটাকে নিয়ে পার্কের শেষ প্রান্তে একটা বেঞ্চের উপর বসেছে। ওদের পিছনে দেবদারু গাছের সারি। কচি কলাপাতা রঙের নতুন পাতায় আলো পড়ে ঝলমল করছে। বিজু আজ খুব ফ্যাশান মেরে জিন্স আর গেঞ্জি পরেছে। হাতে পয়সা এসেছে, এখন মাঞ্জা তো দেবেই। দাঁড়া শালা, তোর ফ্যাশান ফুটিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু মেয়েটা জুটে তো মহা ফ্যাসাদ হল দেখছি! শালা হল্লা মচালেই কেস কেলো হয়ে যাবে। যাকগে, ফার্স্ট চেষ্টা করব মেয়েটাকে ভাগিয়ে দিতে, গড়বড় করলে দুটোকেই ঝেড়ে দেব।

বিজুর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তুম। খেলাধুলো, মেয়ে-ইস্কুলের সামনে জটলা করা, প্রথম সিগারেট টানা—সবই একসঙ্গে। সেই বিজু এত বড় গদ্দারি করবে ভাবতে পারিনি। সমানে পিন মেরে গিয়েছে মানিকবাবুকে। হপ্তাখানেক আগে সেদিন দুটো লং ট্রিপ মেরেছি। ভালোই কামানি হয়েছে। চাঁদুর ঠেকে গিয়ে দু'পেগ চাপিয়েও নিয়েছি। বাড়ি ফিরছিলুম বেশ মুড নিয়ে। ক'দিন ধরেই ভাবছি চুমকিকে একটা সিটি গোল্ডের হার দেব। চৌরাস্তার মোড়ে একটা ভাড়া পেলুম। দুটো লোক, সঙ্গে একটা মেয়েছেলে; সন্তোষপুর যাবে। তখন আমার পকেট গরম। অন্য সময় হলে সিওর কাটিয়ে দিতুম। কিন্তু এখন আমার পয়সার দরকার। চুমকির ব্যাপারটা ফেলে রাখা যাবে না। দেবু স্ট্রেট লাইনে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু আমি সিওর, চুমকিকে শুধু বলার অপেক্ষা। বললেই ও রাজি হয়ে যাবে। চুমকি শুধু আমার মুখ থেকে শুনতে চায়। কিন্তু ওকে তুলব কোথায়! একটা ঘরে সাতজন মেম্বারের সঙ্গে পোলট্রির মুরগির মতো গাদাগাদি করে থাকি। ইমিডিয়েট একটা ঘর তুলতে হবে। তো সেদিন মেয়েছেলে দেখে বুঝলুম ভালো খেঁচে নেওয়া যাবে। বেশ চড়িয়ে রেট বললুম। পার্টিও রাজি হয়ে গেল।

সন্তোষপুরের দিকে গাড়িটা ছুটছিল। দু'পাশে অন্ধকার মাঠ। হঠাৎ পিছন থেকে গলায় ছুরি ধরে গাড়ি থামাতে বলল। তারপর আমাকে পুরো ছেঁকে নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তিনজন। ফিরে এসে মানিকবাবুকে সব বললুম। মানিকবাবু গম্ভীর মুখে শুনল। শেষে বলল, ঠিক আছে দেখছি, তুই গাড়ি গ্যারেজ কর।

পরদিন সকালে গিয়ে দেখি গ্যারেজ ফাঁকা। মানিকবাবু বলে দিল, তোকে আর গাড়ি চালাতে হবে না।

সেই গাড়ি এখন বিজু চালাচ্ছে। বহুত স্ক্যানডাল ছড়িয়েছে আমার নামে। আমি আর গাড়ি পাচ্ছি না। মা আমার দিকে আজকাল কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকায়। বোন সেদিন বলল, দাদা তোর নামে কী সব বিচ্ছিরি কথা শুনছি।

চুমকির কাছে গেলুম একদিন। ও সেজেগুজে কোথায় একটা যাচ্ছে। খুব ব্যস্ত। কথা বলার সময়ই হল না।

কাজের ধাক্কায় চারদিকে ঘুরি। দেখি দেবুর মোটর সাইকেলের পিছনে চুমকি। ঝড়ের মতো আমার পাশ দিয়ে চলে যায়। চুমকিকে বলাই হল না কথাটা। মনে মনে খিস্তি পাড়ি নিজেকে।

এখান থেকে দেখছি খুব লেকচার দিচ্ছে বিজু। শালা কথার মাস্টার! মেয়ে পটাতে ওস্তাদ। নে, যত পারিস বাতেলা ঝেড়ে নে, একটু পরেই তো ফুটে যাবি।

ফের একটা চুমুক মেরে নিজেকে চাঙ্গা করি। চুমকির জন্য দুঃখটা বুকের মধ্যে ঘাই মারে। চুমকিও আমাকে ভুল বুঝল। চুমকি, তোমার দিব্যি, টাকাটা সেদিন সত্যিই চোট হয়ে গেসল। আমাকে আর একটু সময় দিলে পারতে। তোমাকে ছুঁয়ে বলছি, তোমাকে আমি খুব...।

যাঃ শালা, মাতাল হয়ে গেলুম নাকি! ফালতু চিন্তা ঝেড়ে ফেলে সোজা হয়ে বসি। রাত বাড়ছে, একটা-দুটো করে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে বেঞ্চগুলো।

বিজু এখনও মেয়েটাকে নিয়ে বসে আছে। অন্ধকার গুহা থেকে বেরিয়ে আসি আমি। এখান থেকে সোজা দেখা যাচ্ছে ওদের। ঝলমলে ঝাউপাতার ব্যাকগ্রাউন্ডে বসে আছে দুজন। পকেটে হাত ঢুকিয়ে মেশিনটা একবার ছুঁয়ে দেখি।

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বিজু । মর্নিং ওয়াকে আসা মানুষজন ভিড় জমিয়েছে লাশটাকে ঘিরে । চারপাশে চাপ চাপ রক্ত । মুখটা হাঁ, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে । মুখের ওপর ভন ভন করছে মাছি ।

নাহ, আর সময় নেওয়া ঠিক হবে না । একটু পরেই রাজ্যের মাতাল আর গেঁজেল এসে জুটবে । আমি কায়দা করে পাশ কাটিয়ে পিছনের দিকে চলে যাই । তারপর বেড়ালের পায়ে এগোতে থাকি ওদের দিকে । এখনও দুজনে খুব মুডে গল্প করে যাচ্ছে ।

ওদের পিছনে একটা খুব মোটা গাছ আড়াল করে আমি এগোই । তারপর গুঁড়িটার গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি।

হঠাৎ শুনতে পাই বিজু বলছে, আমি তোমাকে খুব...

মেয়েটা খিলখিল করে হাসছে, খুব কী?

বিজু তোতলাচ্ছে, আসলে খুব... কী বলব...

আমি আর এগোতে পারি না । পা দুটো পাথরের মতো ভারী হয়ে গেছে । ছুরিটা শক্ত করে ধরে গাছের গুঁড়িতে ফলাটা ঠেকাই । আমার ঠোঁটগুলো আর বশে নেই, বিড় বিড় করে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে ।

কানে আসছে মেয়েটার হাসি আর বিজুর তোতলামি, আমি তোমাকে...

প্রচণ্ড চাপে ছুরির ফলাটা বেঁকে যাচ্ছে আর আমার অবাধ্য ঠোঁটদুটো বলছে, বলে ফেল নারে শালা, বল, তাড়াতাড়ি বল, দেরি হয়ে যাচ্ছে ।

স্টার অফ ডেভিড

রাজেশ বসু



আদিগন্ত সবুজ পাহাড়ের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ উপত্যকা। কোথাও চায়ের খেত। কোথাও বা মশলার। দূর দৃশ্যপটে উঁকি দিচ্ছে আনাইমুদি শৃঙ্গ। অসংখ্য ঝরনার কাটাকুটি গোটা অঞ্চল জুড়ে। এরই মধ্যে নির্জন সবুজের মধ্যে লালটালিওলা একটি বাংলো। সবুজ রং করা কাঠের বেড়ায় ফুটদেড়েকের সাইনবোর্ড —''হেভেন'স অ্যাবোড''। এখনও বিকেলের আলো নিভে আসেনি। বিশ—ত্রিশগজ তফাত থেকেও লেখাটা পড়তে পারল বব। ভালো নাম দিয়েছে বটে উন্নিবুড়ো। হাসি পেল ওর। ওইসব স্বর্গ—নরকের কনসেপ্টে নেই সে। কয়েকঘণ্টা পর ওই নামটাই খোরাক হয়ে যাবে। হেভেন হয়ে যাবে হেল। লালমুখোরা আর আসছে না। কেস খাবে বুড়ো। খাক শালা! দরকার ছিল খুব। সামান্য সরকারি আমলা হয়ে কম তো কামায়নি। এই মুন্নারেই এরকম গোটা তিনেক বাংলো নাবিয়েছে শালা। পোনমুড়িতেও বানাচ্ছে একটা। সেখানেই আছে এখন। কাল ফিরবে। টাকা কামিয়ে আশ মিটছে না বুড়ো শকুনের। কাজটা নিত না বব, উন্নিবুড়ো সিনে আছে জেনে আর না করেনি। তাছাড়া টাকার অঙ্কটা যথেষ্টই বেশি। গোটা একটা চা বাগান কিনে ফেলা যায়।

থুতু ফেলল বব। চারিপাশটা দেখে নিল ভালো করে। ঘর—ফিরতি পাখির দল ছাড়া প্রাণের স্পন্দন নেই কোথাও। এমনিতেই এদিকটা খুব নির্জন। তা—ও আবার বছরের শেষ দিন। তিন 'ম' নিয়ে ফুর্তি করার দিন। কয়েকটা বুড়োহাবড়া যা পড়ে আছে ঘরের মধ্যে। দিন গুনছে পরপারে যাওয়ার। এই শীতে টিকে গেলে নেক্সট সিজনের শুরুতেই টসকাবে। একটু চিন্তা করল সে। উন্নিবুড়োর অতিথিটিও এই গোয়ালের। ক'দিন পরে এমনিই পটল তুলত। বেকার সময়টাকে এগিয়ে আনার কী ছিল কে জানে! আসলে সব—ই বিজনেস। উন্নির মুখে কালি লেপতে চান ম্যাম। রাইভ্যাল রাখতে চান না। —সত্যি মাইরি! পাত্তি কী চিজ! বুড়ি থুত্থুড়ি হয়ে মরতে চললি, এখনও মাল্লুর ধান্দা। সাদা চামড়ার জাতটাই আসলে এরকম, লাইফে লেনদেন ছাড়া কিছু বোঝে না। এ দেশেও সেই বীজ বুনে দিচ্ছে।

আবার থুতু ফেলল বব। তিনপেগ খেয়েছে মাত্র। অবশ্য পুরোটাই নিট। মুখটা কেমন টক লাগছে। থুতু উঠছে বারেবারে। নার্ভাস হয়ে গেল নাকি? ধুস। সব কাজের—ই শুরু আছে। জলে একবার নেমে পড়ে কুমিরের ভয় করলে চলে না। জ্যাকেটের ভিতরের পকেটে হাত রাখল সে। শীতল ধাতব স্পর্শ। মগজটাকেও এমন সলিড আর কুল রাখতে হবে। কয়েক মিনিটের তো কাজ। বুড়োসাহেবটা ছাড়া ''হেভেনস অ্যাবোড'' বিলকুল ফাঁকা। মিয়াম্মা নামে একটা বউ রান্নাবান্না করে। কাজ সেরে অনেক আগেই হাপিস হয়েছে সে। একদম ফাঁকা গোল। চোখ বুজেও নেট করা যায়।

বাইক লক করে এগিয়ে চলল বব। হ্যান্ডেলে ঝোলানো কেকের প্যাকেটটা হাতে নিয়েছে। এটা হল এনট্রিপাস। অন্ধকার নামছে চুইয়ে চুইয়ে। হেভেন'স অ্যাবোড ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। চারিপাশ খুব ভালো করে জরিপ করে নিল সে। ফলস চাপদাড়িটা দেখে নিল হাত দিয়ে। থোবড়াটা একটু চেঞ্জ করে নেওয়াই বেটার। কাঠের গেট খুলে নুড়ি বিছানো পথ বেয়ে গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়াল সে। তিনধাপ হোয়াইট মার্বেলের সিড়ি বেয়ে মেন দরজা। একবার পিছনে চাইল। কেউ কোত্থাও নেই। কুল সিন। তবু হঠাৎই বুকের ভিতর একডজন মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন স্টার্ট নিয়েছে যেন। উঁহু, নার্ভাস হলে চলবে না। চোয়াল শক্ত করে কলিংবেলের সুইচে চাপ দিল বব। শীতকাল বলে একটা সুবিধা, উলেন গ্লাভস পরাই আছে হাতে। ফিংগারপ্রিন্ট উঠে যাওয়ার সমস্যা নেই।

এক দুই তিন... সেকেন্ড গুনছিল বব। বত্রিশের মাথায় ভাবছিল আবার টুং টাং ঘণ্টা বাজাবে কিনা, তক্ষুনি খট করে দরজাটা খুলল।

''হুম ওয়ান্ট?''—প্রত্যাশামতোই বুড়োসাহেব দরজা খুলেছে। জলহস্তীর মতো বিশাল চেহারা। ম্যাম বলেছিল নব্বুইয়ের কাছাকাছি বয়স। দেখে কিন্তু অতটা মনে হচ্ছে না। সোজা দাঁড়িয়েছে একদম। হাতে লাঠিও নেই। এই শীতেও প্লেন নাইটড্রেস। জাস্ট একটা সিল্কের গাউন। মাল টানছিল মনে হয়, মুখে ভালোই গন্ধ। ববের ইচ্ছে করছিল, এখনই কাজটা সেরে দেয়। কিন্তু সেটা রিস্কি হয়ে যাবে। দরজা খুলে রেখে অ্যাটলিস্ট খুন—টুন করা চলে না। তা সে যতই সেক্লুডেড প্লেস হোক না কেন। কথায় বলে দেওয়ালেরও কান আছে। তাছাড়া ম্যাম নীল রঙের একটা মেটাল স্টার দিয়েছেন, কেন কে জানে, গুলি চালানোর আগে সেটা নিয়েও একটু নকশা দেখানো আছে। পুরনো কী ক্ষার আছে কে জানে!

''গুড ইভনিং স্যার। উন্নিসাব এটা পাঠিয়ে দিলেন—হ্যাপি নিউ ইয়ার স্যার।'' হাতের প্যাকেটটা দেখিয়ে ইংরেজিতে উত্তর দিল বব।

''ওহ দ্যাটস নাইস।'' বলে হাতির পায়ের মতো হাতটা বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিয়েছে বুড়ো। দরজা প্রায় বন্ধ করে আর কি।

''স্যার একটা কাজ আছে, গ্যাস সার্ভিস করে যেতে হবে। জাস্ট আ রুটিন চেক। ডোন্ট ওরি স্যার। স্পেয়ার ওনলি টেনমিনিটস।'' গলা না কাঁপিয়ে ঢোঁক—ফোক না গিলে মোটামুটি স্মার্টলিই বলল বব।

''ক্যুরিয়ার কাম গ্যাস মেকানিক?'' ভুরু কপালে উঠেছে বুড়োর।

''ইয়েজ স্যার। কনফেকশনারিটা আমার ভাইয়ের, তাই...''

''ও কে! ক্যারি অন।'' দরজার পাশ থেকে সাদা জলহস্তী সরে গেল। ঘরে ঢুকে পড়ল বব। এটা ড্রয়িংরুম। বেশ সাজানো—গোছানো ছিমছাম। দেশি বিদেশি জিনিস ভরিয়ে বেশ একটা ককটেল ডেকরেশন করেছে উন্নিবুড়ো। ডলার টানার কায়দা আর কি।

''সোজা গিয়ে ডানদিকের লাস্টরুমটা কিচেন।'' জলহস্তী নির্দেশ দিল গমগমে গলায়। ধপাস করে বসেছে বিশাল একটা আর্মচেয়ারে। সামনেই টি—উডের প্যাঁচালো টেবিল। বুড়ো মাল—ই গিলছিল। স্কচ রাম না হুইস্কি কে জানে! টেবিলের উপরেই রয়েছে ছিপিখোলা বোতলটা। হেবি দেখতে। ঢাউস একটা সেন্টের শিশি যেন। জলটল নেই। ডাইরেক্ট বোতল থেকে মারছে। লিভারের জোর আছে বটে। হয়তো বা ওটারও। কয়েকহাত তফাতে এলসিডি টিভির স্ক্রিনে বৃষ্টিভেজা নায়ক—নায়িকার উদ্দাম নৃত্য। হিন্দি মিউজিক চ্যানেল। সাউন্ড প্রায় শোনাই যাচ্ছে না। দরকারও নেই। ঢুলুঢুলু চোখে নায়িকা আর তার সঙ্গিনীদের ললিত লোভন লীলা গিলছে। ববের পদ্মিনীর মুখটা মনে পড়ল। পরক্ষণেই ওর শরীরের না ঢাকা জায়গাগুলো। চোদ্দোমাস চরকি হয়ে ঘুরছে। এখনও নাকাব সরাতে পারল না। পেমেন্টটা হাতে আসুক, তখন দেখবে কত জোর পদ্মিনীর।

নাঃ, দেরি করে লাভ নেই। সদর দরজাটা বন্ধ করে দিল বব। বুড়ো ফিরেও চাইল না। বড্ড নিরিমিষি কাজ। শিকড় উপড়ানো একটা গাছকে কাটতে হবে। জ্যাকেটের বুকপকেট থেকে মেটালের নীল তারাটা

বের করল ও। লোকটার কোনো খেয়াল নেই। ভারতীয় সুন্দরীর নিতম্বদুলুনি দেখছে তন্ময় হয়ে। দ্যাখ ব্যাটা। শেষবারের মতো দ্যাখ। সোজা গিয়ে টেবিলের উপরে নিজের বাঁ পাটা রাখল বব। স্টারটা একদম লোকটার নাকের ডগায় ধরেছে।

''এটা চিনতে পারেন স্যার?'' ম্যামের শিখিয়ে দেওয়া কথাগুলো বলল সে।

ভুরু কুঁচকে গেল বুড়োর। মুখের জ্যামিতি দ্রুত পাল্টাচ্ছে। গল্প আছে তো!

''হেই...ইউ ব্লাডি সোয়াইন...'' চাপা হুঙ্কার দিয়ে উঠল জলহস্তী। আর দেরি নয়। স্টারটা পকেটে পুরে চট করে টেবিলের উপরে রাখা টিভির রিমোটটা উঠিয়ে নিল বব। ফুল ভল্যুমে তুলে দিল টিভির সাউন্ড। এটা করার খুব প্রয়োজন হয়তো ছিল না। এক কিলোমিটারের মধ্যে কোনও বসতি নেই। তবু, রিস্ক নিচে চায় না সে। কিন্তু ফোল্ডিং ছুরিটা বের করতে যাওয়ার আগেই প্রতিরোধটা এল। চোয়ালের উপর নেমে এল হাতির পায়ের মতো হাতটা। শেষ মুহূর্তে ছিটকে গিয়েও পাঞ্চটা এড়াতে পারল না সে। কানের পাশে হাতুড়ির মতো পড়ল ঘুষিটা। চার—পাঁচ সেকেন্ডের জন্যে পুরো ব্ল্যাকআউট। সংবিৎ ফিরতে না ফিরতেই জলহস্তি ভিতরের ঘরের দিকে ছুটেছে। জ্যাকেট থেকে ছ'ইঞ্চির ফোল্ডিং চাকুটা টক করে বের করে পেলল বব। তারপর যতটা জোর আছে ঠুসে দিল লোকটার পিঠে। বিকট চিৎকার করে একটা পাক খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল জলহস্তীটা। পিঠের ডানদিক দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল বব। বুকের মধ্যে এরোপ্লেন ছুটছে এবার। বুড়োর তাগদ আছে বটে। তবুও উঠে বসার চেষ্টা করছে। চোখের নীল মণিদুটো থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। বব আবার চাকু তাক করল। হাত কাঁপছে খুব। চারহাত তফাতেও লোকটার বুকটা নিশানায় ধরতে পারছে না। যা থাকে কপালে, প্রায় আন্দাজেই লাফিয়ে পড়ল সে। লোকটা চিত হয়ে পড়ল এবার। চাকু বুকের বাঁ—দিক ঘেঁষেই গেঁথে গিয়েছে। একটানে তুলে ফেলল সেটা। চাপকলের মতো রক্ত বেরিয়ে আসছে শরীর থেকে। গা ঘুলিয়ে উঠল ববের। মানুষের শরীরে কত রক্ত থাকে মাইরি! জলহস্তী তবুও ঘসটে ঘসটে দেওয়ালের দিকে এগোচ্ছে। পাগলের মতো আর একবার চাকু চালাল বব। মুচড়ে উঠল অতবড় শরীরটা। এতক্ষণে দম শেষ। একটা হাত দেওয়ালে রেখে পুরো পাথর।

চাকু গুটিয়ে পকেটে চালান করল বব। এবার নিজেই দম নিতে পারছে না। সত্যিই একটা মানুষকে খুন করে ফেলল সে! আচমকাই পিছনে প্রবল কাঁপুনি। চমকে উঠেছিল বব। দুঃ শালা! মোবাইল বাজছে। ফোনটা হাতে নিল বব। কী কপাল মাইরি—পদ্মিনী কলিং! ওয়েট হানি। একঘণ্টার মধ্যেই আসছি। লাইনটা কাটল না। নট আনসারড দেখাক। বলবে বাইক চালাচ্ছিল, শুনতে পায়নি। টিভিটা অফ করে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল এবার। দরজার হ্যাজবোল্টটা টেনে দিল বাইরে থেকে। চারিদিক শান্ত নিঝুম। কে বলবে এইমাত্র একটা সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেল। দরজা পেরিয়ে কাঠের গেটের মুখে থোকা থোকা নীল ফুলের বেড। উন্নিবুড়ো লাইট দিয়ে ডেকরেট করে রেখেছে। ঢোকার সময় নজর করেনি। এখন পাতাসুদ্ধু কয়েকটা ফুল ছিঁড়ে ফেলল বব। পদ্মিনী ফুল ভালোবাসে। একঘণ্টার মধ্যেই ফুলটা ওর চুলে গুঁজে দেবে সে।

২

টিভি চালিয়ে বসেছিলেন স্টেফানিয়া। রাত এখন ঠিক বারোটা। গোটা উপত্যকা ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনিই কেবল জেগে আছেন। সারাদিন ধরে একটাই খবর ব্রেকিং নিউজ করে দেখিয়ে যাচ্ছে চ্যানেলগুলো। পরশু সন্ধেবেলায় কে পি উন্নিকৃষ্ণনের প্রাইভেট কটেজে একজন বিদেশি ট্যুরিস্ট মার্ডার হয়েছেন। এমন ঘটনা এ তল্লাটে এই প্রথম। স্বভাবতই পুলিশ সিরিয়াসলি বিষয়টা নিয়ে পড়েছে। রুদ্রাণী চক্রবর্তী নামে একজন মহিলা পুলিশ অফিসারের চার্জে মনে হয় কেসটা। অল্পবয়সি মেয়েটি খুব কেতা নিয়ে বলছিল, এক সপ্তাহের মধ্যে নাকি কালপ্রিটকে ধরে ফেলবে। হাসি পাচ্ছিল স্টেফানিয়ার। পুলিশের দৌড় কদ্দূর ভালোরকম জানা আছে তাঁর। ক্লান্ত হয়ে এইমাত্র চ্যানেল বদলেছেন। লোকাল একটা রোমান্টিক মুভি হচ্ছে। থিম সেই একই। বড়লোকের মেয়ে। ফুটপাথের ছেলে। ভিলেন বাবা। স্নেহশীলা মা। সর্বত্যাগী বন্ধু। ন্যায়পরায়ণ পুলিশ। আর

হার্ডকোর ভিলেন। অন্যদিন ফিরেও তাকান না। ঘুম আসছে না বলে একটু আগে ওটাতেই স্থির হয়েছেন। ভাষার অসুবিধা নেই। বিদেশি হলেও মালয়ালাম ভাষাটা আয়ত্ব করেছেন বহুকাল আগে। চল্লিশ বছরের উপর এ দেশে আছেন। এসেছিলেন নান হয়ে। কনভেন্টে পড়াতেন। মনে অন্য জিদ ছিল। ক্রমে কনভেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে এতবড় বিজনেস দাঁড় করিয়েছেন। চা—বাগান। রেস্তোরাঁ, পার্লার। কী না! এবং পুরোটাই নিজের পায়ে। একলা হাতে। স্টেফিম্যাম বলতে মুন্নারের সবাই চেনে তাঁকে। এখন অবশ্য সব গুটিয়ে নিচ্ছেন ধীরে ধীরে। বিয়ে করেননি। স্থানীয় একটি ছেলেকে দত্তক নিয়েছিলেন। সে এখন পূর্ণ যুবক। বিদেশের পাঠ শেষ করে কয়েকদিনের মধ্যেই দেশে ফেরার কথা।

ধপ করে একটা শব্দ হল কাছেই। কেউ যেন ব্যালকনিতে লাফিয়ে পড়ল। বালিশের নিচে রাখা পিস্তলে হাত রাখলেন স্টেফানিয়া। টর্চও আছে সঙ্গে। সেটাও নিলেন অন্যহাতে। কে জানে, মনটা কু ডাকছে খুব। আসলে বাঘ একবার রক্তের স্বাদ পেয়ে গেলে মুশকিল।

দুড়ুম করে খুলে গেল দরজাটা। পিস্তল রেখে মাথার উপরের সুইচ বোর্ড টিপে পরপর সবক'টা লাইট জ্বালিয়ে দিলেন স্টেফানিয়া। নরম আলোতে ভরে গেল গোটা ঘর। প্রথমে আগন্তুকের মুখটা স্পষ্ট হচ্ছিল না। পায়ে পায়ে হেঁটে মুখোমুখি দাঁড়াতে দেখতে পেলেন এবার। বাঘ না হলেও বাঘের বাচ্চচা তো বটেই। বব ডায়াজ। রবার্টের ছেলে। লোকটা স্মাগলিং করত। স্টেফানিয়া সোজা পথে এনেছিলেন। গতবছর হঠাৎই কী একটা জ্বরে ভুগে চলে গেল। ছেলেটা খুব ন্যাওটা ছিল তাঁর। ম্যাম বলতে অজ্ঞান। লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুই হল না। রক্তের দোষ আর কি।

''ম্যাম, কাজটা ঠিক করলেন না আপনি!'' ধমকের স্বরে বলল বব।

''এতরাতে এভাবে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকেছ এই কথাটা বলতে?'' পাল্টা ধমক দিলেন স্টেফানিয়া।

''মালটা ফেক। সব কাচ।'' ব্রেসলেটটা জ্যাকেটের পকেট থেকে তুলে ধরে দেখাল বব। জিনিসটা পরশু সকালে নিজে হাতে দিয়েছিলেন ছেলেটিকে। বলেছিলেন, তোর গার্লফ্রেন্ডকে দিস। হতভাগা নিশ্চয় বিক্রি করতে গিয়েছিল। কিন্তু একলাখ পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে কেনা জিনিসটা নকল নাকি! সত্যি দেশ বটে এই ভারতবর্ষ! এখানে পয়সা ফেললেও খাঁটি জিনিসটি পাওয়া মুশকিল।

''তুমি ভুল করছ বব। ওটা যদি সত্যিই নকল হয়, সেটা আমিও জানতাম না। তাছাড়া ওটা তোমার বান্ধবীকে দিয়েছি। বিক্রির জন্যে দিইনি। তার জন্যে ভালো অ্যামাউন্টের অ্যাডভ্যান্স পেয়েছ তুমি। পুরোটা পেতে ধৈর্য ধরতে হবে।'' ঠান্ডা স্বরে বললেন স্টেফানিয়া। এতক্ষণ ঘুম পাচ্ছিল না। হঠাৎই যেন দু'চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে। বুকের বাঁ দিকে টিসটিস ব্যথাটাও সময় বুঝে জানান দিচ্ছে।

''বাজে কথা রাখ বুড়ি। আমার টাকা চাই। পুরোটাই। —অ্যান্ড অ্যাট দিজ ভেরি মোমেন্ট।'' স্টিলের আলমারিটার দিকে তাকাচ্ছে। চেস্টের ড্রয়ারগুলো খুলে ফেলল ফটফট করে।

একটু চিন্তা করলেন স্টেফানিয়া। এই বাড়িটা তাঁর সবসময়ের থাকার জন্যে নয়। মনখারাপের সময় চলে আসেন। লোকালয় থেকে একটু দূরে বাড়িটা সেই জন্যেই তৈরি। একলা থাকবেন বলে আজকে চাকরবাকরদেরও সব ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। বব নিজের লোক বলে বিষয়টা জানে। সুযোগটা কাজে লাগাতে এসেছে। কিন্তু মুশকিল হল, এই মুহূর্তে সত্যিই তেমন টাকাপয়সা নেই। তাছাড়া আলমারির চাবিটাও সঙ্গে আনতে ভুলে গিয়েছেন। কিন্তু ববের যা মূর্তি, বিশ্বাস করবে কি?

''কী হল বুড়ি...?'' মুখ খারাপ করছে বব। স্টেফানিয়া দেখলেন হাতে কখন একটা চকচকে চাকু উঠে এসেছে তার। ঘরময় ঘুরছে সে। লাথি মারল আলমারিতে। মাঝে মাঝেই দৃশ্যপট থেকে সরে যাচ্ছে সে। ফিরে আসা মাত্রই স্টেফানিয়া ভাবছেন সোজা শুট করে দেয় ফ্রাঙ্কেনস্টাইনটিকে। কিন্তু নিজের ঘরে রক্তপাত চান না। মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে।

''বব বিশ্বাস করো, এই মুহূর্তে আমার কাছে তোমাকে দেওয়ার মতো টাকা নেই। ঠিক আছে। কাল অফিসে এসে পুরোটাই নিয়ে যেও।'' বললেন স্টেফানিয়া।

''বব ডায়াজ অত বুদ্ধু না। ফিরে গেলেই তো পুলিশকে ফোন করবি, তাই না?'' দাঁত চেপে বলল বব। রাগে কাঁপছে সে। রিডিংটেবিলে রাখা ফুলদানিটা ছুড়ে মারল আলমারিতে। পোর্সেলিনের দামি ফুলদানি ভাঙল ভীষণ শব্দ করে। ফুলদানির নীলফুলগুলো বব—ই এনেছিল পরশু। ভালো লেগে যাওয়াতে রেখে দিয়েছিলেন স্টেফানিয়া। জুতোর মসমস শুনে মনে হচ্ছে সেগুলোকে পিষছে পা দিয়ে। পরক্ষণেই আবার তেড়ে এল তার দিকে। একদম সোজাসুজি দাঁড়িয়েছে। কী ভয়ঙ্কর লাগছে চব্বিশ বছরের ছেলেটাকে। ঠোঁটের কষ বেয়ে লালা গড়াচ্ছে। চোখ দুটো যেন রক্তপিপাসু ভ্যাম্পায়ারের মতো জ্বলছে। ঝট করে হাত বাড়িয়ে লাইটটা নিবিয়ে দিলেন স্টেফানিয়া। দ্রুত ঠিক করেছেন কী করবেন। অন্ধকার ঘরে হায়েনার মতো হুঙ্কার করে উঠল ছেলেটা। সেকেন্ডের মধ্যে পাঁচ—ব্যাটারির টর্চের তীব্র আলো ফেলেছেন ওর চোখে। ক্ষণিকের জন্যে ঘাবড়ে গিয়েছে ছোঁড়া। সেই সুযোগে বাঁ—হাতে ধরা পিস্তলের ট্রিগারে চাপ দিলেন। ভীষণ শব্দে গুলি ছুটল। প্রতিক্রিয়ায় পিছনে বালিশের উপরে ছিটকে পড়লেন তিনি।

৩

ঠিক একঘণ্টার মধ্যে চলে এল পুলিশ। এত রাতেই। এদেশে কিছু উন্নতি হয়েছে তাহলে। সিনেমাহলের শো ছাড়া পাংচুয়ালিটির আর কোনও নিদর্শন এ দেশে এখনও দেখেননি স্টেফানিয়া। আশ্চর্য হওয়ারই কথা। ফোনে 'কামিং উইদিন অ্যান আওয়ার' শুনে হাসি—ই পেয়েছিল। ভারতীয়দের জানা আছে তাঁর। কিন্তু অবাক কাণ্ড। ঠিক তাই এসেছে। এবং তিনজন সঙ্গী নিয়ে স্বয়ং রুদ্রাণী চক্রবর্তী। ছিপছিপে শ্যামলা— শ্যামলা এই মেয়েটিকেই টিভিতে দেখেছিলেন স্টেফানিয়া। নিচের ঘরে বসে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। দরজা খুলে দিতে সরাসরি প্রশ্ন করল মেয়েটি, ''ম্যাম, আপনিই ফোন করেছিলেন?''

''ইয়েজ। একটা স্কাউন্ড্রেল আমার ঘরে ড্যাগার নিয়ে ঢুকে পড়েছিল। টাকা ডিম্যান্ড করছিল। আই হ্যাড নো অপশন বাট টু শ্যুট হিম। আই থিংক হি ইজ...'' চুপ করে গেলেন স্টেফানিয়া।

''এ তো সিরিয়াল কিলিং শুরু হয়ে গেল দেখছি।'' ভুঁড়িওলা বয়স্ক কনস্টেবলটি উঠেছে।

''বডি কোথায়?'' নিজের পরিচয় দিয়ে বলল রুদ্রাণী চক্রবর্তী।

''আপস্টেয়ার্স। ইন মাই বেডরুম।'' স্থির গলায় বললনে স্টেফানিয়া। ''ব্যালকনির দরজা ঠিকমতো লক ছিল না। লোকটা ধাক্কা মেরে ঢোকে। আওয়াজেই ঘুম ভেঙে যায় আমার। তাও চুপ করে থাকি। বোঝার চেষ্টা করি, উদ্দেশ্যটা কী। লাইট পর্যন্ত জ্বালাইনি। প্রথমে সে আমার চেস্টের ড্রয়ারগুলো খোলে। খুব কশাসলি। কিছু না পেয়ে আমাকে জাগায়। আলমারির চাবি চায়। যেটা আমার কাছে সত্যিই ছিল না। বাট হি ডিডন'ট বিলিভ। ড্যাগার নিয়ে তেড়ে আসে। ভয় পেয়ে শ্যুট করে দিই আমি। ভাগ্যিস আর্মসটা সঙ্গে ছিল। আসলে টিভিতে মিস্টার উন্নিকৃষ্ণনের কটেজে মার্ডারটা দেখার পর থেকে কেমন একটা ভয় করছিল। নিজের রিভলভারটা সঙ্গে রেখেছিলাম তাই।''

থামলেন স্টেফানিয়া। যা বলেছেন যথেষ্ট। পুওর বব। মোটেই ঠকাতেন না ওকে। হতভাগাটা বুঝল না। মাথা নিরেট হলে যা হয়। রুদ্রাণী মেয়েটি কী বুঝেছে সে—ই জানে। একটা নোটবুক বের করে স্টেটমেন্টটা লিখে ফেলল খসখস করে। তারপর দলবল নিয়ে উঠে গেল উপরে।

স্টেফানিয়া বুঝতে পারছিলেন না কী করবেন। বুকের ভিতরে অস্বস্তি হচ্ছে কেমন। ধীরে ধীরে উপরেই উঠে এলেন। —সেই ভয়ানক দৃশ্য! খাটের ঠিক পাশটিতে চিত হয়ে পড়ে আছে বব। বিস্ফারিত নিথর চোখের মণিদুটি সোজা সিলিংয়ের দিকে চেয়ে আছে। চাকুটা পড়ে আছে পাশেই। গুলি সম্ভবত বুকেই লেগেছিল। আঘাতের তীব্রতায় খাট থেকে নিচে ছিটকে পড়ে ছিল সে। দৃশ্যটা সহ্য করতে পারলেন না স্টেফানিয়া, ড্রেসিংটেবিলের সামনে রাখা ছোট্ট টুলটায় বসে পড়লেন ধপ করে।

''ম্যাম মনে হচ্ছে লোকটি আপনার চেনা?'' রুদ্রাণী মেয়েটি নিজেই খচাখচ ফোটো তুলছিল, স্টেফানিয়াকে দেখে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেছে।

''ইয়েজ। এখন মনে হচ্ছে, আমি চিনি ওকে। —বব। বব ডায়াজ। হোয়াট অ্যান আয়রনি! আমারই চা—বাগানে কাজ করত!'' ধীরে ধীরে বললেন স্টেফানিয়া। ছেলেটাকে চেনেন না বলাটা ডাহা মিথ্যে হয়ে যাবে। আরও কিছু বলতেন, হঠাৎই জিনিসটা চোখে পড়ল তাঁর। খাটের পায়ার কাছে পড়ে আছে সেই তারাটা। নীল পেইন্টটা নিজেই লাগিয়েছিলেন। হতভাগা পরশু ফেরত দেয়নি। বলেছিল, বাড়িতে ফেলে এসেছে। কে জানে, কী মতলব ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে সঙ্গেই ছিল। জ্যাকেটের পকেট থেকে বেরিয়ে গিয়ে থাকবে। তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন তারাটা তুলতে।

''উহু, কোনও জিনিসে হাত দেবেন না।'' রুদ্রাণী বলে উঠেছে। চটপট একটা সেলোফিনে তারাটা সাবধানে মুড়ে পকেটস্থ করে ফেলল।

স্টেফানিয়া বললেন, ''কী আশ্চর্য! ওটার সঙ্গে এই ঘটনার কোনও সম্পর্ক নেই। স্টারটা আমার বালিশের নিচেই ছিল। এসব হামলায় পড়ে গিয়ে থাকবে। আপনি হয়তো জানেন না, আমি ইহুদি। দিজ ইজ স্টার অফ ডেভিড। আমাদের ধর্মের প্রতীক।''

রুদ্রাণী যেন শুনলই না। অন্যদিকে মন। পাশে এসে বলল, ''ম্যাম, এই ফুল আপনি কোথায় পেলেন?''

''কোন ফুল?''

''এই তো, মনে হচ্ছে ফ্লাওয়ার ভাসে ছিল।''

''প্লিজ সামনে আসুন। আই হ্যাভ অ্যাকিউট গ্লুকোমা।'' বলতে হল স্টেফানিয়াকে। সাইডভিশন অনেকদিন আগেই হারিয়েছেন।

''গ্লুকোমা!—স্যরি ম্যাম, আই ডিডন'ট নো।'' বলে রুদ্রাণী সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে সেই নীল ফানেলশেপ ফুলটা। নাম কুরিঞ্জি। অনেকে নীলা কুরিঞ্জিও বলে থাকে। বব এনেছিল কোত্থেকে। কে জানে, উন্নিকৃষ্ণনের বাড়ি থেকেই কিনা! সে নানা উপায়ে ফুলটুল চাষ করে থাকে। মনে হচ্ছে ফুলটা না নেওয়াই উচিত ছিল। রুদ্রাণী যদিও একটু অন্যমনস্ক হঠাৎ। গালে তর্জনি ঠেকিয়ে কী ভাবল একটু। বলল, ''ম্যাম আমি ভেবেছিলাম আপনি পোলিশ। গ্লিনস্কি টাইটেলটা পোলিশ বলে জানতাম।''

''ঠিক—ই। আমরা পোলিশ জিউ। কোনো এক সময়ে আমরা পোল্যান্ডে থাকতাম বটে।''

''আচ্ছা ম্যাম একটা প্রশ্ন—বিছানায় আপনি কোনদিকে মাথা দিয়ে শুয়েছিলেন?'' মেয়েটির আচমকা বেখাপ্পা প্রশ্নের শেষ নেই।

''কেন? বালিশ যে দিকে রয়েছে, সেখানেই।'' বললেন স্টেফানিয়া। মেয়েটির মনের গতি—প্রকৃতি বুঝতে পারছেন না।

এবার সে বলল, ''চলুন ম্যাম। আমরা পাশের রুমে বসি। কথা আছে। ইটস ভেরি ইম্পট্যান্ট।''

উপরে দুটিই ঘর। পাশেরটি হ্যাজবোল্ট আঁটা ছিল। রুদ্রাণী চক্রবর্তী নিজেই খুলে ভিতরে ঢুকে লাইট জ্বালিয়েছে। এ ঘরটা মূলত স্টাডি। বইপত্রে ঠাসা। দু—তিনটি চেয়ার আর ছোট একটা বিছানা রাখা আছে। স্টেফানিয়া সোজা গিয়ে বিছানায় বসে পড়লেন।

''ম্যাম একটা কথা জানতে চাই, জিদেক স্মালকি নামে কাউকে চেনেন আপনি?'' রুদ্রাণী একটা বেতের চেয়ার টেনে বসেছে একদম মুখোমুখি।

প্রশ্নটা আসতে পারে এমন একটা আশঙ্কা ছিলই। এই মেয়েটির বাড়ি কলকাতায়। সর্বভারতীয় পরীক্ষা দিয়ে এসেছে চাকরি নিয়ে। খুব শার্প। আসলে ঘরছাড়া মানুষেরা সবসময়—ই এমন হয়। একটু ভাবলেন স্টেফানিয়া। তারপর মাথা নাড়লেন, ''না তো।''

''আর ইউ সিওর?'' মোবাইল বের করে একটা ফোটো সিলেক্ট করে ধরল সে। স্টেফানিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেখলেন। সেই কুমড়োর মতো মুখ। ঢুলুঢুলু চোখ। গালের বাঁ—দিকে গভীর ক্ষতচিহ্ন। বয়সের ভারে সেটা অনেকটা বুজে এলেও ওটা দেখেই ক্রিস্টমাসের পার্টিতে চিনতে পেরেছিলেন জানোয়ারটাকে। সে কি

চিনেছিল? নিশ্চয় না। তাহলে কখন লেজ তুলে পালাত। যা হোক, এখন অবশ্য না—চেনার—ই অভিনয় করতে হবে।

রুদ্রাণী বলল, "ম্যাম, দিজ ইজ মিস্টার স্মালকি। ইনিই উন্নিকৃষ্ণনের কটেজে পরশু সন্ধেয় খুন হয়েছিলেন। ইনসিডেন্টালি ইনিও পোলিশ। আপনার দেশের লোক।"

"বুঝলাম। কিন্তু এটা জেনে আমি কী করব?"

"কিছুই না। আপনি তো যা করার করেছেন। উননব্বুই বছরের জিদেক স্মালকিকে খুন করার পিছনে বব ডায়াজের তো কোনও মোটিভ থাকতে পারে না, টাকার লোভ ছাড়া। — যে লোভটা আপনিই দেখিয়েছিলেন!"

স্টেফানিয়ার বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। এমন একটা কিছু আন্দাজ করেছিলেন। সুতরাং নার্ভাস হলেন না। মুখে কোনও বিস্ময় বা ভয়ের রেখাই ফুটল না তাঁর। তিরাশি বছরের দীর্ঘ জীবনের শুরুটাই এমন ছিল যে অ্যাড্রিনালিন গ্রন্থি সিক্রেশন করে করে কবেই শুকিয়ে হেজে গিয়েছে। হাই তুললেন একটা। বালিশ নিয়ে বিছানায় আধশোয়া হয়ে ব্যঙ্গের সুরে বললেন, "দ্যাখো ভাই, তোমার কমিশনার আমার বন্ধুস্থানীয়। আমাকে শ্রদ্ধা করেন। একজন সিনিয়র সিটিজেনের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়, আশা করি জানা আছে তোমার।"

"অবশ্যই ম্যাম। আদারওয়াইজ আপনি এখন থানায় থাকতেন।" গলায় বেশ পুলিশি টোন এনে বলল রুদ্রাণী।

"আপনার বক্তব্যের অসঙ্গতিগুলিই আমি পয়েন্ট—আউট করছি। এক, ফুলদানিতে যে ফুল পাওয়া গেছে, সেটা কুরিঞ্জি। আপনার নিশ্চয় জানা আছে, বারো বছর অন্তর এই ফুল ফোটে এখানে। আমি যতদূর জানি এই মুহূর্তে এ তল্লাটে মিস্টার উন্নিকৃষ্ণনের কটেজেই এই ফুল ফুটেছে। ফুলটা যে ওখানকার—ই সেটা আমরা পরীক্ষা করলেই জানতে পারব। সম্ভবত বব—ই ওটা এনেছে এখানে।"

"দুই, আপনার অ্যাকিউট গ্লুকোমা। যে জন্যে সাইড—ভিশন আপনার নেই বললেই চলে। একটু আগেই তার প্রমাণ পেয়েছি আমি। কথা হল, তাই যদি হয় তবে অন্ধকারে ববের চেস্টের ড্রয়ার হাতড়ান দেখলেন কী করে? চেস্টটা কিন্তু বিছানার একদম ডানদিকের দেওয়ালে।"

"তিন—ববের বডিটা লক্ষ করেছেন? বিশেষ করে ওর চোখদুটো। আচমকা তীব্র লাইট কারও চোখে পড়লে আইবলস ওইভাবে বিস্ফারিত হয়। এখানেও আপনি মিথ্যে বলেছেন। আসলে ঘটনা হল, ববের সঙ্গে আপনার ভালোমতোই বচসা হয়। তার প্রমাণ ভাঙা ফুলদানি। ঘরে প্রোব্যাবলি তখন লাইট জ্বলছিল। আপনি—ই সম্ভবত বেডসুইচ অফ করে লাইট নিবিয়ে দেন। বব সম্ভবত আপনার মাথার উপরের সুইচটা অন করতে যায়। আপনি বালিশের নিচ থেকে পাঁচব্যাটারির টর্চটা আচমকাই ওর চোখে মারেন। ববের চোখ বিস্ফারিত হয়। সে চমকে ওঠে। সেই মুহূর্তেই ফায়ার করেছিলেন আপনি। মনে রাখবেন মৃত্যুর পর মানুষের চোখের মণি স্থির হয়ে যায়। এবং সেই অবস্থাতেই থাকে। দু'হাত তফাত থেকে পাঁচব্যাটারির তীব্র আলো আচমকা চোখে না পড়লে কারওর চোখের মণির অবস্থা ওইরকম হয় না ম্যাম। টর্চটা বিছানাতেই পাওয়া গেছে। এবং আনফরচুনেটলি নিভু—নিভু অবস্থায়। ঘটনার আকস্মিকতায় নেবাতেও ভুলে গেছিলেন আপনি। যতই হোক, প্রফেশন্যাল তো নন। তবে হ্যাঁ, এই বয়সেও আপনার অ্যামবিডেক্সটিরিটির প্রশংসাই করতে হয়।"

"তোমার কল্পনাশক্তি আছে বটে। কিন্তু মিস্টার উন্নির কটেজে যে খুন হয়েছে সেটাতে আমাকে জড়াচ্ছ কীভাবে?"

"ঠিক। সে বিষয়েই আসছি।" বেশ আত্মবিশ্বাসী স্বরে বলল রুদ্রাণী চক্রবর্তী, "আপনি হয়তো শুনেছেন, অপরাধী যতই চালাক হোক না কেন, কোথাও না কোথাও একটা ভুল সে করে যাবেই। বব ডায়াজ যেমন করেছিল। জিদেক স্মালকির নাড়ি পুরোপুরি বন্ধ হয়েছে কিনা সেটা নিশ্চিন্ত না হয়েই বেরিয়ে পড়েছিল।

বাট, দ্য ফ্যাক্ট ওয়াজ—সে বেরিয়ে যাওয়ার পর কোনওভাবে সামান্য একটু চেতনা এসেছিল স্মালকির। তাতেই হত্যাকারী সম্বন্দে একটা হিন্ট রেখে যায় সে। কী জানেন?—একটা সিক্স—পয়েন্টেড স্টার। নিজের রক্ত দিয়েই মার্বেলের সাদা দেওয়ালে এঁকে দেয় সে। সত্যি বলতে চিহ্নটা প্রথমে আমাদের ভীষণ অদ্ভুত লেগেছিল। কিন্তু জাস্ট একটু আগে আপনিই আমাকে অন্ধকারের মধ্যে আলোর রেখাটা দেখালেন।" পকেট থেকে সেলোফেনে মোড়া নীল তারাটা নিয়ে দেখাল রুদ্রাণী।

"আমার বিশ্বাস, এটা আদৌ আপনার বালিশের নিচে ছিল না। ওটা ববের পকেট থেকেই পড়ে গিয়ে থাকবে। ফিংগারপ্রিন্ট নিলেই সেটা জানা যাবে। সে এসেছিল জিনিসটা আপনাকে ফেরত দিতে। —কেন? সেটা আপনিই ভালো বলতে পারবেন। জিনিসটা যে আপনার আগেই স্বীকার করে ফেলেছেন কিন্তু। নীল রংটা সম্ভবত নতুন। এটা কেন করা হয়েছিল বলবেন ম্যাম? কিংবা কেনই বা বব এটা পকেটে বয়ে বেড়াচ্ছিল?"

স্টেফানিয়া চুপ। বাকশক্তি হারিয়েছেন।

"আরও আছে।" পকেট থেকে ব্রেসলেটটা বের করেছে রুদ্রাণী, "আমার অনুমান এটিও আপনার। ছ'মাস আগে লোকাল একটি দোকানে অর্ডার দিয়ে জিনিসটি আনিয়েছিলেন আপনি। গতকাল দোকানের মালিক আমায় ফোন করে বলে, একটি অল্পবয়সি ছেলে এটি বিক্রি করতে এসেছিল। সন্দেহ হওয়াতে তারা বলে দেয় হিরেগুলো আসল নয়। ছেলেটি চেঁচামেচি করে ফিরে যায়। —ছেলেটি যে বব তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। একটু আগে এটা ওর পকেট থেকেই পাওয়া গেছে। এবং ওটা যে হারিয়েছে বা চুরি গিয়েছে এমন কথাও এখনও আপনি বলেননি ম্যাম। তবে কি ধরে নেব ওটা আপনি জিদেক স্মালকিকে খুনের পারিশ্রমিক হিসাবে দিয়েছিলেন। এবং বুদ্ধু বব সেটা বিক্রি করতে গিয়ে আরও বোকা বনে যায়। নিডলেস টু সে, সেই জন্যেই মাঝরাতে প্রতিশোধ নিতে আসে এখানে। আমার বিশ্বাস যে অস্ত্রটি এখানে পাওয়া গিয়েছে সেটা দিয়েই সে স্মালকিকে খুন করেছিল। ফরেনসিক রিপোর্টে সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে।"

থামল রুদ্রাণী। স্টেফানিয়া ধীরে ধীরে বললেন, "তোমার কোনও কথার উত্তর আমি দেব না। প্রতিবাদও করব না। কেবল একটা কথা বলি, স্টারটা কেন নীল রং করেছিলাম।"

"ম্যাম আপনাকে বলতে হবে না। আমাকেই শেষ করতে দিন। আমার কল্পনাশক্তি কী বলে শুনুন।" রুদ্রাণী শুরু করেছে আবার—'তবে আগে জিদেক স্মালকি নিয়ে একটু বলার আছে। ভাববেন না তার ইতিহাস ঘাঁটিনি আমরা। পোল্যান্ডের ক্রাকো শহরে থাকত সে। হিটলার যখন ইহুদি নিধন যজ্ঞ শুরু করে তখন একাধিক পোলিশ জিউকে সে নাৎসিবাহিনীর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলে। এইভাবে প্রচুর অর্থও সে রোজগার করে। পরে মিত্রশক্তির কাছে হিটলারের পতন হলে সে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। রাষ্ট্রপুঞ্জ তার নামে হুলিয়াও বের করেছিল। অস্ট্রিয়ায় নাম ভাঁড়িয়ে থাকাকালীন ধরাও পড়ে সে। কিন্তু উপযুক্ত সাক্ষীর অভাবে শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেয়ে যায়। আমার কল্পনাশক্তি বলছে, আপনি নিজেও সম্ভবত এই লোকটির শিকার হয়েছিলেন। স্টারটিকে নীল রং করার কারণ লোকটিকে তার দুষ্কর্মের কথা স্মরণ করানো। সেসময় পোলিশ ইহুদিদের নীল রঙের তারা ঝুলিয়ে রাস্তায় বেরোতে হত। —আশা করি, ঠিক বলছি ম্যাম?'

স্টেফানিয়া কিছু শুনতে পাচ্ছিলেন না। তিনি বিড়বিড় করছিলেন, "তখন আমার মাত্রই চোদ্দো বছর বয়স। ১৯৪৩ সাল। জিদেক আমাদের পরিবারের সকলের বন্ধু ছিল। সবাই ভালোবাসতাম ওকে। বাবার কাঠের দোকানেই সে কাজ করত। কিন্তু ভেড়ার ছদ্মবেশে সে যে একটি নেকড়ে ছিল, কে জানত! এস—এস আর্মি আর ব্লু—শার্টের দল যখন ক্রাকো শহরে ইহুদি ধরা শুরু করল, তখন আমরা পালাচ্ছিলাম। জিদেক—ই পথ দেখাচ্ছিল। কিন্তু ওর ভিতরের শয়তানটাকে চিনতে পারিনি। শহর থেকে দূরে একটা গোলাবাড়িতে আমাদের রেখে সে চলে যায় খাবার আনতে। কিছুক্ষণ পর ফিরে আসে এস—এস আর্মির কুত্তাগুলোকে নিয়ে। প্রথমে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের ধরে নিয়ে চালান করে দেয় ওরা। রেখে দেয় মা আর আমাকে। তারপর শুরু হয় পাশবিক অত্যাচার। ভাবতে বমি পায়, জিদেকও ছিল সেই দলে। একসপ্তাহ ধরে লাগাতার

অত্যাচারের পর আমাদের ঠাঁই হয় সব্যিবরের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। মা সেখানেই মারা যান। আমি কইমাছের প্রাণ নিয়ে কীভাবে যেন বেঁচে যাই। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, জীবনে কখনও সেই নরকের কীটের দেখা পেলে এই চরম অমানুষিকতার প্রতিশোধ নেব। মিস্টার উন্নিকৃষ্ণন আমার কাছে আসেন মাঝে—মধ্যে। যেদিন জানতে পারি কুত্তাটা ওঁরই কটেজে গেস্ট হয়ে উঠেছে, নিজেকে স্থির রাখতে পারিনি। প্রতিহিংসার আগুনে ছটফট করেছি। শরীরে সামর্থ্য থাকলে কাজটা আমিই করতাম।—তবে বিশ্বাস করো, ববকে আমি মারতে চাইনি। সে আমাকে ভুল বুঝেছিল।"

চুপ করলেন স্টেফানিয়া। আর মিথ্যে বলতে চান না। একটা ঢাকতে দশটা বলতে হচ্ছে। দিক এরা, যা শাস্তি দেয় দিক।

রুদ্রাণী বলল, "আমি জানি ম্যাম। সেটা আইনের উপরেই ছেড়ে দিন।"

প্রফেসার ইয়াকোয়ার মৃত্যুরহস্য

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী



কলকাতায় জানুয়ারি মানেই বইমেলা। আমাদের শনিবারের আসরে তাই সবার মুখেই বইমেলা। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মিলন বলল, —বই—এর যা দাম হচ্ছে, তাতে গল্পের বই আর কেনা যাবে না।

আমরা সবাই তাতে সায় দিলাম।

সবিতা বলে উঠল,—এক অনিলিখাদিই আমাদের ভরসা।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। অনিলিখা বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে বলে উঠল,—তবে, আজ আর কোনো গল্প নয়। আজ প্রফেসার ইয়াকোয়ার কথা বলব।

—প্রফেসার ইয়াকোয়া?

—সে কী! ইয়াকোয়ার নাম শুনিসনি? ইয়াকোয়া জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং—এ পৃথিবীর প্রথম সারির একজন বিজ্ঞানী। সারা পৃথিবী ওনাকে চেনে।—অনিলিখা বলতে থাকে—ইয়াকোয়ার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় রোজারম্যানের মাধ্যমে। হার্ভার্ডে আমাদের ইকনমিক্সের ক্লাস নিতেন রোজারম্যান। ইয়াকোয়ার বাড়ি ছিল আমার হোস্টেল থেকে মিনিট পাঁচেক দূরে। ওনার বাড়িতে ছিল বিশাল ল্যাবরেটরি। কেন জানি না, আমার ওই ল্যাবরেটরিতে যেতে খুব ভালো লাগত। যদিও পরীক্ষা—নিরীক্ষার কিছুই বুঝতাম না, তবুও ভালো লাগত।

লোক হিসাবে ইয়াকোয়ার কোনো তুলনা হয় না। প্রচণ্ড আপনভোলা লোক। কোনো কিছুতেই লক্ষ নেই। শুনেছি, একবার হার্ভার্ডে পথ ভুলে পদার্থবিজ্ঞানের ক্লাসে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সেখানে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং—এর ক্লাস নিয়ে চলে এসেছিলেন।

ইয়াকোয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল ডলসম্যান। ডলসম্যানও কথাবার্তায়, আচার—ব্যবহারে খুবই অমায়িক। ইয়াকোয়ার সব কাজে সহকারী হিসাবে থাকত ডলসম্যান। অথচ আমি গেলেই ডলসম্যান দেখি কোথায় উধাও হয়ে যেত।

সেদিনও ইয়াকোয়ার বাড়িতে গেছি। রাত তখন আটটা হবে। দেখি ইয়াকোয়া আর ডলসম্যান খুব মনোযোগ দিয়ে একটা মাইক্রোস্কোপে ছোট টিউবের ভেতরের তরল দেখছে।

আমি 'গুড ইভিনিং' বলতেই প্রফেসার ইয়াকোয়া আমার দিকে না তাকিয়েই বলে উঠলেন, —এটা এক ধরনের ব্যাকটিরিয়া যা কোনও গাছে নিজের জিন ইনজেকট করে জীবনধারণ করে। আমরা এর সাহায্যে একটা দ্রবণ তৈরি করেছি, যা যে—কোনো গাছে স্প্রে করলে সেই গাছে ফুল ফুটবে।

—সে আবার কী করে সম্ভব? ঝোপঝাড়েও ফুল ফোটাবেন নাকি?

ইয়াকোয়া ঘাড় না ঘুরিয়ে বললেন, —হ্যাঁ, ঠিক তাই। লিফি আর অ্যাপাটেলা ওয়ান বলে দু'ধরনের জিন আছে, যা যে—কোনো গাছে ফুল ফোটাতে সাহায্য করে। এই জিন ফুল ফোটে না এমন কোনো গাছে ঢোকালে, সে গাছেও ফুল ফুটবে। তাই আমি ব্যাকটিরিয়ার মাধ্যমে ওই জিন গাছে ইনজেকট করে দেখব। আমার পরীক্ষার গাছ কোনটা জানো তো? ওই দেখো।

বলে ইয়াকোয়া ল্যাবরেটরির এককোণে রাখা একটা গাছের চারার দিকে আঙুল তুলে দেখালেন।

ওটার নাম সান—ডেসমোডিয়ান গাইরানস—অর্থাৎ এক বিশেষ ধরনের টেলিগ্রাফ প্ল্যান্ট যাতে ফুল ফোটে না, —ইয়াকোয়া ফের বলে উঠলেন।

—তা আপনি এ গাছটা পছন্দ করলেন কেন?

—খুবই সেনসিটিভ গাছ হওয়ার জন্য এর প্রতিক্রিয়া অন্যান্য গাছের তুলনায় তাড়াতাড়ি হবে আশা করি।

ইয়াকোয়ার কথার মধ্যে চা নিয়ে বাড়ির চাকর চ্যাপম্যান ঢুকল। ইয়াকোয়া আমাকে বললেন, —যাও, চ্যাপম্যানের সঙ্গে গল্প করো।

বুঝতে পারলাম ইয়াকোয়ার কাজে অসুবিধা হচ্ছে। আমি আর কী করি, চ্যাপম্যানের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলে বাড়ির উদ্দেশে পা বাড়ালাম।

এর দিন দশেক পরে একদিন ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে শুনি সেদিন সকালে ইয়াকোয়াকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। বিস্তারিত যা শুনলাম তা হল, কয়েকদিন আগে ইয়াকোয়ার কাছে এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা আসেন। ওনার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়া। ইয়াকোয়া এমনিতে ডাক্তার। তাই ওনার কাছে ওই ভদ্রমহিলা এক বিশেষ অসুখের চিকিৎসার জন্য আসেন।

ভদ্রমহিলার হঠাৎ করে স্মৃতিশক্তি কমে গেছে। বুদ্ধি, চেতনা, অনুভূতিও একই সঙ্গে প্রচণ্ড মাত্রায় কমে গেছে। স্নায়ুকোষের হঠাৎ করে নষ্ট হয়ে যাওয়াই এর কারণ। এককথায় একে 'অ্যালজাইমার ডিজিজ' বলে।

ইয়াকোয়া কী একটা ইঞ্জেকশন দেন, এবং দেবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই ভদ্রমহিলা মারা যান। ইয়াকোয়ার ছ'মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। নেহাত অত নামকরা বিজ্ঞানী, তাই আদালত অপেক্ষাকৃত হাল্কা শাস্তি দিয়েছিল।

—কেন, ভুল চিকিৎসাতেই যে মারা গেছে তার প্রমাণ কী? ইয়াকোয়ার ছ'মাস সশ্রম কারাদণ্ড বিনা বিচারেই ঠিক হল নাকি?— সুরজিৎ বলে ওঠে।

—না, সেটা আদালত থেকেই ঠিক হয়েছিল। ওখানে বিচার অনেক তাড়াতাড়ি হয়। তাছাড়া ইয়াকোয়া অকপটে নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

পরে আমি জেলে ওনার সঙ্গে দেখা করি। উনি বলেন যে উনি দুটো সলিউশন তৈরি করেছিলেন—একটা গাছে ফুল ফোটানোর জন্য, অন্যটা ওই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার স্নায়ুকোষ উজ্জীবিত করার জন্য। ভুলবশত দুটোর প্রয়োগ উল্টে যায়। অর্থাৎ গাছের জন্য তৈরি করা দ্রবণটা উনি ইনজেকট করেন ভদ্রমহিলার শরীরে। এবং তাতেই ওঁর মৃত্যু হয়। আরেকটা জিনিস জেনেছিলাম, সলিউশন দুটো ইয়াকোয়ার হাতে ডলসম্যানই তুলে দিয়েছিল।

এর পরের ছ'মাস ইয়াকোয়ার ল্যাবরেটরিতে আমি আর যাইনি। আসল লোকই নেই, তো কার জন্য যাব?

ইয়াকোয়া ছাড়া পাওয়ার পরের দিন আমি আবার ওনার বাড়ি যাই। আমাকে দেখেই ইয়াকোয়া স্বভাবসুলভ হাসিঠাট্টা শুরু করলেন। কথায় কথায় উনি সেই গাছের কথা তুললেন। গাছের ওপরেও তো ভুল ইঞ্জেকশান প্রয়োগ করা হয়েছিল। গাছটা কিন্তু বেঁচে গেছে। বলে উনি আঙুল তুলে ঘরের কোণে রাখা টবটার দিকে দেখালেন।

সত্যিই, গাছটা বেশ বড় হয়ে গেছে। বেশ সবল, সতেজ চেহারা। পাতার রং লালচে সবুজ। সাত—আটটা ডাল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ডলসম্যান দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। ইয়াকোয়া ডেকে পাশে বসালেন।

আজ ইয়াকোয়ার কাজের ব্যস্ততা নেই। মার্ক টোয়েন থেকে শুরু করে পিকাসোর আঁকার সম্বন্ধেও আলোচনা হল। খালি একটা জিনিস লক্ষ করলাম, মাঝেমধ্যেই ইয়াকোয়া উঠে গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। আবার ফিরে আসছেন।

খানিকক্ষণ বাদে আমি যে প্রশ্নটা করব ভাবছিলাম, ডলসম্যানই সেটা করে বসল,—কী দেখলেন স্যার?

—এ গাছটাকে আমি আসা থেকেই লক্ষ করছি। ইতিমধ্যে কতকগুলো আশ্চর্য জিনিস আমার নজরে এসেছে। গাছটা কিছু আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। তোমাদের চোখে পড়েনি?

—সে আবার কীরকম?

—আমার মনে হচ্ছে গাছটার বুদ্ধি আছে। বোঝার ক্ষমতা আছে। আর সেটা এর ডাল—পাতার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। এখন গাছটা মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শুনছে। পাতাগুলো তাই শান্তভাবে রয়েছে। খানিকক্ষণ আগে আমার কথায় তোমরা যখন হাসছিলে, তখন আমি গাছটার দিকে তাকিয়েছিলাম। অদ্ভুতভাবে ডালগুলো দুলছিল। সেতারের তারে টান দিলে যেরকম কম্পন সৃষ্টি হয়, ঠিক সেরকমই হাসির তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছিল ডালের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে।

কালকে আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে একটা ডাল ধরে মচকাচ্ছিলাম। হঠাৎ চোখ পড়ল গাছটার দিকে। সারা গায়ে যন্ত্রণার চিহ্ন। কুঁচকে ওঠা গাছের পাতায় অভিমানের ছাপ। আধমচকানো ডালটায় বেশ খানিকক্ষণ হাত বোলালাম। মনে হল গাছটা আমার ভুল বুঝতে পেরেছে।

হেসে উঠে বলে উঠলাম,—প্রফেসার, এটা কিন্তু আপনার সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার। আমি এ গাছে অসাধারণ কিছু—

কথা থেমে গেল গাছের দিকে চোখ পড়তে। সত্যি সত্যিই গাছের পাতায় যেন একটা তরঙ্গের ছোঁয়া।

—প্রত্যেকটা জিনিস লক্ষ করার জন্য একটু ধৈর্য ধরতে হয়—ইয়াকোয়া একটু যেন অসন্তুষ্ট হয়েই বলে উঠলেন।

সেদিন আরও খানিকক্ষণ গল্পগুজব চলল। জেলের অন্যান্য কয়েদিদের সঙ্গে দিন কাটানোর অভিজ্ঞতা, জেলের খাওয়াদাওয়া, কীভাবে ওখানে সময় কাটত—সেসব নিয়ে কথা হল। আমার চোখ ছিল গাছের উপর। টিউবলাইটের আলোয় মাঝে মাঝে দু—একটা পাতা চকচক করা ছাড়া দেখার মতো তেমন কিছুই চোখে পড়ল না।

এরপরে আমি যখনই গেছি, প্রফেসারকে দেখতাম হয় কোনো পরীক্ষা—নিরীক্ষা করছেন, না হয় ওই গাছের পাশে বসে আছেন। মাঝে মাঝেই বলতেন,— তুমি এলে গাছটা বেশ খুশি হয়।

আমি যতটা সম্ভব গম্ভীর হয়ে ওনার কথা শুনতাম। কথার বিষয়বস্তু খালি একটাই—তা হল এ গাছ।

ডলসম্যাস ওই গাছ নিয়ে প্রফেসারের মাতামাতিটা আদৌ পছন্দ করত না। গাছের কথা উঠলেই দেখতাম ও প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাইছে।

ওদিকে ইয়াকোয়া আর ইয়াকোয়ার গাছ সবার আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রফেসার ক্লাস নিতে না এলে ছাত্ররা বলত, —স্যার গাছে জল দিচ্ছেন। গল্প শোনাচ্ছেন।

রাস্তায় জোরে হাঁটতে দেখলে প্রতিবেশীরা বলত—বোধ হয় গাছের ভারী খিদে পেয়েছে। উনি তাই বাজারে চলেছেন।

কথাগুলো অবশ্যই অতিরঞ্জিত, তবে এটা ঠিক যে ইয়াকোয়ার বেশির ভাগ সময়ই কাটত ওই গাছটাকে নিয়ে। আমাকে আর ডলসম্যানকে ডেকে ডেকে দেখাতেন কীভাবে গাছের পাতায় পাতায় রাগ ফুটে ওঠে, কীভাবে খুশিতে দুলে ওঠে, কীভাবে পাতা ধরে টানলে বিরক্তি প্রকাশ করে। এমনকী পাশের আরেকটা

গাছে জল দিলে কীভাবে এ গাছে ঈর্ষার ভাব ফুটে ওঠে, তা—ও উনি দেখাতেন। আমিও আশ্চর্য হয়ে তাই দেখতাম। বেশ সময় কেটে যেত।

এর কয়েকদিন বাদে ইয়াকোয়া হঠাৎ আমার হোস্টেলে এসে হাজির। মুখে চোখে উত্তেজনার চিহ্ন। ঘটনা এই যে ইয়াকোয়া ওই গাছের ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৬ পেয়েছেন। এ—ব্যাপারে ওনার বক্তব্য, কি উদ্ভিদ —কি প্রাণী, যে—কোনো দুই ভিন্ন জীবের ক্রোমোজোম সংখ্যাও ভিন্ন হতে বাধ্য। মানুষের দেহে ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৬, তা আমরা সবাই জানি। কাছাকাছি ক্রোমোজোম সংখ্যার উদ্ভিদ বলতে, সোলানাম টিউবারসাম—যার ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৮। আর কফি অ্যারাবিকা—যার ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৪। তাই ৪৬ ক্রোমোজোম সংখ্যাবিশিষ্ট এই গাছ ওনার মতে বিজ্ঞানের কাছেও এক বিস্ময়। এছাড়া উনি এ—ও বললেন যে ৪৬ ক্রোমোজোম সংখ্যাবিশিষ্ট উদ্ভিদও যে মানুষের মতোই বুদ্ধিমান হবে, এতে আর আশ্চর্য কী!

—আচ্ছা অনিলিখা, গাছের ক্রোমোজোম সংখ্যা কীভাবে গোনা হয়?—সত্যেনদা প্রশ্ন তুলল।

—প্রফেসার ইয়াকোয়া থাকলে আমি কাল—পরশুর মধ্যে ব্যাপারটা জেনে বলতে পারতাম। এটা তো আর আমার সাবজেক্ট নয়।

—থাকলে মানে? ইয়াকোয়া মারা গেছেন বুঝি?

—হ্যাঁ, এর কয়েকদিনের মধ্যেই হঠাৎ ইয়াকোয়া মারা যান। স্বাভাবিক মৃত্যু। যেদিন মারা যান, তার আগের দিনই ওনার বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছি। বেশ হাসিখুশি সুস্থ দেখে এসেছি। তবে কার জীবনে কখন যে কী হয় বলা মুশকিল। তবু আমার মন মেনে নিতে পারছিল না মৃত্যুটাকে।

ইয়াকোয়ার বাড়ি গিয়ে দেখি সেখানে অনেক লোক। বিশ্বের বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানীর সমাবেশ ঘটেছে। প্রত্যেকের মুখেই এক কথা—ইয়াকোয়াকে হারানো সারা বিশ্বের কাছে এক অপূরণীয় ক্ষতি।

ডলসম্যান ঘরের এককোণে মাথা নিচু করে বসে আছে। খুব ভেঙে পড়েছে। হাজার হোক বহুদিন ইয়াকোয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করেছে। ওকে সান্ত্বনা দিলাম।

ওর সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় চোখ পড়ল গাছটার উপর। এতক্ষণ গাছটার কথা ভুলেই গেছিলাম। গাছটার পাতায় পাতায় পরিষ্কার একটা মুষড়ে পড়া ভাব। গাছের পাতাগুলো যেন কীরকম রাগী রাগী চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। অন্তত ইয়াকোয়া থাকলে তো তাই বলতেন।

ডলসম্যানকে দেখালাম। ডলসম্যান আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিল। উঠে চলে গেল অন্য ঘরে।

আমার সামনেই বসেছিলেন মিঃ বার্টরান্ড। উনি বোস্টন পুলিশের একজন হর্তাকর্তা ব্যক্তি। উনি ডলসম্যানের হঠাৎ করে এভাবে উঠে যাওয়া লক্ষ করেছিলেন। উনি জিজ্ঞেস করলেন—কী ব্যাপার?

আমি গাছের এই পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করলাম। ইয়াকোয়ার সূত্রে এই গাছের কথা শুনতে কেউ বাকি রাখেনি। যদিও চোখে দেখেছি শুধু আমরা তিন—চারজন।

উনি গাছের পরিবর্তনটা দেখাতে বললেন। দেখাতে গিয়েই দেখলাম, গাছের পাতাগুলো আগের মতো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। আমি কিছু বলে ওঠার আগেই দেখি গাছের পাতাগুলো ফের সামনের দিকে বেঁকে যাচ্ছে। ডগার দিকটা ছুঁচালো হয়ে উঠেছে। রেগে যাওয়ার ছাপ। মাথা ঘুরিয়ে দেখি ডলসম্যান ঘরে ঢুকছে। নেহাতই ইয়ার্কি ছলে বলে উঠলাম, —কী হে ডলসম্যান, তোমাকে দেখলেই যে গাছটা বেঁকে বসছে, কিছু অপকর্ম করেছ নাকি?

কথাটা আমি হাল্কাভাবেই বলেছিলাম। কিন্তু ডলসম্যান দেখি গর্জে উঠল,—ইউ আর এ লায়ার। গাছের এরকম পরিবর্তন মাঝে মাঝেই হয়ে থাকে। রেগে যাওয়া, মুষড়ে পড়া, খুশি হওয়া—এ সব আষাঢ়ে গল্প। তুমি আর এ—বুড়োটা প্রত্যেককে বোকা বানিয়ে এসেছ। একটা সাধারণ গাছকে অসাধারণ করে তুলেছ।

এরকম আচমকা চেঁচামেচি করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ডলসম্যান। পিছু পিছু দেখলাম বার্টরান্ডও বেরিয়ে গেল।

এতটা বলার পর অনিলিখা উঠে দাঁড়ল,—এবার বাড়ি যেতে হবে।

আমরা সবাই হইচই করে উঠলাম—গল্পই তো শেষ হল না!

একেবারে ক্লাইম্যাক্সে এসে হঠাৎ করে ইতি টানার প্রবণতা আগেও অনিলিখার মধ্যে দেখেছি। তাই আমরা প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম, —তারপর?

—বাকি যেটা বলব, সেটা নিশ্চয়ই তোরা অনুমান করে নিয়েছিস। তার পরেরদিন আমিও সেই খবরটাই শুনলাম, যেটা আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম। ডলসম্যানের হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে ওঠা বার্টরান্ডের মতো অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসারের চোখ এড়ায়নি।

সেদিন সন্দেহের বশে বার্টরান্ড ডলসম্যানকে জেরা করতে নিয়ে যায়। লাই ডিটেক্টরের সামনে ডলসম্যান স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, ইয়াকোয়ার মূল্যবান রিসার্চ পেপার হাতানোর জন্য ডলসম্যান ইয়াকোয়াকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে। ডলসম্যান ইয়াকোয়াকে সম্পূর্ণ নিঁখুতভাবে হত্যা করেছিল। এমনকী একটা বিশেষ ইঞ্জেকশনও পরে দিয়েছিল, যাতে শ্বাসরোধে মৃত্যু বলে মনে না হয়। কিন্তু একটা সাক্ষ্য ওর অলক্ষ্যে রয়ে গিয়েছিল। তা হল ইয়াকোয়ার ওই গাছটা—সান—ডেসমোডিয়ান গাইরানস।

এতটা বলার পর পাশের টেবিলে রাখা জলের গেলাসটা এক চুমুকে শেষ করে অনিলিখা উঠে দাঁড়াল।

—আচ্ছা, ওই গাছটার কী হল?—মিলন আমার প্রশ্নটাই তুলল।

মুচকি হেসে অনিলিখা বলে,—আশা করি, গাছটা এখনও আছে।

—তা, ওইরকম অসাধারণ গাছ নিয়ে হইচই পড়েনি?

—না।

—কেন?

অনিলিখা একইরকম মুখে বলে ওঠে, — ডলসম্যানের কথাই ঠিক। পরে প্রমাণ পাওয়া যায় যে গাছটার মধ্যে কোনওরকম বিশেষত্বই ছিল না। হ্যাঁ, ডাল—পাতার মধ্যে কিছু সময় অন্তর পরিবর্তন হত বটে, তবে সেটা যে—কোনো সান ডেসমোডিয়াম গাইরানসেই হয়। ইয়াকোয়ার মতো প্রতিভাবান ও পণ্ডিত লোক গাছটাকে কেন যে ওভাবে দেখেছিলেন বা আমাদেরকে দেখিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। তবে আমার মনে হয় উনি ইচ্ছাকৃতভাবে ঘরে আরেকটা প্রাণের অস্তিত্বকে তৈরি করেছিলেন, যার উপর ভরসা করা যায়। উনি চাইছিলেন, এমন কারো সঙ্গ, যার বোধ আছে, বুদ্ধি আছে—যার কোনো ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকার ক্ষমতা আছে।

দুই—এ পক্ষ

ইন্দ্রনীল সান্যাল



মালব্যনগরের অ্যাসাইনমেন্ট চুকিয়ে দিল্লি ফেরামাত্র প্রতিরক্ষামন্ত্রী রঞ্জিত গগৈ প্রথমা লাহিড়ীকে তলব করলেন। 'প্র্যাট, তোকে আবার কলকাতা যেতে হবে।'

প্রথমা ভারত সরকারের এলিট ইনটেলিজেন্স উইং 'কাইমেরা'র সদস্য। র, সিবিআই, আর্মি, নেভি বা এয়ারফোর্স কাইমেরার অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক অপরাধ মোকাবিলার জন্যে রঞ্জিত নিজের হাতে কাইমেরা তৈরি করেছেন।

ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি থেকে পাশ করার পর প্রথমার পোস্টিং হয় আর্মিতে। পড়াশোনায় তুখোড়, কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার হাতের তালুর মতো জানে, সার্টিফায়েড হ্যাকার, মার্শাল আর্টে পটু। রঞ্জিতের ব্যক্তিগত অনুরোধে সে আর্মি থেকে কাইমেরায় জয়েন করে।

প্রথমা বলল, 'এই তো বেঙ্গল থেকে ফিরলাম। আবার কেন?'

'মাননীয় রাষ্ট্রপতি অরুণ চ্যাটার্জির কার্ডিয়োলজিস্টের নাম ডক্টর চঞ্চল দুবে। পানিহাটিতে ওঁর একটা হার্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে। নাম ''চঞ্চল'স হসপিটাল ইন পানিহাটি'' বা ''চিপ''। রাষ্ট্রপতির স্ত্রী একটা মানথলি ম্যাগাজিন এডিট করেন। তার নেক্সট ইস্যুর জন্যে চঞ্চলের ইন্টারভিউ চাইছেন।'

প্রথমা বুঝতেও পারেনি, ইন্টারভিউ নেওয়ার মতো সোজা ব্যাপার থেকে কত জটিল ঘটনা ঘটতে চলেছে...

দুই

পেনেটিতে, গঙ্গার ধারে দশ বিঘে জমির ওপরে গড়ে উঠেছে চিপ। চারটে পাঁচতলা হাসপাতাল বিল্ডিং ছাড়াও রয়েছে ডাক্তারদের বাংলো, সিস্টার—স্টাফ—রোগীর বাড়ির লোকেদের থাকার জন্যে কোয়ার্টার। গঙ্গার শোভা, নীল আকাশ আর সবুজ মাঠ দেখলে হৃদয় আপনিই ভালো থাকে।

খোদ চঞ্চলের হৃদয় এই মুহূর্তে ভালো নেই। হার্টব্লকের কারণে বুকে পেসমেকার বসানো হয়েছে। অনেক ফোনাফুনির পরে চঞ্চলের সাক্ষাৎকারের অনুমতি পেয়েছে প্রথমা।

সে প্রথমবার ফোন করেছিল পেসমেকার বসানোর তিনদিন আগে। সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব শুনে হাসপাতালের 'অরএমও' ডক্টর বিকাশ দত্ত ফোন কেটে দেন। দ্বিতীয়দিন ফোন ধরে চঞ্চলের বউ গায়ত্রী। সে ধৈর্য ধরে সবটা শোনে এবং অপারেশনের পরে সময় দেয়। আজ সেই কাঙ্ক্ষিত দিন।

চঞ্চল শুয়ে রয়েছেন নিজের বাংলোর বেডরুমে। মাস্টারবেডের বদলে আইসিসিইউয়ের রেলিং লাগানো বেড। বেডের মাথার দিক পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রিতে ভাঁজ করা। পেসমেকার বসানোর পরে চঞ্চল সম্পূর্ণ সুস্থ। তবে

বেডরেস্টে রয়েছেন। বেডের পাশে রাখা হয়েছে অক্সিজেন সিলিন্ডার, আইভি স্যালাইনের পাউচ এবং স্ট্যান্ড, কার্ডিয়াক মনিটর।

'তোমার নাম প্রথমা, আমার পদবি দুবে। তুমি ''এক'' আর আমি ''দুই''। কী ইন্টারেস্টিং ব্যাপার বলো তো!' প্রাথমিক আলাপের পরে বললেন চঞ্চল।

প্রথমা মৃদু হাসল। বেডের ডানপাশে বসে থাকা বছর তেরোর কিশোরের মাথায় হাত বুলিয়ে চঞ্চল বললেন, 'চিপ আমার প্রথম সন্তান। আর এ আমার দ্বিতীয় সন্তান। শাশ্বত।'

শাশ্বত টুকটুকে ফরসা। ভাসাভাসা চোখ, গালে সদ্য ফোটা দাড়ির আভাস, ল্যাকপ্যাকে চেহারা। বয়ঃসন্ধির চৌকাঠে পা রেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। অ্যান্টেনাওয়ালা, রেডিয়ো হার্ডওয়্যার লাগানো ঢাউস ল্যাপটপে সে সোশাল নেটওয়ার্কিং করছে। কি—বোর্ডের ওপরে হাত চলছে বিদ্যুতের গতিতে।

বেডের বাঁপাশে রাখা চেয়ারে বসে স্মার্টফোনের রেকর্ডার অন করে প্রথমা। স্মার্টফোন আর ইয়ারপ্লাগ বেডের বাঁদিকে রেখে সাক্ষাৎকার শুরু করে। 'রাষ্ট্রপতির কার্ডিয়োলজিস্ট মানে এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের একনম্বর কার্ডিয়োলজিস্ট। এই সাফল্যের রহস্য কী?'

'জীবনে একমিনিট সময়ও নষ্ট করিনি। জীবনের সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছি।' ক্লান্ত গলায় বললেন চঞ্চল।

সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে গলায় বিষণ্ণতার সুর। সুযোগ বুঝে দ্বিতীয় প্রশ্নটি করে প্রথমা 'কোনও রিগ্রেট আছে নাকি?'

'আছে। পেশাদার জগতে প্রথম হতে গিয়ে পরিবারকে সময় দিতে পারিনি। এটাই একমাত্র রিগ্রেট।'

'আপনার স্ত্রীও কি ডাক্তার?'

'গায়ত্রী হোমমেকার হিসাবেই হ্যাপি।'

'ছেলের কোন ক্লাস?'

'শাশ্বতর এখন ক্লাস সেভেন। দিনরাত ভিডিয়ো গেম খেলে আর সোশাল নেটওয়ার্কিং করে। হাফইয়ার্লিতে গাডডু খেয়েছে। আমি ওকে বলি ভিডিয়ট। ভিডিয়ো গেমার আর ইডিয়টের কম্বিনেশান।'

মন্তব্য শুনে বাবার দিকে রাগি চোখে তাকায় শাশ্বত। চঞ্চল বলেন, 'ভারচুয়াল ধাষ্টামো বন্ধ করে পড়াশোনায় মন দে। আমাদের ফ্যামিলি তিন জেনারেশানের কার্ডিয়োলজিস্ট। তোকেও কার্ডিয়োলজিস্ট হতে হবে। সামনের মাসেই মেডিক্যাল এন্ট্রান্সের প্রিপারেটরি কোর্সে ভর্তি করে দেব।'

কি—বোর্ডের উপরে চলতে থাকা শাশ্বতর হাত মুহূর্তের জন্যে থমকায়। সে বলে, 'দুটো কথা মনে রাখো! এক নম্বর, ভারচুয়াল ইজ রিয়্যাল। নাম্বার টু, আমি বড় হয়ে কার্ডিয়োলজিস্ট হব না। সফটওয়্যার প্রোগ্রামার হব।'

'দু—দুবার সাইকায়াট্রিক কাউন্সেলিং করিয়েও কোনো লাভ হল না।' ছেলের চুল ঘেঁটে দিলেন স্নেহময় বাবা, 'ভারচুয়ালকে কেউ রিয়্যাল বলে? অনুভূতিহীন জোম্বি তৈরি হচ্ছে একটা!'

বাবা—ছেলের কচকচি থেকে বেরোতে পরের প্রশ্নে ঢুকে পড়ে প্রথমা। 'এত বড় হাসপাতাল সামলান কী করে?'

'অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমি সামলাই না। তার জন্যে মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট ডক্টরলক্ষ্মণ মিশ্র আছে। সে আমার পেসমেকার বসিয়েছে। আমার থেকে বছর পাঁচেকের জুনিয়ার।'

চঞ্চলের কথার মধ্যে ঘরে ঢুকল লক্ষ্মণ। ছ'ফুট লম্বা, শ্যামলা গায়ের রং, একমাথার কোঁকড়া চুল, মোটা গোঁফ। অ্যাপ্রনের পকেট থেকে স্টেথোস্কোপ বার করে প্রথমাকে বলল, 'আপনার ইন্টারভিউয়ের কথা গায়ত্রী এক্ষুনি আমাকে বলল। আগে জানলে অ্যালাও করতাম না। আপনাকে আর সময় দেওয়া যাবে না। চঞ্চল নিডস অ্যাবসলিউট রেস্ট।'

প্রথমা বলল, 'আমার আর পাঁচ মিনিট লাগবে...'

'বাই দ্য ওয়ে, আপনি স্মার্টফোন আর ইয়ারপ্লাগ বেডে রেখেছেন কেন? ওগুলো সরান।'

'সরি!' বিছানা থেকে যন্ত্র সরিয়ে প্রথমা ভাবে, শাশ্বতর কম্পিউটার বিছানায় থাকলে অসুবিধে নেই। আমার স্মার্টফোন থাকলেই দোষ! যত্তসব!

পালস দেখে, প্রেশার মেপে লক্ষ্মণ বলল, 'সব প্যারামিটার স্টেবল আছে। তোমার কিছু লাগবে?'

'চাঁদুকে পাঠিয়ে দাও। ওষুধ খাব।'

'আমি এখানেই আছি স্যার।' প্রথমাকে চমকে দিয়ে বেডের পিছন থেকে উঠে দাঁড়াল বছর পঁচিশের এক যুবক। সে মেঝেয় চাদর পেতে শুয়েছিল। তার উপস্থিতি টের পাওয়া গেল।

চঞ্চল প্রথমাকে বললেন, 'চাঁদু আমার ড্রাইভার কাম পারসোনাল সেক্রেটারি। টু—ইন—ওয়ান। চাঁদু, ওষুধ দে।'

লক্ষ্মণ বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল, 'তোমার ইন্টারভিউ শেষ হলে গায়ত্রী খাবার নিয়ে আসবে।'

'খাবার না পিণ্ডি! যত্তসব ন্যাকামো!' স্বগতোক্তি করেন চঞ্চল।

বউয়ের উপরে এত রাগ কেন। ঝগড়া হয়েছে নাকি? ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক না গলিয়ে প্রথমা বলল, 'কবে থেকে পুরোদমে প্র্যাকটিস শুরু করছেন?'

'গতকাল সন্ধেবেলা আইসিসিইউ থেকে ফিরলাম। এখন দু'দিন রেস্ট।' বুকের বাঁদিকে হাত বোলাচ্ছেন চঞ্চল।

'এই নিন ওষুধ', চঞ্চলের হাতে ট্যাবলেট আর জলের গেলাস তুলে দিয়েছে চাঁদু। ট্যাবলেট মুখে ফেলে একঢোক জল খেয়ে গেলাস ফেরত দেয় চঞ্চল। চাঁদু জিজ্ঞাসা করে, 'দেবীমাতার ক্যাপসুলটা দেব?'

'ওর ক্যাপসুল আমি খাব না!' ঘাড় নাড়েন চঞ্চল।

দেবীমাতার নাম শুনে প্রথমা ভাবে, কার্ডিয়োলজিস্টেরও গুরুমা আছে? তার চিন্তার মধ্যে চঞ্চল বুকের বাঁদিকে মালিশ করতে করতে বলেন, 'চাঁদু...লক্ষ্মণকে ডাক...'

'কী হল?' প্রথমা উৎকণ্ঠিত। চঞ্চল কুলকুল করে ঘামছেন। মুখ ফ্যাকাশে, শ্বাস চলছে দ্রুত গতিতে।

চাঁদু চিৎকার করে বলল, 'স্যারের শরীর খারাপ লাগছে!' চিৎকার শুনে দৌড়ে ঘরে ঢুকল লক্ষ্মণ আর গায়ত্রী। বছর চল্লিশের গায়ত্রীকে মা—মা দেখতে। টুকটুকে ফরসা, বেঁটেখাটো, গিন্নিবান্নি টাইপ।

গায়ত্রী আর লক্ষ্মণকে দেখে শুকনো জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে চঞ্চল বললেন, 'স—ব শে—ষ—হ—য়ে—গে—ল...'

পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রিতে হেলিয়ে রাখা বেড মেঝের সমান্তরাল করে দেয় লক্ষ্মণ। চঞ্চলের নাকে অক্সিজেনের নল গোঁজে। হাতে স্যালাইনের সুচ ঢোকায়। প্রথমা আর শাশ্বতকে ধাক্কা মেরে বেডের পাশ থেকে সরায়, ল্যাপটপ বেড থেকে সরিয়ে পাশের টেবিলে রাখে, কার্ডিয়াক মনিটরের তার চঞ্চলের শরীরে জুড়ে দেয়। চাঁদু মোবাইল ফোনে অ্যাম্বুলেন্স ডাকছে।

মনিটর হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠে সবুজ জীবনরেখা দেখাতে শুরু করেছে। পিঁকপিঁক করে হৃদয়ের শব্দ শোনাচ্ছে।

মনিটারের দিকে তাকিয়ে প্রথমা দেখল ঢেউয়ের মতো জীবনরেখা একলহমায় স্ট্রেটলাইন হয়ে গেল। শিশুর হাতে আঁকা মাটি আর আকাশের মধ্যেকার দিগন্তরেখার মতো সোজা।

অ্যাম্বুলেন্সের হুটারের শব্দ শোনা যাচ্ছে। গায়ত্রী স্বামীর নিস্পন্দ বুকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

তিন

'দেখুন ম্যাডাম, ব্যাপারটা সিরিয়াস,' প্রথমার দিকে তাকিয়ে বলল পানিহাটি থানার অফিসার ইনচার্জ পুলক দাস, 'ডক্টর চঞ্চল দুবের আনন্যাচরাল ডেথ নিয়ে ওঁর স্ত্রী গায়ত্রী দুবে এবং ওঁর কোলিগ ডাক্তার লক্ষ্মণ মিশ্র পানিহাটি থানায় আলাদা দুটো এফআইআর করেছে। গায়ত্রীর অভিযোগ দেবীমাতার বিরুদ্ধে। লক্ষ্মণের অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে। দুটি এফআইআর—এই ধারা তিনশো দুই দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ

''কালপেবল হোমিসাইড অ্যামাউন্টিং টু মার্ডার।'' দেবীমাতা বা আপনাকে আমি আপাতত জেরা করার জন্যে থানায় নিয়ে যাচ্ছি না। কিন্তু আপনি আমাকে হেল্প করুন।'

'আমি আপনাকে কীভাবে হেল্প করব?' নিরীহ মুখে জানতে চায় প্রথমা।

'দেখুন ম্যাডাম, আমার কাছে হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে অলরেডি খবর চলে এসেছে যে আপনি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী। কোন ডিপার্টমেন্ট, সেটা জানার অধিকার নাকি আমার নেই। প্লাস, আমার উপরে চাপ আছে, যেন অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল আপনাকে ছেড়ে দিই। কিন্তু কেসটা র্যাপ আপ না করে কী করে ছাড়ি বলুন!'

প্রথমা মাথা নিচু করে ভাবছে। নিজেকে নিয়ে নয়। চঞ্চলকে নিয়ে। অ্যাম্বুলেন্সে চাপিয়ে চিপ—এর আইসিসিইউতে নিয়ে গিয়েও তাঁকে বাঁচানো যায়নি। লক্ষ্মণ ডেথ ডিক্লেয়ার করেছে সকাল এগারোটায়। এখন রাত আটটা। কান্নাকাটি, চিৎকার, থানায় ফোন, পুলিশ আসা, পোস্ট—মর্টেমের জন্যে বডি বারাসাত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, ময়না তদন্তের রিপোর্ট টেলিফোন মারফত আনঅফিশিয়ালি জানতে পারা—এইসব করতে করতে সন্ধে সাতটা বেজেছে। চঞ্চলের সেলাই করা দেহ এখন চিপ—এর রিসেপশানে রাখা রয়েছে। আগামিকাল সৎকার হবে। প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া অনেকক্ষণ এসে গেছে। রাষ্ট্রপতির কার্ডিয়োলজিস্টের মৃত্যু মানে ধুন্ধুমার মিডিয়া সার্কাস।

প্রথমা আর পুলক বসে রয়েছে চঞ্চলের বাংলোর ড্রয়িং রুমে। কপালে হাত দিয়ে প্রথমা বলল, 'হার্টের রুগির মৃত্যুকে ''আনন্যাচরাল ডেথ'' কেন বলা হচ্ছে?'

'দু—দুটো এফআইআর হয়ে গেছে। মিডিয়ার চাপ আছে। আমাকে প্রসিড করতেই হবে,' শ্রাগ করে পুলক, 'পোস্ট—মর্টেম যিনি করেছেন তিনি ফোনে জানিয়েছেন যে পেসমেকার বন্ধ হয়ে হার্টব্লকের ফলে মৃত্যু। লিখিত রিপোর্ট কাল দেবেন। ভিসেরার কেমিক্যাল অ্যানালিসিস রিপোর্টের প্রাইমারি ফাইন্ডিং আর কিছুক্ষণের মধ্যে ফোনে জানাবেন।'

প্রথমা বলল, 'সময় নষ্ট করে লাভ নেই। গায়ত্রীকে ডাকুন। অভিযোগকারিণীকে দিয়ে জেরা শুরু করা যাক।'

চার

ড্রয়িং রুমে ঢুকে গায়ত্রী বলল, 'ইনস্পেক্টর দাস, আমাকে ডেকেছেন?'

গায়ত্রী সিঁদুর মুছে ফেললেও সিঁথির লাল আভা যায়নি। পরনে নীল, মেরুনপেড়ে শাড়ি। কান্নাকাটির ফলে চোখ জবাফুলের মতো লাল। পুলক বলল, 'আপনি বসুন।'

'আপনি কেন মনে করছেন যে আপনার স্বামীকে খুন করা হয়েছে?' সরাসরি গায়ত্রীকে প্রশ্ন করে প্রথমা।

আঁচলের খুঁট আঙুলের ফাঁকে নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে গায়ত্রী বলে, 'দেবীমাতার নাম শুনেছেন?'

'বিখ্যাত নিউ—এজ গুরুমা,' বলে প্রথমা, 'যোগব্যায়াম, প্রাণিক হিলিং, রিফ্লেক্সোলজি, বিপাসনা, নেচারোপ্যাথির খিচুড়ি বানিয়ে ''আর্ট অফ লাইফ'' নামে বিক্রি করে। এক মাসের সেশানের জন্যে কোটিপতিরা লাইন দেয়। এলাহাবাদে বিশাল আশ্রম, অন্যান্য রাজ্যেও হেলথ হাব আছে। আছে নিজস্ব এফএম এবং টিভি চ্যানেল।'

'গত ছ'মাস ধরে দেবী আমার বরের মাথা খাচ্ছে।' নিচু গলায় বলে গায়ত্রী।

'দেবী কেন চঞ্চলের মাথা খাবেন? কীভাবেই বা খাবেন?'

'চঞ্চল মোটা হয়ে যাচ্ছিল। পেশেন্ট দেখাকালীন দুবার মাথা ঘুরে পড়ে যায়। তখন ও দেবীকে চিপ—এ আমন্ত্রণ জানায়, ''আর্ট অফ লাইফ'' সেশান করার জন্যে। দেবীকে পাশের বাংলোয় থাকতে দেয়। অন্য হার্ট পেশেন্টের সঙ্গে দেবীর সেশানে যোগ দেয়। একমাস সেশান করার পরে চঞ্চল অনেকটা রোগা হয়। মাথা ঘোরাটা কমেনি। কেন না ওটা হার্ট ব্লকের জন্যে হচ্ছিল। আলটিমেটলি পেসমেকার বসাতেই হল। মাঝখান থেকে আমার সববোনাশ হয়ে গেল।'

'সববোনাশ বলতে?'

'দেবীমাতা ওঁকে এমন বশ করে ফেলেছে যে ওর ''আর্ট অফ লাইফ''—এর জন্য প্রচুর টাকা তো চঞ্চল দিয়েছেই, উপরন্তু সম্পত্তির অর্ধেক দেবীমাতার বুজরুকি আর্টের নামে উইল করে দিয়ে গেছে। এতে নাকি অনেক মানুষের উপকার হবে! ছেলেটার নাম প্রাণে ধরে কাটতে পারেনি। চঞ্চল মারা যাওয়ার পরে চিপ—এর মালিক এখন দেবী। আমি সন্দেহ করব না এটা মার্ডার?'

কফিতে চুমুক দিয়ে পুলক বলল, 'কিন্তু দেবী তো প্লেস অফ অকারেন্সে ছিলেনই না!'

'ঘটনাস্থলে না থেকেও মার্ডার করা যায়, মিস্টার দাস। আজকাল নানা সাসটেইনড রিলিজ ক্যাপসুল বেরিয়েছে। খাওয়ার অনেক পরে অ্যাকশন শুরু হয়। চঞ্চল নিয়মিত দেবীর দেওয়া হারবাল ক্যাপসুল খেত।'

'ইন্টারেস্টিং!' প্রথমা গায়ত্রীকে বলে, 'আপনি ডক্টর লক্ষ্মণ মিশ্রকে পাঠিয়ে দিন। আর দেবীকে বলে রাখুন, আমরা ওঁর সঙ্গে কথা বলব।'

পাঁচ

'দেখুন, আমার হাতে একদম সময় নেই। চিপ—এর ম্যানেজমেন্ট সামলানো একটা হেডেক। তার কর্ণধারের অন্ত্যেষ্টি সামলানো আর একটা। এর মধ্যে আমাদের আর জ্বালাবেন না।' ড্রয়িং রুমে ঢুকে সোফায় বসে পুলকের দিকে তাকিয়ে বলল লক্ষ্মণ।

'চঞ্চল তো প্রাক্তন কর্ণধার হয়ে গেলেন। বর্তমান কর্ণধার কে? আপনি?' টুক করে প্রশ্ন ছোড়ে পুলক।

'ট্যালেন্ট আর লেবারকে প্রায়রিটি দিলে সেটাই হওয়া উচিত। কিন্তু দেশটার নাম ভারতবর্ষ। এখানে ভড়ং আর বুজরুকির জয় হয়। আপনি দেবীমাতার নাম শুনেছেন?'

'না শুনে উপায় আছে? টিভি খুললেই তাঁর ছবি।'

'একদিকে মডার্ন মেডিসিন। অন্যদিকে ইন্ডিয়ান মিস্টিসিজম। এই দুই পক্ষের গাঁটছড়া বেঁধে দেবী চিপ—কে ইন্টারন্যাশনাল ওয়েলনেস হাবে বদলে দিতে চায়। যেখানে মেডিসিন বা সার্জারি ছাড়াই হৃদযন্ত্র ভালো থাকবে। দেবীর মোটো হল, ''বাই দ্য বাইপাস।''

'দেবী চাইলেই তো আর বদল ঘটবে না! তার জন্যে চঞ্চলের অনুমতি প্রয়োজন।'

'চঞ্চল উইল করে চিপ—এর অর্ধেক মালিকানা দেবীর নামে করে দিয়েছে। আমি এখন ওই ফ্রডটার বেতনভুক কর্মচারী! কী হিউমিলিয়েটিং!'

'বাকি অর্ধেক মালিকানা তো শাশ্বতর নামে। অত হিউমিলিয়েশানের কী আছে?'

'শত এখনও জুনিয়র। সম্পত্তির অর্ধেক ওর নামে থাকলেও ওর লিগাল গার্জেন সেটা হ্যান্ডল করবে। চঞ্চল কাকে লিগাল গার্জেন করে গেছে কে জানে!'

প্রথমা স্যান্ডউইচ খেতে ব্যস্ত ছিল। এতক্ষণে মুখ খুলল। 'চঞ্চলের পেসমেকার বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ কী হতে পারে?'

লক্ষ্মণ প্রথমার দিকে তাকিয়ে আঙুল নেড়ে বলে, 'আপনি চঞ্চলের বেডে স্মার্টফোন আর ইয়ারপ্লাগ রেখেছিলেন। আপনি কি জানেন যে এ থেকে পেসমেকার ড্যামেজ হতে পারে?'

'তাই আপনি আমার নামে এফআইআর করেছেন?'

'পেসমেকারের সাইজ বিস্কুটের মতো।' রাগি গলায় বলে লক্ষ্মণ, 'বুকের ডানদিকে কলার বোনের তলায়, চামড়ার নীচে বসানো থাকে। পেসমেকার থেকে একটা তার ধমনি দিয়ে চলে যায় দক্ষিণ নিলয় ও দক্ষিণ অলিন্দে। পেসমেকারে ইমপালস তৈরি হলে, তারবাহিত হয়ে সেই ইমপালস হৃদয়ে পৌঁছে তাকে ঠিক ছন্দে নাচায়। স্মার্টফোন সরাসরি পেসমেকারের ওপরে কোনো এফেক্ট করে না। কিন্তু ইয়ারপ্লাগের ম্যাগনেট পেসমেকারের ইমপালস জেনারেশানে ব্যাগড়া দিয়েছে। সেটাই চঞ্চলের মৃত্যুর কারণ।'

প্রথমার মনে সংশয় বাসা বাঁধছে। তার জন্যে যদি চঞ্চল মারা গিয়ে থাকেন, তাহলে সে নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে পারবে না।

পুলক নিচু গলায় লক্ষ্মণকে বলল, 'আপনি যান। দেবীকে পাঠিয়ে দিন।'

ছয়

'নমস্কার। আমাকে এখানে ডাকা হয়েছে?' ড্রয়িং রুমে ঢুকে সবার দিকে তাকিয়ে হাত জড়ো করল দেবীমাতা। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা। জিনস এবং নামাবলির কুর্তি পরা দেবীকে দেখে পুলক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'বসুন।'

সোফায় বসল দেবী। প্রথমা তার হাতে এক কাপ কফি তুলে দিয়ে বলল, 'গায়ত্রী অভিযোগ করেছেন যে আপনি সাসটেইনড রিলিজ ক্যাপসুল খাইয়ে চঞ্চলকে হত্যা করেছেন।'

'ভিসেরার কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের রিপোর্ট এলেই সত্যিটা বোঝা যাবে।' কফিতে চুমুক দেয় দেবী।

'চঞ্চলের শেষ উইল অনুযায়ী ওঁর অবর্তমানে, যাবতীয় সম্পত্তির অর্ধেক মালিক আপনি। গায়ত্রীর অভিযোগ, এটাই আপনার খুন করার মোটিভ।'

'অর্থ নিয়ে কথা বলা আমার জীবনদর্শনের বিরোধী।'

এরমধ্যে পুলকের ফোন এসেছে। সে মোবাইলে নিচু গলায় কথা বলছে। ফোন কেটে বলল, 'সেন্ট্রাল ফরেনসিক রিসার্চ ল্যাবরেটরি থেকে জানাল, ভিসেরার কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করে কোনো পয়জন পাওয়া যায়নি। চাঁদুর দেওয়া যে দুটো ওষুধ উনি খেয়েছিলেন, সেগুলো ব্লাড প্রেসার কমানোর ওষুধ। রক্তে তাদের মাত্রা স্বাভাবিক।'

'গায়ত্রীর সাসটেইনড রিলিজ পয়জন ক্যাপসুলের তত্ত্ব তা হলে বাতিল!' তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে দেবী, 'আমি এবার উঠি?'

প্রথমা বলে, 'চঞ্চল চাঁদুকে বলছিলেন যে আপনার হারবাল ক্যাপসুল উনি আর খাবেন না।'

দেবীমাতা একপরদা গলা চড়িয়ে বলল, 'পেসিং—এর দুদিন আগে পর্যন্ত চঞ্চল হারবাল ক্যাপসুল খেয়েছে। পেসিং—এর পরে খেয়েছে কি না জানি না। আইসিসিইউতে আমি যাইনি।'

'আপনি এবার আসতে পারেন।' নমস্কার করে প্রথমা। তাকে পাত্তা না দিয়ে পুলকের দিকে তাকিয়ে দেবী বলে, 'লক্ষ্মণের মুখে শুনলাম যে এই জার্নালিস্ট মেয়েটি চঞ্চলের বেডে স্মার্টফোন এবং ইয়ারপ্লাগ রেখেছিল। আমার 'হেলদি হার্ট উইদাউট ডক্টর' বইতে পরিষ্কার বলা আছে যে পেসমেকারের তিন সেন্টিমিটারের মধ্যে ম্যাগনেট থাকলে সেটা ইমপালস জেনারেশানে প্রবলেম করে। অন্যদের জেরা করা বন্ধ করে আপনি আগে একে জেরা করুন। চঞ্চলের মৃত্যুর কারণ খুঁজে পাবেন।'

পুলক বলল, 'আপনি চাঁদুকে পাঠিয়ে দিন।'

সাত

দেবী ঘর থেকে বেরোতেই প্রথমা হঠাৎ চনমনে। আগেকার সেই মনমরা ভাব আর নেই। একটুকরো কাগজে খসখস করে একলাইন লিখে পুলকের হাতে ধরিয়েছে। চাঁদু ঘরে ঢুকতেই তাকে কড়া গলায় বলল, 'তুমি সারাদিন স্যারের সঙ্গে থাকতে?'

'হ্যাঁ।'

'চঞ্চল যে সেকেন্ড উইল করেছিলেন, সেটা তুমি জানতে?'

চাঁদু মুখ খোলার আগে পুলক শাশ্বতকে বলল, 'বাথরুমটা কোথায়?'

'আমি দেখিয়ে দিচ্ছি,' বলল চাঁদু।

'আমার কথার উত্তর না দিয়ে পালানোর চেষ্টা কোরো না!' চাঁদুকে ধমক দেয় প্রথমা। শাশ্বত ব্যাজার মুখে পুলককে নিয়ে ড্রয়িং রুম থেকে বেরোয়।

শাশ্বতর ল্যাপটপের সামনে বসে প্রথমা বলল, 'আমি চিরকুটে বড়বাবুকে লিখেছিলাম যে উনি যেন শাশ্বতকে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যান। তুমি বড়বাবুকে বাথরুম দেখাতে গিয়ে কেসটা ঘেঁটে দিচ্ছিলে। আমি যে প্রশ্নটা করেছি, তার উত্তর দাও।'

'হ্যাঁ,' মাথা নিচু করে বলে চাঁদু।

'তুমি দুটো উইলের কথাই জানতে?'

'দুটো নয়,' এদিক—ওদিক দেখে নিচু গলায় চাঁদু বলে, 'উইল আসলে তিনটে।'

'ভুল বকছ কেন?' ল্যাপটপের ওয়েব হিস্ট্রি ঘাঁটছে প্রথমা।

'ভুল বকছি না। তিনটে উইলেরই একজন সাক্ষী আমি, আর অন্যজন আরএমও বিকাশ দত্ত। উনি স্যারের ছোটবেলার বন্ধু।'

'লাস্ট উইল, মানে তিন নম্বর উইলটা কবে হয়েছে?'

'গতকাল রাতে। আইসিসিইউ থেকে বাড়ি আসার আগে স্যার এই উইলটা করেছেন।'

'এই উইলে উত্তরাধিকারী কে?'

'প্রথম আর তিন নম্বর উইলে কোনো তফাত নেই। স্যার মরে যাওয়ার পরে সব সম্পত্তির মালিক এখন আবার গিন্নিমা আর খোকাবাবু।'

ওয়েবহিস্ট্রি ঘাঁটতে ঘাঁটতে প্রথমা বলল, 'কার্ডিয়োট্রনিক্স।'

তাকে অবাক করে দিয়ে চাঁদু বলল, 'ঠিক বলেছেন।'

'কী ঠিক বলেছি?' প্রথমা জানতে চায়।

'স্যারের বুকে কার্ডিয়োট্রনিক্স কোম্পানির পেসমেকার বসানো হয়েছে। ওটাই এখন ওয়ার্ল্ডের বেস্ট।'

'কার্ডিয়োলজিস্টের সঙ্গে থেকে তুমিও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হয়ে গেলে নাকি?' প্রাণখোলা হাসে প্রথমা।

শাশ্বত আর পুলক ড্রয়িংরুমে ফেরত এসেছে। প্রথমাকে ল্যাপটপ ঘাঁটতে দেখে শাশ্বত গলা তুলে বলল, 'ল্যাপটপ পারসোনাল জিনিস। অন্যেরটা ইউজ করা উচিত নয়।'

'বিপদের সময় অন্য লোকের জিনিস ইউজ করতে হয়।' কি—বোর্ডে প্রথমার আঙুল চলছে। তাকে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করছে শাশ্বত। বলছে, 'আপনার কেন বিপদ হবে? বিপদ তো দেবীমাতার।'

'কেন?' ল্যাপটপ পুলকের হাতে তুলে দিয়ে বলে প্রথমা।

'আমি ওই হারবাল ক্যাপসুল কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের জন্যে মুম্বাইয়ের ফার্মাকোলজি ল্যাবে পাঠিয়েছিলাম। রিপোর্টে বলছে, হারবাল ক্যাপসুল হাইডোজ স্টেরয়েডে ভরপুর। রিপোর্ট দেখার পর বাবা আর ওই মেয়েটার মধ্যে বিরাট বাওয়াল হয়!'

চাঁদু বলে, 'তারপর থেকেই স্যার আর দিদিমণির দেওয়া ওষুধ খাননি। গতকাল রাতের উইলটাও ওই কারণে করেন।'

'নতুন উইলের কথা কে কে জানে?'

'স্যার, উকিলবাবু, ডাক্তার বিকাশ দত্ত, খোকাবাবু আর আমি। আমি কিন্তু কাউকে বলিনি।' কাঁচুমাচু মুখে বলে চাঁদু।

'আমিও বলিনি,' ভাঙা গলায় বলে শাশ্বত।

'তুমি যে কাউকে বলোনি এটা আমি জানি,' শাশ্বতর মাথায় হাত বুলিয়ে প্রথমা বলল, 'চাঁদু, সবাইকে একবার স্যারের বেডরুমে ডাকো। ফাইনাল কথাবার্তা বলে আমি উঠব।'

আট

'বেশি সময় নেব না। সংক্ষেপে বলি।' চঞ্চলের বেডের চারপাশের চেয়ারে বসে থাকা গায়ত্রী, লক্ষ্মণ আর দেবীর দিকে তাকিয়ে বলে প্রথমা। চাঁদু বেডের পিছনে, মেঝেয় বসেছে। শাশ্বত পুলকের পাশে বসে ল্যাপটপ নেওয়ার জন্যে ছোঁকছোঁক করছে। পুলক ল্যাপটপ হাতছাড়া করেনি।

'চঞ্চল মারা গেলে কার লাভ?' সবার দিকে তাকিয়ে জানতে চায় প্রথমা। 'গায়ত্রী এবং লক্ষ্মণ মনে করছে দেবীর লাভ। কেন—না চঞ্চলের যাবতীয় সম্পত্তির মালকিন এখন দেবী।'

'টাকাপয়সা নিয়ে কথা বলা আমার অপছন্দ। তাও বলি, দেবীমাতা ট্রাস্টের টাকার অভাব নেই।' নরম গলায় বলে দেবী।

'আপনার হারবাল ক্যাপসুলে স্টেরয়েড মেশানো থাকে। এই তথ্য ফাঁস হয়ে গেলে ট্রাস্টের উপরে মানুষের ট্রাস্ট চলে যাবে। চলে যাবে আপনার কোটি টাকার সম্পত্তি। মিডিয়ার কাছে মুখ খোলার আগে চঞ্চলকে সরিয়ে দেওয়া খুন করার পক্ষে বিরাট বড় মোটিভ।'

'শাট আপ! বেশি কথা বললে তোমার জিভ ছিঁড়ে নেব!' হুঙ্কার ছাড়ে দেবী।

পুলক চেঁচায়, 'বেশি কথা বললে এক্ষুনি আপনার হাতে হাতকড়া পরিয়ে মিডিয়ার সামনে দিয়ে প্রিজন ভ্যানে তুলব।' দেবী চুপ করে যায়।

প্রথমা বলে, 'অন্যদের মোটিভে আসা যাক। দেবী মনে করে, সম্পত্তি হাতছাড়া হওয়ার ক্ষোভে গায়ত্রী ওঁকে খুন করেছেন। তাছাড়া চঞ্চল মরে যাওয়ায় লক্ষ্মণেরও তো লাভ হল।'

'আমার আবার কী লাভ?' হাতা গুটিয়ে সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে লক্ষণ। 'চিপ—এর সুপারইনটেন্ডেট হিসেবে আর কত দিন থাকবেন? রাষ্ট্রপতির হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হতে গেলে যদি কারও হৃদয় থামিয়ে দিতে হয়, তবে তাই সই! এর থেকে বড় মোটিভ আর হয় না।'

লক্ষ্মণ বলে, 'কিন্তু চঞ্চল তো সবকিছু দেবীমাতার নামেই করে গেছে। আমি কেন চঞ্চলকে মারতে যাব? তিন নম্বর উইলের কথা তো আমি জানিই না!'

মৃদু হাসে প্রথমা, 'মোটিভ ভুলে গিয়ে এবার আমরা কজ অব ডেথে ঢুকি। চঞ্চলের মৃত্যু স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক? অস্বাভাবিক হলে এটা কি হত্যা?'

'দিস ইজ মার্ডার! অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে আপনাকে পালাতে দেব না!' গর্জন করে লক্ষ্মণ। পুলককে বলে, 'আমি আপনাকে বলেছিলাম যে ইয়ারপ্লাগের ম্যাগনেট থেকে পেসমেকার ডিঅ্যাকটিভেটেড হয়েছে। আপনি এই জার্নালিস্টকে অ্যারেস্ট করুন!'

'আপনি ভুল বলেছিলেন!' পুলক কিছু বলার আগেই প্রথমার গলা বেডরুম জুড়ে চাবুকের মতো আছড়ে পড়ল, 'কেন, সেটা জানার জন্যে আপনাকে চঞ্চলের বেডে একবার শুতে হবে। চাঁদু, স্যারের বেডটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি করে দাও।'

চাঁদু বেডের হেডএন্ড তুলে দিল। লক্ষ্মণ লালচোখে প্রথমাকে মেপে নিয়ে বিছানায় আধশোওয়া হল। প্রথমা বলল, 'ধরে নিন, আপনি চঞ্চল। আমি জার্নালিস্ট। আমার পুরনো জায়গায় বসছি। স্মার্টফোন আর ইয়ারপ্লাগ পুরনো জায়গায় রাখছি।'

বেডের বাঁ পাশের চেয়ারে বসে প্রথমা লক্ষ্মণকে বলল, 'পেসমেকার বসানো থাকে বুকের ডানদিকে। ইয়ারপ্লাগের ম্যাগনেট কাজ করে তিন সেন্টিমিটারের মধ্যে। আপনার বাঁদিকে থাকা ইয়ারপ্লাগ এখন আপনার বুকের ডানদিকে বসানো পেসমেকারের থেকে অন্তত দু'ফুট দূরে। আমার ইয়ারপ্লাগের ম্যাগনেট থেকে চঞ্চলের পেসমেকার বন্ধ হয়নি।'

লক্ষ্মণের বডি ল্যাঙ্গোয়েজে আগের আগ্রাসী ভাব আর নেই। বিড়বিড় করে সে বলল, 'তা হলে? চঞ্চল কীভাবে মারা গেল?'

'সেটা জানার চেষ্টা করা যাক!' লক্ষ্মণকে ছেড়ে শাশ্বতকে নিয়ে পড়েছে প্রথমা, 'খোকাবাবু, তোমার ল্যাপটপের ওয়েব হিস্ট্রিতে কার্ডিয়োট্রনিক্সের লিঙ্ক কেন রয়েছে?'

'তুমি আমার ল্যাপটপ ফেরত দাও।' পুলককে মিনতি করে শাশ্বত।

শাশ্বতর কবজি ধরে বেডের ডানপাশে এনে প্রথমা লক্ষ্মণকে বলে, 'আমি ডাক্তারি বুঝি না। ভুল বললে সংশোধন করে দেবেন। পেসমেকারের প্রাণভোমরা একটা মাইক্রোচিপ। তাতে পেশেন্ট এবং তার রোগ সংক্রান্ত যাবতীয় ডেটা ভরা থাকে। মাইক্রোচিপ থেকে এই ডেটা ওয়্যারলেস রেডিয়ো সিগন্যালের মাধ্যমে

ট্রান্সমিটেড হয়। দরকার পড়লে, বুকের চামড়া না কেটে, পেসমেকারে হাত না দিয়ে, পেশেন্টের হার্টরেট বাড়ানো বা কমানো হয় এই মাইক্রোচিপের সাহায্যে। তাই তো?'

লক্ষ্মণ নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ে।

'চঞ্চলের ডানদিকে বসে, রেডিয়ো হার্ডওয়্যার লাগানো ল্যাপটপের মাধ্যমে শাশ্বত রেডিয়ো সিগন্যাল ইন্টারসেপ্ট করেছে। তারপর সেই ডেটার সাহায্যে কার্ডিয়োট্রনিক্সের সার্ভারে ঢুকে চঞ্চলের পেসমেকারের ইমপালস জেনারেশান বন্ধ করে দিয়েছে।'

পুলক বলল, 'বুঝলাম না। একটু সহজ করে বলুন।'

'চেষ্টা করছি,' বলে প্রথমা, 'মোবাইল ফোন চুরি হলে, এয়ারটাইম প্রোভাইডারকে খবর দিলে ওরা যেভাবে চুরি যাওয়া সিমকার্ড ডিঅ্যাকটিভেট করে দেয়, এটা সেই পদ্ধতি। শাশ্বত একজন ধুরন্ধর হ্যাকার।'

পুলক বলল, 'এবার বুঝলাম। আমি এই ল্যাপটপ কলকাতার পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেলে পাঠাচ্ছি। ওরা হার্ডডিস্ক থেকে সব ডেটা উদ্ধার করে দেবে।'

শাশ্বতর গালে ঠাস করে চড় মেরে তাকে জড়িয়ে ধরে গায়ত্রী। কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'কেন এইরকম করলি? কেন?'

গায়ত্রীর কোলে মাথা রেখে চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছে শাশ্বত। কৈশোরের ভাঙা গলায় বলছে, 'বাবাটা খালি বলত, ''তোকে কার্ডিয়োলজিস্ট হতে হবে।'' আমার ভালো লাগত না মা। বাবাটা আমাকে পাগলের ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছিল। স্কুলের বন্ধুরা এই নিয়ে আমায় ''বুলি'' করে। আমার ভালো লাগে না মা। তুমি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। সফটওয়্যার নিয়ে পড়াশোনা করতে আমাকে এনকারেজ করো। ডাক্তার হওয়ার কথা বলে ''বুলি'' করো না। ''জোম্বি'' বলে গালাগাল দাও না। আর তাছাড়া বাবা তোমাকে খুব কাঁদিয়েছে। আই নিউ ইট মা। তুমি চোখের জল আড়াল করেছ ঠিকই, বাট আমার থেকে গোপন করতে পারোনি।'

প্রথমা নরম গলায় বলে, 'শাশ্বত, তুমি কি জানো যে তুমি যা করেছ, সেটা মার্ডার?'

'মার্ডার কেন হবে? দিস ইজ হার্ট হ্যাকিং।' ভাসাভাসা চোখে নিষ্পাপ দৃষ্টি মেলে বলে শাশ্বত, 'কার্ডিয়োট্রনিক্সের সার্ভারের সিকিয়োরিটিতে কিছু লুপহোল ছিল। সেটা ধরিয়ে দিয়ে আমি ওদের মেইল করে দিয়েছি। যাতে ওরা ভুলটা কারেকশান করে নেয়।'

পুলক প্রথমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা যে শাশ্বতর কাজ এটা আপনার কখন মনে হল?'

'লক্ষ্মণ বলেছিল ম্যাগনেট থেকে পেসমেকারের ড্যামেজ হয়। দেবী যখন বলল যে পেসমেকারের তিন সেন্টিমিটারের মধ্যে ম্যাগনেট থাকলে তবেই ড্যামেজ হবে, তখনই আমি নিজেকে সন্দেহের তালিকার বাইরে রাখি। কেননা আমার ইয়ারপ্লাগ অনেক দূরে ছিল। কাছে ছিল শাশ্বতর ল্যাপটপ। 'চিপ' শব্দটা বারবার শুনে হঠাৎ মনে হল, পেসমেকারেও তো চিপ থাকে। শাশ্বতর দৃষ্টিতে চঞ্চলের প্রতি ঘৃণাই আমাকে বাধ্য করে ওর ল্যাপটপে নাক গলাতে। আপনাকে ওই চিরকুট দেওয়ার আসল কারণ হল, আমি শাশ্বতকে মেশিন থেকে তুলতে চেয়েছিলাম।'

দেবী চুপ করে বসে আছে। চাঁদু মেঝের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে। পাখির মায়ের মতো দুই পক্ষ দিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে গায়ত্রী। শাশ্বত মায়ের কোলে বসে আছে।লক্ষ্মণের মাথা নিচু। পুলক পানিহাটি থানায় ফোন করছে।

একদল পরাজিত মানুষকে পিছনে ফেলে প্রথমা ঘর থেকে বেরোল। অডিয়োভিশুয়াল আর প্রিন্ট মিডিয়া —এই দুই পক্ষের নজর বাঁচিয়ে তাকে 'চিপ' থেকে বেরিয়ে দিল্লি ফিরতে হবে। সামনে অনেক কাজ।

সীতা

সায়ন্তনী পূততুণ্ড



এক

অবশেষে বনোয়ারিলাল শ্রীঘরে গেল!

সংবাদটা শুনে আদৌ বিস্মিত হইনি। বরং এতদিন কেন যে ও জেলে যায়নি, সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার! গত কয়েক বছর ধরেই হাজতবাসের ফাঁড়াটা ওর মাথার ওপর খাঁড়ার মতো ঝুলছিল। কিন্তু কোনোবারই জেলের ভাত খেতে হয়নি ওকে। এই প্রথমবার ব্যতিক্রম ঘটল!

খবরটা পেলাম সুখিয়ার কাছে। সুখিয়া বনোয়ারিলালের দাদা বংশীলালের বউ। ওরা দুই ভাই-ই কয়লাখনির অস্থায়ী শ্রমিক। বলাই বাহুল্য, সকালে বেরোলে বিকেলে ফিরে আসবে কিনা, সে গ্যারান্টি ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ দিতে পারবে না। তার ওপর একা রামে রক্ষা নেই, দোসর লক্ষ্মণ! ওই বিপজ্জনক কাজের ফাঁকেই দুই ভাই মিলে আবার সুযোগ পেলেই কয়লা চুরি করে। তাতে সংসারে দুটো পয়সা বেশি আসে ঠিকই, কিন্তু কয়লা চুরি করায় প্রাণের ঝুঁকি আছে। যে কোনো সময় মারা পড়তে পারে। উপরন্তু ধরা পড়লে জেলের ভাত খেতেও হতে পারে।

বনোয়ারিলালের শ্রীঘরে গমনের স্বপক্ষে কয়লাচুরি ও বে-আইনিভাবে বিক্রি করার কারণই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু শুধু এটুকুতেই তার কার্যকলাপ থেমে থাকেনি। জেলে যাওয়ার রাস্তাটা সে আরও বেশি প্রশস্ত করেছিল নিজের বউ রামদুলারিকে নিয়মিত ঠেঙিয়ে! যার শহুরে ও পোশাকি নাম— ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স! কিন্তু রামদুলারি বা সুখিয়ারা জানে না ফোর নাইন্টি এইট কাকে বলে। বরং তাদের ধারণা, মরদ যখন, তখন তো পেটাবেই! খেতে, পরতে দেয়, আর 'লুগাইকে' একটু পেটাবে না?

একটি নামকরা এনজি ও-'র পক্ষ থেকে যখন আমি বিহারের এই প্রত্যন্ত প্রদেশে এসে পৌঁছই তখন প্রথমদিকে জায়গাটাকে শান্তিপ্রিয় বলেই মনে হয়েছিল। এখানকার বেশির ভাগ লোকই কয়লাখনিতে দিন-মজুর হিসাবে খাটে। আবার কেউ বা অন্যের জমিতে মাটি কোপানো, লাঙল চালানোর কাজ করে। যখন কাজ থাকে, দিনান্তে পয়সা পায়, তখন বাড়িতে দুবেলা হাঁড়ি চড়ে। অন্যথায় পেটে কিল মেরে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। বিনোদন বলতে বিড়ি, বা গাঁজার ছিলিমে সুখটান। সঙ্গে উৎকট গন্ধওয়ালা দেশি মদ! কখনও কখনও মুরগি লড়াই, কিংবা ছোটখাটো ' নৌটঙ্কি' বা কুস্তির 'দঙ্গল'। এর বেশি ফুর্তি করার সামর্থ্য ওদের নেই। ইলেকট্রিসিটি থাকলেও সারি সারি ঝুপড়িগুলোয় তার চোখ ধাঁধানো আলোর অনুপ্রবেশ এখনও হয়নি। বরং সন্ধে হলেই তেলের কুপি জ্বলে ওঠে। আমার আজন্ম শহুরে চোখ সেই শান্ত আলোয়

বড় আরাম পায়। মনে হয়, একমুঠো জোনাকির স্নিগ্ধ আলো কেউ ছড়িয়ে দিয়েছে চতুর্দিকে। ঝুপড়িগুলোয় যেন নেমে এসেছে এক অদ্ভুত ঠান্ডা দীপ্তি! প্রায় রাতেই এনজি-ও'র সবেধন নীলমণি গেস্টহাউসের বারান্দায় বসে তাকিয়ে থাকতাম ওই বিন্দু বিন্দু আলোর দিকে। বড় ভালো লাগত।

কিন্তু সপ্তাহখানেক ঘুরতে না ঘুরতেই বুঝলাম অশিক্ষা আর কুসংস্কারের আড়তের মধ্যে এসে পড়েছি। আমাদের এনজিও এই গ্রামে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রাণপণ খাটছিল। কিন্তু আখেরে কোনো লাভ হয়নি। স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে, রোগী নেই। থাকবে কী করে? এখানে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তারের কাছে যায় না, বরং দৌড়য় জনৈক জংলিবাবার কাছে। ডাক্তারবাবু একদিন আফসোস করে বলছিলেন—' কেন যে মরতে এখানে এলেন! কখনও কখনও আমারও সেই জোকটার মতো মনে হয় যে, নরক থেকে এখানে ফোন করলে নির্ঘাৎ লোক্যাল কলই হবে! আমি এখানে ট্রিটমেন্ট করার জন্য বসে আছি, কম্পাউন্ডার আছে, ওষুধ আছে, টেবিল- চেয়ার—সব আছে। কিন্তু পেশেন্ট নেই'।

'কেন? পেশেন্ট থাকবে না কেন?' অবাক হয়ে বলি— 'ট্রিটমেন্ট তো ফ্রি-তে দেওয়া হচ্ছে! এমনকী ওষুধও ফ্রি! এক পয়সাও লাগবে না। তাবে?' ডাক্তারবাবু হাসলেন—'ওই খানেই মার খা গিয়া ইন্ডিয়া! আমি শুধু ওষুধই দিতে পারি। জংলিবাবার মতো হাত ঘুরিয়ে ''নিম্বু'' বা শূন্য থেকে ''বিভূতি'', আই মিন ছাই, তো আমদানি করতে পারি না!'

তাই তো! কঠিন সমস্যা! ডাক্তারবাবু ওষুধ দিতে পারেন, লেবু বা ছাই আমদানি করবেন কী করে! অতএব স্বাস্থ্যকেন্দ্র ফাঁকাই পড়ে থাকে। কম্পাউন্ডার ও ডাক্তার সম্মিলিতভাবে মশা ও মাছি তাড়ান!

ডাক্তারবাবু আপনমনেই বিড়বিড় করে বলেন—'এই তো! কিছুদিন আগেই একটা বাচ্চা মেয়ের জ্বর হয়েছিল! পুরো হলুদ হয়ে গিয়েছিল। ক্লিয়ার কেস অব জন্ডিস! কিন্তু তাকে ডাক্তারখানায় আনা তো দূর, সবাই মিলে জংলিবাবার কাছে নিয়ে গেল! জংলিবাবা পরীক্ষা করে বললেন—''ভূত ধরেছে''। তারপর তিনদিন ঝাঁটাপেটা, লোহার ছ্যাঁকা দেওয়ার পর ভূত তো গেলই, মেয়েটার প্রাণও গেল! আমি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম...শুধু দেখলাম...!'

ওঁর হাহাকারের সান্ত্বনা আমার কাছে ছিল না! শুধু বুঝলাম, স্বাস্থ্যের এই হাল! আর শিক্ষার কথা বলতে গেলে কান্না পেয়ে যায়। আমি নিজেই এখানে শিক্ষকতা করতে এসেছি। আমাদের এনজিও আপাতত একটা মেটে বাড়িতে শ্রমিক-সন্তানদের জন্য অস্থায়ী স্কুল গড়ে তুলেছে। সেখানে পড়ানোর জন্য একজন হেডস্যার ও আমাকে নিয়ে সর্বসাকুল্যে দুজন শিক্ষক উপস্থিত। অফিস থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে এই মেটে বাড়িটা পাকা হবে কি না তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ছাত্রসংখ্যার ওপরে! টার্গেট টাইম—দু বছর। কিন্তু আমি এখনই হলফ করে বলতে পারি—জীবনেও হবে না! দশমাস আগে ছাত্রসংখ্যা ছিল শূন্য! এখনও তাই! তাও ভালো, জনগণনা মাইনাসে রান করে না! তাই বৎসরান্তে রিপোর্ট করার সময় 'উন্নতি হয়নি' বলতে পারব। কিন্তু 'অবনতি হয়েছে' তা আমার অতিবড় শত্তুরও প্রমাণ করতে পারবে না!

'আগের জন তিনমাসেই পালিয়েছিল'। হেডস্যার আবার লখনৌ-র মানুষ। প্রথম সাক্ষাতেই চোস্ত হিন্দিতে বললেন—'আপনি কবে পালাচ্ছেন, জনাব?'

প্রথম সম্ভাষণেই হকচকিয়ে গেলাম। আমার বিস্ময় দেখে ভদ্রলোক হেসে ফেলেন—'আপনি ''কলকত্তার'' লোক। এখানকার হালচাল দেখলে দুদিনেই ''পালাই পালাই'' করবেন। এদের পড়ানোর সাধ্যি স্বয়ং দেবী সরস্বতীরও নেই, তো আমরা কোথাকার খাঞ্জা খাঁ?'

স্কুলের হেডস্যার যদি প্রথমেই এমন একখানা আছোলা বাঁশ দিয়ে দেন, তবে শিক্ষক বেচারি যায় কোথায়? তবু ভাবলাম, এত সহজে ছাড়ব না।

'প্রথম প্রথম অনেক চেষ্টা করেছি'। হেডস্যার নির্লিপ্ত মুখে জানালেন—'কিন্তু বাচ্চাগুলো পড়বে কী! ওরাও তো বাপ-মায়ের সঙ্গে কাজে বেরোয়। কেউ কয়লাখনিতে যায়। কেউ জমিতে খাটার কাজ করে'।

'কিন্তু শিশুশ্রম তো বে-আইনি!'

'আইন!' এবার সজোরে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক—'এখানে আইন কোথায়? ''পুলিশ-ঠানে'' একটা আছে ঠিকই, কিন্তু আইন নেই!'

বুঝলাম, 'পুলিশ-ঠানে' আসলে শালগ্রাম শিলারই নামান্তর! তবু হাল ছাড়িনি । এই এনজিও-তে এটাই প্রথম আমার 'বিগ ভেঞ্চার' । এতদিন বয়েস নিতান্তই কম বলে ছোটখাটো কাজই করতে হচ্ছিল । নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ এই প্রথম । মনে মনে ভাবলাম, এত সহজে ছাড়ব! চ্যালেঞ্জ নিয়েই দেখি না কী হয়! আমিও নজরুল, নেতাজি, ক্ষুদিরামের দেশের লোক । 'আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেইদিন হব শান্ত...!'

অনেক উত্তপ্ত কবিতা মনে মনে আবৃত্তি করে অবশেষে মাঠে নেমেই পড়লাম । মনে মনে বিদ্রোহী কবিতা আওড়ালেও বাহ্যিক ভাবটা একদম বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মতো! যেন দোরে দোরে গিয়ে ঝুলি পেতে বলছি—'ভিক্ষাং দেহি'! কুড়িয়ে বাড়িয়ে যদি একটি ছাত্র বা ছাত্রী মিলে যায় তবেই একেবারে আগ্রা ফোর্ট জয় করে ফেলব! কিন্তু 'অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়' । প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়িতেই চা, গুড়, মুড়ি পেলাম, সসম্মানে 'মাস্টারজি' অভিধাও জুটল, হাত পাখার মিঠে বাতাসও পেলাম—কিন্তু ছাত্রছাত্রী পাওয়া গেল না! ঘরে ঘরে শুধু বাটিটা পাততে বাকি রেখেছি । কিন্তু ভবি ভোলবার নয় । ঘরের শিশুদের ধানখেতে, কয়লা খনিতে, কিংবা কোনো লালার চাল-কলে, তেল-কলে খাটতে দিতে রাজি ওরা । কিন্তু স্কুলে পড়তে পাঠালেই 'সত্যনাশ' । বেশ কয়েকবার বোঝানোর চেষ্টাও করলাম । সবার মুখেই এক কথা—'আমার একার রোজগারে ''গেরস্থী'' চলে কী করে মাস্টারজি? একেই কাজের ঠিক নেই । আজ আছে, কাল নেই । বাঁচতে হলে তো সবাইকেই ''মেহনত'' করতে হবে । আর আমাদের মতো মজুরদের ঘরের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে কোন ''জজ-কালেক্টর'' হবে! ওসব আপনাদের মতো বড় লোকদের ব্যাপার! মজদুরি খাটলে পয়সা আসবে, ''সকুল'' এ পড়ে কি দু বেলার ''দাল-রোটি'' জোগাড় করতে পারবে বাচ্চা?'

এই 'ঘর-ঘর' ক্যাম্পেনিং-এর সময়ই দেখা হল বনোয়ারিলালের সঙ্গে! ওর দাদা বংশীলাল এবং বনোয়ারির বাড়িতেও গিয়েছিলাম ছাত্র-ছাত্রীর খোঁজে । কিন্তু গিয়ে যা দেখলাম তাতে চক্ষু চড়কগাছ! বনোয়ারি তখন ওর বউ রামদুলারিকে পেটাতে ব্যস্ত ছিল । উঠোনে পা দিয়েই বুঝলাম—টাইমিঙে ভুল হয়েছে! সামনে এক ক্ষীণদেহী, বিবর্ণ-শুকনো-ক্ষয়াটে চেহারার নারী ঘুঁষি-লাথি খেয়ে কঁকিয়ে যাচ্ছে, আর এক পুরুষ তাকে মেরে মেরে পাট পাট করছে । গালি দিচ্ছে—'কালমুহি, করমজলি! আজ তোকে মেরেই না ফেলেছি!'...

'মাস্টারজি...!'

মুহূর্তের মধ্যে চিন্তাসূত্রটা ছিঁড়ে গেল । কিন্তু সেই দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে! সামনেই ক্লান্ত ধ্বস্ত চেহারার সুখিয়া দাঁড়িয়েছিল । ক্লান্ত হওয়াই স্বাভাবিক । তিনদিন আগেই সে একটি সন্তান প্রসব করেছে । এ গ্রামের সকলেই জেনে গিয়েছে আমি 'ছাত্রবিহীন মাস্টারজি'— অর্থাৎ 'মিনিস্টার উইদ আউট পোর্টফোলিও'! কিন্তু পড়াশোনা জানি বলে গাঁয়ের অনেকেই আমার কাছে সমস্যা সমাধানের আর্জি নিয়ে আসে । আজ বনোয়ারিলালের হাজতবাসের খবর নিয়ে এসেছে ভগ্নদূত নিরুপায় সুখিয়া!

মনে মনে ভাবছিলাম— 'পুলিশ-ঠানে' নামক শালগ্রাম শিলাটি হঠাৎ নড়ে চড়ে বসল কেন? এতদিনে কি তবে কয়লা চুরির অপরাধ ধরা পড়ল? না আচম্বিতে রামদুলারির মাথায় কোনো দিব্য শক্তি ভর করে ফোর নাইন্টি এইটের পাঠ পড়িয়েছে! রামদুলারিও তো গর্ভবতী! নাকি গর্ভবতী বউটা মার খেতে খেতে মরেই গেল বলে খুনের অভিযোগে ধরেছে পুলিশ? যদি তাই হয়ে থাকে, তবে বেশ হয়েছে । অনেক আগেই ওর শাস্তি হওয়া উচিত ছিল!

নির্বিকারভাবে জানতে চাই— ‘পুলিশ ধরেছে কেন? কয়লা চুরি করেছে? না বউটাকে খুন করেছে?’

সুখিয়া ছলছল চোখে বলল— ‘না মাস্টারজি । বনোয়ারি রামদুলারিকে পেটায়নি’ । একটু থেমে সজল চোখে জানায় সে— ‘ও বংশী...মানে আমার মরদটাকে পিটিয়েছে! পিটিয়ে নাক মুখ ফাটিয়ে দিয়েছে । ও ‘‘ঠানে’’ তে বনোয়ারির নামে ‘‘রপট’’ লিখিয়েছে হুজুর! এদিকে রামদুলারিরও পেট হয়েছে । সকাল থেকে কিছু খায়নি সে । খালি কাঁদছে । এখন আপনি কিছু করুন । নয়তো পুলিশ বনোয়ারিকে ছাড়বে না! রামদুলারি কেঁদে কেঁদে জান দিয়ে দেবে ।’

যাঃ কলা! এ তো উলটপুরাণ! মাথায় আস্ত আকাশ ভেঙে পড়লেও বোধহয় এত আশ্চর্য হতাম না! শেষ পর্যন্ত বনোয়ারি রামদুলারিকে নয়, বংশীলালকে পেটানোর অপরাধে জেলে গেল! ভাবা যায় না! কবিগুরু এই পরিস্থিতিতে থাকলে নির্ঘাত একটা আপ্তবাক্য লিখে ফেলতেন—

‘বউ ঠ্যাঙাইলে নিস্তার আছে, ভাই ঠ্যাঙাইলে নাই!’

দুই

‘আপনি আবার কষ্ট করে এলেন কেন, মাস্টারজি?’ একমুখ জর্দা পানের পিক ফেলে বললেন দারোগা —‘এ তো ওদের ‘‘নিজি’’ মামলা । এক ভাই আরেক ভাইকে পিটিয়েছে । পুলিশে ‘‘রপট’’ লিখিয়েছে । এরপর দেখবেন একটু পরেই দুই ভাই গলা জড়াজড়ি করে কান্নাকাটি করবে । ‘‘মাফি’’ চাইবে । তারপর নালিশ তুলে নিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে বাড়ি চলে যাবে । বংশী আর বনোয়ারি— দুটোই সমান ‘‘নৌটঙ্কিবাজ’’!’

‘নিজি’ মামলা আর পারিবারিক ‘নৌটঙ্কি’র মধ্যে পুলিশ কেন মাথা ঘামাচ্ছে তা বুঝতে অবশ্য বাকি ছিল না । বংশীলাল চোরাই কয়লার দামের ‘হিস্যা’ দারোগা সাহেবকে দেয় । অতএব সেই কড়ক নোটের সুগন্ধ শালগ্রাম শিলাতেও প্রাণসঞ্চার করেছে । আমি একঝলক বনোয়ারিলালের দিকে দেখলাম । লোহার গরাদের পিছনে সে বিস্রস্ত, অবিন্যস্ত হয়ে বসে আছে । মুখ শুকিয়ে গিয়েছে । চুল উসকোখুসকো ।

গরাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি— ‘বংশীকে পেটালি কেন?’

সে বলল— ‘বংশী ভাবিকে পেটাচ্ছিল । তাই আমিও দিয়েছি কয়েক ঘা!’

এবার আর আকাশ নয়, গোটা ব্রহ্মাণ্ডটাই বুঝি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল মাথায়! এ কী কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে! যে নিজেই বউপেটানোয় ওস্তাদ, সে কি না বউদির গায়ে হাত তুলেছে বলে নিজের দাদাকেই পিটিয়েছে! এ চৈতন্য হল কবে ওর?

আমার হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে বনোয়ারি যেন অনুচ্চারিত প্রশ্নটা বুঝে নিল । আস্তে আস্তে বলল— ‘ভাবি আবার লড়কি পয়দা করেছে । তাই দাদা পেটাচ্ছিল! ম্যায়নে ভি দিয়া রখকে!’ সে ভাসাভাসা চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে—‘আপনিই তো বলেছিলেন মাস্টারজি, যে লড়কি লছমীজির অংশ হয়! সীতার জাত লড়কি! তবে সীতা-মাইয়ার অপমান কী করে হতে দিই?

এ কী! এ যে পুরো সীতাভক্ত হনুমান! এই ভাবান্তর হল কী করে? কবেই বা হল! বনোয়ারি ভিতরে ভিতরে এতটা পাল্টেছে, টেরই পাইনি! এ কী আদৌ সেই বনোয়ারিলাল...!

...সেদিন বনোয়ারি একটা আস্ত বাঁশ দিয়ে এলোপাথাড়ি পেটাচ্ছিল বউটাকে! অসহায় রামদুলারি মাটিতে পড়ে প্রাণপণ চেঁচাচ্ছিল আর কাঁদছিল! বংশী আর সুখিয়া নীরব দর্শক! দৃশ্যটা দেখে আর বৌদ্ধ ভিক্ষুর ইমেজ বজায় রাখতে পারলাম না । বাঁশটা ফের বিপজ্জনকভাবে তুলেছিল বনোয়ারি । আমি লাফ মেরে এগিয়ে গিয়ে খপ করে তার হাত চেপে ধরি ।

বনোয়ারি রক্তচক্ষু তুলে আমার দিকে তাকায় । একটু অনুতাপও নেই ওর মুখে । বরং পারলে যেন বাঁশটা রামদুলারির মাথায় না বসিয়ে আমার মাথাতেই বসায়! কিন্তু অত সহজ নয় । আমার হাত খেটে খাওয়া মজুরের না হলেও কলেজ লেভেলে চ্যাম্পিয়ান বক্সারের কড়া হাত । বনোয়ারি সেটা বুঝতে পেরেছিল ।

প্রথমে রাগ, পরে বিস্ময় ছাপ ফেলল ওর মুখে। রাগে গর গর করে বলল— 'কে আপনি? আমাদের ঘরের ব্যাপারে দখলদারি করছেন কেন?'

রামদুলারির দিকে তাকালাম। ওর চোখে জল। দু হাত জোড় করে অসহায় মিনতিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখেই বুঝলাম, মেয়েটি এই প্রথম মার খাচ্ছে না। আগের মারের দাগগুলো এখনও তার মুখ থেকে অবলুপ্ত হয়নি।

আমার মাথার ভেতরটা দপ করে জ্বলে উঠল। বললাম— 'লজ্জা করে না! নিজের বউকে এমন অমানুষের মতো পেটাচ্ছ! তোমাকে আমি পুলিশে দেব।'

'পুলিশ!' বনোয়ারি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে— 'কী অপরাধ করেছি আমি?'

'স্ত্রীকে পেটানো আইনত অপরাধ।' দাঁতে দাঁত পিষে বললাম— 'এই অপরাধে তোমার জেলযাত্রা কেউ আটকাতে পারবে না! এটা ভারতীয় কানুন।'

'ছ্যাঃ' বনোয়ারি হাতের বাঁশটা ফেলে দিয়ে বলল— 'আপনিও দেখছি আগের ''নাকচড়ি'' মাস্টারনিটার মতো কথা বলছেন! আমি পাপ করেছি? ওই শালিকে জিজ্ঞাসা করুন— ও কী করেছে? তিন বছর ধরে আমার ঘরে ''লড়কি'' পয়দা করছে!'

'লড়কি পয়দা করেছে তো কী? মেয়েরা মানুষ নয়?'

'ওসব আমি জানি না।' তেড়িয়া ভঙ্গিতে জানায় সে— 'জংলিবাবা বলেছে আমার ঘরে ''রামললা''র অবতার আসবে। রামললা জংলিবাবার স্বপ্নে দেখা দিয়ে জানিয়েছেন যে তিনি আমার ঘরে আসবেন! আমার কিসমত চমকাবে। তার জন্য ঘরে যা ছিল সব বেচেবুচে প্রতিবছর ছেলের জন্য যজ্ঞ করাচ্ছি জংলিবাবাকে দিয়ে! আর এই ''করমজলি'' খালি লড়কির পর লড়কিই পয়দা করেছে। এটা পাপ নয়?'

বলতে বলতেই সে ফের তেড়ে গেল মেয়েটির দিকে— 'শালি, মেরেই ফেলব আজ তোকে!'

রামদুলারি ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। আমার মাথাতেও খুন চেপে গেল! এতদিন ধরে কুসংস্কারের সঙ্গে লড়তে লড়তে আমারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। অন্ধত্বেরও একটা সীমা আছে। সপাটে এক ঘুঁষি বসিয়ে দিলাম ওর মুখে। বক্সারের ঘুঁষি! সামলাতে না পেরে পড়ে গেল বনোয়ারি!

'তোর জংলিবাবার এইসি কি তেইসি! যজ্ঞ করলে ঘরে রাম আসবে?' রাগে অন্ধ হয়ে হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে গিয়েছিল। কী বলছি, কী করছি খেয়াল ছিল না। আঙুল তুলে বললাম—'জীবনেও আসবে না! কারণ রাম নারায়ণের অংশ! আর নারায়ণ লক্ষ্মীকে ছাড়া কখনও একা আসেন না! লক্ষ্মীর অংশ হলেন রাধা, সীতা। মেয়ে নন ওঁরা? তোরা যখন রামনাম করিস, তখন কার নাম আগে বলিস? যখন ডাকাডাকি করিস তখন সীতা-রাম, রাধে-শাম বলিস, আর এটাও বুঝিস না রাম বলার আগে সীতার নাম আসে? শামের আগে রাধা? কাউকে আজ পর্যন্ত রাম-সীতা বলতে শুনেছিস, রাঘব-জানকী বলতে শুনেছিস? সবসময় সীতা রামের আগে থাকে, জানকী-রাঘব বলা হয়। শামের আগে রাধা, নারায়ণের আগে লক্ষ্মী! আর ''লড়কি'' লক্ষ্মীর অংশ হয় শুয়োরের বাচ্চা! যেখানে লক্ষ্মীর এমন হেলাফেলা, যেখানে সীতার জাতের ''মোল'', ''ইজ্জত'' নেই— সেখানে রাম কোনোদিন আসে না! আসবেও না! আর রইল তোর জংলিবাবা? তাকেও দেখে নেব আমি!'

কথাগুলো ছুড়ে দিয়েই হনহন করে চলে এসেছিলাম। এরকম নাটকীয় ভাষণ আগে কখনও দিইনি। রক্তারক্তি কাণ্ডও হয়ে যেতে পারত! কিন্তু আসার আগে দেখেছিলাম বনোয়ারি কেমন যেন হতবাক হয়ে বসে আছে। পালটা মার দেওয়া তো দূর, সে যেন একেবারে শক্তিহীন হয়ে মূঢ়ের মতো এলিয়ে পড়েছে উঠোনে!

এই ঘটনা রাষ্ট্র হতে বেশি সময় নেয়নি। দাবানলের মতো খবরটা ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। হেডমাস্টারমশাই এবং ডাক্তারবাবু আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। বললেন— 'সর্বনাশ! সত্যিই কি আপনি জংলিবাবার বিরুদ্ধে স্টেপ নেবেন?'

আমার গরম রক্ত তখন টগবগিয়ে ফুটছে—'নিশ্চয়ই । ওই ভণ্ডবাবাই হল সব নষ্টের গোড়া! ওকে তো আমি...' ।

হেডমাস্টারমশাই সভয়ে বললেন—'ওসব করার কথা মনেও আনবেন না । ওই জংলিবাবা ডেঞ্জারাস লোক । আপনার আগে যে দুজন টিচার এসেছিল, তারাও ওই লোকটার এগেনস্টে স্টেপ নিতে চেয়েছিল । অমনি গ্রামবাসীদের জংলিবাবা বোঝালেন যে ওরা নাকি শয়তানের দূত! ওদের পুড়িয়ে মারলে স্বর্গের দরজা খুলে যাবে । অনেক পুণ্য হবে । ব্যস, গ্রামবাসীরা একদিন রাতে এসে ওদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল!'

শুনতে শুনতে রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল । শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে বলি—'তারপর?'

ভদ্রলোক হাসলেন—'দুজনেরই বরাত ভালো ছিল । কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে বাড়ির বাইরে চলে আসতে পেরেছিলেন । তারপরই কালক্ষেপ না করে সিধা চম্পট! আপনাদের কলকাতা অফিস এই ঘটনা জানে । সেইজন্যই প্রথম দিন জানতে চাইছিলাম—কবে পালাচ্ছেন?'

এবার পুরো ছবিটা পরিষ্কার হল । সম্ভবত আমার অন্য কোলিগরা এই ঘটনা জানে বলেই কেউ আসতে রাজি হয়নি । যেহেতু আমি তখন নতুন জয়েন করেছি, কিছু জানতাম না, তাই বাড় খেয়ে শহিদ হওয়ার জন্য আমাকেই এখানে পাঠিয়েছে অফিস । আমি যোগ্যতর বলে নয়!

ডাক্তারবাবু জানান—'পৃথিবী উলটে যাক, কিন্তু জংলিবাবার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবেন না । একটু সাবধানেও থাকবেন । এ ব্যাটারা দল বেঁধে মারপিট করতে এক্সপার্ট ।'

আমি হেসে জানাই—'অত সহজ নয় । দল বেঁধে মারতে এলে আগে কয়েকটাকে মেরেই মরব । সে ক্ষমতা আছে' ।

ডাক্তারবাবু বিড়বিড় করেন— 'তবু হাতের কাছে একটা লাঠি রাখবেন । বলা যায় না...!'

ডাক্তারবাবুর সামনে ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দিলেও মনে কিন্তু একটা ভয় থেকেই গেল । এরপর সচরাচর রাতে বাইরে বেরোতাম না । একটা প্রমাণ সাইজের লাঠি ঘরে মজুত রাখলাম । রাত্রে ঘুম হত না! কী জানি! যদি বনোয়ারিলাল দলবল নিয়ে এসে হাজির হয়...! যদি জংলিবাবার নির্দেশে 'গৃহদাহ' কেস করে দেয়...!

বনোয়ারি অবশ্য এল । কিন্তু দলবল নিয়ে নয় । একদিন ভোররাতে দরজায় জোরালো নকের আওয়াজ শুনে লাফিয়ে উঠলাম । পোক্ত লাঠিটা বিছানার পাশেই ছিল । শক্ত করে চেপে ধরে বলি— 'কে?'

উলটো দিক থেকে ভেজা ভেজা গলার স্বর ভেসে এল—'মাস্টারজি, আমি বনোয়ারি!'

নামটা শুনেই আমার হাতের মুঠো আরও শক্ত করে লাঠিটাকে চেপে ধরল—'কী চাও'?

'থোড়া বাতচিৎ করতে চাই মাস্টারজি' ।

কথা বলার সুরটা অবশ্য যথেষ্টই নরম ছিল । তবু সন্দিগ্ধ স্বরে বলি—'বাতচিৎ করতে এসেছ, না দলবল নিয়ে মারপিট করতে?'

অন্যপ্রান্ত থেকে বনোয়ারির বিব্রত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'রামললা'-র কীরে বাবু । স্রেফ কয়েকটা কথা বলতে এসেছি । আমি একা । আর কেউ নেই!'

কথা শুনে মনে হল সত্যি কথাই বলছে । তবু সাবধানের মার নেই । একহাতে লাঠি বাগিয়ে ধরে অন্যহাতে হুড়কো খুলে দিলাম!

তারপর যা ঘটল, তা অবিশ্বাস্য! বনোয়ারি কথা নেই বার্তা নেই, হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠে আমার দু-পা জড়িয়ে ধরল! কান্নাবিকৃত স্বরে বলল—'আপনি ঠিকই বলেছিলেন হুজুর! আমি পাপী! না বুঝে অনেক পাপ করেছি । সিয়া-মা'র জাতকে দূরছাই করেছি! তাই রামলালা আমার কাছে আসছেন না! জংলিবাবাও বলল—আগে সিয়া, পরে রাম! সীতা না এলে রাম আসে না! যেখানে সীতা-মাইয়া নেই, সেখানে রামজি থাকবেন কী ভাবে?'

মনে হল বোধহয় সুকুমার রায়ের 'হযবরল' গল্পের মতো আমারও নাম কেউ 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' রেখে দিয়েছে, অথবা ও ফরাসি ভাষায় কথা বলছে! ঘটনা যে এমন ট্র্যাপিজের খেলের মতো ডিগবাজি খাবে স্বপ্নেও ভাবিনি । কোনমতে প্রাণপণে পা ছাড়িয়ে নিয়ে বলি—'আরে ঠিক আছে......ঠিক আছে ।'

'না মাস্টারজি!' সে নাছোড়বান্দা । ফের পা জড়িয়ে ধরেছে— 'ওই লাঠিটা আপনি আমার পিঠে ভাঙুন! আমি পাপী। মহাপাপী! আমি সীতা-মা কে অবহেলা করেছি । রামললাও তাই গুসসা করে আমার ঘরে আসছেন না! মারুন মাস্টারজি!'

শুরু হয়েছিল মারপিট দিয়ে । কিন্তু কিছুদিন গড়াতে না গড়াতেই বন্ধুত্ব জমে গেল । বনোয়ারিলাল নিয়ম করে বিকেলবেলায় নানারকম 'ভাজি-পুরী' নিয়ে এসে হাজির হত । অনেক বারণ করেছিলাম । ও শোনেনি । রোজ এসে ঘণ্টা- দেড় ঘণ্টা ধরে গল্প করত, সুখ-দুঃখের কথা বলত । ওর বৃদ্ধ-বাপ মা এখনও বেঁচে আছেন । কিন্তু বংশী বা বনোয়ারি, কেউই ওদের দেখে না । বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এই গ্রামেই ওর বোন আর বেহনোই-এর সঙ্গে থাকেন । বংশী আর বনোয়ারির একটাই দুঃখ । মা ষষ্ঠীর কৃপায় বংশীর চার সন্তান । আর বনোয়ারির তিন । কিন্তু কারোরই পুত্রসন্তান নেই । সবই কন্যাসন্তান ।

'মাস্টারজি, বেটা না থাকলে যে নরকেও ঠাঁই হবে না!' অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে জানিয়েছিল বনোয়ারি —'ছেলের হাতের জল না পেলে যে আত্মার শান্তিও হবে না! লড়কি তো সুখের পায়রা । আজ এখানে বকম বকম করছে, অন্য বাড়িতে দানাপানি পেলে সেখানেই উড়ে চলে যাবে । বুড়ো বয়েসে তবে দেখবে কে?'

ভয়ংকর হাসি পেল । কোনোমতে হাসি চেপে বললাম—'তাই? তা তোর বাপ-মায়ের তো দু-দুটো বেটা! বুড়ো বয়েসে ওদের কে দেখছে? বেটা না বেটি?'

বনোয়ারি একটু থমকাল । কী বুঝল কে জানে! কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে তারপর বলল—'কিন্তু বেটার হাতের জল না পেলে যে স্বর্গ নসিব হয় না! পরজন্মে মানবজন্মও মেলে না!'

মৃদু হেসে জানাই—'ভাই, আমি শুধু এইটুকু জানি যে এ জন্মে যদি বেঁচে থাকতে ভাত-জল, সন্তানের আদর-যত্ন না পাই, তো মরার পরে ওই মশা মারার ধূপ আর পিণ্ড দিয়ে আমার কাঁচকলা হবে! না খেতে পেয়েই যদি মরি, তবে যম শিং নিয়ে তাড়া করুক, কি মেনকা সামনে এসে ধেইধেই করে নৃত্যই করুক—কী আসে যায়! তোদের রামললাও তো শুধু বাপের এক কথায় বনবাসে চলে গিয়েছিলেন । বাপ-মাকে কতটা ভক্তি করলে এমন করা যায় ভাব তো!'

সে চুপ করে আমার কথা শুনছিল । বুঝলাম ওষুধ ধরছে! ওরা যে ভাষা, যে জাতীয় যুক্তি বোঝে— সেই যুক্তি দিয়েই গজচক্র করতে হবে ব্যাটাকে! বললাম — 'তাছাড়া রামললা আসবেই বা কেন? তোরা সব নিরক্ষর! রামজির বাপ-মা কত শিক্ষিত ছিলেন জানিস? ভগবান রামজি নিজেও কত শিক্ষিত ছিলেন । সব বিদ্যা জানতেন! তোদের ঘরে এলে তো বেচারিকে ক অক্ষর গোমাংস হয়েই থাকতে হবে! হয় কারোর খেতে কাজ করতে হবে, নয়তো কয়লাচুরি করতে পাঠাবি । কোনো দেব-দেবী এসব করে?'

বনোয়ারি কী বুঝল কে জানে! কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফের আস্তে আস্তে বলল — 'সও টাকা কি বাত, মাস্টারজি । কথা দিচ্ছি বেটা ঘরে এলে তাকে আমাদের মতো 'আনপড়, গওঁয়ার' বানাব না! আপনার সকুলেই পড়াব ছেলেকে! অনেকগুলো পাশ দেওয়াব...!'

এরপরও ও অনেকবার আমার কাছে এসেছে । দেখলাম, রামকে ছেড়ে ও এখন সীতাকে নিয়ে পড়েছে । সীতা-মাইয়াকে নিয়ে ওর অপরিসীম কৌতূহল । খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সীতার জন্মবৃত্তান্ত জানল । তারপর কী যেন ভেবে বলল—'আচ্ছা মাস্টারজি, সীতা মাইয়া তো তবে ধরতী মায়ের পুত্রী । মিট্টিতে জন্ম । তবে তিনি কোনো ঔরতের পেট থেকে আসবেন কী করে?'

ওর প্রশ্নটা শুনে চমৎকৃত হয়েছিলাম । একটা অশিক্ষিত, মজুর মানুষের মাথায়ও এমন প্রশ্ন আসে! সীতার জন্ম যে মনুষ্য-যোনি থেকে হয়নি, হতে পারে না, তা একদম ঠিকঠাক বুঝে গিয়েছে । আমি মৃদু হেসে বলি—'এটা কলিকাল বনোয়ারি । এখন আর সীতা মাটি ভেদ করে আসেন না! আগে যজ্ঞ করে রাজরাজড়ারা ছেলে-মেয়ে পেতেন । এখন হয়? তুইও তো তিন-তিনবার ঘর বাঁধা দিয়ে, রামদুলারির গয়না বেচে জংলিবাবাকে দিয়ে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করালি । হল?'

বনোয়ারি সেদিন অসন্তুষ্ট মুখে চলে গিয়েছিল । সম্ভবত উত্তরটা ওর পছন্দ হয়নি । কিন্তু পিতৃ-মাতৃভক্তির ওষুধটা সত্যিই ধরেছিল । একদিন খবর পেলাম বনোয়ারি বাপ-মাকে নিজের ঘরে এনে তুলেছে । তাদের জোরদার সেবাও করছে!

সেদিন ভেবেছিলাম পরিবর্তনটা সাময়িক । কিন্তু আজ বংশীলালকে মেরে বনোয়ারি প্রমাণ করে দিল—সত্যিই সে বদলে গিয়েছে!

তিন

'আপনি তো মিরাকল করে দিলেন মশাই!'

ডাক্তারবাবু প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে তাকালেন—'ওদের অস্ত্রে ওদেরই ঘায়েল করেছেন! রামদুলারিকে বনোয়ারি আর পেটায় না । বংশীও ভাইয়ের ভয়ে সুখিয়ার গায়ে হাতটুকুও তোলে না! অতবড় একটা ট্র্যাজিক ঘটনা হয়ে যাওয়ার পরও সুখিয়াকে বেশি দোষারোপও করেনি! করলেন কীভাবে!'

ঘটনাটা সত্যিই ট্র্যাজিক! বংশীলালের সদ্যোজাত শিশুকন্যাটি দেখতে বড় চমৎকার হয়েছিল । ওদের ঘরে অমন সুন্দর রাজকন্যার মতো মেয়ে জন্মায় না! বংশী আর বনোয়ারির ঝামেলা চুকেবুকে গিয়েছিল সেদিনই । বনোয়ারি ছাড়া পেয়েই আমাকে ওর নতুন ভাইঝির 'মুখ-দিখাই' এর জন্য 'নেওতা' দিয়ে বসল । প্রথামাফিক দেখতেও গিয়েছিলাম । একজোড়া ছোট ছোট রুপোর বালা দিয়ে শিশুটিকে দেখেওছিলাম । ভারী মায়াবী । সবচেয়ে মায়াবী তার হাসি! বংশী গর্বিত কাকার মতো বলেছিল—'এই হল আমাদের সীতা মাইয়া—নয়, মাস্টারজি?'

আমি হেসে মাথা নেড়েছিলাম । বনোয়ারি তার সুন্দরী ভাইঝির গর্বে একেবারে কয়েক ইঞ্চি বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল! এমনকী কাজ থেকেও তাড়াতাড়ি ফিরত শিশুকন্যাটির জন্য । সবসময়ই হয় তাকে কোলে নিয়ে আদর করছে, নয়তো খেলছে!

কিন্তু একদিন ও বাড়িতে ফের কান্নার রোল উঠল! তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দেখি, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে! বনোয়ারির অমন সুন্দরী শিশু সীতামাইয়াকে ভামে কিংবা শেয়ালে টেনে নিয়ে গিয়েছে । এ ঘটনা অবশ্য নতুন নয়! ওদের চিরকালীন অভ্যাস গরমকালে বাড়ির বাইরে দাওয়ায় শোওয়া! এর আগেও বহু নবজাতক ভাম বা শিয়ালের হিংস্র লোলুপ দাঁতের শিকার হয়েছে । হতভাগিনী ক্লান্ত মা শিশুকন্যাকে কোলের কাছে রেখে নিশ্ছিদ্র ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল । কখন যে তার সন্তানকে বুক থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছে সুযোগসন্ধানী জানোয়ারগুলো, টেরই পায়নি ।

ওদের বাড়ি গিয়ে দেখি সে এক সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড! বংশী সুখিয়াকে যা নয় তাই বলে দোষারোপ করছে । তার অবস্থা দেখে মনে হয় শোকের চেয়েও রাগ বেশি! তেলে পড়বে কি জলে পড়বে বুঝতে পারছে না!

আমি পৌঁছতেই গালিগালাজগুলোকে গিলে নিল বংশী । সুখিয়া বেচারি শুধু কেঁদেই চলেছে । ওর অবস্থা দেখে রাগ হল । বললাম— 'ওর কী দোষ? তুমিও তো বাপু পাশে ছিলে! তুমি টের পেয়েছ? না, মেয়ের দায়িত্ব একা মায়েরই?'

চুপ করে ভর্ৎসনাটা হজম করল ও । মাথা হেঁট করে আমার কথাই মেনে নিল । জোরালো গলায় বললাম—'খালি কান্নাকাটি-গালিগালাজ করলেই চলবে? মেয়েটার খোঁজ করবে না? হয়তো এখনও জন্তুটা বেশি দূর যেতে পারেনি । হয়তো এখনও আশা আছে...!'

আশা ছিল না! অনেক খোঁজাখুঁজির পর শুধু মেয়েটির পরনের ছোট্ট জামাটা মিলল । তা ও ছেঁড়াখোঁড়া! সুখিয়া তিনদিন শুধু বুক ভাসিয়ে কাঁদল । বনোয়ারি গুম হয়ে বসে রইল । বংশী কয়েকদিন কাজে গেল না । আসন্নপ্রসবা রামদুলারি ভারী শরীরটা নিয়ে শুকনো মুখে গোটা ঘটনার নীরব সাক্ষী হয়ে রইল । তার অনাগত সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় হয়তো কাঁদতেও পারল না!

তারপর আবার সব স্বাভাবিক! গরিবের ঘরে শোক বেশিদিন থাকে না । বিশেষ করে যখন একটির মৃত্যুর শোক ভোলাবার জন্য ঘরে আরও তিনটি মজুত রয়েছে তখন দুঃখের ঠাঁই বেশিক্ষণ হয় না । সুখিয়া চোখের জল মুছে কাজে লাগল । বংশীও ফের কয়লাচুরির কাজে নেমে পড়ল । ধাক্কাটা শুধু সামলাতে পারেনি বনোয়ারি । তার হাবভাব এরপর থেকেই কেমন অস্বাভাবিক হয়ে গেল! বেশি কথা বলে না । চুপচাপ বসে থাকে । সারাদিন ধরে কী যে ভাবে ভগবানই জানে! জিজ্ঞাসা করলে শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে!

'যে ভাবে এগোচ্ছেন, তাতে আপনার স্কুল হয়তো শীগগিরই ছাত্র-ছাত্রীতে ভরে উঠবে' । ডাক্তারবাবু বললেন—'আপনাকে ওরা সবাই খুব মান্য করে । পারলে আপনিই পারবেন । অন্তত একটা লোককে তো কুসংস্কারের কবল থেকে টেনে বের করেছেন! আজ একজন বেরিয়েছে, কাল আরও দুজন বেরোবে । এইভাবেই তো হয়...!'

বুকের কয়েক ইঞ্চি ফুলে উঠল । অনেক সময় মানুষের ধারণা হয়, সে আসলে সাধারণ মানুষ নয়—যুগন্ধর! আমারও হঠাৎ তাই মনে হয়েছিল । মনে হয়েছিল, এটা আসলে নিয়তি! আমি ওদের অন্ধত্ব দূরীকরণের জন্যই আসলে এসেছি! রামমোহন, বিদ্যাসাগর না হলেও আমি ছোটখাটো এক সমাজ সংস্কারক!

আত্মশ্লাঘা কখনওই স্বাস্থ্যকর জিনিস নয় । কিন্তু তা সত্বেও একটু গর্বিত বোধ না করে পারলাম না । অন্তত বনোয়ারিকে তো আলোয় টেনে আনতে পেরেছি । যদিও পুরোপুরি নয় । কারণ তিনবারের পরও তার শিক্ষা হয়নি । রামদুলারির এখন-তখন অবস্থা । যে-কোনো সময়ই চলে আসতে পারে নবজাতক । এই পরিস্থিতিতে সে আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে জংলিবাবাকে দিয়ে ফের যজ্ঞ করাচ্ছে! আমি আপত্তি করেছিলাম । সে শোনেনি । বলেছে— 'এইবার শেষ! এবার রামললা আসবেই!'

'যদি না আসে?'

সে একটু চুপ করে থেকে বলল—'তবে আর কোশিশই করব না!'

আমি চুপ করে ওদের ঝুপড়ির দিকেই তাকিয়েছিলাম! কালো ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশের দিকে উড়ছে! ওই জংলীবাবা কীসব পোড়াচ্ছে কে জানে! যত্তসব ভড়ং! যজ্ঞ, তুকতাকের নামে কত লোকের শেষ সম্বলটুকুও গিলেছে শয়তানটা! আমার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে । ওটাকেও দেখে নেব একদিন । যেদিন আমার সময় আসবে, সেদিন...!

আর কিছু ভাবার আগেই আচমকা মনে হল মাথাটা ঘুরছে! এ কী! ... চতুর্দিকটা এভাবে পাক খাচ্ছে কেন? টের পেলাম পায়ের নীচে মাটিটাও আন্দোলন শুরু করেছে! যেন রামদুলারির মতোই প্রসব বেদনা উঠেছে তারও! ... চোখের সামনে দেখতে পেলাম গাছগুলো কাঁপছে ... কেউ যেন ধরে ঝাঁকাচ্ছে ... ঝুপঝাপ করে ঝুপড়িগুলো খসে পড়ছে! ... কী সর্বনাশ! ভূমিকম্প!

পড়িমরি করে দৌড়লাম শ্রমিকদের ঝুপড়ি লক্ষ্য করে । পায়ের নীচে মাটি কাঁপছে... মনে হচ্ছে টাল খেয়ে পড়ে যাব ... তবু দৌড়লাম ... ওদের এখনই সাবধান করে দিতে হবে ... বাইরে বেরিয়ে আসতে বলতে হবে! আর রামদুলারি! তার কী অবস্থা কে জানে ...! ঝুপড়ির নীচে চাপা পড়েনি তো...!

টলতে টলতে কোনো মতে হাজির হয়েছি বনোয়ারিদের বাড়ির সামনে! বংশী আর সুখিয়া ততক্ষণে কোনোমতে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এসেছে যন্ত্রণাকাতর রামদুলারিকে । মেয়েরা মিলে কোনোমতে

পরনের শাড়ি, গামছা দিয়ে আড়াল করেছে তাকে । ধাই-মা উপস্থিত! যজ্ঞ লন্ডভন্ড! ঝুপড়িগুলো মৃত সৈনিকের মতো মাটিতে এলিয়ে পড়েছে!...

'আ গয়ি! আ গ ... য়ি!'

এই অবস্থায় একটা উচ্ছ্বসিত, আনন্দ-উদ্বেলিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠি! কী আশ্চর্য! বনোয়ারিলাল অমন উন্মত্তের মতো দু-হাত তুলে নাচছে কেন? ও কি পাগল হয়ে গেল! শোকে দুঃখে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে?

'সীতামাইয়া আ গয়ি মাস্টারজি!' সে আমাকে আনন্দের চোটে জড়িয়ে ধরেছে—'কলিকালেও সীতা মাইয়া মাটির বুক চিরে প্রকট হয়েছেন! ওই দেখুন!'

তার অঙ্গুলিনির্দেশ লক্ষ করে যা দেখলাম তাতে মনে হল আদৌ ভূমিকম্পটা মাটিতে হচ্ছে না! আমার শরীরে হচ্ছে! প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম ... মনে হল, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না ... শুনতে পাচ্ছি না ... ! ... বংশী আর সুখিয়া স্তম্ভিত, বিহ্বলের মতো সেদিকেই দেখছে ... আর আমি ...!

ভূমিকম্পের তীব্রতায় উঠোনের মাটি কোথাও ধসে পড়েছে! কোথাও লম্বালম্বি বিরাট চিড় ধরেছে । সেই চিড়ের ফাঁক দিয়েই উদ্ধত প্রশ্নের মতো একটা শিশুহাতের কঙ্কাল উঁকি মারছে! হাতে এখনও আমার দেওয়া রুপোর বালা! শিশুহাতটার তর্জনি নিবদ্ধ বনোয়ারিলালের দিকেই! কী যেন ইঙ্গিত করছে...! তার মানে ... ওকে কোনো ভাম বা শেয়াল নেয়নি ...!

আমি কোনোমতে বললাম—'বনোয়ারি! এ—কী!'

বনোয়ারি নাচতে নাচতেই বলল—'সিয়া মা! ধরতি ফুঁড়ে উঠে এসেছে! আমি জানতাম! আমি জানতাম কলিকাল হলেও আমার সিয়া মা পুনর্জন্ম নিয়ে ধরতীর বুক থেকে ঠিক আসবেনই! এবার তো রামলালা আমার ঘরে আসবেই! সবাই জয়-জয়কার করো । শাঁখ বাজাও! সীতা মাইয়া এসেছেন! রামও আসছেন! জয় সিয়ারাম, জয় জানকি রাঘব, জয় সিয়ারাম...!'

হে রা—ম!

লাল জোছনা

কাবেরী রায়চৌধুরী



—তাহলে কী ভাবতেছ?

—কী, আবার? এক সঙ্গে থাকবার ছাড়া আর কী? তুমি আর আমি। আমি আর তুমি! এতবড় একটা ঢাকা শহরে আমাদের দুইজনারই তো কেউ নাই! কাম শ্যাষ হইলে দুইজনাই একলা!'

আয়েশার হাতের ওপর আলতো চাপ দিল শেখ মিরাজ। সি.এন.জি অটো চালানো কড়াপড়া হাতের শক্ত আঙুল দিয়ে আয়েশার সেলাই মেশিন চালানো কড়া হাতের তালুতে হাত বোলাচ্ছে।

—সাঁতার দিতে মন চায়!

সম্মুখে বয়ে যাওয়া কালিগঙ্গা নদীর দিকে তাকিয়ে আবেগ ডুবিয়ে কথাটা বলল আয়েশা! 'কাম আর কাম! দ্যাশে থাকতে রোজ সাঁতার দিতাম। কাল থেক্যে আবার ওবার টাইম! দুই শিপটে কাম হইব। তোমার সঙ্গে দেখা করবার সময় পাইব না।'

—তা বইল্যেই হবে? আমি আসব তোমার ফ্যাকটরির সামনে। টিফিন টাইমে আমি আসব বাসায় যাইবার আগে। তোমার মুখখানা দেখে বাসায় গিয়া পচা পান্তা সোনা মুখ করে খাইব এখন।

এই ভরা বর্ষায় কালিগঙ্গার বুকে ছলকে ছলকে উঠছে ঢেউ! আয়েশার আবেগও! মায়া লাগে মিরাজের কথা শুনে। মায়ায় পড়ে গেছে মানুষটার। খাওয়ার কষ্ট। হাত পুড়িয়ে রাঁধতে হয়। একদিন সেই রান্না খাইয়েছিল মিরাজ! 'মা—গো—মা! সে অখাদ্য মুখে দেওয়া যায় না! বউ থাকতে বউ নাই! সে নাকি ঢাকা শহরে আসতে চায় না! শহরে নাকি তার দম বন্ধ হয়ে যায়। সে গ্রামে থাকতেই পছন্দ করে!'

তেতো আর খুব নুনে পোড়া তরকারির আস্বাদ নিতে নিতে তার মুখ যখন বিকৃত হয়ে গেছিল তখন তার গালে আঙুল দিয়ে টোকা মেরে মিরাজ বলেছিল, 'আমার বউ হবে?'

বউ! তোমার তো দ্যাশে সুন্দরী বউ আছে মিঞা! কয়ডা করবা?

আচমকাই তাকে চমকে দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছিল মিরাজ। আরেব্বাস! কী লোহার মতো শক্ত হাত আর পেশি। রোগা কাঠির মতো লোক হলে কী হবে গায়ের জোর যে কী ভীষণ তা টের পেয়েছিল সেইদিনই।

জাপটে ধরে বলেছিল, এইবার বুঝো কয়ডা করতে পারি! সন্দেহ আছে কিছু?

শরীর কাঁপতে কাঁপতে দুর্বল হয়ে গেছে তখন তার। যেন একটা পাখির পালকের আঘাতেই মৃত্যু হবে!

কেমন ভেঙে পড়া গলায় বলেছিল, ছাড়ো মিঞা। ছাড়ো, ছাড়ো, আহ! ছাড়ো।

—ক্যান ছাড়ব? ধরসি এমনি এমনি?

সে তখন গলে যাচ্ছে। আনিসুজ্জমানের চেহারাটা কতদিন পরে মনে পড়ল! ঢাকা শহরে প্রথম আসার পর যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ নিয়েছিল সে সেখানেই আনিসুজ্জমান 'আয়রন ম্যান' ছিল। তৈরি হওয়া পোশাক ইস্তিরি করার কাম করত! আর সে মাপ দেওয়া কাপড় কাটত। আলাপ হল। প্রেম হল। গর্ভবতীও হল খুব দ্রুত। গর্ভপাতও হল আনিসুজ্জমান বেঁকে বসায়।

মনে পড়ছে। মনে পড়ছিল সেইদিনের সবকিছু আবার। প্রেমের কথাগুলো সব কেমন একরকম। এক ভাষা বলে পুরুষ ও নারী।

আনিসুজ্জমানকে যখন সে জানাল গর্ভের কথা, সে আশ্চর্য হয়ে বলল, ও বাচ্চচা আমার তা কে কইল? তুই বেটি লুচ্চিচ মাইয়া মানুষ, কই কই যাস তা আমি কী জানি?

হতবাক সে। কাটা জিওল মাছের মতো শরীর কাঁপছে তার। গলা দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছে না। সমস্ত কথাগুলো গলার কাছে দলা বেঁধে ইট হয়ে গেছে।

আনিসুজ্জমান বলে চলল, এক মাস আলাপ—পরিচয় হইতে না হইতে যে মাগি পেরায় অচেনা পুরুষের সঙ্গে শুইতে পারে তার চরিত্তির তখন বুঝছি। আর আমার বাসায় বউ আছে, বাচ্চচা আছে। আমি ক্যামনে বিয়া করব? তাছাড়া কার কার সঙ্গে কই কই শুইছিস বিলাই কুত্তার মতো তার খবর কে জানে? ও বাচ্চচা আমার নয়। তুমি পথ দেখো।'

প্রায় বেহুঁশ শরীরটাকে টানতে টানতে, তার ভার বইতে বইতে কীভাবে যে ছোট্ট ঘুপচি বাসায় ফিরে এসেছিল সে সেইদিন!

পাশের ঘরের হিন্দু বউটাকে নিয়ে পরদিন গর্ভপাত করে এসেছিল সে।

ভালোবাসার প্রথম আঘাত যে বড় যন্ত্রণার! তাই মাস পুরতে বেতন নিয়ে চলে এসেছিল সে কাজ ছেড়ে। আর ওই ফ্যাক্টরিমুখো হয়নি।

যাতায়াতের পথে গোল্ডেন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি চোখে পড়ে এখনও। ক্ষণিকের জন্য মন কেমন করে ওঠে! ব্যস, ওইটুকুই স্মৃতি। কখনও কখনও রাত বেরাতে হিসাব করে বাচ্চচাটা থাকলে কত বড় হত। তিন বছর! তিন বছরের বাচ্চচা! ছেলে না মেয়ে কী জানি? পায়ে পায়ে হাঁটত। কেউ একটা খুব নিজের হত! মন আবার কেমন যেন করে!

কিন্তু মন খারাপ করার আর সময় কোথায়? ঢাকা শহরে মন খারাপ করে ঘরে শুয়ে থাকার সময় বড়জোর চব্বিশ ঘণ্টা। প্রতিদিন বেঁচে থাকার যুদ্ধ।

মিরাজের আলিঙ্গন তিনটে বছর পর আনিসুজ্জমানকে মনে পড়িয়ে দিয়েছিল আবার! সেই শক্ত আষ্টেপৃষ্টে আলিঙ্গন।

—কী ভাবতেছ?

—কিছু না।

—তুমি কিন্তু এখনও আমার হইলে না! আইজ বাসায় যাইবা?

চলো না? শুধু রাস্তায় রাস্তায় নদীর ঘাটে ঘুরে বেড়াইতে ভালো লাগে? মিরাজের হাত তার কোমর ছুঁয়েছে এখন।

—না, বাসায় গিয়া কী হইব? বন্ধ ঘর। আলো—বাতাস ঢোকে না! কী করব বাসায় গিয়া?

—আমাকে কোলোজ করে পাইতে ইচ্ছা হয় না তোর? কী রে সোহাগি?

হেসে ফেলল আয়েশা। বলল, 'সোহাগি!' সেডা আবার কেডা হইল?

আশপাশ দেখে নিয়ে জাপটে ধরে এবার খান দুয়েক চুমু খেয়ে ফেলল মিরাজ তাকে। আদর ঘন গলায় বলল, তুই, তুই আমার সোহাগি। তুই এখনও দুই মাস হইয়া গেল বুঝস নাই আমারে।

তোর জন্য কী না করতে পারি আমি! বিয়া করি চল। দুই জনাই কামাই করি। আমি বাসা ভাড়া দিব। আর তুই বাজার খরচ। আর তোর লিপিস্টিক শাড়ি আমি দিব। কি? রাজি?

—আমার একখান বাচ্চচার সাধ বড়।

—তা তো হইবই। তবে আমরা এখন বাচ্চচা নিমু না। অনেক খরচা। যে বাবুটা আসবে তারে যদি বেবি ফুড, মাছটা—ডিমটা খাওয়াইতেই না পারি তাইলে বড় দুঃখ।

—তোমার তো বউ আছে। দুইডা বাচ্চচা। তোমার আর কী? দীর্ঘ নিঃশ্বাস পতন হল আয়েশার বুক ভেঙে।

মেঘ কালো আকাশ। কালিগঙ্গার আকাশ, জল আরও ঘন।

আরও কালো।

লোকজন বিশেষ নেই। কিছু নৌকা আর ছোট লঞ্চ, ভুটভুটি যাতায়াত করছে শুধু।

—নৌকা চড়বি? চল, কিছুটা দূর পর্যন্ত ঘুরন দিয়া আসি।

—না। কেমন যেন জেদ পেয়ে বসল। মাথা নাড়ল আয়েশা, না, চলো যে—যার বাসায় যাই গিয়া। কাইল থেকে আবার কোরবানি পর্যন্ত দুই শিপটে কাম!

—আমার বাসাটা কি আমাদের বাসা হইতে পারে না? তোমায় তো কত আলফাল লোক ডিস্টাব দেয়। ঢাকা শহরে একলা মাইয়া মানুষের জন্য নিরাপদ নয় গো দোস্ত। চলো একসঙ্গে থাকি দুই জনা। তোমার হাতে রান্না খাইয়া সকাল বেলায় গাড়ি ইস্ট্যাট দেবনে। আর রাতে দুই জনা দুই জনারে জড়াইয়া ঘুম দিব। আহ! শান্তি!

লোভ হয়। বড় লোভ হচ্ছে আয়েশার। বড় একলা লাগে! দিনভর কাম কাজ করার পর একলা বাসায় ফিরে এসে কথা বলার একটা লোক নেই পর্যন্ত।

আগে তার শরীর বোধও ছিল না। আনিসুজ্জমান তাকে তার নিজস্ব শরীরের খিদে তেষ্টা চিনিয়েছে প্রথম। এখন সেই নিজের শরীরটাও বিশ্বাসঘাতকতা করে তার সঙ্গে।

ঘাড় নাড়ল আয়েশা। বলল, বিয়া করব।

—বিয়া নয়। আমারে আরেকটু চিনো বউ। আরেকটু বুঝো। তারপর। আমি মানুষটা তো খারাপও হইতে পারি?

সেই দিন জোছনা হঠাৎই লাল হয়ে গেল মধ্যরাতের পর!

আঁশটে দুর্গন্ধময় খালের কালো জল যেটা এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে চাঁদ দেখছিল, জোছনা মাখছিল শরীরে। সেই জলের রং লাল হয়ে গেল হঠাৎই!

চপার দিয়ে আয়েশার ক্ষত—বিক্ষত ধপধপে শরীরটা কালো পাঁক গোলা জলের মধ্যে আধ ডোবা পড়ে আছে, সেই রাতের আকাশ বাতাস জোছনা দেখল চেয়ে চেয়ে।

ফ্যালফ্যাল করে টেবিলে রাখা উদ্ধার হওয়া চপারটা দেখছে শেখ মিরাজ।

চপারটা তো নোংরা পচা গলা খলের জলে ফেলে দিয়েছিল সে আয়েশার সঙ্গে!

—আর পারতেছিলাম না স্যর! বড্ড বাড়াবাড়ি করতেছিল। বিয়া করো বিয়া করো বইল্যা মাথার পোকা বার কইরা দিচ্ছিল।

—তাই? তা বিয়া করতে অসুবিধা কী ছিল? দুইডা বউ হইত। 'মন্দ কী?' হাসছেন অফিসার নুরুল ইসলাম।

—আমার বউ অনেক সুন্দরী স্যর। আর সে আমার ছাড়া কিস্যু বুঝে না স্যর। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কায়েম করে। আমার দুইডা বাচ্চচা, বুড়া মা—বাপ ঘরসংসার সামলায়। সে যদি জানতে পারে আমি বিয়া করছি তা হইলে বিষ খাইবে স্যর।

—বাব্বা! ধর্মের কথা শোনাইলি যে বাবা!

—স্যর, ফতেমাকে আমি কষ্ট দিতে পারুম না। হেইডা তো চুক্তির থাকা। দুইজনাই একলা। আমার বাসা ভাড়া, ওর বাজার খরচ, রান্না। বিনিময়ে দুই জনাই একটু ফুর্তিফার্তা কইরে থাকা। কিন্তু ও যে এমনভাবে সিরিয়াস হইয়া যাইবে এমনডা ভাবতে পারি নাই। মার দিছি কত। তাইতে বেটির আরও পেরেম!

—রান্না করিস নাই?
—না।
—ক্যান?
—এমনি, শরীল ভালো নাই।
—কী হইসে?
—দুই মাস হয় নাই।
—তাতে চিন্তার কী আছে? কাল আমার সঙ্গে যাবি হাসপাতালে। খালাস হইয়া আসবি।
—ক্যান? আমি তো তোমারে বুইঝ্যা লইসি। আমাদের দুইজনার দুই জনারে বুঝবার কথা হইছিল।
—তা হইছিল?
—আমি তোমারে ছাইড়া কারুর সঙ্গে আর বিয়া বসাইতে পারুম না জানো! আমি এক্কেবারে তোমার হইয়া গেছি!
—আমার বউ মানব না।
—বউ! বউ আর বউ। আমি বুঝি তোমার কেউ না? এই যে ঘরসংসার রান্নাবান্না করতেছি তোমার—! এই যে যত্ন আত্তি...। সেগুলো কিস্যু না?
তোমার শরীলটার ক্ষুধা মিটাইছি রাতভর—! আমি তোমার বউ নই এখনও?
—আমার বউ বিষ খাইব জানতে পারলে। ও খুব ভালো। বোরকা পইরা চক্ষু দুটি শুধু বাইর কইরা রাখে সে। অনেক সুন্দর। অনেক ভালো সে। তোর মতো খানকিবিত্তি করে না। বুঝলি মাগি? তুই বাইর হ এখনই। আমার বাসা থেকে বাইর হ।
—ক্যান যামু? আমারও অনেক খরচ হইছে। কুত্তারবাচ্চচা! তুই তো আমার পয়সাও চুইস্যা খাইছস। আমার টাকাপয়সা...ফিরত দে। যামু গিয়া। বউ দেখাইতেছে! নে! দেখ গা বোরকার তলে তলে কী করতেছে তোর বউ!
—তবে রে মাগি! গলা টিপে ধরেছে, মিরাজ আয়েশার! আর তারপরই হাতের পাশে থাকা চপারের কোপ নেমে এল আয়েশার গলায়, মুখে।

থমথমে রাত। শেখ কামাল নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ফতেমা বিবির ঘর থেকে। চাটাই দেওয়া জানলায় চোখ রেখে তাকিয়ে আছে ফতেমা। অস্পষ্ট উচ্চচারণ করল, খোদা হাফিজ।

মধ্যপিরের বাগের দুর্গন্ধময় খালের জলে ছুড়ে ফেলে দিল আয়েশার দেহ মিরাজ। বলল, আল্লা হাফিজ রাতটুকু সময়। ভোর না হতেই গুছিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে।

—পাপ বাপকেও ছাড়ে না জানিস তো? বোকা! দিব্যি দুইডা বউ নিয়া সংসার করতে পারতিস! এখন জেলের ভাত খা।' অফিসার নুরুল ইসলাম মুচকি হাসলেন।

দুই পৃথিবী

বিনোদ ঘোষাল



তুমি একজন উন্মাদ। তোমার সঙ্গে কথা বলে কোনো লাভ নেই। একটু আগে অর্চি আমাকে এই কথাগুলো বলে গেল। বলার সময় ও অনেক বড় করে হাঁ করছিল। ওর অন্ধকার মুখের ভেতর দিয়ে খসখসে জিভ আর আলজিভটা থিরথির করে নড়তে দেখছিলাম আমি। একটা অদ্ভুত দৃশ্যকল্প। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি ভুলে গেছিলাম অর্চি আসলে কী বিষয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছে। ওর চিৎকারগুলো বহু দূর থেকে হাওয়াতে ভাসতে ভাসতে এসে পৌঁছতে শুরু করছিল আমার কাছে। টুকরো টুকরো ভাঙা কথা। তার মধ্যে 'মাকে খুন...মাকে খুন', শব্দ দুটো বেশ কয়েকবার ছিল। আমি আন্দাজ করছিলাম অর্চি আবার ওর মায়ের মৃত্যু সম্পর্কে কিছু একটা বলছে। বুলার মৃত্যু আমার কাছেও খুব বেদনার তা কি অর্চি জানে? এমনকী আমার নিজের মৃত্যুও যথেষ্ট যন্ত্রণার, তা-ও জানে না কেউ।

আজ আমি মরে যাব। কারণ? মরে যাওয়ার জন্য কোনো যথেষ্ট কারণ লাগে বলে আমি মনে করি না। আমার আজকের পর থেকে আর কোনো কাজ নেই, সুতরাং আমি মরে যেতেই পারি। আর একমাত্র মৃত মানুষদের হাতেই কোনো কাজ থাকে না।

অর্চি আমার ছেলে। উনিশ বছর বয়স হয়ে গেল ওর। আমার সঙ্গেই থাকে। কেন থাকে কে জানে? হয়তো চাকরি কিংবা বিয়ে কিছু একটা করার পরদিন থেকে আর থাকবে না। থাকা সম্ভবও না। এই দুটো ঘরের মধ্যে এত বছর ধরে এত মানুষ এসে দিনের পর দিন থাকে যে, যে-কারওরই মেনে নেওয়া কঠিন। আমি নিজেই হাঁফিয়ে উঠি একেক সময়। ঘরে হাঁটাচলা করতে গিয়ে ধাক্কা লাগে পরস্পরের সঙ্গে। আমি নিজের চোখে দেখি সেসব দৃশ্য। বুলা বিরক্ত হত খুব। একসময় বিরক্তিটা মাত্রা ছাড়াতে শুরু করল। তারপর একদিন অরণ্য নিজে হাতে বালিশ চাপা দিয়ে খুন করল বুলাকে। আমি নিজে চোখে দেখলাম বুলা ঘুমোচ্ছিল সেইরাত্রে বিছানায়। আমি টেবিলে বসেছিলাম। অরণ্য বেরিয়ে এসে বালিশ নিয়ে বুলার মুখে চেপে ধরল। বুলা দু-হাত ছড়িয়ে তীব্র ছটফট করছিল, হাত বাড়িয়ে বোধহয় আমাকে খুঁজছিল বাঁচার জন্য। কিন্তু ওকে বাঁচাতে যেতে পারিনি। কারণ আমি তখন চেয়ারে বসেছিলাম। কিন্তু সত্যি আমার সেদিন বড় কষ্ট হচ্ছিল। আমি বারবার নিজের চোখের জল মুছছিলাম। কিন্তু অরণ্যর হাত থেকে বুলাকে বাঁচাতে পারিনি, কারণ আমি তো চেয়ারে বসেছিলাম। আমার প্রিয় টেবিলের সামনে রাখা চেয়ারটায়।

আমার চোখের সামনে বুলা চলে গেল। তবে খুব বেশি কষ্ট পায়নি। মিনিট খানেক। বড় ভালো ছিল বুলা। আমাকে ভালোবাসত খুব একসময়। সেই বিয়ের কত আগে থেকে। কিন্তু অরণ্য ওকে একটুও সহ্য করতে পারত না। মেরেই ফেলল। আমার চোখের সামনে। খুন করে আবার ঢুকে গেল।

আমার মনে আছে পরের দিন পুলিশ এসে শুধু আমাকে জেরা করছিল। অরণ্যকে কেউ খোঁজেনি। আমার আশ্চর্য লাগছিল। অ্যারেস্ট হওয়া উচিত ছিল অরণ্যর। হলাম আমি। যখন থানায় যাচ্ছি আমি পিছন ফিরে দেখি আমার টেবিলের এককোণে দাঁড়িয়ে অরণ্য মিটিমিটি হাসছে। বুলাকে খুন করে একটুও লজ্জা নেই ওর।

অবশ্য আমি ছাড়া পেয়ে গেলাম। বেকসুর। বুলা নাকি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরেনি। হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছিল। হাই প্রেশার ছিল বুলার। বছর খানেক আগে একটা সিভিয়র অ্যাটাকও হয়েছিল। আমার খুব অবাক লেগেছিল পুলিশ খবর পেল কী করে? পরে বুঝেছি, পুলিশে খবর দিয়েছিল অর্চি। আমার একমাত্র ছেলে অর্চিস্মান। নিজে ছেলে হয়ে বাপকে খুনের আসামি কেন ভেবে বসল কে জানে! ভেবেছিল ওর মা, মানে বুলাকে, আমি খুন করেছি। কেন করব আমি? কারণ কী?

যাই হোক। বুলা চলে যাওয়ার পর আমি ভেবেছিলাম অর্চিও চলে যাবে বাড়ি ছেড়ে। গেল না। গেলে ভালোই হত। দুটো মাত্র ঘর। এতগুলো লোক-বাচ্চাকাচ্চা এই দুটো ঘরে কখনও আঁটে? আর মানুষগুলো তো কেউ ঘর ছেড়ে যায় না কোথাও। সামনের দোকানটাতেও যায় না, আমি না বললে, খুব বাধ্য। যখন বলি কথা বলতে, বলে। যখন বলি হাঁটতে, হাঁটে। আদর করতে নির্দেশ দিলে আদর করে। আর যদি বলি কাউকে...।

এই তো অরণ্য, বিদিশা, তপন, পুষ্পল, নীল, স্বর্ণালি, মিঃ সেন, দাশবাবু, নীহারুল, বিক্রম এ ছাড়া আরও বেশ কয়েকজন প্রায় আড়াই বছর ধরে আমার বাড়িতে রয়েছে। এর মধ্যে অবশ্য অরণ্য, বিদিশা, নীল আর স্বর্ণালীর সঙ্গেই আমার কথা হয় বেশি। বাকিদের সঙ্গে অনেক কম। কয়েকজনকে তো ভুলেই গেছিলাম আমি। তবু ওরা সবাই মিলে এই দুটো ঘরেই থাকত। ওরা যে আসবে এবং থাকবে অনেকদিন সে কথা কিন্তু আমি আগেই বুলা আর অর্চিকে জানিয়েছিলাম। শুনে বুলা শুধু 'হুম' বলেছিল। আর কিছু বলেনি। আর অর্চি এবারেও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি ওষুধগুলো ঠিকঠাক খাও তো?

বাড়িতে লোক আসার সঙ্গে ওষুধ খাওয়ার সম্পর্ক কী? আর এ তো প্রথমবার নয়। এর আগেও অনেকবার এসেছে, নতুন নতুন মানুষ। আমাদের সঙ্গে কেউ মাসের পর মাস, কেউ বছরের পর বছর, কাটিয়েছে। বুলা এ সব জানত। কারণ বিয়ের আগেই আমি ওকে জানিয়েছিলাম এইসব কথা। ও সব শুনে শুধু হেসে বলেছিল, আসুক না। কোনো অসুবিধা নেই। শুধু তোমার আর আমার মাঝখানে না শুলেই হল।

না, কেউ শোয়নি তো! তবু বিয়ের কুড়ি বছর পর কেন যে বুলা হঠাৎ অসহিষ্ণু হতে শুরু করল। আমাকে অসুস্থ ভাবতে শুরু করল। আমি অসুস্থ! কই ঘরের মধ্যে এতগুলো লোক কখনও তো আমাকে সে-কথা বলেনি। কী সম্মান করে আমাকে! এত সম্মান আমাকে আর কেউ করে না।

আমার এই ঘরদুটোর মধ্যে আমি এত বছরে কম কিছু তো দেখিনি। প্রেম-বিরহ-মৃত্যু, বিচ্ছেদ, লোভ-ঘেন্না-ভালোবাসা, অনেক অনেক কিছু। কত সংসার তৈরি হল, ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কত শিশুর জন্ম হয়েছে এই ঘরে। তার কান্নায় আমারা ঘরের দেওয়াল, ছাদ, উঠোন ভরে গেছে। আমার মনে রয়েছে দীপ্তেন আর ঊর্মিমালার মেয়ে হয়েছিল এক শরৎকালের ভোরবেলায়। ওরা তিন বছর ছিল এই ছোট্ট ঘরটায়। বাচ্চাটার যখন জন্ম হচ্ছিল আমি বাইরে, জানলার বাইরে, তাকিয়ে দেখছিলাম, উঠোনে শিউলি গাছটার নীচে ফুলে ভরে গেছে। আমি আনন্দে কাঁদছিলাম। খুব ইচ্ছে করছিল শিশুটাকে একবার ওই ভোরের আলোতে ফুলের মধ্যে শোওয়াতে। ঊর্মিকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম। ঊর্মি অনুমতি দেয়নি। আমি জোর করিনি। ওরই তো মেয়ে। আমি ওর নাম দিয়েছিলাম উমা। সেই নাম পছন্দ হয়েছিল ঊর্মির।

আরও কত কত ইতিহাস রয়েছে এই ঘরে। আমার এই ঘরদুটোতে। এই তো বছর চারেক আগে অম্লান যখন পুলিশের গুলি খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেছিল, রক্তে ভেসে যাচ্ছিল আমার এই ঘরের মেঝে। আমি নিজে হাতে সারা রাত ধরে বালতি বালতি জল ঢেলে সেই রক্ত ধুয়েছি। রক্তের আঁশটে গন্ধে ভরে গেছিল ঘর। মেঝে ধুয়ে আমি যখন উঠে দাঁড়িয়েছি দেখি খাটের এককোণে গুটিয়ে বসে বুলা ভয়ে থরথর করে

কাঁপছে। আমাকে দেখে ভীষণ ভয় পাচ্ছিল ও। অর্চিও কখন যেন নিজের ঘর ছেড়ে এ-ঘরের দরজার সামনে এসে আমার দিকে একই দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। আমার দিকে কেন? মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা মাওবাদী নেতা অম্লানের দিকে ওরা একেবারের জন্যও কেউ তাকাচ্ছিল না কেনও?

আমাকে ওরা দুজনে মিলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে বেশ কয়েকবার। আমি গেছিও। ওরা যাতে শান্তি পায় করুক না। শুধু ওষুধগুলো না খেলেই হল। আমি জানি ওই ওষুধগুলো খেলে আমি শুধু ঘুমোব, আর ঘুমোব। আর এই লোকগুলো যারা আমার সঙ্গে মাসের পর মাস বছরের পর বছর থাকে, আমার কথায় ওঠে, বসে, সিগারেট খায় ওরা কেউ আর থাকবে না। আর আমি পারব না ওদের ছেড়ে থাকতে।

বুলা অশান্তি করতে শুরু করেছিল অনেকদিন আগে থেকেই। অর্চি বড় হতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে ও যেন একটা সাপোর্ট পেয়ে অশান্তিটা আরও বাড়তে থাকছিল। আমি ওদের বেশ কয়েকবার বলেছি অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে। শোনেনি। শুধু অশান্তি আর অশান্তি। এবারে যেন সবথেকে বেশি। অরণ্য, বিদিশা, তপন, পুষ্পল, নীল ওরাও বিরক্ত হচ্ছিল বুলা অরা অর্চির ওপর। বিশেষ করে অরণ্য খুব রেগে উঠছিল বুলার ওপর। অরণ্য এমনিতেই খুব রাগী। আমিও যথেষ্ট সমঝে চলি ওকে। অনেক সময়ই আমারও কথা শোনে না ও। নিজের ইচ্ছেমতো চলে। আর আমি অসহায় হয়ে চেয়ারে বসে তাকিয়ে থাকি টেবিলের দিকে।

সেদিন রাত্রে এমনই অশান্ত ছিল অরণ্য। মদ খেয়ে বাড়ি ফিরেছিল। টলছিল। আমি গন্ধ পাচ্ছিলাম দিশি মদের। সেদিনই সন্ধেবেলা বুলা আবার আমার সঙ্গে খুব ঝগড়া করল। আমাকে পাগল, ব্যর্থ, অসামাজিক ইত্যাদি আরও অনেক শব্দ বলল। শব্দগুলো পীড়া দিচ্ছিল আমাকে। শরীর খারাপ লাগছিল আমার। মাথার ভেতর ঝনঝন শব্দ হতে শুরু করেছিল। তবু নিজের টেবিল চেয়ার ছেড়ে উঠিনি। আমি বুলার করা সব অপমান সহ্য করে নিয়েছিলাম, কিন্তু অরণ্য পারেনি। আসলে ওরা কেউ কোনোদিনই আমার লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারে না। আমি স্পষ্ট দেখলাম মাঝরাতে অরণ্য বেরিয়ে এল। বুলাকে খুন করে আবার ঢুকে গেল।

জানি কেউ বিশ্বাস করবে না এসব কথা। এই যেমন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি অর্চির ব্যবহারে বেশ কিছুদিন ধরে ভীষণ ক্ষুব্ধ হচ্ছে বিদিশা। আমাকে বারবার বলছে, তুমি একজন প্রতিভা। কেন এত অপমান সহ্য করছ মুখ বুজে? ওকে সরিয়ে দাও। ও তোমাকে পছন্দ করে না।

আমি জিজ্ঞেস করি, তাহলে আমার কাছে থাকে কেন?

থাকে কারণ ওর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই এই মুহূর্তে।

কেন, ওর মা-র কাছে গিয়েই তো থাকতে পারে!

আমার এমন কথায় সামান্য ঠোঁট হেলিয়ে হাসে বিদিশা। সেই হাসিতে ওর ভরা শরীর সামান্য কেঁপে ওঠে। আমার সামনে ঘন হয়ে এসে বলে, বেশ তো, তাহলে ওর মায়ের কাছেই পাঠিয়ে দাও ওকে। ওখানেই থাকুক। আমি বিদিশার মুখের ভেতর থেকে এলাচের গন্ধ পাই। ওকে এলাচ খাওয়া আমিই অভ্যাস করিয়েছি। বিদিশার কাঁধে হাত রাখি আমি। গত আড়াই বছর ধরে একটু একটু করে ওকে গড়ে তুলেছি আমি। নিজের মনের মতো করে। ও আমার সামনেই স্নান করে, শাড়ি পড়ে, চুল আঁচড়ায়। এতটুকু লজ্জা পায় না। শুধু ও কেন, এই ঘরে বছরের পর বছর ধরে যে ওরা থাকে, ঘোরে ফেরে খায়, ঘুমোয় তারা কেউ কোনোকিছু করতেই লজ্জা পায় না আমার সামনে। ওদের আগে যারা থেকেছে তারাও পায়নি কোনোদিন। কারণ ওরা পুরোটাই আমার। একমাত্র আমার। ওদের প্রতিটা নিঃশ্বাসে শুধুমাত্র আমার অধিকার। আমি ঠিক করি ওরা কতদিন কতক্ষণ কীভাবে নিঃস্বাস ফেলবে। আমার হুকুম ছাড়া ওরা কিচ্ছু করতে পারে না। অথচ এই ঘরের মধ্যেই বুলা আমাকে অস্বীকার করত। আমাকে উন্মাদ বলত, অপদার্থ বলত। আমাকে ওদের সামনে যখন-তখন অপমান করত। ওরা হাঁ করে তাকিয়ে দেখত ওদের ঈশ্বর তার স্ত্রী, পুত্রের কাছে দিনের পর দিন লাঞ্ছিত হচ্ছে। তাই একদিন রাত্রে আমার অরণ্য, যাকে আমি সব থেকে ভালোবাসি, বুলাকে আমারই সামনে খুন করল। আমি তখন লিখছিলাম। লিখছিলাম, অরণ্য হাতে একটা বালিশ নিয়ে ঝুঁকে দেখল একবার। তারপর আচমকা বালিশটা ঠেসে ধরল ওর মুখে...।

ইদানীং অর্চিও একেবারে সহ্য করতে পারছে না আমাকে। একেবারে ওর মায়ের স্বভাব পেয়েছে। বিদিশা আমাকে বারবার বলে আমি কোনোদিন অর্চিকে কিছু একটা করে ফেলব। আমি সামলে রাখি বিদিশাকে। কতদিন পারব এভাবে জানি না।

অর্চিও এভাবে চলে যাবে আমি ভাবতে পারিনি। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে যন্ত্রণায়। আমি প্রাণপণ বিদিশাকে আটকানোর চেষ্টা করেছি যাতে অর্চিকে আজ রাত্রে ও খাবার না বেড়ে দেয়। আমি জানতাম কিছু একটা ঘটবে। ঠিক তাই ঘটল। রুটি, তরকারি, ডাল ডাইনিং টেবিলে বেড়ে দিল বিদিশা। আর ডাল তরকারির মধ্যে মিশিয়ে দিল বিষ। তীব্র বিষ। খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ছটফট করতে করতে ওই টেবিলের মধ্যেই মাথা গুঁজে পড়ে রইল অর্চি। বিদিশা হাসছিল। এমনভাবে অর্চির শরীরটার দিকে তাকিয়ে হাসছিল যেন বহুদিন পর ও জিতে গেছে। আমার কান্না পাচ্ছিল খুব। আমার একমাত্র ছেলে আমারই সামনে মৃত পড়ে রয়েছে। আর আমি অসহায়, কিচ্ছু করতে পারছি না। ক্রমাগত আমাকে লিখে চলতে হচ্ছে, 'অর্চির শরীরটাকে দু-হাতে কয়েকবার নেড়ে দেখল বিদিশা। কোনো সাড়া নেই। নিশ্চিন্ত হল। অর্চির চোখদুটো বিস্ফারিত। ভীষণ ভয়।' বিদিশা আমাকে ক্রমাগত বলে চলেছে, এবার লিখুন, নিজের একমাত্র সন্তানকে নিজেরই চোখের সামনে খুন হতে দেখলে কোন পিতা নিজেকে ঠিক রাখতে পারে? আর আমি লিখছি, লিখেই চলেছি। ঠিক যেভাবে আমাকে লিখতে হয়েছিল 'অরণ্য হাতে একটা বালিশ নিয়ে ঝুঁকে দেখল একবার। তারপর আচমকা বালিশটা ঠেসে ধরল বুলার মুখে...।'

তপন, পুষ্পল, নীল, স্বর্ণালি, মিঃ সেন, দাশবাবু, নীহারুল, বিক্রম আরও সবাই ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে অর্চিকে। ওরা কেউ শোকার্ত, কেউ আনন্দিত। আজ ওরাও চলে যাবে আমাকে ছেড়ে। একটু পরেই। শেষ হবে আমার আঠেরোতম উপন্যাস। আমি আর লিখব না। নিজের স্ত্রী-পুত্র সবাই ছেড়ে গেছে আমাকে এদের জন্য। ওদের দুজনকে খুন করেছে ওরা। আর না। বুলা আমাকে বলত আমি একজন ব্যর্থ লেখক। আমার সতেরোটা উপন্যাসের একটাও বিক্রি হয়নি, কোনো পুরস্কার পায়নি। আমি বুলার রোজগারের টাকায় বই করি। কেউ আমাকে পছন্দ করে না। শুধুমাত্র আমার চরিত্ররা আমাকে ভালোবাসে। ওরা আমার সঙ্গে থাকে, খায়, ঘুমোয়, কথা বলে— যতদিন না আমার লেখা শেষ হয়। শেষ হলে আবার নতুনরা আসে। থাকে, খায়...।

লেখাটা শেষ করি ভোর রাত্রে। আর একে একে মিলিয়ে যেতে থাকে অরণ্য, বিদিশা, নীল, মিঃ দাশ সবাই। কষ্টে আমার বুক ছিঁড়ে যেতে থাকে। এতগুলো দিন একসঙ্গে একই ঘরে থাকার পর চলে যাচ্ছে ওরা। আমাকে ছেড়ে। প্রিয়জনকে শ্মশানে দাহ করে স্নান সেরে ফেরার মতো অনুভূতি হতে থাকে আমার। গোটা বুক ফাঁকা হতে হতে একেবারে শূন্য হয়ে যায়।

আর কেউ নেই ওরা। মধ্যরাতের বাজারের মতো খাঁখাঁ করছে ঘরটা। কলম বন্ধ করে পাণ্ডুলিপির ওপর রেখে ক্লান্ত আমি কোনোমতে উঠে দাঁড়াই চেয়ার ছেড়ে। আর বিছানার দিকে চোখ পড়তেই শিউরে উঠি। বুলা ঘুমোচ্ছে খাটে! জানলা দিয়ে ভোরবেলার আলো এসে পড়েছে ওর মুখে। তাহলে?...এতদিন কোথায় ছিল বুলা? আমি পা ঘসে ঘসে হ্যাচোর-প্যাচোর করতে করতে পাশে অর্চির ঘরে যাই, দেখি ও-ও ঘুমোচ্ছে, একেবারে ওর মায়ের মতো করে। তাহলে...!

আমি ফিরে আসি আবার নিজের ঘরে। খুব সাবধানে বুলার পাশে এসে গুটিয়ে শুই। ওর মুখের দিকে তাকাই। বড় সুন্দর লাগে ওর মুখটা। ভালো লাগে ওকে। আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে। টেবিলে ড্রয়ারে যে বিষের শিশিটা রাখা রয়েছে সেটার কথা মনে পড়ে। আমি আবার উঠতে যাই, কিন্তু ঠিক তক্ষুনি খুব আবছা একটা মুখ চোখের সামনে দুলতে শুরু করে। ভোরবেলার মতো নিষ্পাপ কিশোরী মুখ। আমি ওর নাম দিয়ে

ফেলি লাজবন্তী। তারপর ভাবতে শুরু করি। ভাবতে থাকি। লাজবন্তী একটু একটু করে আমার কাছে আসতে থাকে। আমার ঘরে।

জীবনের রংমশাল

দীপান্বিতা রায়



শাড়িটা পরা হয়ে গেছে । বেড়ার গায়ে ঝোলানো ফাটা আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে দ্রুতহাতে বিনুনি বাঁধছিল পারুল । আয়নার সামনে দাঁড়ানোটা অবশ্য খানিকটা অভ্যাসের মতো । কাচের পিছনে জায়গায় জায়গায় পারা উঠে গেছে । তাই মুখটা দেখায় ঝাপসা, যেন জলে ভিজে ধেবড়ে যাওয়া ছবি । তবে পারুলের যে তাতে খুব কিছু আসে-যায় তা নয় । সিঁথিটা ঠিক রেখে চুলগুলো শুধু টান করে বেঁধে রাখা বই তো নয় । মুখের ওপর চুল এসে পড়লে স্কুলের দিদিরা বকেন । ওইটুকু আয়না ছাড়াই করে নেওয়া যায় । আয়নাটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় বরং ওর দিদি বকুলের একটু দুঃখ আছে । আরশির সামনে দাঁড়িয়ে নিজের একঢাল কালো চুল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে বকুল ভালোবাসে ।

চুল বাঁধতে বাঁধতেই এসব এতাল- বেতাল কথা মনে হচ্ছিল পারুলের । যদিও এসব কথা ভাবার আজকে সময় নয় । বুকের ভিতরটা গুড়গুড়িয়ে উঠছে মাঝেমাঝেই । এমন সময় বাইরে থেকে মঞ্জুর গলা শোনা গেল, পারুল হল তোর। তাড়াতাড়ি কর ।

বিনুনির নীচে গার্টারটা টাইট করে লাগাতে লাগাতে বেরিয়ে আসে পারুল । দরজার চৌকাঠ পেরোলে মাটির দাওয়া । তার ওপর খড়ের চাল । গত দুবছর ছাওয়া হয়নি । খড় আলগা হয়ে এসেছে । দাওয়ার এখানে-ওখানে খড়ের কুটি পড়ে আছে । অন্যদিন বকুল সকালবেলা একপ্রস্থ ঝাঁট দিয়ে দেয় । আজ বোধহয় কোনও কারণে পেরে ওঠেনি । দাওয়ার ওপাশে রান্নাঘর । প্লাস্টিকের চটিটা পায়ে গলাতে গলাতে পারুল গলা তোলে, মা আসছি ।

দাঁড়া, দাঁড়া, দুদণ্ড দাঁড়া, মা । বলতে বলতে রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে কাকিমা । পিছনে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে মা ।

কাকিমার হাতে একটা ছোট বাটি । বাটিতে আঙুল ডুবিয়ে পারুলের কপালে দই-হলুদের ফোঁটা দেয় কাকিমা । পারুল জানে, কাল সন্ধেবেলা কাকিমা চেয়ে-চিন্তে ওই আধবাটি দুধ জোগাড় করে এনেছে । তেঁতুলগুলে তাতেই দই পাতা হয়েছে । সকালে এই ফোঁটাটুকু দেওয়ার জন্য এত আয়োজন । ফোঁটা নিয়ে কাকিমাকে প্রণাম করে পারুল, মাকেও । শীর্ণ হাতটা মাথায় রেখে মা অস্ফুটে কী যেন বলে । কাকিমার গেলায় দুগগা দুগগা শুনতে শুনতে দাওয়া থেকে নেমে পড়ে পারুল । মঞ্জু অপেক্ষা করছিল । দুজনে মিলে জোরপায়ে স্কুলের দিকে দৌড় । আজ রেজাল্ট বেরোবে মাধ্যমিকের ।

রাস্তা অনেকটা । পিচ বাঁধানো নয় । শীত-গরমে সমস্যা নেই । বর্ষায় কষ্ট হয় । তবে বৃষ্টি শুরু হয়নি এখনও । শুকনো রাস্তায় যতটা সম্ভব পা চালিয়ে হাঁটছিল দুজনে । বেশ কিছুটা দূরে আরও চার-পাঁচজন

মেয়ের একটা দল যাচ্ছে । তাদের ধরে ফেলতে পারলে ভালো হয় । কিন্তু তার আগেই জোড়ের কালভার্টের পাশে দেখা গেল মূর্তিমান দাঁড়িয়ে আছে বাইক নিয়ে ।

ওই দ্যাখ, আবার এসেছে । ফিস ফিস করে বলে মঞ্জু ।

তাকাস না । পাশ কাটিয়ে চলে যাব । কথা বলতে বলতে আঁচলটা কোমরে গুঁজে নেয় পারুল ।

এই এক উৎপাত চলছে বেশ কিছুদিন । গোবর্ধন মণ্ডলের ছেলে পরেশ । দ্যাখ না দ্যাখ পারুলের পিছনে লেগে রয়েছে । যখন-তখন পারুলদের বাড়ির সামনে দিয়ে চক্কর । স্কুল যাওয়া-আসার পথে তো রোজ দাঁড়িয়ে থাকা বাঁধা । গোবর্ধন মণ্ডল এলাকার নাম-ডাকওলা বড়লোক । বিঘের পর বিঘে ধানিজমি । চালকল, লরির ব্যবসা । কী নেই! এককথায় টাকার কুমির । পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিশাল বাড়ি । আগে পার্টির লোকেদের সঙ্গেও ভালো ওঠা-বসা ছিল । পালাবদলের পর সেটা কমেছে । কিন্তু ক্ষমতা কমেনি বিশেষ । পয়সার জোর থাকলে ক্ষমতা তো থাকবেই । লোকে বলে এলাকার কুখ্যাত গুন্ডা পোটকাও নাকি গোবর্ধনের বশ । গোবর্ধন তাকে নিয়মিত মাসোহারা দেয় । সেজন্যই এলাকার কোনও পাঁচুর সাহস নেই মণ্ডলবাবুর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার ।

এহেন গোবর্ধন মণ্ডলের একমাত্র ছেলে পরেশ । অনেক ঠাকুরের দোরধরা, শিবরাত্তিরের সলতে । ছেলে চাইলে গোবর্ধন বোধহয় আকাশের চাঁদটাও পেড়ে এনে দিতে পারে । এমন ছেলের হঠাৎ দিনমজুরি খেটে খাওয়া হারাধন গড়ুইয়ের মেয়ে পারুলকে কেন পছন্দ হল ভগবানই জানে । পারুলকে অবশ্য দেখতে মন্দ নয় । মাজা রং । ছিপছিপে গড়ন । মুখখানাও দিব্যি মিষ্টি । কিন্তু তাদের চালের ফুটো দিয়ে বর্ষার জল পড়ে । বাবা-কাকার কাজ না থাকলে অনেকসময়ই একবেলা উপোস দিতে হয় । আসলে ওই যে সেই কথায় বলে না, যার সঙ্গে যার মজে মন, ব্যাপারটা বোধহয় অনেকটা সেরকমই । কিন্তু এক্ষেত্রে মন মজার ব্যাপারটা পুরোপুরি একপক্ষীয় । পারুলের মন মজেনি । সত্যিকথা বলতে পরেশ যে তারজন্যই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে সেটা পারুল প্রথমটায় ভাবেওনি, বুঝতেও পারেনি । পরে বুঝতে পেরে ভয়ে সিঁটিয়ে যায় । তারপর যতদিন গেছে অবস্থাটা ক্রমশ বিরক্তির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে । এদিকে পারুলের যে তাকে পছন্দ না-ও হতে পারে সেটা সম্ভবত পরেশের কল্পনার অতীত । তাই সেও পিছনে লেগে আছে ।

আজ অবশ্য পরেশকে নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো মনের অবস্থা ছিল না পারুলের । কোনওরকমে পাশ কাটিয়ে দ্রুত এগিয়ে যায় দুজনে । পিছন থেকে রোজকার মতোই অশ্লীল টিপ্পনি উড়ে আসে । কান না দিয়ে জোরে পা চালায় । আরও খানিকটা এগিয়ে বাঁক নিতেই স্কুলবাড়ির নিচু পাঁচিল । ধারে একটা মস্ত পেয়ারা গাছ । জালি এসেছে অনেক । হজমিওয়ালা তেকোণা বাঁশের খাঁচাটা নামিয়ে জিনিসপত্র গোছাচ্ছে । পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢোকে পারুল আর মঞ্জু । সোজা বড়দির ঘরে । সেখানে ততক্ষণে জড়ো হয়েছে তাদের ক্লাসের আরও অনেকে । বড় টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে বড়দি আর অঙ্কের সবিতাদি কাগজপত্র গোছাচ্ছিলেন । পারুল আর মঞ্জু ঘরে ঢুকতেই বড়দি মুখ তুলে তাকিয়ে হেসে বললেন, এই তো, এসে গেছে । এবার তাহলে খবরটা দিয়ে দেওয়া যাক । হেসে ঘাড় নাড়লেন সবিতাদিও ।

শোনো মেয়েরা, আমাদের সরলাবালা হাইস্কুলের মাধ্যমিকের রেজাল্ট এবার খুব ভালো হয়েছে । তোমরা বাহান্ন জন পরীক্ষা দিয়েছিলে । সবাই পাশ করেছ । মেয়েদের গলা থেকে একটা সমবেত উল্লাস ধ্বনি বেরিয়ে আসে । সেটাকে থামতে সময় দিয়ে ফের বড়দি বলেন, ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে দশ জন । আর সবচেয়ে আনন্দের কথা হল এবছর আমাদের এক ছাত্রী চারটে বিষয়ে লেটার নিয়ে স্টার পেয়েছে । সে কে জানো তোমরা? পারুলবালা গড়ুই । আমাদের পারুল ।

কাঁচা মাটির রাস্তাটা ধরে ছুটতে ছুটতে আসছে পারুল । পায়ের প্লাস্টিকের চটিটা কখন ছিটকে গেছে, খেয়াল নেই । কাঁটায় দু-চারবার শাড়ি আটকেছে, ভ্রুক্ষেপ করেনি । তাদের মাটির বাড়িটা দেখা যাচ্ছে । চালের খুঁটিটা ধরে মা দাঁড়িয়ে আছে । হাতের ঝাঁটাটা ছুড়ে ফেলে এগিয়ে আসছে কাকিমা । বোনের দিকে ছুটে আসছে বকুল, মা মা আমি স্টার পেয়েছি । চারটে লেটার । স্কুলে ফার্স্ট হয়েছি মা... আমি ফার্স্ট হয়েছি...

- - -

গল্পটা তো এরকম হতেই পারত। হলে হয়তো আমরা অনেকেই খুশিও হতাম। কিন্তু মেয়েটার নাম যে পারুলবালা গড়ুই। পরিচয়, জনমজুর খাটা হারাধন গড়ুইয়ের মেয়ে। তার জীবনটা এরকম সরলপথে এগোনো যে বড় কঠিন। তাই কল্পনার পারা উঠে যাওয়া ঝাপসা আয়না থেকে এবার চলুন দৃষ্টি ফেরানো যাক চোখধাঁধানো বাস্তবে।

মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। কাকিমার বাপের বাড়ি উরালি গ্রামে। পারুলদের মাচানতলা থেকে বাসে যেতে সময় লাগে আধঘণ্টা। তবে বাস তো সেই হাইরোডে। বাড়ি থেকে হেঁটে বাসরাস্তা পৌঁছতে প্রায় চল্লিশ মিনিট। ভ্যানরিকশা চলে। কিন্তু তাতে তো আবার পাঁচটা করে টাকা নেবে। আবার বাসভাড়াও দিতে হবে চারটে টাকা। পারুল, তার মা আর কাকিমা তাই হেঁটেই বাসরাস্তা চলে গেছিল। বকুল যায়নি। বাবা-কাকার ভাত-জল করতে হবে। কাকার ছেলে-মেয়ে দুটো ছোট। ওদেরকেও সঙ্গে নেয়নি কাকিমা। নিলেই ভ্যানে চাপতে হবে। অতখানি পথ হাঁটতে পারবে না। তার থেকে বকুলের কাছে একটা রাত দিব্যি থাকবে। বাপের বাড়ি যাওয়াটা জরুরি। একে তো বুড়ি মায়ের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি। তার ওপর একটা জমি বিক্রির কথা হচ্ছে। ডাক-খোঁজ না করলেই ভাইরা বোনেরা ভাগটুকু মেরে দেওয়ার ধান্দা করবে। কিন্তু এসব কাজে একলা গেলে ঠিক জোর পাওয়া যায় না। তাই পারুল আর তার মাকে সঙ্গে নেওয়া। বরকে বলে লাভ নেই। একে তো সে অনেকদিন বাদে খানতিনেক ঘর ছাওয়ার কাজ পেয়েছে। ঠিকঠাক করলে দুটো পয়সা ঘরে আসবে। তার ওপর সে একটা মেনিমুখো গাঁজাখোর। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কোথায় গাঁজা খেয়ে উল্টে পড়ে থাকবে। তখন তার খোঁজ নেওয়াটাই একটা মস্ত কাজ হয়ে দাঁড়াবে। তার চেয়ে বড় জা সঙ্গে থাকা ভালো। রোগা- সোগা ছোটখাটো মানুষটি হলে কী হবে, বুদ্ধি ধরে খুব। মাথাটিও ঠান্ডা। আর পারুলকে তো নিতেই হবে। সে তো তাদের বাড়ির সব থেকে বড় বল-ভরসা। লেখাপড়া-জানা মেয়ে।

কাজ-টাজ মিটল ভালোভাবেই। পরদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে উরালি থেকে বেরোল তিনজনে। মাচানতলা মোড়ে যখন বাস পৌঁছল, বেলা তখন প্রায় চারটে। বাসরাস্তার পাশেই মস্ত হাট বসেছে। বকুলের চুলের ফিতে আর ছোট বোনের লাল রিবন কিনতে কাকিমা দাঁড়াল মনিহারি জিনিস বিক্রির চালাটার সামনে। মা এদিকে পদির ঠাকুমার সঙ্গে কথা বলছে। একটু বিরক্ত লাগছিল পারুলের। তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছতে হবে। প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের নার্স দিদির মেয়েটাকে সপ্তাহে ছ'দিন তাকে পড়াতে যেতে হয়। ক্লাস ওয়ানে পড়ে মেয়েটা। কিন্তু ভয়ানক বিচ্ছু। এক জায়গায় বসিয়ে রাখাই কঠিন। একদিন পারুল না গেলেই মুখ ভার হয় দিদিমণির। মাস গেলে দুশোটা টাকা দেয়। না গিয়ে কী করে পারুল! টাকা ক'টা যে তার বড্ড দরকার।

ওই ক'টা টাকা ছিল বলে তো পরীক্ষার সময় অন্তত খাতা-টাতা কিনতে পেরেছে। বইয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেছিল। কিন্তু উত্তর লেখা প্র্যাকটিস করতে হলে তো খাতা লাগবে। পারুল পাবে কোথায়? তাও তো মঞ্জু ছিল তাই। ওর বাবার পোস্টাপিসে চাকরি। পুরোনো কাগজ এনে দিত আপিস থেকে। হলদে হয়ে যাওয়া কাগজ। তাতে কী? মঞ্জু আর পারুল তাতেও অঙ্ক কষত। পারুলের বাড়িতে তো আর কারেন্ট নেই। সুয্যি ডুবল তো বই-খাতার পাট চুকল। কেরোসিন থাকলে হ্যারিকেন জ্বালানো যায়। কিন্তু গত দু-বছর বাবা-কাকা কেউই তেমন জন খাটার কাজ পায়নি। ভাত জোটানো যেখানে কঠিন, সেখানে কেরোসিন কে কিনবে? মঞ্জুর বাড়িতেই রাত পর্যন্ত পড়ত পারুল। পড়া শেষ হলে ওর বাবা টর্চ নিয়ে পৌঁছে দিয়ে যেত।

এসব কথা বাবা-কাকা জানে কিনা সন্দেহ আছে পারুলের। কাকা তো সন্ধেরাত্তির থেকেই গাঁজার আড্ডায়। বাড়ি যখন ফেরে আগু-পিছু জ্ঞান নেই। বাবার ওসব দোষ নেই। সংসারের জন্য ভূতের খাটনি খাটে। তারপর সন্ধে না লাগতে যা হোক কিছু পেটে দিয়ে মোষের ঘুম। পারুল যে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল, সেটা বাবা জানে কিনা সন্দেহ। ভরসা শুধু মা আর ওই কাকিমাটি। পাখির ছানার মতো আগলায় পারুলকে। কাকিমার পোষা মুরগি আছে গোটা কয়েক। তাদের একটা ডিমও নিজের ছেলেকে পর্যন্ত দেয়

না কাকিমা। পারুল খাবে। পড়াশোনা করছে না! ভালো খেতে হবে ওকে। বড় ভরসা তার ওপর কাকিমার। মনে মনে ভাবে পারুল। পরীক্ষা তো ভালোই হয়েছে। এদের আশা পূরণ করতে পারবে তো?

ভাবতে ভাবতেই মনের কোণে তিতকুটে ভাব। হরি ময়রার দোকান পেরিয়ে যেখানে রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে মোটরসাইকেলে হেলান দিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে পরেশ। বড়লোকের বখা ছেলে। ক্লাস সেভেনে উঠে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। তারপর থেকে সারাদিন শুধু ফুলবাবুটি সেজে টো-টো কোম্পানি। আজ এ মেয়ের পিছনে, কাল ও মেয়ের পিছনে হিড়িক দেওয়া। আগে সাইকেল চড়ত, এখন আবার বাইক কিনেছে একখানা। কী কুক্ষণে যে পারুলকে চোখে ধরেছে! নাহোক মাস ছয়েক পিছনে লেগেই আছে। পারুলের একেকদিন ইচ্ছে করে পায়ের চটিটা খুলে দু-চার ঘা দিয়ে দেয়। কিন্তু মঞ্জু বারণ করে, ওসব করতে যাস না। ওরা বড়লোকের ছেলে। কী করতে কী করে দেবে, কোথায় ফাঁসিয়ে দেবে তার ঠিক আছে? তার চেয়ে চুপচাপ থাক। পাত্তা না দিলে এমনিই কেটে যাবে।

মঞ্জুর কথাটা মাথায় রেখেই আজও এগোল পারুল। দেরি করা যাবে না। কাল পড়াতে যাওয়া হয়নি। আজও না গেলে নার্স দিদিমণি চারটে কড়া কথা বলতে ছাড়বে না। তবে একবার পিছন ফিরে দেখে নিল। কাকিমার কেনাকাটি হয়ে গেছে। মা-কাকিমা দুজনেই আসছে গুটিগুটি।

রাস্তার বাঁকে মোটরসাইকেলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল পরেশ। পারুলকে একা দেখেই এগিয়ে এল। চোয়াল শক্ত করে দেখেও না দেখার ভান করছিল পারুল। কিন্তু পরেশ ছাড়ার পাত্র নয়। রাস্তার মাঝখানে দু-পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে বলল, একটা কথা ছিল।

উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে পারুল। কিন্তু রাস্তার প্রায় সবটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে পরেশ। ফের বলে, বললাম যে একটা কথা ছিল। একমিনিট দাঁড়িয়ে শুনে গেলে ভালো হয়।

আমার সময় নেই। রাস্তা ছাড়ুন।— হিস হিসিয়ে ওঠে পারুল।

এত ব্যস্ত কীসের, হ্যাঁ? বড় যে গুমোর দেখছি।

এবার আর সামলাতে পারে না পারুল। সোজা তাকিয়ে বলে, আপনার মতো রাস্তার রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর সময় আমার নেই। সরুন, নাহলে এবার চেঁচিয়ে লোক ডাকব। কয়েক সেকেন্ড একটু থতিয়ে যায় পরেশ। তারপর সরে যেতে যেতে দাঁতে-দাঁত ঘষে বলে, কাজটা ভালো করলি না, পারুল।

কোনওদিকে না তাকিয়ে সামনে এগোয় পারুল। মাথার ভিতরটা যেন আগুন হয়ে আছে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রায় দৌড়চ্ছে। মা-কাকিমা যে অনেকটা পিছনে পড়ে গেছে সে খেয়াল নেই। এমনকী মোটরসাইকেলের জান্তব আওয়াজটা যে ক্রমশ কাছে চলে আসছে সেটাও খেয়াল করেনি। যখন করল তখন আর সময় নেই। ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাওয়া মেয়েটাকে পিষে দিয়ে চলে গেল পরেশ। গোবর্ধন মণ্ডলের শিবরাত্তিরের সলতে।

আপনারা বলছেন, এটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়, খুন? আপনারা দেখেছেন? নিজের চোখে দেখেছেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখেছি গো। নিজের চক্ষে দেখেছি। গোবর্ধন মণ্ডলের ছেলে আমাদের মেয়েটার ওপর দিয়ে ভটভটিটা চালায়ে দিল। আমাদের মেয়েটা মরে গেল গো। মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরে গেল।

থানার বড়বাবুর সামনে দাঁড়িয়ে হাউহাউ করে কাঁদছিল পারুলের কাকিমা। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে পারুলের মা। ভাষাহীন চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। হাত-পায়ে কোনও বশ নেই। মঞ্জুর মা তাকে শক্ত করে ধরে না থাকলে যে-কোনো সময় বোধহয় মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।

পারুলের বাবা আর কাকা হাঁটুতে মুখ গুঁজে মাটিতে বসে।

খুনের অভিযোগই লেখা হল। মা আর কাকিমার টিপছাপ নিলেন বড়বাবু। সেদিন রাতেই পরেশকে গ্রেফতার করল পুলিশ। গোবর্ধন মণ্ডল বোধহয় ভাবতেই পারেননি যে জনমজুর হারাধন গড়ুইয়ের সাহস হবে তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে এফ আই আর করার। পরেশ তাই বাড়িতেই ছিল।

পরদিন তাকে আদালতে তোলা হলে জজসাহেব বারো দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিলেন । সন্ধে হয়ে গেছে । পারুলকে দাহ করে এসে দাওয়ায় পাতা ছেঁড়া দড়ির খাটিয়াটার ওপর বসে ছিল পারুলের বাবা । কাকাও বসে আছে মাটিতে । বকুল এসে দু-কাপ চা দিয়ে গেল । কালকের ঘটনার পর থেকে এখনও পর্যন্ত একবিন্দু জলও খাওয়ানো যায়নি পারুলের মাকে । একটি কথা ফোটেনি মুখে । কাকিমার কোলে মাথা রেখে চুপ করে শুয়ে আছে শুধু ।

মোটরসাইকেলের আলোটা দেখা যাচ্ছিল দূর থেকেই । কিন্তু সেটা তাদের বাড়ির কাছে এসে দাঁড়াবে ভাবেনি কেউই । পরপর দুটো বাইক । গোবর্ধনবাবু আর তার দুই শাগরেদকে আসতে দেখে একটু সামলে বসে হারাধন । চাপা গলায় বলে, বকুল, তুই ভিতরে যা ।

ঘর থেকে দুটো প্লাস্টিকের চেয়ার বার করে দিয়ে নিঃশব্দে ভিতরে চলে যায় বকুল । দাওয়ায় উঠে গোবর্ধনবাবু একটা চেয়ারে বসেন । শাগরেদরা দাঁড়িয়ে থাকে । একটা অস্বস্তিকর নীরবতা । তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে গোবর্ধন মণ্ডল বলেন, দ্যাখ হারাধন, যা হওয়ার তা তো হয়ে গেছে । তোদের মেয়ে তো আর ফিরে আসবে না । খামোখা আমার ছেলেটা জেলের ঘানি পিষবে । আমার একমাত্র ছেলে । তোরা বাবু মামলাটা তুলে নে । আমি তোদের পুষিবে দেব । মেয়েটা আমার মরে গেছে দাদা । ওর মা একফোঁটা জল খাচ্ছে না । — এর বেশি আর কিছু বলতে পারে না হারাধন ।

জানি রে, জানি । আমিও তো ছেলেপিলের বাপ । আমার বাড়িতেও তো একই অবস্থা । ওর মা শুধু মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে আর বলছে আমার ছেলেকে ফিরিয়ে এনে দাও । তোদের তো আরও দু-পাঁচটা আছে । আমাদের তো ওই একটিই । আমি কথা দিচ্ছি হারা তোদের কোনও অভাব রাখব না ।

কীসের অভাব রাখবেন না, বাবু? আমাদের মেয়ের অভাব পুরায়ে দেবেন? আপনি কি ভগবান?

পারুলের কাকিমার আলগা আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে । দু-চোখ যেন দু-খণ্ড আগুনের গোলা ।

আঃ, তুই ঘরে যা । মেলা কথা বলিস না ।— ধমকে ওঠে পারুলের কাকা ।

গোবর্ধন মণ্ডল কিন্তু মিছরিমাখা গলায় বলেন, ছেড়ে দে বাবা । কিছু বলিস না । ওরা মায়ের জাত । কিন্তু আমার কথাটা শোন কিছু করতে হবে না । থানায় গিয়ে কিছু বলতেও হবে না । শুধু কেস যেদিন উঠবে সেদিন সাক্ষী দিতে যাসনি । বাড়িতে একটা বড় মেয়ে আছে । আর একটা বড় হচ্ছে । ছেলেটাকে মানুষ করতে হবে । এসব কথাও তো মাথায় রাখতে হবে ।

আরও কিছুক্ষণ ধানাই-পানাই করে চলে যান গোবর্ধনবাবু । কিন্তু তার পরের দিন আবার আসেন । তার পরের দিনও । রোজই । কখনও তিনি নিজে । কখনও তাঁর চেলারা । পারুলের বাবা-কাকার হাতে টাকা গুঁজে দেয় । চালের বস্তা ঢুকিয়ে রাখে রান্নাঘরে । নিচু গলায় ফিসফিসিয়ে বাড়াতে থাকে টাকার অঙ্ক । নাকের ডগায় গাজরের মতো ঝোলাতে থাকে একটা শ্যামলা মেয়ের জীবনের বিনিময়ে সারা পরিবারের নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন ।

কেস ওঠে বারো দিন পরে । বাদী পক্ষের কেউ সাক্ষী দিতে আসেনি । কিন্তু তবু তো খুনের মামলা । তাই আবার দু সপ্তাহের পুলিশ হেফাজত হয় পরেশের ।

রাস্তায় একদিন পারুলের বাবাকে দেখে চমকে ওঠে মঞ্জু । পরিষ্কার ধুতি-শার্ট পরা । ক্ষৌরি করা গাল । তবে কি লোকে যা ফিসফাস করছে সবই সত্যি? গোবর্ধন মণ্ডল পয়সা দিয়ে কিনে নিয়েছে পারুলের বাড়ির লোকজনকে? পরেশের ছাড়া পাওয়া এবার শুধু সময়ের ওয়াস্তা ।

আরও দুবার কেস ওঠে । সাক্ষী না থাকায় হেফাজতের মেয়াদ বাড়ে । থানা থেকে খবর নেন গোবর্ধন মণ্ডল । এবার কেস যখন উঠবে বাদী পক্ষের সাক্ষী না থাকলে জামিন হয়ে যাবে পরেশের । মামলা অবশ্য চলবে । কিন্তু তাতে কী? ছেলে ঘরে ফিরলে বড় উকিল লাগিয়ে ও মামলা যে শেষ পর্যন্ত খারিজ করাতে পারবেন, এমন বিশ্বাস গোবর্ধন মণ্ডলের নিজের ওপর আছে । দশ লক্ষ টাকা আর পাঁচ বিঘে জমি

হারাধনদের দুই ভাইয়ের নামে লিখে দেবেন । কাগজপত্র সব তৈরি । সহজে অবশ্য হয়নি । দুই ভাই-ই বেগড়বাঁই করেছে অনেক । মেয়ের জন্য দরদ উথলে দিয়েছে । পাঁচ লাখে হয়ে যাবে ভেবেছিলেন । দশ লাখ পর্যন্ত উঠতে হল । সঙ্গে চাপা শাসানি । জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করার ফল যে ভালো হয় না তার নানারকম উদাহরণ ।

শেষকালে একদিন পোটকা গিয়ে বড় মেয়েটার সঙ্গে খানিক গল্প-গাছা করে আসার পর সব ঠান্ডা হয়ে গেল । পার্টি ক্ষমতায় থাকলে অবশ্য এত ঝামেলা পোহাতে হত না । পাশা উলটে যাওয়ায় একটু সমস্যা হয়েছে । ব্যবসাপত্তরগুলো সময়মতো গুছিয়ে নেওয়া গেছিল বলেই বাঁচোয়া ।

২৪ জুন । আজ আবার পরেশের কেস উঠবে আদালতে । এবারটা সামলানো গেলেই জামিন । সকালেই নেতাইকে হারাধনের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন গোবর্ধন মণ্ডল । অ্যাটাচিতে দশ লাখ টাকা আর জমির দানপত্র । পরেশের জামিন হয়ে গেলেই মোবাইলে খবর দেবেন নেতাইকে । ব্যাঙ্কে সব ফিট করা আছে । কাগজপত্র হাতে দিয়ে নেতাই নিজে দুই ভাইকে বাইকে চাপিয়ে ব্যাঙ্কে নিয়ে গিয়ে আলাদা আলাদা নামে টাকা জমা করে দেবে । গোবর্ধন নিজে আদালতে থাকবেন । একেবারে ছেলেকে নিয়ে ফিরবেন ।

কী ভেবে বেরোনোর আগে নেতাইকে ডেকে গোবর্ধন বলে দিলেন, মেশিনটা সঙ্গে নিয়ে যা । গরিব লোক তো । হঠাৎ মাথা গরম হয়ে যেতে পারে । একবার জামাটা তুলে দেখিয়ে দিবি, ঠান্ডা হয়ে যাবে ।

সকাল সকালই চলে এসেছে নেতাই । বারান্দায় প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে আছে আরাম করে । বাড়ির কেউই আজ ঘর থেকে বেরোয়নি । দাওয়ায় বসে একটার পর একটা বিড়ি খেয়ে যাচ্ছে হারাধন । বকুলের কাকা চা খেয়ে আবার কাঁথামুড়ি দিয়েছে । ছোট ভাই-বোনদুটো বই-শেলেট নিয়ে বসেছে । রান্নাঘরের সামনে কুটনো কুটছে বকুল । উনুনে ভাতের হাঁড়ি বসিয়েছে কাকিমা । রান্নাঘরেরই একপাশে বসে আছে পারুলের মা । চোখে ভাষা নেই । শুধুই বোবা কান্না । ভয় আর অপরাধবোধের একটা গুমোট কম্বল যেন ঢেকে আছে গোটা বাড়িটাকে ।

বসে বসে ঢুল আসছিল নেতাইয়ের । হঠাৎ পায়ের শব্দে চটকা ভাঙল । ভাঙা বেড়ার গেটটা পেরিয়ে ছুটে ঢুকছে একটা মেয়ে । নীলপাড় শাড়ি পরা । মেয়েটাকে চেনে নিতাই । পোস্টাপিসের বাবুর মেয়ে । মঞ্জু না কী যেন নাম....মরা মেয়েটার বন্ধু ছিল...এ আবার কী ঝামেলা পাকাতে এল.... ভাবতে ভাবতেই চিৎকার করে ওঠে মঞ্জু, কাকিমা...আ...কাকিমা গো ..., পারুল ফার্স্ট হয়েছে, ফার্স্ট হয়েছে, স্টার পেয়েছে কাকিমা.... চারটে লেটার পেয়েছে... আমাদের সবার থেকে বেশি নম্বর পেয়েছে গো পারুল...সব থেকে বেশি... ।

ছুটে বেরিয়ে এসেছে পারুলের কাকিমা । বিদুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠেছে মা । বঁটি ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে বকুল।

আমি ভ্যান রিকশা নিয়ে এসেছি কাকিমা, মঞ্জুর গলা কাঁপছে ।

দিদি চলো ।—আঁচলটা কোমরে গুঁজে নিয়ে পারুলের মায়ের হাত ধরে টানে কাকিমা । কোন এক অমিতশক্তিতে ভর করে এগিয়ে আসে মা-ও ।

অ্যাই অ্যাই, কেউ কোত্থাও যাবে না । অ্যাই ছুঁড়ি, ভাগ এখান থেকে...নইলে... । — লাফ দিয়ে এগিয়ে এসেছে নিতাই । কোমরে লুকিয়ে রাখা মেশিনটা মূহূর্তে হাতের মুঠোয় ।

কাকে মারবে তুমি? ক’জনকে মারবে?—কোমরে হাত দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে মঞ্জু ।

চমকে উঠে নেতাই দ্যাখে বেড়ার ধারে নীল পাড় সাদা শাড়ির ভিড় । শ্যামলা মুখ, শক্ত চোয়াল । আরও আসছে । অনেকে । দূরের আলপথ ধরে ধেয়ে আসছে ।

বাড়ির সামনে রাখা ভ্যান রিকশায় ততক্ষণে চেপে বসেছে পারুলের মা । উঠতে গিয়েও থেমে যায় কাকিমা । নেতাইয়ের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, তোর মালিককে গিয়ে বলিস, আমাদের মেয়ে ফার্স্ট হইছে রে...লেটার পেইছে । এসব কথার মানে জানে না তোর মালিক । মানেটা শিখে নিতে বলিস ।

ভ্যান রিকশা ছেড়ে দেয় । নীলপাড় সাদা শাড়ির নিরাপত্তারক্ষীদের পাশ কাটিয়ে এগোতে থাকে শহরের দিকে । ভেঙে খানখান হয়ে যাওয়া স্বপ্নগুলোকে আবার নতুন করে বুনতে শেখায় শক্তি সংগ্রহ করতে ।

গোলা

জয়ন্ত দে



নোটন মার্ডার হল ।

নোটনকে মার্ডার করল ছক্কারা । ছক্কারা নোটনকে কীভাবে মেরেছিল এখন আমরা সবাই তা জানি । আমরা মানে আলোদার ছেলেরা । বা পাবলিকের ভাষায় বললে আলোর গ্রুপের ছেলেরা ।

কিন্তু নোটন যখন বেঁচে, আমরা তখনই আঁচ করতে পেরেছিলাম সে মরতে চলেছে । এই মৃত্যুর আঁচ হয়তো আরও অনেকে করেছিল । তারা আলোদার লোকজন নয় । তারা নোটনকে চেনা বান্ধবনগরের পাঁচ পাবলিক । তারা সাহসে ভর দিয়ে মুখে বলত না । কিন্তু বলত, নির্ঘাত বলত, গিলতে গিলতে এবার লিভার ফেটে মরবে ছেলেটা ।

এই লিভার নিয়ে নোটনের নিজেরও চিন্তা ছিল । তাই সকালের ভাতে পেঁপে সেদ্ধ তার চাই-ই । সকালের ভাত মানে ন'টা নাগাদ ঘুম ভাঙার পর ব্রেকফাস্ট কাম লাঞ্চ কাম সারাদিনের বাড়ির খাবার এটাই । নোটনের পেঁপে সেদ্ধ খাওয়ার মধ্যে লিভারের দর্শন ছিল । সেদ্ধ পেঁপে লিভার চাঙ্গা রাখে । তেমনই ওর অদ্ভুত যুক্তি ছিল এক বেলা ভাতের । নোটন বলত, চার বেলা বাড়ির ভাত খেয়ে লোহা-লক্কড়ের কারবারি হওয়া যায় না ।

আমরা আলোদার উদাহরণ দিতাম । বলতাম, এক নম্বর কারবারি তো আলোদা, নোটন হাসত । বলত, আলোদা খোদ কোম্পানি । আর আমরা হলাম লোহা লক্কড়ের খুচরো বিক্রেতা ।

তো এই এলাকার এক নম্বর কোম্পানি আলোদা বলত, লোহা লক্কড় কোমরে নিয়ে ঘুরলেই কেউ কারবারি হয় না। তোকে সবাই জানে— তুই মাতাল । নেতা সেজেছিস মদো মাতালের ।

তবু আমরা সেই মদো মাতালরাও মিলে মিশে আলোদাকে ঘিরে প্রত্যহ নরক গুলজার করি । আর এখানেই আমরা মাঝে মাঝে এঁকে ফেলি নোটনের মৃত্যুদৃশ্য । আমাদের সামনের চেয়ারে নোটন । সে তখন দাঁতে নখ খোঁটে । মরণদৃশ্যটা আমরা এভাবে আঁকি, বান্ধবনগর পোস্ট অফিসের উলটো দিকের সেই গলি । গলিটা এঁকে বেঁকে নোটনের বাড়ির দিকে গেছে । নোটন মধ্যরাতে সেই রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরে । রাস্তার ধারে পর পর ক'টা ডোবা আর পুকুর । আমরা বলেছিলাম, সেই পুকুরের কথা । এঁকে ছিলাম, সেই পুকুর ভরা জলের ছবি ।

এটা ছিল স্রেফ সাদা কালো একটা দৃশ্য । এখানে যে যেমন খুশি রং দিত । রং ছেটাত । কেউ বলত, জলে একবার পড়লে ও হাঁটু জলে হাবুডুবু খেয়েই শেষ । কেউ বলত, পাঁকে মুন্ডু গুঁজে যাবে । আর নেশার ভারে বাটখারা হয়ে ওই মুন্ডু টপ করে গেঁথে যাবে ।

নেশা করে করে নোটনের এখন হাত পা কাঁপে। ও যদি পুকুরে পড়ে আর উঠতে পারবে? আমাদের কথা শুনে নোটন হাসত। বলত, এখানকার সব পুকুরের দম আমি জানি— কেউ আমাকে হজম করতে পারবে না!

এবার আমাদের আঁকা নোটনের মরণ দৃশ্যে রং দিল আলোদা।

বলল, ছক্কার কথা।

আলোদার কাছের ছেলে নোটন মানতে পারল না এ কথা। ও কাঁপা হাত উঁচিয়ে বলল, ছক্কা ভালো হতে চায় আলোদা।

আলোদা বলল, ছক্কা ক্রিমিনাল।

আজ আমার নাইট ডিউটি। অগত্যা সকালে আলোদার অফিসে। খবরের কাগজ থেকে মুখ নামিয়ে আমি বললাম, এলাকার লোকে কিন্তু আমাদেরও ক্রিমিনাল বলে।

আলোদা বলল, আমাদের বলছিস কেন? বল, তোমাদের!

আমি বললাম, অবশ্য ক্রিমিনাল বলার আগে পলিটিক্যাল কথাটা জুড়ে দেয়।

আলোদা বলল, ওই জন্যেই তো পার্টিটা ছাড়লাম। সকলের মনে রাখা উচিত বয়েস বাড়ছে। এখনও আমাদের চলতি আছে। যে যেভাবে পারিস ব্যবসা ধান্দা করে গুছিয়ে নে।

আমি চাকরি করি। এমন চার-ছ'জন। আর সবাই ধান্দা খুঁজছে। আর ধান্দার তো এখন একটাই জাতীয় সংগীত— কনস্ট্রাকশন। যে সংগীতের মুখড়া দালালি, অস্থায়ী ইট বালি সাপ্লাই, অন্তরা প্রমোটিং।

আর এইসব কাজকারবার লাগলে ভালো, না লাগলে ছিঁচকে ! তো আমাদের সবার সব রকম ধান্দা ছিল। হাতে কলমে না থাকলেও মনে মনে তো ছিলই। কিন্তু নোটনের একটাই ধান্দা ছিল, সে মদ খাবে। দিনে খাবে, রাতে খাবে, সারা দিন খাবে। আমরা ওকে বোঝানোর চেষ্টা করতাম সারা দিন খাস না। রাতে খা আর দশটা বাজার আগে বাড়ি ঢুকে যা। নোটন আমাদের কথা শুনত এই পর্যন্তই। পাত্তা দিত না। বলত, এখন আমাদের ভালো টাইম। কোনো ঝামেলা নেই। যখন সাহেব বাগানের চিল্কা, কালী বাড়ির যিশু-নয়নরা ধরলেই দানা ভরে দিত তখনও আমি এমনই থেকেছি।

নোটনের কথায় আলোদা চোখ বন্ধ করল। তারপর আমাদের আঁকা নোটনের সেই মরণ-দৃশ্যের ওপর ভয়ঙ্কর এক পোঁচ কালি বুলিয়ে দিত। বলত, ছক্কারা তোর জন্যে একটাও দানা খরচ করবে না। সেরেফ একটা ধাক্কা মেরে পুকুরে ফেলে দেবে। নোটন তোর নম্বর লেগে গেছে!

নোটন দু'হাতের চেটোয় মুখ মুছে আমাদের কথাও মুছে ফেলত। তবে এসব কথায় সব সময়ই ও কিছু একটা বলত বিড় বিড় করে। যা আমরা শুনতে পেতাম না।

এদিকটা আমাদেরই চলতি। আগে আমরাই পার্টি ছিলাম। পার্টির জন্যে ইলেকশন করতাম। আর পার্টি আমাদের পুলিশটা দেখে দিত। আমাদের যা ক্রিমিনাল অ্যাকটিভিটি সব ওই ইলেকশনের আগে পিছে। আর ইলেকশনের দিন আমরা খুল্লাম খুল্লা ওয়ান ডে খেলে দিতাম। এতেই আমাদের বারো মাস চলে যেত। পার্টি প্রশাসন আমাদের। ফলে গড়িয়ে খেলেও ফুরোত না। আর বাদবাকি যেটুকু হাত চালাতে হত তা কিছুটা সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায়, কিছু অন্য কোনও দাদা গজালে। তারপর এত বড় টিম, এত বড় এলাকা— ঝামেলা তো আছেই।

তবে ঝামেলা ইদানীং বেড়ে গিয়েছিল পার্টির মধ্যে। পি.এস. পুলক সেনের সঙ্গে আলোদার চিরকেলে খিঁচ। ইলেকশনের আগে আলোদাকে বলা হল, তোমরা বুথ নেবে। ফ্রেশ ছেলে এলাকা চমকাবে। তো ফ্রেশ ছেলেরা এল মহেশতলা থেকে। তারা শেষ তিন দিন থেকে মাল মাংস ধ্বংস করে বুথ চিনল, এলাকার অলিগলি চিনল, বেছে বেছে দু-চারটে বাড়ি, ছ'-আট জন লোক চিনল। ওদের মদ থেকে মেশিন সব দায়িত্ব আলোদার। তারপর ওয়ান ডে ম্যাচ হয়ে গেল। আর শেষে পার্টি ডেকে বলল, তোমাদের সমাজবিরোধী কার্যকলাপের জন্যে পার্টির দু'পার্সেন্ট ভোট কমেছে।

আলোদা চোখ বন্ধ করে বলল, থার্টি পার্সেন্ট ছাপ্পা, টেন পার্সেন্ট চমকানো। এক-একটা বুথে নাইন্টি সিক্স নাইন্টি সেভেন পার্সেন্ট পোল করিয়ে দিলাম, তবু টু পার্সেন্টের কেস! সমাজবিরোধী! ইদানীং সব ইলেকশন শেষেই এক গীত। পুলক সেন হাসছে।

আলোদা পার্টি ছেড়ে দিল। আলোদার সঙ্গে আমরাও।

তবু এ এলাকায় আলোদাই শেষ কথা বলে। আর শেষ কথা বলার হক যেহেতু আলোদার, ফলে আমাদের কাছে কেসের অন্ত নেই। প্রতিদিনই কেউ না কেউ আসে আমাদের কাছে। তারা সবাই আমাদের দিয়ে আলোদাকে ধরতে চায়। তাই তারা প্রথমে আমাদের ধরে। ফলে তারাই আমাদের স্পনসর।

এছাড়া কাউকে না কাউকে পাওয়া যায় যে আমাদের মুরগি হয়। তারপর ফাউয়ের টাকা আছে। কেস মেটানোর ধান্দা আছে। তারও পরে বৃষ্টি আছে, শীত আছে। পকেটে ক্যাশ আছে। নাহলে ধার আছে। এবং সর্বক্ষণ বান্ধবনগর পোস্ট অফিসের সামনে নোটন আছে।

আমি চাকরি করি। খবরের কাগজের চাকরি। দুপুরে বেরিয়ে মধ্য রাতে বাড়ি ফিরি। মাঝে মাঝে রাতে বান্ধবনগরের মোড়ের মাথায় নোটনের দেখা পাই। ও কোনোরকমে চোখ টেনে বলে, তোর জন্যে দাঁড়িয়ে আছি পলু। একটু খাবি তো। চিকেন কষা বা রুটি তড়কা যা হোক আনিয়ে নে।

আমি ঘাড় নাড়াই, খাব না। নোটন বলে, তোর জন্যে দাঁড়িয়ে আছি— না খেলে একশো টাকা দিতে হবে।

আমি হাসি— আর খেলে?

নোটনের সোজা হিসেব, ওই একশো। তুই কি ভাবছিস খেলে বেশি নেব?

শেষ পর্যন্ত অবশ্য রফা হয়। তা এক-একদিন এক-এক রকম। এর মধ্যে বেশির ভাগ দিনই ছিল প্রতিশ্রুতি।— আমি পুরো বোতল দেব।—আমি চায়না টাউনে নিয়ে যাব। ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে সব হিসেবপত্রের কথা মিটে গেলে প্রতিবার নোটন একটা প্রশ্ন করত।— তোর হাতে রোজ বই দেখি, সব বই তুই পড়িস পলু?

— না, সব বই পড়া হয় না। কিনে রাখলাম, পরে পড়ব। তাছাড়া কখন কোন বই দরকার লাগে। রইল হাতের কাছে।

আমাদের নিয়ে আলোদা খুব বিব্রত। বলত, এটা মদো মাতালের টিম। আলোদার টিমের এরকম নানা ভাগ। কোনোটা মদো মাতাল। কোনোটা লোহালক্কড় মানে অ্যাকশনের। কোনোটা লাফরা টিম। এই লাফরা টিম বিভিন্ন জায়গায় শুধু ঝামেলা পাকায়। আরও একটা টিম আছে, যাদের দেখিয়ে আলোদা বলে — ওদের দেখ, দেখে শেখ। এরা ব্যবসায়ী। আমরা বলি মুখোশ টিম। ধান্দাবাজদের হাট্টিমা টিম টিম! কিন্তু নোটনের কদর সব টিমে। কেন না নোটন হচ্ছে আলোদার টিমের হোল টাইমার।

আসলে অ্যাকশন টিমের ছেলে নোটন। সেই নোটন এখন মদো মাতাল টিমের অবিসংবাদিত নেতা। এই টিমের পুরনো ছেলে দেবু সকালে খায় না। রাত পর্যন্ত কোচিং ক্লাস। ফলে রাতে সময় পায় না। খেলেও মাপ বাঁধা। আর এক পুরনো ছেলে অনু। ও আগের মতো নেই। মুখ চুন করে বলে— বউ ক্যাচাল করে। ছেলেটা বড় হয়েছে।

তবু পুরনো ছেলে অনেকই আছে। যাবেটা কোথায়? আর নিত্য নতুন ছেলে আসছে। ক'দিনে তারা পুরোনো হচ্ছে। আসলে আলোদার ছেলেদের গ্রুপ সব সময় আলো করা। কেউ না কেউ থেকেই যায়।

ইদানীং আমরা কয়েকজন কিছুটা ছিটকে গেছি। ছুটির দিন ছাড়া পারতপক্ষে ওদিকে যাই না। গেলেও কোনো ঝামেলায় ঢুকি না। হাবিজাবি গল্প করে কেটে আসি। এখন মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করি, কী করতে চাইছে ওরা সবাই? শুধু কি একটাই কাজ— নিজেদের চলতি করা। এলাকায় কায়েম রাখা?

একদিন রাতে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে নোটনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নোটন বলল, পলু একটা জিনিস দেখবি? আমি বললাম, কী?

নোটন প্যান্টের পিছন কোমর থেকে একটা রিভলভার বের করল। বলল, ফরেনের মাল। জাপানি। হেভি জিনিস। পঁচিশ চাইছে। ভাবছি রেখে দেব।

আমি বললাম, আর এসবে কী হবে নোটন? লোহা লক্কড়ের গল্প ছাড় না।

নোটন হাসল। বলল, যদি কোনো সময় দরকার লাগে। তারপর নোটন আরও হাসতে হাসতে বলল, তুই এত বই কিনিস কেন পলু? সব তো পড়িস না বললি। তোর মতোই আমিও কিনে রাখছি, যদি কখনও দরকার পড়ে। রইল হাতের কাছে।

দুই

নোটন মার্ডার হল।

নোটনকে মার্ডার করল ছক্কারা। মার্ডার করে ওরা সাত সকালেই চলে গেল পুলিশের কাছে। ওদের কাছে পুলিশ হেপাজতই তখন সব থেকে নিরাপদ। ওরা জানত আলোদার কাছের ছেলে নোটন। আলোদা ওদের ছাড়বে না। তবে পার্টি ওদের পিছনে। পার্টি মানেই আইন প্রশাসন। তাই আপাতত সেফ জেল কাস্টডি। তারপর এলাকা ঠান্ডা হলে বেরিয়ে আসবে।

জেল থেকে খবর আসছে— ওরা কীভাবে নোটনকে মেরেছে। জেলে ওদের ফাইলের যে মেড তার থেকে খবর আসছে। ওদের ফাইলের অন্য গ্রুপের ছেলে পত্তর নোটন খুনের গল্প শোনাচ্ছে ইন্টারভিউতে।

আমরা শুনছি আর আশ্চর্য হচ্ছি। —আরে এ যেন হুবহু আমাদের সেই বলে দেওয়া কথা। আমাদেরই এঁকে ফেলা নকশা! সেই পোস্ট অফিসের উলটো দিকের গলি। সেই মদ খেয়ে বাড়ির দিকে হেঁটে যাওয়া মাতাল নোটন। মধ্যরাত। ওরা নোটনকে ডেকেছিল। বলেছিল, নোটন এসো একটু খেয়ে যাও।

মদলোভী নোটন 'না' 'হ্যাঁ' করে বসেছিল ওদের সঙ্গে। তারপর সুযোগ বুঝে একজন ওকে জড়িয়ে ধরে। আর একজন পরনের উইন্ডচিটার খুলে হাতা দিয়ে ফাঁস দিয়ে দেয় নোটনের গলায়। তার আগে কী একটা ব্যাপার নিয়ে নোটনের সঙ্গে ঝামেলা লেগেছিল ওদের। কী নিয়ে ওই ঝামেলা তা জানার আমাদের আগ্রহ নেই। কারণ ঝামেলাটা ফালতু! ঝামেলাটা স্রেফ গেম প্ল্যান। পোস্ট অফিসের গলিতেই নোটন মরেছে। তারপর ওকে টানতে টানতে ফেলে দিয়েছে দূরে।

কী আশ্চর্য আমরা— আলোদার কথা মিলে গেছে। নোটনকে মেরেছে সেই ছক্কা। আর মারতে একটাও দানা খরচ করেনি। সেরেফ উইন্ড চিটারের ফাঁস, ব্যস!

মদ খেতে খেতে মরে এসেছিল নোটন। ওর হাত পা কাঁপত। ওর কথা জড়িয়ে যেত। ওর মুখের চামড়া তেলা আর লাল হয়ে গিয়েছিল। আলোদা বলত, ওর নম্বর লেগে গেছে।

আমরা হাসতাম। নোটনও হাসত। নোটন বলত, মদ খেয়েই তো অ্যাকশন করেছি— এখন অ্যাকশন নেই বলে মদ ছেড়ে দেব? আর যে দিন থেকে লাইনে এসেছি সে দিনই নম্বর লাগিয়ে এসেছি।

এই লাইন কথাটা আলোদা বলত। লাইন কথাটা নোটনও অবলীলায় বলতে পারত।

নোটনের লাইনে কেমন যেন আলো আর আঁধার থাকত। সেখানে কেমন যেন ঘোর ঘোর এতোল বেতোল পা ফেলা। যেন উলটো দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ট্রেন ছুটে আসছে। দু'চোখ অন্ধ করে দেওয়া তার আলো। গম গম চাকার ঘষটানিতে মৃত্যুর গান।

আগে লাইনের কথায় রোমাঞ্চ হত। অ্যাকশন করতে পারতাম না। কিন্তু অ্যাকশনের কথায় ছটফট করতাম। মারপিটের গল্প পেলে হাঁ করে বসে গিলতাম। কী ভয়ঙ্কর এক একটা গল্প! ওরা চিঙ্কাদের সঙ্গে লড়ছে। কীভাবে আলোদা একা একা ওদের এলাকায় ঢুকছে, এ হাতে রিভলভার, ও হাতে বোম। ওরা যিশু নয়নদের সঙ্গে লড়ছে। রাত নামলেই এলাকা কুরুক্ষেত্র। টান টান উত্তেজনা। দিনে সবার দেখা পাওয়া যায় না। সন্ধে নামলেই সবাই জড়ো হয়। তারপর চিঙ্কা এলাকা ছাড়ল। যিশু-নয়নও হাওয়া।

আলোদা বলে, পিসফুল এলাকা! আলোদা বলে, কিন্তু আমাদের লাইফ পিসফুল নয় । যে-কোনওদিন যে-কেউ সদর দরজার সামনে মার্ডার হয়ে যাবে । কে কোথায় আমাদের কী গেম সাজাচ্ছে আমরা জানি না ।

আলোদার কথায় আমার ভয় করত । মনে হত আমারও যেন মৃত্যু বাঁধা । ছুরি গুলি বোমা । বোম গুলি ছুরি ।

এখন এসব কথা শুনলে গা গুলিয়ে ওঠে । মনে হয় সব যেন অচেনা । আমি ক্রমশ সরে আসছি । চার বেলা বাড়িতে খাই । ইদানীং অন্ধকারে ওদের মুখগুলো বড় অচেনা ঠেকে! আলোয় এলে ওদের চেনার চেষ্টা করছি । ওরা কি আলো আর অন্ধকারে পালটে পালটে যায়? কেমন সবাই বলে আমারও কি তাই মনে হয়? তবু যাই । ঘুরে ফিরে ওদের কাছাকাছি চলে যাই । নাইট ডিউটি থাকলে সকালে যাই । ছুটির দিনে রাতে । পাড়ার মেয়ে গিতুর সঙ্গে প্রেম করি । করি না করতাম— কে জানে? সারা সপ্তা ধরে গিতুকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করি । ভুলে যাই । কিন্তু ছুটির দিন সন্ধেবেলা গিতু ঠিক টেনে নেয় আমাকে । আগে ওকে নিয়ে বন্ধ ই সি এলের ভেতরে ঢুকতাম । এখন গ্রুপের কারোর নির্মীয়মাণ ফ্ল্যাটবাড়িতে ঢুকে পড়ি । মিস্তিরিদের কাছ থেকে মাদুর নিয়ে তিনতলা, চারতলায় উঠে যাই । আমি ক'টা খবরের কাগজ নিয়ে আসি । মাদুরে পেতে দারুণ বিছানা করে ফেলি । গিতু আনে মশার জন্যে কয়েল । আমি তখন ওর শরীরে মুখ রগড়াই । গিতু আমাকে প্রশ্রয় দিতে দিতে বলে— এবার একটা ফ্ল্যাট কেনার ধান্দা করো । চার তলায় নেবে । টপ ফ্লোর। আমরা জানলা খুলে শোব । অত ওপরে মশা থাকবে না ।

আমি গিতুর ওপরে শুয়ে হৈমন্তিকার কথা ভাবি । ক্রেডিট কার্ডের চেক নিতে আসা হৈমন্তিকাকে ব্যাপক লাগে । ফোনে গল্প করি । ও মোবাইলে মেসেজ পাঠায় । আমি কাজের ফাঁকে আঙুল আর নখে উত্তর দিই । এমন উত্তর যাতে দু'রকম মানে হয় । বন্ধু বললে বন্ধু, অন্য কিছু হলে অন্য কিছু!

নীচে নামার সময় গিতুকে বলি, আগে যাও ।

গিতু ফুঁসে ওঠে, কেন আমরা কি চুরি করছি?

— ফাঁকা বাড়ি থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে শুধু শুধু কেস খাবার কোনো যুক্তি নেই ।

গিতু তেড়িয়া হয়ে জবাব দেয়, যারা কেস দেবে তারা তো হয় ঝি নয় অন্যের বউ নিয়ে ঢোকে! তুমি কি তাই? আমরা সবার সামনে দিয়ে প্রেম করব ।

গিতু বোঝে না । ও বড় রাস্তায়, আলোতে এসেও আমার শরীরের সঙ্গে মিশে হাঁটতে চায় । অন্যদের দেখিয়ে দেখিয়ে জোরে জোরে হাসে । এটা খাওয়াবে? ওটা খাওয়াবে— করে বায়না জোড়ে । টাকা দিয়ে কেটে আসি ।

এ সময় আমার মানি ব্যাগে বেশি টাকা দেখলে গিতু কেমন ভয় পায়! বলে, এত টাকা নিয়ে মাল খেতে যাচ্ছ? আমার কাছে রেখে দাও— কাল নিয়ে নেবে ।

আমি যে গিতুকে বলতে পারি না, কাল যে তোমাকে ভুলতে চাই! এই রাত থেকেই তোমাকে ভুলে যাওয়ার অভ্যেস করব! গিতু জানে না, আজ ওর নগ্ন পিঠে আমি একটা একটা আঙুল আর নখ ছুঁইয়ে হৈমন্তিকার জন্যে মেসেজ ভাসিয়েছি! এ সপ্তাহে আমার দুদিন নাইট ডিউটি । নাইট ডিউটির সময় হৈমন্তিকার সঙ্গে দেখা হয় । ও আমাকে ওর অফিসের অনেকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে । আমি বুঝি ও কোথাও আলাপ করানোর সময় আমার আগে আমার অফিসের নামটা বলে । খবরের কাগজের নামে কেমন এক জাদু আছে!

ইদানীং আমার পাড়ার বন্ধুরাও তাই করে । ওদের সঙ্গে তাল রেখে আমিও করি । তাতে রেজাল্ট বেশ ভালো! আমার দিকে সবাই কেমন এক সম্ভ্রমের চোখে তাকায় । এলাকার নতুন কেউ আমার সঙ্গে মিশলে, প্রথমে ঢোঁক গিলে, তারপর পারমিশন নিয়ে বলে— ওদের সঙ্গে কী করে মেশেন?

ওরা মানে আলোদা? ওরা মানে আমার বন্ধুরা— আলোদার ছেলেরা ।

এসব কথায় এখন আমি দারুণ হাসতে শিখেছি । হাসতে হাসতে প্রশ্নকারীকে এক গোলকধাঁধায় ফেলে দিই! সে তার সমস্ত চিন্তাভাবনা নিয়ে গোলকধাঁধায় ছোটাছুটি করে । আমি হেসে যাই । হাসতে হাসতে চেপে যাই ওদের সঙ্গে মিশে আমি বড় হয়েছি, বাঁচতে শিখেছি! এসব কথা চেপে আমি বলি— আমি কাজের স্বার্থে মিশি! আর তারা সাহস পেয়ে বলে, ওরা আপনার লেখার সোর্স— তাই বলুন! ঠিক সন্দেহ করেছি ।

যথারীতি আমি হাসি । এ হাসিটা আমি আলোদার কাছ থেকে শিখেছি । এই হাসিতে নিজেকে চেপে যাওয়ার কথাটাও আমি আলোদার কাছ থেকে রপ্ত করেছি ।

এ কায়দায় আলোদা ওদের মদো মাতালের টিম বলে ঘেন্না ঘেন্না করে । অ্যাকশনের মারকুটে ছেলেদের লোহালক্কড়-এর টিম বলে নির্লিপ্ত মুখে তাকায় । যেন এরা আলোদার কেউ নয় । যেটুকু তা শুধু বিরক্তি । এ চালে নতুন যারা তারা খুব ঘাবড়ে যায় । আমরা আলোদার ডায়ালগে হো হো করে হাসি ।

আর অলোদা মুখোশ টিমকে দেখিয়ে বলে, ওদের কাছ থেকে শেখ । আমরা বুঝি, ইদানীং এদের কাছ থেকেই আলোদা বেশি শেখে । এটা অন্য ছেলেরা শিখবে কী করে, শিখতে গেলে যে বাবার টাকা লাগে । আসলে আলোদা নিজেকে আড়াল করে ।

আমিও নিজেকে আড়াল করি । পুরনো বন্ধুদের কাছে ভদ্র ভালো ছেলে হয়ে যাই । অফিসে গুলি বোমা ছুরির গল্প করি । হৈমন্তিকার কথা ভাবতে ভাবতে গিতুর শরীরে মুখ গুঁজে থাকি ।

আসলে আড়ালের ওপারে আমি । আড়ালের এপারে আমি । আমি নিজেকে দেখি । কোথায় যেন একটা চোরা টান। ফলে অমাবস্যায় পূর্ণিমায় দিকভ্রান্তের মতো ফুলে ফেঁপে ছুটি । মদো-মাতালের টিমে ভিড়ে গিয়ে গেলাসে মুখ থুবড়ে বসি ।

বোতল থেকে মদের সঙ্গে গেলাসে গেলাসে নোটনের কথা বিলি হয়ে যায় । যথারীতি নোটনের কথায় গলা-বুক জ্বালিয়ে মদ ঢালি । গেলাসে কালচে-লাল তরল । ঝটকা মেরে দেখি নোটনের গলায় ফাঁস হয়ে বসা উইন্ডচিটারের রং কি এমনই ছিল? চিৎকার করি, গেলাসের রংটা ফিকে করে দে । জল ঢাল । তবু পেটের গহ্বরে চলে যেতে গিয়ে সে তরল গলা রুদ্ধ করে । মনে হয় ফিকে লাল একটা উইন্ডচিটার! তবে কি নোটন একা নয় আমাদেরও শ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছে রংবেরঙা এক একটা উইন্ডচিটার ।

তিন

এরকমই একটা ছুটির দিনে ঠেকে যাব না, যাব না করে চলে গেছি । তার আগে সন্ধেবেলা গিতুর শরীরে শরীর রেখে হৈমন্তিকার দিকে মন উড়িয়ে দিয়েছি । ফিসফিস করে গিতুকে বলেছি, আমাকে ছেড়ে দে ।

গিতু বলল, চলো বিয়ে করি ।

— আমার কিছু ভালো লাগছে না ।

গিতু বলল, তখন রোববারের জন্যে হা পিত্যেস করে বসে থাকতে হবে না, রোজ পাবে ।

আমি বললাম, আমি তোমায় ভালোবাসি না! খালি মনে হয় তুমি আমার গলা টিপে ধরেছ ।

গিতু আমাকে গা থেকে ঝটকা মেরে ফেলে লাথি ছুড়ল । বলল, তবে রোববার হলেই এসে মুখ রগড়াও কেন? বিষ ওগরাতে!

আমি কোনো কথা বললাম না ।

গিতু বলল, এবার বলো, কে কার গলা টিপল!

ঠেকে এসে না না করেও নেশা চড়িয়ে ফেললাম । উইন্ডচিটার-রঙা মদ! খাচ্ছি আর ভাবছি, কে কাকে গলা পেঁচিয়ে মারছি— গিতু আমাকে? না আমি গিতুকে?

গলায় হাত বোলাতে বোলাতে ঠেক থেকে বাড়ি ফিরছি । আমাদের বাড়ির সামনে লাফরা জগার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল । আমাকে দেখে লাফরা জগার ভাই দাঁত কেলিয়ে বলল, পলুদা ঠেক থেকে ফিরছ? নিশ্চয় পোগ্গাম ছিল?

আমি দেখলাম জগার ভাইয়ের হাতে কালো রঙের ব্যাগ। ব্যাগের ভেতর কী যেন ধড়ফড় করছে। বুঝলাম কারও বাড়ি থেকে নির্ঘাৎ কিছু ঝেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, ব্যাগে কী রে?

ও আমার কথা শুনেই কেটে যেতে যেতে বলল, কাল বলব।

আমি খপ করে ওর চুলের মুঠি চেপে ধরি।— পেটে এক লাথি মারব। কী নিয়ে যাচ্ছিস আগে দেখা।

লাফরা জগার ভাই তেরিয়া হয়ে বলল, তুমি কিন্তু মাল খেয়ে বাওয়াল করছ পলুদা।

—তুই আমার বাড়ির সামনে থেকে চুরি করে যাবি, আর আমি তোকে ছেড়ে দেব। কথা শেষে ওর গালে একটা চড় কষালাম।

চড় খেয়েই ও বলল, ঠিক আছে— তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, মাল খালাস করে দিচ্ছি।

আমার সামনেই ও ফস করে ব্যাগের চেন টানল। ব্যাগটা খুলতেই দেখলাম— ভেতরটা নিশ্চুপ অন্ধকার! জগার ভাই ব্যাগের মুখ হাঁ করে বলল, নিয়ে নাও। ব্যাগটা আমার।

ব্যাগের পেটের অন্ধকারে আমার কেমন গা শিরশির করছে। আমাকে ভেতরে হাত দিতে বলছে, কী আছে ভেতরে? হাত দিলে কি কামড়ে দেবে? এ শালা আমাকে কামড় খাওয়াতে চাইছে!

আমি দাঁত ঘষটে বললাম, চালাকি করছিস আমার সঙ্গে!

জগার ভাই বলল, চালাকির কী আছে। বলেই ও ব্যাগ উলটে দিল। ব্যাগের ভেতর থেকে থস থস করে দুটো নিষ্প্রাণ পায়রা পড়ে গেল মাটিতে। আর একটা মাটিতে পড়ে মুখ রগড়ে ঝটপট করে উঠল।

আমি কিছু বলার আগেই ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল জগার ভাই তারপর দুটো পায়রাকে হাতে নেড়ে চেড়ে বলল, মালগুলো মরে গেছে পলুদা।

আমি বিড় বিড় করলাম, একটা বেঁচে!

জগার ভাই বলল, প্যারাসুট কাপড়ের ব্যাগ— হাওয়া পাস করেনি, সব কেলিয়ে গেছে।

ব্যাগটা ভাঁজ করে একটুখানি। সেটা হাতের থাবার ভেতর নিয়ে জগার ভাই হাওয়া হয়ে গেল।

দু'পা এগিয়ে বাড়ির গলিপথে দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি। ডাইনে বাঁয়ে এবাড়ি-ওবাড়ির দেওয়ালে, পায়ের নীচে কঠিন মাটি, মাথায় টুকরো করা আকাশ আর সামনে পিছনে নিরেট অন্ধকার। আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। শুধুমাত্র শ্বাস নেওয়ার জন্যে বুকটা হাপরের মতো করে নাকটা মুখটা ওপরে তুলে ধরলাম।

সকালে আলোদার ঠেকে যাওয়ার কথা ছিল না। তবু গেলাম। গিয়ে গড় গড় করে কাল রাতের কেসটা বললাম।

আলোদা বলল, ফালতু ব্যাপার— ছাড় তো পলু।

আমি বললাম, ফালতু ব্যাপার কী— দম বন্ধ হয়ে পায়রাগুলো মরে গেল!

আমার কথা শুনে অনেকে হেসে উঠল।

আলোদা বলল, ওগুলো গোলা পায়রা।

আমি চমকে উঠে আলোদাকে দেখলাম। দিনের আলোর মতো চেনা আলোদাকে ইদানীং চন্দননগর চন্দননগর লাগে। আলোদার সব কিছু যেন এখন টুনি বালবের নকশা ডিজাইন করা। জ্বলছে নিভছে। নিভছে জ্বলছে।

আমি বললাম, গোলা পায়রার জন্যে তোমার কোনো দুঃখ হয় না?

আলোদা দু'হাতে মুখ মুছল। তারপর খুব শান্ত গলায় বলল, তোর প্রতি আমাদের অনেক আশা পলু! আমি তো সবাইকে বলি, পলু আমাদের অনেক বড় হবে। একদিন আমরা গর্ব করে বলব তোর কথা। বলব, পলু আমাদের ছেলে! আজ কত বড় হয়েছে!

আমি বললাম, কত বড় আলোদা? লক্কা হয়ে মেঘ ধরব, না হোমর হয়ে চাঁদ ধরব?

ঠান্ডা চোখে আলোদা বলল, তুই কেন পায়রা হবি?

— কেন হব না? হয় গোলা, নয় লক্কা, নয় হোমর । উইন্ডচিটার, বা প্যারাসুট কাপড়ে তেমন কোনো তফাত নেই আলোদা ।

আলোদা কোনো কথা বলল না । আলোদার গলায় ঘাম । নাকের পাটা ফুলছে । রগের চামড়ার নীচে সেই ঠেলে ওঠা রাগের পোকা । দাঁতে দাঁত চেপে আলোদা কঠিন হয়ে বসে থাকল ।

বেলা গড়িয়ে যায় । ঠেক ভাঙলে একসঙ্গে উঠি । দোতলা থেকে একতলা নীচে নামার সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে আলোদা আমার কাঁধে হাত রাখল । ফিসফিস করে বলল, তবে গোলা পায়রাকেও বেড়ালে খেলে আমার বড় জ্বালা! এই বয়সেও আবার বেড়াল শিকারে যেতে হবে ।

এক পা এক পা করে সিঁড়ি ভাঙি । আমি কি এখন আলোদাকে বলতে পারি, ঠিকই তো বাঘের এলাকায় বিড়াল ঘুরবে তা হয় না! আমি কি এখন আলোদাকে বলতে পারি, বাঘ আর বেড়াল একই!

না বলতে পারি না ।

আলোদার বাইক গর্জন করে ছুটে গেলে সাদা কালো ফিনফিনে ধোঁয়ায় দাঁড়িয়ে থাকি ।

মরীচিকা

অনন্যা দাশ



আমার নাম শৌভিক সেন। আমার একটা পরিচয় হল আমি একটা খুন করেছি, তবে আমার সেই পরিচয়টা কেউ জানে না, অন্তত আমি তাই মনে করি। আমার যে পরিচয়টা সবাই জানে সেটা হল আমি গার্মেন্টস ইন্টারন্যাশনালের মালিক। আমি সমাজে প্রতিষ্ঠিত, সবাই আমাকে সমীহ করে। আসলে যে আমি খুব একটা হিংস্র প্রকৃতির তা কিন্তু নয়, তবে আমি একটু বেশি পরিমাণে স্বার্থপর। অনেকেই হয়তো সেটা মানতে পারবে না কারণ আমি বহু অনাথাশ্রম, মহিলা সংস্থা ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ দিই— কিন্তু সেটাও স্বার্থের কারণে। আসলে কাগজে আমার নাম বড় বড় হরফে বেরোলে আমার খুব ভালো লাগে। আর ছবি বেরোলে তো কথাই নেই! আমি একটা বিলাসবহুল বাড়িতে থাকি, অনেকেই আমাকে টাকার কুমির বলে। আমি অবশ্য তাতে রাগি না, বরং আমার ভালোই লাগে, কারণ অনেক কষ্ট করে এই অর্থ আমি উপার্জন করেছি!

আমার বাবা ছিল সাধারণ এক কারখানার কর্মী। মোটামুটি সংসার চলে যেত আমাদের। আমার যখন আট বছর বয়স তখন একদিন অন্যমনস্ক হয়ে কাজ করতে গিয়ে মেশিনে বাবার ডান হাতটা কাটা যায়। ব্যস, তারপর থেকেই শুরু হয়ে যায় আমাদের চরম দুঃখের দিন। বাবা চাকরি তো হারালই এবং মানসিক দিক থেকেও এতটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল যে, আর কিছুই করতে পারত না। মা বাড়িতে বাড়িতে বাসন-মাজা, কাপড়-কাচা, রান্না-করা শুরু করল। যদিও মার এত কষ্ট সত্ত্বেও স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়নি আমার। মা বড়লোকদের বাড়িতে কাজ করতে যেত— কোনো কোনোদিন শরীর খারাপ হলে আমাকে দিয়ে বলতে পাঠাত। ওদের গাড়ি, আসবাবপত্র, ওদের ছেলেমেয়েদের খেলনা দেখে আমি মনে মনে ভাবতাম আমাকে বড় হয়ে এইরকম বাড়িতে থাকতে হবে, গরিবের জীবনে আমি বেশিদিন থাকব না। মাকে জিজ্ঞেস করলে মা বলত, 'মন দিয়ে পড়াশোনা কর বাবা, তাহলেই অনেক দূর যেতে পারবি।' আমি তাই করতাম। একটা বস্তিতে থাকতাম আমরা। আশপাশের অন্য ছেলেমেয়েরা যখন গালাগালি, খিস্তিখেউড় করত আমি তখন দাঁতে দাঁত চেপে পড়াশোনা করতাম। নিজেকে বারবার বলতাম, আমি ওদের মতো নই, আমাকে অনেক দূর যেতে হবে। আর গেলামও, স্কুলে ভালো রেজাল্ট করে কলেজে ঢুকলাম। এম কম পাশ করে গার্মেন্টস ইন্টারন্যাশনালে চাকরিতে ঢুকলাম, আর সেটাই হল আমার জীবনের যাকে বলে 'টার্নিং পয়েন্ট'। গার্মেন্টস ইন্টারন্যাশনাল একটা ছোট প্রাইভেট কোম্পানি ছিল। মালিক আলোময় সরকার নিজের হাতে সেটাকে গড়ে তুলেছিলেন। আমি প্রচণ্ড খাটতাম, রাতদিন এক করে ওখানেই পড়ে থাকতাম। খুব শিগগিরই আলোময়বাবুর নজরে পড়লাম আমি। আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা শুনে খুব খুশি হলেন উনি, নিজের বাড়িতেও নিয়ে গেলেন। সেখানেই আমার আলাপ হল শ্রেয়ার সঙ্গে।

শ্রেয়া আলোময় সরকারের একমাত্র মেয়ে। দেখতে মোটামুটি সুশ্রী কিন্তু আমার কাছে সে যেন জাদুর জগতের চাবিকাঠি। সেই থেকে শুরু হল আমার জীবনের আরেক অধ্যায়— প্রেমকে ঘাড় ধরে আমার জীবনে টেনে নিয়ে এলাম আমি। ফুল, কবিতা, চকোলেট সব কিছু দিয়ে শ্রেয়ার মন কাড়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলাম। বেশিদিন লাগলও না, তিনমাসের মধ্যেই গলে গেল সে! আরও তিন মাস লাগল ওর মা-বাবাকে রাজি করাতে। শেষ পর্যন্ত তাঁরাও মত দিলেন, কিন্তু একটা শর্তে— বিয়ের পর আমাকে ঘরজামাই হয়ে ওনাদের বাড়িতেই থাকতে হবে। আমি এককথাতেই রাজি। আমার নিজের মা-বাবা ততদিনে গত হয়েছেন, ফলে পিছুটান বলতে কিছু নেই।

শুভ দিনক্ষণ দেখে আমার সঙ্গে শ্রেয়ার বিয়ে হয়ে গেল। শ্রেয়ার সঙ্গে ওদের বাড়িতে থাকতে শুরু করলাম আমি। বিয়ের পর কিন্তু আমি থেমে যাইনি, ঠিক একইভাবে কাজ করে যেতাম আলোময়বাবুর কোম্পানিতে। শ্রেয়া প্রায়ই বলত, 'এত খাটো কেন? মাঝে মাঝে তো বিশ্রাম নিতে পারো, বাবা কিছু বলবে না!'

আমি হেসে বলতাম, 'বা রে! নিজেদের কোম্পানির জন্যে খাটব না তো কার জন্যে খাটব?'

দিন গড়িয়ে চলল। বিয়ের পাঁচ বছর বাদে একটা দুর্ঘটনায় শ্রেয়ার মা আর বাবা দুজনেই মারা গেলেন— না, আমার কোনো হাত ছিল না সেটাতে। আমি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে রাজি ছিলাম। যাই হোক, উইলে দেখা গেল বাড়িটা শ্রেয়ার আর কোম্পানিটা আমার! উত্তেজনায় আমি সেদিন সারারাত ঘুমোতে পারিনি! শ্রেয়া কান্নাকাটি করে ঘুমিয়ে পড়েছিল আর আমি সারারাত জেগে ভেবেছিলাম, এখন কী করব!

পরদিন থেকে আমি গার্মেন্টস ইন্টারন্যাশনালের দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিলাম। কিছু বয়স্ক লোক আমার নেতৃত্বটা ভালোভাবে নিতে পারছিল না। আমি তাদের সসম্মানে রিটায়ার করার প্রস্তাব দিতে তারা মেনে নিল। তাতে আমার লাভই হল, আমি আমার মতন উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোকেদের চাকরি দিতে শুরু করলাম, চড়চড় করে বাড়তে লাগল কোম্পানিটা। খুব শিগগিরই আমরা ভারত ছেড়ে বিদেশেও মার্কেটিং শুরু করলাম। কাজের চাপ বেড়েই চলল। শ্রেয়াকে তাই খুব কম সময়ই দিতে পারতাম। ও কী সব ক্লাব, চ্যারিটি ইত্যাদি নিয়ে থাকত, ঠিক খেয়ালও করতাম না। তবে ও যখন যা চেয়েছে কখনও 'না' বলিনি। এইভাবেই চলছিল সবকিছু— এমন সময় একদিন স্বাগতার আবির্ভাব হল।

আলোময়বাবুর সময় থেকে মিসেস জোসেফ চেয়ারম্যানের সেক্রেটারি ছিলেন। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলা, খুবই এফিশিয়েন্ট এবং নিখুঁত কাজ। ওনাকে নিয়ে আমার কোনো সমস্যা ছিল না, কিন্তু ওনার ষাট বছর বয়স হতে উনি রিটায়ার করবেন ঠিক করলেন। ওনার মেয়ে নাকি বিয়ে হয়ে নাগপুরে সেটল করেছে, ওখানে কিছুদিন কাটাতে চান, ইত্যাদি ইত্যাদি! কী আর বলব? রাজি হলাম। তবে বললাম, 'আপনাকে আমি যেতে দেব মিসেস জোসেফ, তবে নতুন সেক্রেটারি কিন্তু আপনাকেই ঠিক করে দিয়ে যেতে হবে। ওসব শ-য়ে শ-য়ে লোককে ইন্টারভিউ আমি করতে পারব না। স্মার্ট, চৌকশ একজন কাউকে আপনার জায়গায় বসিয়ে আপনার কাজগুলো শিখিয়ে দিলেই আপনার ছুটি!'

মিসেস জোসেফ আমার কথাতে রাজি হলেন। সত্যি বলতে কী আমাকে একেবারেই বিরক্ত করেননি। ওনাকে কথাটা বলার দু-মাস পর উনি স্বাগতার সঙ্গে আমরা আলাপ করিয়ে দিলেন। ভালোই লাগল ওর সঙ্গে কথা বলতে। স্বাগতা চলে যাওয়ার পর মিসেস জোসেফ আমাকে বললেন, 'এই মেয়েটাকেই আমি বেছেছি— আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে একে অফার লেটার পাঠিয়ে দিতে পারি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার কোনো আপত্তি নেই, আপনি পাঠিয়ে দিন। আপনি যদি মনে করেন ও যোগ্য, সব কাজ হ্যান্ডেল করতে পারবে, তাহলে আজই ওকে অফার লেটার পাঠিয়ে দিন, ও জয়েন করলেই আপনার ছুটি!'

এইভাবেই স্মার্ট, সপ্রতিভ ঝকঝকে ছাব্বিশ বছরের স্বাগতা আমার সেক্রেটারি হয়ে আমার অফিসে ঢুকল।

স্বাগতা সত্যি খুব কাজের মেয়ে। মিসেস জোসেফের অভাব ও আমাকে একদিনের জন্যেও বুঝতে দেয়নি। সব সময় মুখে হাসি লেগেই আছে। ওর হাসি দেখলে যেন আমার দিনগুলো বেশি ঝলমলে হয়ে উঠত। কোনো কাজে 'না' বলত না স্বাগতা, সব কাজ শিখে নিতে রাজি।

শ্রেয়ার সঙ্গেও একদিন আলাপ করিয়ে দিলাম স্বাগতার। আমি কাজপাগল বলে দুর্নাম আছে, কিন্তু ব্যভিচারী দুর্নামটা নেই, কারণ আমি খুব সাবধানী, তাই শ্রেয়া স্বাভাবিকভাবেই স্বাগতার সঙ্গে কথাটথা বলল। ওহ, বলা হয়নি, এর মধ্যে আমার আরও অনেক উন্নতি হয়েছে। আমি গাড়ি আর হেলিকপ্টার দুটোই চালাতে শিখেছি এবং নিজস্ব দুটো কার আর একটা হেলিকপ্টারও কিনেছি। যখন-তখন সেগুলো নিয়ে বিভিন্ন ব্রাঞ্চে আর ফ্যাক্টরিতে পৌঁছে যাই। লোকে বেশ চমকে টমকে যায়, তাতে আমার খুব মজা হয়। ওই যে কথায় আছে না, 'দা সিপ অফ পাওয়ার ইজ ভেরি অ্যাডিকটিভ।'

স্বাগতার মায়াজালে আমি ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়তে লাগলাম। ওরও যে আমাকে ভালো লাগে সেটা ও বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে দিত। ওর মতন একজন সুন্দরী স্মার্ট মেয়ে আমার মতন ছেচল্লিশ বছরের এক আধবুড়োকে পাত্তা দিচ্ছে সেটা ভেবেই আমি পুলকিত ছিলাম। মেয়েরা যে তাদের বসেদের সঙ্গে প্রায়ই এই রকমটা করে থাকে সেটা আমার জানা ছিল না। যাই হোক, এক ভ্যালেনটাইন্স ডে-তে স্বাগতা আমাকে একটা কার্ড দিল। সেদিন সারাদিন আমি কাজের ফাঁকে ফাঁকে কার্ডটা নিয়ে ভাবলাম। বিকেল সাতটা নাগাদ অফিস থেকে বেরিয়ে কী মনে হল স্বাগতার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। একটা ফাইল হাতে নিয়েছিলাম এই ভেবে যে, যদি দেখি ওর সঙ্গে কেউ রয়েছে তাহলে ওকে ফাইলটা ধরিয়ে দিয়ে চলে আসব। ওর বাড়িতে গিয়ে বেল দিতেই স্বাগতা এসে দরজা খুলল। আমাকে দেখে খুব আশ্চর্য হল, 'স্যার আপনি? আসুন আসুন, কিছু দরকার আছে নাকি?'

'না, না, তেমন কিছু নয়। এই ফাইলটা তোমাকে দিতে এলাম। তুমি এটা পড়ে রাখলে কালকের মিটিংয়ে তোমার সুবিধা হবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পড়ে রাখব। তবে আপনাকে একবারটির জন্যে হলেও ভিতরে আসতে হবে, স্যার! আপনি দরজা থেকে চলে গেলে ভীষণ পাপ হবে আমার!'

'নাহ, মানে আজ তো ভ্যালেন্টাইন্স ডে— তোমার অন্য প্ল্যান ট্যান...'

'আমার অন্য কোনো প্ল্যান নেই!' বলে স্বাগতা আমার হাত ধরে আমাকে টেনে নিয়ে গেল বাড়ির ভিতর।

সুন্দর ছিমছাম বাড়ি। প্রচুর গাছপালা রয়েছে ঘরের মধ্যেই। স্বাগতা জল আর মিষ্টি নিয়ে এল আমার জন্যে। আমাকে বলল, 'আমি কিন্তু আজকে চিংড়ি মাছ রান্না করেছি স্যার, আপনাকে খেয়ে যেতেই হবে!'

আমি এমনিতেও প্রায়ই ক্লায়েন্টদের সঙ্গে হোটেলে খেয়ে বা দেরি করে বাড়ি ফিরি, তাই শ্রেয়া আর আমার জন্যে অপেক্ষা করে না। ও খেয়ে আমার খাবার টেবিলে রেখে টিভি দেখতে চলে যায়— আর বেশি রাত হলে শুয়েও পড়ে। তাই আমি স্বাগতার হাতের রাঁধা চিংড়ি খেতে রাজি হলাম। আর সেইদিন থেকে স্বাগতার সঙ্গে আমার শারীরিক সম্পর্কের সূত্রপাত হল। ওর রূপের মোহিনী ঢেউয়ে আমি একেবারে ভেসে গেলাম।

আমি রাতে রোজই দেরি করে ফিরতাম তাই সেটা আর নতুন কিছু নয় বলে শ্রেয়ার সন্দেহের কোনো কারণ ছিল না। অফিসে আমি আর স্বাগতা আগের মতন বস আর সেক্রেটারি হয়েই রইলাম। আমি ওকে সাবধান করে দিয়েছিলাম যে, অফিসের লোক আমাদের নিয়ে গসিপ করুক সেটা আমি চাই না মোটেই, তাই অফিসে এতটুকু অন্তরঙ্গতা দেখানো চলবে না! সেই কারণে অফিসের কেউ ঘুণাক্ষরেও ব্যাপারটা জানতে পারেনি।

ভালোই চলছিল এইভাবে মাস ছয়েক, তারপরই গন্ডগোলটা হল।

স্বাগতাকে আমি খুব পরিষ্কার করে বলে দিয়েছিলাম, 'দেখো আমি কিন্তু কোনো কমপ্লিকেশান চাই না!'

ও আমাকে আশ্বস্ত করেছিল যে, ও বার্থকন্ট্রোল পিলস নিচ্ছে এবং আমি সে-ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। আমিও তাই ওসব নিয়ে ভাবিনি। সেই ভ্যালেনটাইন্স ডে-র ছ'মাস পরে একদিন বিকেলে স্বাগতার বাড়ি গিয়ে দেখি ও বেশ লাল টুকটুকে একটা শাড়ি পরেছে, সঙ্গে গয়নাও পরেছে। এমনিতে বেশিরভাগ সময় ও সালোয়ার কামিজ বা জিন্স, অথবা স্কার্ট আর টপ পরে থাকে। খাবার ঘরে গিয়ে দেখি আমার পছন্দের সব রান্নাও করেছে। বড় বড় মোমবাতি জ্বালিয়ে মৃদু গানের শব্দে খেতে বসার সময় আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার, আজ এত আয়োজন? কারও জন্মদিন নাকি?' আমার নয় সেটা অবশ্য জানতাম।

স্বাগতা অল্প হেসে বলল, 'না, না, আমার জন্মদিন তো জানুয়ারি মাসে, কবে হয়ে গেছে! আবার আসছে বছর হবে।'

'তাহলে এত সব?'

'একটা ভালো খবর আছে।'

'কী খবর?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'খেয়ে নাও তারপর বলছি।'

'তুমি এখনও চিনলে না আমায়? যতক্ষণ না তুমি বলবে ততক্ষণ আমি খেতেই পারব না!'

স্বাগতা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আই অ্যাম প্রেগনেন্ট!'

আমি তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম। পিছনের চেয়ারটা উলটে পড়ে গেল। রাগে আমার সারা শরীর তখন কাঁপছে।

'তুমি বলেছিলে তুমি প্রিকশান নিচ্ছ!'

'যখন বলেছিলাম তখন নিচ্ছিলাম, তারপর বন্ধ করে দিয়েছিলাম!'

'হাউ ডেয়ার ইউ! এনিওয়ে, তোমাকে অ্যাবর্সন করাতে হবে।'

'না!'

স্বাগতা ওই একটা কথা বলে নিজের 'ডেথ ওয়ারান্টে' সই করে ফেলল।

আমি আর খেলাম না। বাড়ি চলে এলাম। সারাটা পথ ভাবলাম, কী করব। শ্রেয়াকে ডিভোর্স করে স্বাগতাকে বিয়ে করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এত কিছু করে যে বাড়ি আর কোম্পানি আমার হাতে এসেছে তার একচুলও আমি ছাড়তে রাজি নই। বাড়িটা তো ইনফ্যাক্ট শ্রেয়ার নামে, আর ও কোনো চাকরি করে না বলে ওকে যে পরিমাণ খোরপোশ দিতে হবে সেটা ভাবলেই আমার মুখটা বিস্বাদ হয়ে উঠছিল। শুধু তাই নয়, যে স্ক্যানডালটা হবে সেটা কোম্পানির পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক হবে। শৌভিক সেন তার সেক্রেটারির সঙ্গে ফুর্তি করে বেড়িয়েছে— কাগজে ওইসবো বেরলে আমার মানসম্মান ধুলোয় মিশে যাবে! আর সবচেয়ে বড় কথা, স্বাগতার সঙ্গে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে সংসার করার কোনো বাসনাই আমার নেই।

পরদিন স্বাগতা অফিসে এল না। টেনশানে আমি সারাদিন কোনো কাজ করতে পারলাম না। তখনই ঠিক করে ফেললাম— নাহ, এভাবে চলতে পারে না! ওকে আরেকবার বুঝিয়ে দেখব, না বুঝলে অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে, কারণ যত দিন যাবে লোক জানাজানি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

স্বাগতাকে ফোন করে ওর খবর নিলাম। ও বলল, ওর শরীরটা ভালো লাগছিল না তাই ও অফিসে আসেনি।

বিকেলে ওর বাড়িতে গিয়ে ওকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু মেয়েটা এতটাই বোকা যে, কিছুই শুনল না। এই প্রথম আমার স্বাগতাকে বুদ্ধিহীন মনে হল। খুব দৃঢ় গলাতেই ও বলে চলল, 'অ্যাবর্শান আমি করাব না! তুমি শ্রেয়াদিকে ডিভোর্স করে আমাকে বিয়ে করবে কিনা সেটা তোমার ব্যাপার!'

'ঠিক আছে, আমি একটু ভেবে দেখি। ও হ্যাঁ, কালকে একটা সাইট ভিজিট আছে। তুমি হেলিকপ্টারে যেতে পারবে, না অন্য কাউকে বলব?'

'আমি পারব!'

'ঠিক আছে, তাহলে তোমাকে তুলে নেব সকাল সকাল।'

এর আগেও স্বাগতা অনেকবার আমার সঙ্গে সাইট ভিজিটে গেছে, তাই ও কিছু সন্দেহ করল না। ওকে যেটা জানালাম না সেটা হল এই ভিজিটে শুধু আমরা দুজন যাব, পিল্লাই বা শর্মা কেউ থাকবে না!

স্বাগতার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার হেলিকপ্টারটাকে দেখতে গেলাম। জরুরি কিছু জিনিস হেলিকপ্টারে রেখে এলাম। রাতে যখন বাড়ি ফিরলাম দেখলাম শ্রেয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। সারারাত আমার ঘুম হল না— প্ল্যানটা বারবার মাথায় ঝালিয়ে নিচ্ছিলাম— কোথাও কোনো ফাঁকফোকর থেকে যাচ্ছে না তো?

পরের দিন, খুব ভোরবেলা অফিসে পৌঁছে স্বাগতাকে ফোন করলাম। ওকে বললাম, ওকে বাড়ি থেকে তুলতে একটু অসুবিধা হবে, তাই ও যদি সোজা যেখানে হেলিকপ্টার থাকে সেখানে চলে আসে তাহলে আমার খুব সুবিধা হবে।

স্বাগতা রাজি হল।

আমি অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়ি নিয়ে সোজা হেলিকপ্টারের হ্যাংগারে পৌঁছে গেলাম। সেটা আর কিছুই নয়, শহর থেকে কিছুটা দূরে একটা খালি জায়গায় একটা গুদামঘর মতন। ঝড় বৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে হেলিকপ্টারটা ওই গুদামঘরটার মধ্যে রাখি। জায়গাটার আশেপাশে কোনো লোকবসতি নেই।

কিছুক্ষণ পর স্বাগতা এল। স্কুটিটাকে বাইরে পার্ক করে গুদামের ভিতর চলে এল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে বলল, 'পিল্লাই আর শর্মাজিরা যাচ্ছেন না?

আমি গ্লাভস-পরা হাত দুটোকে পকেটে ঢুকিয়ে রেখে বললাম, 'নাহ, আজ শুধু আমি আর তুমি!'

ও মনে হয় একটু ভয় পেল, কী একটা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই আমি পকেট থেকে তারটা বার করে ওর গলায় পেঁচিয়ে একটা টান মারলাম। জলজ্যান্ত সুন্দরী মেয়ে থেকে একটা কুৎসিত মৃতদেহে পরিণত হয়ে যেতে স্বাগতার বেশিক্ষণ লাগল না। কুৎসিত, কারণ, ওর মুখটা নীলচে-বেগুনি মতন হয়ে গিয়েছিল, জিভ, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল, নাঃ,আর তাকাতে পারছিলাম না আমি।

গাড়ির পিছন থেকে ত্রিপলটা বার করে সেটা দিয়ে ওর দেহটাকে গোল করে পাকিয়ে মুড়ে ফেললাম। স্বাগতার ত্রিপলে মোড়া দেহ, ওর হাতব্যাগ, ফোন, স্কুটি সব কিছু হেলিকপ্টারে তুলে রওনা দিলাম দার্জিলিংয়ে আমাদের ফ্যাক্টরির পথে। ফ্লাইট প্ল্যান? ওসব কে দেবে! আমি প্রায়ই কোনো ফ্লাইট প্ল্যান জমা দিই না— হেলিকপ্টার তো!

পথে হঠাৎ মনে হল, আমি একটা নয়, দুটো খুন করলাম! যদিও ওই রক্তমাংসের পিণ্ডের প্রতি আমার কোনো অনুভূতিই নেই।

ফ্যাক্টরি থেকে কিছুটা দূরে জঙ্গলের মধ্যে হেলিকপ্টার নামিয়ে স্বাগতা, ওর হাতব্যাগ, স্কুটি সব কিছু একটা গভীর খাদে ফেলে দিলাম। অতল গভীরে সব মিলিয়ে গেল। একবার মনে হল, স্বাগতা কি ওর কোনো আত্মীয় বা বন্ধুকে আমার কথা বলেছিল? ওর মা-বাবা নেই সেটা জানতাম, আর ও ছিল একমাত্র সন্তান...যাক, ওসব ভেবে এখন লাভ নেই।

ফ্যাক্টরি পরিদর্শন শেষ করে সব কিছু সেরে যখন বাড়ি ঢুকলাম তখন অনেক রাত। শ্রেয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম। মনটা বেশ হালকা লাগছিল।

পরদিন অফিসের কাজকর্ম দিব্যি চলছিল, এমন সময়, বিকেল পাঁচটার সময়, শ্রেয়া আমার অফিসে এসে হাজির হল। আমি একটু চমকেই উঠলাম— ও তো কোনোদিন এইভাবে অফিসে আসে না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার, তুমি এখানে?'

'স্বাগতা বলেছিল অনাথ-আশ্রমের বাচ্চাদের দেখতে আজকে ও আমার সঙ্গে যাবে। ও বলেছিল, ও ভলেন্টিয়ারি করবে, তা কোথায় সে?'

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'স্বাগতা তো দিন তিনেক হল আসছে না— জানি না শরীর খারাপ হয়েছে হয়তো।'

'সে কী! একটা মেয়ে তিনদিন ধরে কাজে আসছে না আর তোমরা ওর কোনো খোঁজখবর নাওনি! কেমন অফিসের কলিগ তোমরা! দেখি, আমার কাছে ওর মোবাইল নম্বরটা আছে, আমিই কল করি?,' বলে ডায়াল করতে শুরু করে দিল।

স্বাগতার মোবাইল ফোন তো পাহাড়ের অতল খাদে, তাই কারো তোলার কথা নয়। শ্রেয়া কিছুক্ষণ চেষ্টা করে বলল, 'হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। যাই ওর বাড়িতে একবার ঢুঁ মেরে আসি।'

ওর বাড়িতে শ্রেয়া একবার গিয়েছিল কী একটা পুজোতে। আমি রাগ চাপতে চাপতে বললাম, 'যাও, তবে যদি কারো শরীর খারাপ থাকে তাকে ডিস্টার্ব করা কি ঠিক?'

শ্রেয়া অকাট্য যুক্তি দিয়ে বলল, 'যদি বেশি শরীর খারাপ হয়ে অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে তাহলে? একা একা থাকে মেয়েটা!'

শ্রেয়া চলে গেল। আমি গোঁজ হয়ে বসে রইলাম। শেষে কিনা আমারই বউ পরোপকার করার ঠেলায় আমাকে ধরিয়ে দেবে? যাক, বেশি ভেবে লাভ নেই, এই ভেবেই বসে রইলাম।

শ্রেয়ার ফোন এল ঘণ্টা দুয়েক বাদে। বলল, 'স্বাগতা মনে হয় বাড়িতে নেই। পাশের বাড়ির মহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, উনিও কিছু জানেন না। আমরা দুজনে দরজা ধাক্কা দিলাম, কিন্তু কেউ খুলছে না দেখে আমি পুলিশে খবর দিয়েছি।'

'সে কী!' আমি আঁতকে উঠলাম, 'ও যদি কয়েক দিনের জন্যে কোথাও গিয়ে থাকে তাহলে? ফিরে এসে দেখবে দরজা ভাঙা!'

'কী জানি বাবা, আমার ব্যাপারটা ভালো লাগছে না। ও যদি অন্য কোথাও যেত তাহলে তো তোমাকে বলে যেত!''

'কিন্তু তা বলে এখুনি পুলিশ!' ঘটনার গতিপ্রবাহ দ্রুত আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছিল।

'তুমিও এখানে চলে এসো, কারণ, পুলিশ এলে ওদের অনেক প্রশ্ন থাকবে— আর আমি একা ওদের সামলাতে পারব না!'

অগত্যা আমি রোজকার মতো অফিস থেকে স্বাগতার বাড়ির দিকে রওনা হলাম। আগেই বলেছি, আমি বিশেষ সাবধানী, স্বাগতার পাড়াতে আমি ওই প্রথম দিন ছাড়া কোনোদিন গাড়ি নিয়ে ঢুকিনি। গাড়ি অন্য পাড়ায় রেখে হেঁটে আসতাম— তা-ও অন্ধকার নামার পর। পাড়ার কেউ যাতে আমাকে না দেখতে পায় সেই চেষ্টাই করতাম— টুপিও থাকত মাথায়। তাই গাড়ি নিয়ে স্বাগতার পাড়ায় ঢুকতে আমার ভয় ছিল না। আমার গাড়ি এখানে কেউ চিনতে পারবে না, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

স্বাগতার বাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখন পুলিশ এসেছে। একজন বৃদ্ধ ইন্সপেকটর, যাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে এসেছেন। তাঁর মুখে অসংখ্য বলিরেখা আর বেশ ঝুলো একজোড়া পাকা গোঁফ। সঙ্গে একটা ছোকরা হাবিলদার। দরজার তালা ভাঙা হয়ে গেছে।

আমাকে দেখে বুড়ো ইন্সপেক্টার বলে উঠলেন, 'আপনি কে?'

'আমার নাম শৌভিক সেন। আমি স্বাগতার বস। আমার মিসেসই আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছে। আমি বারবার বলেছিলাম কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে— হয়তো কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ি গেছে।'

'আগেও কি এইরকম ভ্যানিশ হয়েছেন স্বাগতাদেবী?' লোকটা বুড়ো হলে কী হবে, চোখের দৃষ্টি অসম্ভব তীকষ্ন। 'না' বলতে বাধ্য হলাম আমি।

'দেখুন স্যার, আমার মনে হয় আরও কয়েকটা দিন দেখে তারপর...'

আমার মুখ থেকে কথা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে উনি বললেন, 'আমার নাম অনিল শর্মা— আপনি আমাকে মিস্টার শর্মা বলে ডাকতে পারেন, আর এই হল অরিজিৎ কর্মকার, বাচ্চা ছেলে, নতুন কাজ শিখছে। ও, কী যেন বলছিলেন আপনি... ও হ্যাঁ, কিছুদিন অপেক্ষা করতে? সে না হয় করা যাবে। আমাদের সব কিছুতে এমনিতেই অনেক সময় লেগে যায়। ওই যে হিন্দি ফিলিমে দেখেন না সব কিছু হয়ে যাওয়ার পর পুলিশ আসে— সেইরকম আর কী! তা স্বাগতা ম্যাডাম কি আপনাকে কিছু বলেছিলেন কোথায় যাচ্ছেন বা কিছু?'

'না, ও তিনদিন ধরে অফিসে আসছে না— আমাকে কিছুই বলেনি।'

'সিঙ্কে দুধের গেলাস নামানো রয়েছে, খুব বেশি পুরনো তো মনে হচ্ছে না। হুঁ! আচ্ছা, উনি অফিসে যাতায়াত করতেন কীভাবে?'

'ঠিক বলতে পারব না, বাসে-ট্রামে যেত মনে হয়। ও হ্যাঁ, একটা স্কুটিও ছিল ওর।'

'ও আচ্ছা, সেটাকেও তো দেখছি না,' বলে শর্মা চারিদিক দেখে বেড়াতে লাগলেন।

আমি ইচ্ছে করে এদিক-ওদিক চারিদিকে হাত দিয়ে বেড়াচ্ছিলাম, যাতে পরে ফিঙ্গার প্রিন্টিং করে আমার হাতের ছাপ পেলে আমি আজ এখানে আসার ব্যাপারটা ব্যবহার করতে পারি!

শ্রেয়াও এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছিল। হঠাৎ কী মনে হল ইন্সপেক্টরকে বলল,'মিস্টার শর্মা, আমার একটু কাজ আছে, আমাকে যেতে হবে। এই আমার কার্ড, আমার মোবাইল নম্বর ওতে আছে। কিছু দরকার হলে ফোন করবেন, কেমন?' বলে সে আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে কেটে পড়ল।

সারা বিকেল ধরে মিস্টার শর্মা আমাকে এটা-সেটা জিজ্ঞেস করেই চললেন। আমি যথাসম্ভব ঠান্ডা মাথায় সব প্রশ্নের উত্তর দিলাম। এই ফাঁকে আমি দেখতে চেষ্টা করছিলাম যে, স্বাগতার ডায়েরি জাতীয় কিছু রাখার অভ্যাস ছিল নাকি— কিন্তু সেরকম কিছু চোখে পড়ল না।

বাড়ি যখন ফিরলাম তখন রাত এগারোটা। তখনও শ্রেয়া ফেরেনি দেখে একটু অবাক লাগল। যাই হোক, মিস্টার শর্মা স্বাগতার বাড়িতে কিছু খুঁজে পাননি, তাই কাল অফিসে আসবেন বলেছেন। সেই কারণে আমি একটু আগে অফিসে গিয়ে স্বাগতার ডেস্ক ড্রয়ার সব দেখে এসেছি, গ্লাভস পরতে ভুলিনি অবশ্য। কিছু নেই সেখানেও। আশ্চর্য, মেয়েটার দরকারি কাগজ, ঠিকানার বই কিছুই পাওয়া যায়নি। অবশ্য সেইসব হ্যান্ডব্যাগেও থাকতে পারে, সেটা তো আমি টেক কেয়ার করেছি। খুব খিদে পেয়েছিল। ফ্রিজ থেকে খাবার বার করে খেয়ে নিলাম।

বারোটা নাগাদ শ্রেয়া বাড়ি ফিরল। উদভ্রান্তের মতন চেহারা তার। ওর চোখের চাহনি দেখে আমার বুকটা ধক করে উঠল। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে বলো তো? কোথায় গিয়েছিলে? এত রাত হল কেন?'

শ্রেয়া ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে আমার সামনের সোফাটায় বসল। ব্যাগ থেকে কী একটা বার করে আমাকে দেখিয়ে বলল, 'এটা তোমার হেলিকপ্টার রাখার গুদাম থেকে পেয়েছি!'

আমি তাকিয়ে দেখলাম, এক পাটি মেয়েদের চটি! আমার মুখে ভূত দেখার মতন ভাব দেখে শ্রেয়া বলল, 'স্বাগতা কোথায়? দেখো, মিথ্যে কথা বলে লাভ নেই। আমি জানি ওর কিছু একটা হয়েছে।'

'কী করে জানো?' আমি মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

শ্রেয়া কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল, তারপর বলল, 'সুইসাইড বম্বার বোঝো?'

আমি কিছু বলছি না দেখে শ্রেয়া বলল, 'স্বাগতা ছিল সুইসাইড বম্বারদের মতন একজন— যারা নিজেদের প্রাণের তোয়াক্কা না করে একটা উদ্দেশ্যের জন্যে প্রাণ দিতে রাজি হয়!'

আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছিল। শ্রেয়া বলে কী!

'মিসেস জোসেফের সাহায্যে স্বাগতাকে তোমার অফিসে আমিই ঢুকিয়েছিলাম। স্বাগতা আমারই চ্যারিটির অনাথ আশ্রমে বড় হওয়া একটি মেয়ে। বাবার কোম্পানি হাতে পেয়ে তুমি যে নানান দু-নম্বরি পথে সেটাকে বাড়াচ্ছিলে, মিসেস জোসেফ সেসবই আমাকে বলেছিলেন। কিন্তু ওনার বয়স হয়েছিল। ঝুঁকি নিয়ে প্রমাণ জোগাড় করার ইচ্ছে বা ক্ষমতা কোনোটাই ওনার ছিল না, তাই আমরা দুজনে মিলে স্বাগতাকে সব কথা জানাই। ও রাজি হতে ওকে কোচ করি আমরা দুজনে। ওর কাজ সহজ হবে না আমরা জানতাম। ঝুঁকিও প্রচুর—সেটাও ওকে বলেছিলাম। কিন্তু ওই বয়সে যা হয়, ওর ভয়ডর তেমন ছিল না।'

শ্রেয়ার কথায় আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল— মহিলা বলে কী! তার মানে আমি বেমালুম না বুঝে সুঝে ওদের ফাঁদে পা দিয়েছিলাম।

শ্রেয়া বলে চলল, 'তাড়াতাড়ি কাজ সারতে গিয়ে ও তোমার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়— হ্যাঁ, আমি সবই জানি। তোমাকে ঘেন্না করি আমি। ওর ওই বাড়ি, স্কুটি সব আমিই কিনে দিয়েছিলাম। ও অনেক প্রমাণও জোগাড় করে ফেলেছিল। তাই আমি ওকে বলেছিলাম ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিতে, কিন্তু ও বলেছিল যে, স্বার্থের জন্যে তুমি যে মানুষ খুনও করতে পারো সেটাও ও প্রমাণ করে ছাড়বে। প্রেগনেন্সির ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ওর বানানো। ও অনাথ আশ্রমে বড় হওয়া মেয়ে— মা-বাবা ছাড়া বড় হওয়া যে কত কষ্টকর সেটা ও জানত। ও কোনোদিনই অবাঞ্ছিত কোনো বাচ্চার জন্ম দিত না। আসলে তুমি যে এত তাড়াতাড়ি কিছু একটা করে ফেলবে সেটা আমরা আন্দাজ করতে পারিনি। আমাদেরই ভুল। প্রতিপক্ষকে তার প্রাপ্য গুরুত্ব দিইনি আমরা! স্বাগতা তোমার ফন্দি ধরতে পারেনি, ও ভেবেছিল সত্যি বুঝি কাজ আছে সাইটে।' শ্রেয়া থামল, ব্যাগ থেকে একটা জলের বোতল বার করে ঢকঢক করে খানিকটা জল খেল। বোতলটা ব্যাগে রেখে ও যে জিনিসটা বার করল সেটা ওর হাতে দেখে আমি বেশ চমকে উঠলাম— একটা রিভলভার!

'তোমাকে আমি সম্মানের সঙ্গে মরার একটা সুযোগ দিচ্ছি— এক্ষুনি একটা সুইসাইড নোট লেখো যে, তোমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়, আর তারপর এই রিভলভারটা দিয়ে গুলি করে আমি তোমাকে মুক্তি দেব। স্বাগতার কথা কারও মনে থাকবে না। আমি বলে দেব, ও চাকরি নিয়ে অন্য শহরে চলে গেছে। সাধারণ লোকেরা অতশত মনে রাখে না। কী? রাজি তো? নাহলে এক্ষুনি ইন্সপেক্টর শর্মাকে ফোন করে সব বলে দেব— আর চটির প্রমাণ তো আছেই! কোম্পানিতে অসৎ কারবার ধরে ফেলার জন্যে স্বাগতাকে খুন করার অভিযোগে তোমার দশ বছরের জেল তো হবেই। আর যা টিটি পড়বে নামে সেটা না হয় আর নাই বা বললাম!'

শ্রেয়াকে আমি নিরীহ মেয়ে বলেই জানতাম, আর ওর পেটে পেটে কিনা এত বুদ্ধি!

'তুমি দার্জিলিং ফ্যাক্টরিতে গিয়েছিলে তো? কাছাকাছি কোনো পাহাড়ের খাদে বেচারি মেয়েটার দেহ পড়ে রয়েছে নিশ্চয়ই। নাও, লেখো। তোমার মতো কীটের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই! আর চালাকি করার চেষ্টা কোরো না— আমি কিন্তু রিভলভার চালাতে জানি, তোমার পায়ে গুলি করে পুলিশকে বলব যে স্বাগতার ব্যাপারটা বলতে তুমি আমাকেও খুন করার চেষ্টা করছিলে তাই আত্মরক্ষার জন্যে আমাকে গুলি চালাতেই হয়েছে!'

আমি কোথায় গন্ডগোলটা করে ফেললাম সেটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। হয়তো শ্রেয়াকে আমি তেমন সময় দিইনি বলে ওর মনে আমার প্রতি ক্ষোভ জন্মেছিল। নাকি ওর বাবার তৈরি কোম্পানিকে খানিক অসৎ উপায়ে অনেক বেশি বড় করে তুলছিলাম বলে— কী জানি! পেনটা হাতে নিয়ে একটা সুইসাইড নোট লিখে ফেললাম। শ্রেয়া কঠিন মুখে রিভলভারটা আমার কপালে ঠেকাল, ঠিক ডানহাতি মানুষ আত্মহত্যা করলে যেখানে গুলি লাগা উচিত সেখানে! তারপর...।

পুলিশকে ফোন করার আগে শ্রেয়া সরকার সেন আর একটা ফোন করল, 'অনিল চাচা, তোমার পুলিশের অভিনয় ফাটাফাটি হয়েছিল। তুমি আর বাবলু বাড়তি বকশিশ পাবে। তবে কিছুদিন এদিকটায় এসো না, পুলিশের কারবার চলবে তো। আমি সময় সুযোগ মতন তোমার সঙ্গে দেখা করে নেব।

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বার করা মেয়েলি জুতোর ওই একপাটি নিজের জুতোর র‍্যাকে অন্য পাটিটার পাশে রেখে দিল শ্রেয়া। ভাগ্যিস শৌভিক মেয়েদের জুতো-টুতোর প্রতি নজর দিত না! হ্যাংগারে আসলে তো কিছুই পড়ে ছিল না, তাই এই জুয়াটা খেলতে হল। একটা প্রচ্ছন্ন হাসি শ্রেয়ার ঠোঁটে খেলেই মিলিয়ে গেল কি?

আততায়ী

যশোধরা রায়চৌধুরী



একটা স্ট্রবেরি রঙের আকাশ, এক কোনায় মেঘ জমে আছে ডিপ চকলেট রঙের। যেন তুলতুলে স্ট্রবেরিটার উপরে জমাট, লোভনীয় ক্রাস্টের মতো ঠান্ডা, শক্ত চকলেট, ভেঙে ফেললেই গড়িয়ে পড়বে রসের মতো আলোমাখামাখি ভোর।

দিবাস্বপ্ন দেখছিল সঞ্চিতা, বারান্দায় বসে। ভোর ফুটে গেছে অনেকক্ষণ। জগিং সেরে এসে ওটস খেয়ে এখন ফেসিয়ালে বসেছে। ওর ছোট্ট নুক, দড়ির দোলনায়।

দুলতে দুলতে সমস্ত অ্যাটমসফিয়ার দুলছিল যেন। আকাশের ফ্রেমটাও।

মামপি, শোন।

চটকা ভাঙল।

নিলুপিসি, তুমি ডাকছিলে?

বারান্দা থেকে ঘরের দিকে মুখ বাড়াল সঞ্চিতা। ওর নিটোল ডিমের মতো মুখ। টাটকা ক্রিমিশ ত্বক আপাতত সাদা ধবধবে আস্তরণের তলায়।

—সারা মুখে কী মেখেছিস এসব? অফিসে বেরোনোর আগে, বাবা, পারিসও বটে।

—ধ্যাত, ছাড়ো তো। বলো না কী বলছিলে। সঞ্চিতা হাসল। ফেসিয়াল মাখা মুখ, যেন মুখোশের আড়ালে ঢাকা। কিছুটা ক্লাউন যেন।

—আরে কতবার করে তোর ফোনটা বাজছিল। রিংটোনে এমন একটা ঝাঁঝালো গান লাগিয়েছিস, শুনলেই পিত্তি জ্বলে যায়। এটা তোর কত নম্বর ফোন?

—আমার তো দুটোই ফোন, জানোই তো। ওটা পুরোনোটা। বাজুক। আমি এখন ধরছি না।

—কেন, ওটা কি হ্যালাফেলার ফোন?

—ফোনটা না, ফোনের কনট্যাক্টগুলো। কলেজের সব বন্ধুরা ওই নাম্বারটা জানে। ভীষণ বোর।

—হুম। বুঝেছি। এখন তোমার নতুন চাকরি, নতুন অফিসের নতুন বন্ধুরা সব। তাদের চিনে নিতে যত মজা, পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে কি আর তত মজা পাবে?

উফ, ছাড়ো না। ফরগেট ইট ইয়ার। তোমার যত্তসব পুরোনো পুরোনো কথা...

ওরে, কথায় বলে পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে।

এবার পুরোটা ঘরের মধ্যে ঢুকে আসে সঞ্চিতা। হেলায় একবার খাটের উপর থেকে তুলে দেখে পুরনো মডেলের, পুরনো সিম ভরা সেই ফোনটা। যেটায় আটটা মিসড কল রেখেছে ঋদ্ধিমান। ওর পুরোনো

বয়ফ্রেন্ড। শিট। কী ভীষণ টায়ারসাম। হতাশ লাগে সঞ্চিতার। কেন যে লোকজন বোঝে না!

নিলুপিসিটাও তেমনি। এসব কথা খুঁচিয়ে ওর পেট থেকে বার করবেই। অর্চির ব্যাপারেও খুব কৌতূহল। অর্চিই যেন সবটা জুড়ে আছে সঞ্চিতার। এমন একটা ভাব। না হয় কয়েকদিন ডেট করেইছে। তাই বলে...অর্চি কী খায়, অর্চি কী পরে, অর্চির ফ্যাভ মিউজিক কী। অত জানার কী দরকার?

নিলুপিসি, ইউ জাস্ট গিভ মি এ ব্রেক, ওকে? আমার সব ব্যাপারে মাথা গলাতে হবে না তোমাকে। মা কি গলায়? বাবা? তাহলে তুমি কেন?

নীলুপিসি নিজে তো বেশ ডিভোর্স টিভোর্স করে ছাড়া গরু। এটা মা বলে, ফিসফিসিয়ে। নিজের কোনও ইস্যু নেই বলে আমার মেয়েটাকে নিয়ে পড়েছে। যেন একদম অ্যাডপ্টই করে ফেলেছে সঞ্চিতাকে, নিলুটা।

আজকাল এই নিলুপিসির জন্যেই বাবা—মার সঙ্গে আগের মতো ভুলভাল, অ্যাজিটো কেওটিক বিহেভ করতে পারে না সঞ্চিতা। আগে তো হুটহাট করে হোম ডেলিভারিতে বিরিয়ানি আনিয়ে খেত, পিৎজা আনিয়ে নিত নিজের জন্য। ডালভাত হরিবোল, পটলের ডালনাকে রিজেক্ট করতে ইউজ করত নিজের খ্যাপামি, জোর ফলাত মাথা গরম করে। রাগ করে দুম করে দরজা বন্ধ করা, সারা রাত না ঘুমিয়ে চ্যাটিং, তারপর সকাল দুপুর গড়িয়ে বেলা বারোটা অবধি ভোঁসভোঁস ঘুমোনো...সবটাই চলত। এখন আর মা—বাবা ওকে ভয়ই পায় না। এসব দেখাতে গেলেই সবাই হাসতে শুরু করে।

পিসি এসে কী যেন উল্টো ফ্যাচাং করেছে। সঞ্চিতার আর আগের সম্মান নেই। লোকে আর ওকে ভয় পায় না। হিটলারি যে ব্যাপারগুলো করে দিব্যি চালাচ্ছিল নিজে, মাকে ভয় খাইয়ে, বাবাকে চুপ করিয়ে রেখেছিল নানা কলকাঠি নেড়ে। ইমোশনাল ব্ল্যাকমেলিং করলেই বাবা সুড়সুড় করে টাকা বের করে দিত আগে...স্টুডেন্ট লাইফে, এখন নিজের টাকা নিজের সব...তাহলেও যেন সেরকম মজা নেই বাবা—মায়ের উপর কর্তৃত্ব ফলিয়ে...

সব ভেস্তে দিয়েছে পিসিই।

যাও না বাবা তুমি তোমার দামড়া কাকুবন্ধুগুলোর সঙ্গে কফি হাউজে আঁতলামো করতে, তা না, সঞ্চিতার সঙ্গেই যত কথা!

২

অর্চি এখনও মেয়ে দেখলে ঘাবড়ে যায়। কিন্তু সেদিন সঞ্চিতাকে দেখে কী যেন হয়ে গেল। ফানি আছে একটু, কিন্তু ভীষণ কিউট। রোগা, মিষ্টি, ছোট্টখাট্টো একদম, টাইটস কুর্তিতে কেমন যেন পাখি পাখি। খুব উজ্জ্বল দুটো চোখ। দেখলেই মনে হয় মিচমিচে শয়তান। কিন্তু কেন যেন অর্চির ওকে দেখে একটুও ভয় করল না। বেশ পাশে বসে ভাটাল অনেকক্ষণ। তারপর উঠে যাওয়ার সময় ক্যাজুয়ালি বলল, সি ইউ। আর অমনি মেয়েটাও সি ইউ বলে মোবাইল নাম্বার নিয়ে নিল। সেই থেকে টুকটাক ফোন হচ্ছে। দু'দিন বসল কাফে কফি ডে—তে। অর্চির পয়সা খসল কিছু, একদিন সঞ্চিতাও খাওয়াল। ওদের দুজনের অফিস একটাই বিল্ডিং—এ, সেক্টর ফাইভ—এ। দুটো আলাদা ব্লক অবশ্য। কিন্তু বাসস্টপে, নিচের লবির কফি শপে, এখানে—ওখানে দেখা হয়ে যাওয়ার স্কোপ প্রচুর।

অর্চি একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, অবশ্যই ক্লিয়ারলি না, সঞ্চিতার কোনও স্টেডি বয়ফ্রেন্ড আছে কিনা। সঞ্চিতাও ওকে তো সরাসরি কিছু বলেনি, তবে একটা মেসেজ দিয়েছে। না, ফোনের টেক্সট মেসেজ না। বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বলে দিয়েছে, এখন কেউ নেই। আগে হয়তো ছিল। সেটা আপাতত ম্যাটার করে না।

সেই থেকে মোটামুটি লটকে আছে সম্পর্কটা একই জায়গায়। এগোচ্ছে বলা যায় না। কারণ ফিজিকাল হওয়া হয়নি এখনও। হয়তো নেক্সট টাইম আর একটু প্রাইভেসি আছে এমন জায়গায় দেখা হয়ে যাবে।

তবে একটাই আশার কথা, সেদিন ইমেল করেছে অর্চি ওকে, একটা পাতলা পর্দার আড়ালে একটা সেক্সি টপ পরা দীপিকা পাড়ুকোনের ছবি, পর্দাটায় ক্লিক করলেই ছবিটা একটা মোটকা মহিলায় কনভার্টেড হয়ে যায়। আর একটা গলা বলে ওঠে, দ্যাটস মাই মাম্মি!

সেটা দেখে হি হি হাসির চারটে ইমোটিকন পাঠিয়েছে ওকে সঞ্চিতা।

তার মানে কেস টা এগোচ্ছে। আপাতত অর্চি বসে আছে ওর কিউবিকলে, পাশের কিউবিকল থেকে চুমকি ঘোষটা গলাটা জিরাফের মতো বাগিয়ে বলে উঠল, অর্চি, আমাকে লবিতে বেরোলে একটা কফি এনে দেবে, প্লিইইজ?

কেন কেন, তোমার কফি বওয়া আমার কাজ নাকি? মনে মনে ঝাঁজালেও, অর্চি মেয়েটাকে পুরো কাটাল না। মেয়েটার চোখে একটা থ্রেট দেখতে পেল যেন। আসলে চুমকি ঘোষ দেখেছে, কাজের ফাঁকে চ্যাট করতে অর্চিকে। ওকে ঘাঁটালে ম্যানেজমেন্টকে যদি আবার লাগায়? তার উপর ও শুনেছে, মেয়েটার বাবা দীপেন ঘোষ পুলিশে কাজ করে। কে ঘাঁটাবে ওকে, বাবা!

চুমকি ঘোষের মোটা, ফুলো মুখটা ফর্সা আর মেক আপ লাগানো, কিন্তু ভীষণ চওড়া, ওকে দেখলে ভারতের ম্যাপ না, সাইবেরিয়া, তুন্দ্রা, তাইগাসহ একটা চ্যাপটা রাশিয়ার ম্যাপ মনে পড়ে যায়। এক কান থেকে আর এক কান পর্যন্ত পৌঁছতে দু—দুটো সাদা ধবধবে মরুভূমির মতো গাল আর একটা প্রকাণ্ড নাক পেরোতে হবে...দূর, অতটা পাড়ি দেওয়ার ধক কার আছে?

উল্টোদিকে সঞ্চিতাকে দেখ, ছোট্ট একটা মুখ, ছোট্ট একটা দেশের মতো...না ভারতও নয়, ধানি লংকার শেপের শ্রীলংকা যেন, কুচুত করে দাঁতে কেটে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে।

অর্চি কিছুটা রিপালসানের বশেই চুমকিকে না চটিয়ে দু কাপ কফি এনে নীরবে এক কাপ ওর ডেস্কে রাখে। চুমকি ওর স্থূল শরীরটা যথাসম্ভব পিছিয়ে নেয়, বেন্ডিং ব্যাকওয়ার্ডস যাকে বলে, ঘোরানো চেয়ারের পিঠের উপর ভর দিয়ে, নেকু নেকু গলায় বলে, থ্যাংক্যু সুইটি। নাউ টেল মি, ওয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?

মেনশন নট, লাজুক মুখে বলে, অর্চি কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে কাজে বসে যায়। ইয়ারফোনটা একটা ব্যারিয়ারের কাজ করবে এবার।

সংগোপনে স্কাইপে মেসেজ পাঠায় সঞ্চিতাকে, R u online?’

উত্তর আসে ইমোটিকনে। উত্থিত হাতের ছবি। মানে হ্যাঁ, আই অ্যাম অ্যাট মাই ডেস্ক।

অর্চি এবার লেখে, gr8!

৩

নিলুপিসি উল্টোদিকের রেস্তোরাঁয় বসে থেকে থেকে নজর রাখছে। সঞ্চিতা ঢুকে গেল ওই কাফেটায়। নিলুপিসি বসেছে। সস্তার রেস্তোরাঁয়। অর্চি আসবে। জেনেছে ওদের কনভার্সেশন থেকে, চ্যাটে। গতকাল সাইন আউট না করে কম্পিউটার থেকে উঠে গেছিল মেয়ে।

নীলুপিসি পুলিশগিরি করছে কোনও কৌতূহল থেকে নয়। স্রেফ সিকুউরিটি কনসার্ন থেকে। পরে, ঋদ্ধিমানের মামা, পুলিশ মামা, নিলুপিসিকে ইনপুট দিয়েছেন কিছু। আপাতত, নিলুপিসির ব্রিফ খুব পরিষ্কার। ঋদ্ধিমানের রিসেন্ট ডিপ্রেশনটা নিলুপিসিকে ভাবিয়েছে, প্লাস, একটা ফায়ার আর্ম মিসিং রিপোর্ট। এখন হাতে নাতে ধরতে হবে। যে কোনওদিন অবশ্য অ্যাটাক হতেই পারে, তবে আজকের চান্স খুব বেশি।

বেশ কিছুদিন ধরেই আসলে সঞ্চিতার আগের ফোন—এর কললিস্টের ভেতর থেকে দু—তিনটে কনট্যাক্ট নিলুকে খুব ভাবাচ্ছিল। ফোনটা এখন সঞ্চিতা ইউজই করে না। ওর সময় নেই এতগুলো ফোনের এতগুলো কনট্যাক্টের সঙ্গে সম্পর্ক মেনটেন করার। খাটের উপর ফেলে রাখতে রাখতে একদিন সঞ্চিতা ফোনটার কথা ভুলেই গেল। বাড়িতে পড়ে থাকা ফোনটা কিন্তু নিলুপিসিকে ভাবিয়ে চলেছিল। আর এভাবেই একদিন ঋদ্ধিমানের কলটা রিসিভ করে ফেলে নিলু।

পর পর সাত—আটদিন, ওই ফোনে ঋদ্ধিমানের প্রচুর মিসড কল ছিল।

দেখার পর নিলুপিসি গোপনে সিদ্ধান্তটা নেয়। ফোনটা রিসিভ করে। দায়িত্ব নিয়ে সঞ্চিতার মতো গলা করে কথা বলে। অবশ্য গলা চেঞ্জ না করলেও চলত, কারণ ঋদ্ধিমান সঞ্চিতাই ফোনটা ধরেছে ভেবে এতটাই এক্সাইটেড ছিল, প্রায় আনন্দে উন্মাদ, ও নোটিসই করত না নিলুপিসির গলাটার ডিফারেন্সটা। মুখের কাছে হাত চেপে কথা বলেছে নিলুপিসি। একদম হুঁ হাঁ দিয়ে চালিয়েছে, ঋদ্ধিমান বুঝতেই পারেনি, তাছাড়া ওর বোঝার মতো অবস্থাও ছিল না... হাউ হাউ করে চিৎকার করেছে শুধু।

তারপর থেকে বেশ কয়েকবার ওকে ফোন করে শোনার কাজটা করে গেছে নিলুপিসি।

ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক হয়ে গিয়েছে ঋদ্ধিমানের কমিউনিকেশন। ও এখন একতরফা কথা বলে যায়। কথা শুনতে শুনতে কান জ্বলে যায়, তবু শোনে নিলু। সঞ্চিতাকে ভালো রাখতে চায়, বোধ হয় ঋদ্ধিমানেরও ভালো চায়।

তুমি আমাকে কেন কিছু বলছ না, সঞ্চিতা। কেন বলে গেলে না, সেদিন ওফেলিয়া বার থেকে ওইভাবে উঠে চলে এসেছিলে, কেন? পরদিন কাফেতে তিনঘণ্টা বসেছিলাম... তোমাকে ফলো করে করে তোমার অফিস অবধি গেছিলাম, তুমি আমাকে দেখতেও পেলে না...

এরপর কিন্তু তোমার বাড়ির সামনের রাস্তায় বসে পড়ব। ইউ নো, আই ক্যান কিল মাইসেলফ...কিন্তু আগে তোমাকে বলতে হবে তুমি কী চাও? বলো, বলো সঞ্চিতা...

উফফফ কেন এরকম করছ সঞ্চিতা...আমি ছ'দিন পর পর বাড়ি থেকে বেরোইনি, কিন্তু যেদিন বেরোব, দেখবে কী করি...আমি পাগল হয়ে যাব, আই হ্যাভ নোবডি টু টক টু...

তুমি সেদিন আবার গোলাপি জামাটা পরেছিলে আমি দেখেছিলাম...বাট হাউ ক্যান ইউ বি সো ইনডিফারেন্ট টু মি?

ঋদ্ধিমানের বাড়িটা খুঁজে বার করে ফেলেছে নিলু। ওর কথা ফলো করে করে, নিজে স্বল্প কথা গুনগুন করে বলে, ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করে, ক্লু ইউজ করে বার করে নিয়েছে ওর ঠিকানা। এখন ঋদ্ধির বাড়ির কাছে অনেকটা সময় কাটায় নিলুপিসি। সামনের লেডিস টেলারটাতে তিন—তিনবার ব্লাউজ বানাতে দিয়েছে, একবার সালোয়ার কামিজ। তাতেই কার্যসিদ্ধি। এখন ঋদ্ধির ছোটমামা, পুলিশের মাঝারি লেভেলের অফিসার, নিলুপিসির পকেটে, ওরই সঙ্গে দু—তিনবার ঋদ্ধিকে দেখেছিল এর আগে, উর্দি দেখে বুঝেছে লোকটা পুলিশ। সুতরাং এবার ভদ্রলোকের সঙ্গে মিট করা, মিসিং রিভলভারের খোঁজ, অনেক বেশি সাবধানতা, সাইকিয়াট্রিক হেল্প এর ব্যবস্থা রাখা, এবং আজ, এই এখন, কাফের সামনে বসে থাকা।

৪

তুমি কি আমাকে ভালোবাসো, সঞ্চিতা?

সঞ্চিতার ব্লু জামা পরা ছোট্ট চেহারাটা কাফের দরজা থেকে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কী ভীষণ সেক্সি, কিন্তু মেয়েটা কিছুতেই ধরা দেবে না ওর কাছে, ঠিকই করে নিয়েছে যেন। দু—চারটে ফোনের পর একদিন সারাদিন ফোন আর রিসিভই করল না হয়তো। উইমসিকাল মেয়ে, না ইচ্ছে করে নাচাচ্ছে?

নাচাচ্ছে, নাচাচ্ছে, আমাকে নাচাচ্ছে। উফফ ভাবতেই কান গলা বেয়ে গরম ঢেউ, একটা রাগ আছড়ে পড়ে শিরায় শিরায়। মনে পড়ে যায় পুরনো অপমানগুলো। সেই যে সেবার, অস্মি বলে মেয়েটা। জাস্ট কিছুদিন ডেটিং করে কেটে গেল। জাস্ট নো সাড়া নো শব্দ। বুকের মধ্যে হাঁকপাঁক করে অপমান, রাতের ঘুমে হানা দেয় মেয়েটার তাগড়া শরীর আর ফিল্মসি জামাকাপড়। এভাবেই কষ্ট জমছে বুকের ভেতর। আর রাগ জমছে মাথার মধ্যে। শ্যুট করে দেব...জাস্ট শ্যুট হার। যেরকম স্বপ্নে দেখেছিল সেদিন...কাছে যাচ্ছে যত, দূরে দূরে সরে যাচ্ছে মেয়েটা...কে ছিল সেটা? অস্মি না সঞ্চিতা? সঞ্চিতাই বোধ হয়।

আর, বন্দুকটা, ওর দিকে তাক করতে করতেই, শ্যুট! মাথার মধ্যে বলে ফেলল ওর পৌরুষ। অমনি স্বতোৎসার উঠে এল ফোয়ারায়, রাগের উৎসমুখ খুলে গেল, অনুরাগেরও। সবকিছুর মূলে, একেবারে

গোড়ায়, সেই দপদপানি, সেই কষ্টটা আছে, যা ওকে করায় সবকিছু। ফলো করায় সঞ্চিতার মতো তিতলিদের...

ও আজ পকেটে মালটা নিয়েই বেরিয়েছে। শক্ত ধাতব ফিল। ওকে উত্তেজিত করে ফিলটা। অনুভূতি ভোঁতা হওয়ার আগেই কাজটা করে ফেলতে হবে। কার্গো প্যান্টটা, অনেকগুলো পকেটসুদ্ধ, খুব হালকা লাগে আজ। শরীরটাই হালকা লাগে যেন। উড়তে উড়তে কাফেতে ঢুকে যায়। হাসিমুখেই, কিচ্ছুটি না বুঝে, সরল চোখে সঞ্চিতা ওর দিকে মুখ ফেরাবে। যদিও ছেনাল মেয়েমানুষ, তবু সরল। না—বোঝা হরিণ চোখ। বোকা চোখ। সেই ওর সাদা চোখে আস্তে আস্তে বিস্ময়, তারপর বিস্ফারিত দুটি চোখে ধীরে ধীরে ভয়, ধীরে ধীরে বিভীষিকা...আহ, কী মজা!

মা যখন বাবাকে ছেড়ে চলে যায় বাবা বলেছিল, মেয়েমানুষ ছোঁবে না কখনও। তখন বোঝেনি ও। মানেটা কী। তারপর সুচিত্রাকাকিমা যখন এল, বাবাকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল তুমি যে বলেছিলে, মহিলা ব্যাপারটাই একটা যাচ্ছেতাই জিনিস, মাউসট্র্যাপ, জীবনকে ভেতর থেকে ফোঁপরা করে দেয়? তখন ওর চোদ্দো। বাবার দিকে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে শেখেনি, অথচ ভেতরে ঘৃণা থরথর করত, বাবা যখন সুচিত্রাকাকিমাকে নিয়ে ফিরত বাড়ি, মাল খেত।

অনেক পরে ও অর্জি কথাটা শেখে। অথচ মেয়েরা ওকে চায় না। ও তাদের এমএমএস পাঠায়, অশ্লীল জোকস পাঠায়। তারা কিছুদিন ওর সঙ্গে মেশে, ওকে দেখে নেয়, মেপে নেয়, তারপর সরে যায়। তারা শুধু ওকে শুকনো শুকনো ইমোটিকন পাঠায়। তারপর একদিন চুপ মেরে যায়। একদিন শুধু ওর ইমেল গিয়ে গিয়ে তাদের মেলবক্সে জমে যায়, জমাট বেঁধে যায়। হয়তো সেই ইমেলগুলোকে না দেখেই সোজা ডিলিট করে বা স্প্যাম ফোল্ডারে পাঠিয়ে দেয়। একদিন হয়তো তারা ওকেই পুরো ব্লক করে দেয়। উফফফ।

মেনে নেওয়া যায় না এটা। একদম মেনে নেওয়া যায় না। একটা কিছু করতেই হবে।

দীঘল, কনফিডেন্ট পায়ে কাফের ভেতরটায় ঢোকে ও, তারপর একদম ক্লোজ রেঞ্জে এসে রিভলভারটা সটান তুলে ধরে প্রিয়, নীলরং জামা পরা, পাখি পাখি ছোট্ট চেহারার মেয়েটার দিকে। ব্যাং।

ব্যাং ব্যাং ব্যাং।

সঞ্চিতা লুটিয়ে পড়ে। চেয়ার উল্টে যায়।

নিলুপিসি, এক কাপ চা আর দুটো লেড়ো বিস্কুট নিয়ে বসে আছে। সঙ্গে তপন। ওর বন্ধু। দুজনেই অ্যালার্ট, কিন্তু অফ গড়িয়াহাট রোড, একটু ভেতরের এক কাফে কফি ডে আর তার উল্টোদিকের চায়ের দোকানের মুখটা এখনও ফাঁকা...ফাঁকা মানে, নাঃ, এখনও কোনও চিহ্ন দেখা যায়নি ঋদ্ধিমানের। ওর পুলিশ মামা দীপেন ঘোষ মোবাইলে বলেছেন, ঋদ্ধি বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। সবকিছু মিলে যাচ্ছে কিন্তু। উনিও উদ্বিগ্ন। রিভলভারটা মিসিং হওয়ার খবর উনিই বলেছিলেন, উইথ লট অফ ওয়ারি।...যেখান থেকে গেছে, সেটাও ঋদ্ধির নাগালে...কিন্তু যতটা পেরেছেন, ঋদ্ধির ঘর সার্চ করে পাওয়া যায়নি জিনিসটা। খোলাখুলি কিছু করতে বা বলতে সাহস পাননি উনি, কেননা ঋদ্ধি যথেষ্ট ডিস্টেবিলাইজড, ওকে সন্দেহ করা হচ্ছে জানলে বলা যায় না, সুইসাইডাল টেনডেন্সি হতে পারে।

বাড়িতেও নজর রাখছেন উনি। কিন্তু ঋদ্ধি বেরিয়ে পড়ার পরই, ওকে ফলো করছে একটা গাড়ি। আর, সঞ্চিতা যে কাফেতে বসেছে, অর্চির সঙ্গে মিট করবে বলে, সেখানে নজর রাখছে সঞ্চিতার পিসি।

ব্যাং ব্যাং ব্যাং। আচমকা পাড়াটাকে চিরে দিয়ে আওয়াজটা, চিৎকার তারপর, হইচই। তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল নিলুপিসি, প্রায় চায়ের কাপ উল্টে ফেলে তপনও। কী হচ্ছে বুঝতে না পেরে হতবাক, কেননা ঋদ্ধি, ঋদ্ধি তো এখনও বালিগঞ্জ ফাঁড়ি ক্রস করেনি, এখনই জানা গিয়েছে। জাস্ট দু সেকেন্ড আগেই।

কাফে থেকে লাফ দিয়ে বেরোচ্ছে এখন, সঞ্চিতাকে শ্যুট করে, তার আততায়ী। গুলিটা মারার পরপর ও কী করবে, ভেবে পায়নি দু—চার মোমেন্ট। বিস্রস্ত কাফেটা, চারিদিকে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে লোকজন। মাতালের মতো ঘুরে গিয়েই হঠাৎ তিরবেগে দৌড়তে শুরু করে দিল অর্চি।

ততক্ষণে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দেওয়া সার্ভিস রিভলভারটা ধোঁওয়া ওঠার পর ঠান্ডা। একরাশ মানুষের স্থির দৃষ্টির সামনে। একমাত্র পাশের কিউবিকলের ওই চুমকি ঘোষ মেয়েটাই অর্চিকে ততটা টানত না...বেশ নিরাপদ রাশিয়ার মতো চেহারার মেয়েটা বাবার ড্রয়ার থেকে সার্ভিস রিভলভার এনে দিয়েছিল অর্চিকে।

রোজ এক কাপ কফির ফেভারের পরিবর্তে।

প্রস্তর ঘাতক

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত



দিবাকরদা যে ঘরে বসে আছেন ঈশান সে ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল । একদম সাজিয়ে গুছিয়ে বসেছেন দিবাকরদা । ডান হাতে স্কচের গ্লাস, বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে বেশ কায়দা করে ধরা জ্বলন্ত সিগারেট । চারপাশে আট-দশ-জন আয়োজক । তাদের মুখ থেকে নিজের স্তুতি শুনছেন দিবাকরদা । এক ভদ্রলোক তাঁর উদ্দেশে বললেন, আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে কলকাতা থেকে আপনি যে এতদূর ছুটে আসবেন তা এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না । অনুষ্ঠানটা আমরা ভোপালে বা সাতনায় করতেই পারতাম কিন্তু এখানে করলাম কারণ, আপনার মতো গুণী মানুষ যাঁরা আসছেন তাঁরা অনুষ্ঠানের সাথে সাথে এই খাজুরাহোটাও ঘুরে দেখতে পারবেন ।

লোকটার কথা শুনে দিবাকরদা মৃদু হেসে বললেন, ‘তাহলে লোভ দেখিয়ে টেনে আনলেন বলছেন? এ জায়গা কিন্তু আমার দেখা । বছর কুড়ি আগে আমরা কয়েকজন লেখক বন্ধু মিলে এখানে বেড়াতে এসেছিলাম । সে অর্থে এ জায়গা আমার কাছে, এখানে সেই একটা সুর সুন্দরীর মূর্তি আছে না, যে নৃত্যের ভঙ্গিমায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে আর এক পা থেকে কাঁটা তুলছে? মনে আছে আমার । এখানে তো অনেক মন্দির আছে! হিন্দু মন্দির, জৈন মন্দির ।’

তাঁর কথা শুনে একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, হ্যাঁ, পার্শ্বনাথের মন্দিরের গায়েই অমন মূর্তি আছে । আমি আসলে ঠিক আপনার কথা বলতে চাইনি । আপনি এত বড় সাহিত্যিক । আপনি যে দেশবিদেশের সর্ব্বত্র ঘুরেছেন । এই খাজুরাহো আপনার নিশ্চয়ই দেখা থাকবে । আসলে অন্য এমন অনেকে আসবেন যাদের এ জায়গা দেখা নেই ।’

দিবাকরদা লোকটার কথার প্রতুত্তরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঈশানকে দেখতে পেয়ে হুইস্কির গ্লাসটা উচিয়ে ধরে প্রথমে বললেন, এসো, এসো, বসে পড়ো । লজ্জা কোরো না । আরও একটা গ্লাস আছে ।’ তারপর অন্যদের উদ্দেশে বললেন, ঈশান কিন্তু খুব ভালো লিখছে । আমরা আর কতদিন লিখব, ওরাই এখন বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ । তাই আপনারা যখন কোনো তরুণ লেখককে সঙ্গে আনার কথা বললেন, তখন ওর কথা আমার মাথায় এল । আপনারা কেউ পড়েছেন ওর লেখা?

সুতরাং একটা নিস্তব্ধতাই ঈশানকে বুঝিয়ে দিল তারা পড়েনি । অবশ্য পড়ার কথাও নয়, আসলে প্রথমত কলকাতার সব বাংলা কাগজ আসে না । তাছাড়া মাত্র বছর চারেক লিখতে শুরু করেছে ঈশান । মাত্র তিনটে বই তার । কলকাতায় তার লেখা কিছুটা পরিচিতি পেলেও এত তাড়াতাড়ি এত দূরে তার নাম ছড়াবে তা ঈশান আশা করে না । সেটাই স্বাভাবিক । কিন্তু ঘরের লোকগুলো ঈশান যাতে ব্যাপারটাতে

অপ্রস্তুত না হয় সে জন্য তার লেখা পড়েছে কিনা সে জবাব না দিয়ে একসাথে বলে উঠল, 'ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে আসুন, ভিতরে আসুন?'

এখানে আসার পর ভোপালের বঙ্গভাষী সমিতির আয়োজকরা ঈশানের প্রতি আতিথেয়তার ত্রুটি না রাখলেও ঈশানের নিজের মনের ভিতর কেমন যেন লজ্জা বোধ হচ্ছে। তার খালি মনে হচ্ছে নিজের যোগ্যতায় নয়, দিবাকরদার সঙ্গী বলেই সবাই খাতির করছে তাকে। আরও অনেক অতিথি অভ্যাগত এসেছেন এই সাংস্কৃতিক বঙ্গ সম্মেলনে। তাদের কেউ চিত্রকর, কেউ নাট্যকর্মী, কেউ অধ্যাপক, কেউ বা নৃত্যশিল্পী। এই রিসর্টেরই নানা ঘরে তাঁরা আছেন। কিন্তু নাম আর খ্যাতির বিচারে উদ্যোক্তাদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু দিবাকরদাই। আর দিবাকরের আলোকছটা ঈশানের গায়েও লাগছে। তাই উদ্যোক্তারা তাকেও খাতির করছে।'

দিবাকরদা ও অন্যদের কথা শুনে ঈশান বলল, 'না, না, আপনারা বরং গল্প করুন। জানলা দিয়ে দেখলাম কিছুটা দূরে একটা মন্দির দেখা যাচ্ছে। ওদিকটায় একবার দেখে এলে অসুবিধা হবে?'

একজন লোক, সম্ভবত স্থানীয় কেউ হবেন, তিনি হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আটটা বাজে। রাত হলেও এখানে তেমন কোনো অসুবিধা নেই। চোর-ডাকাতের ভয় নেই। ওটাই কান্তরিয় শিব মন্দির। যেতে পারেন। তবে কাল তো দুপুরে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু, সকালবেলায় আপনাদের এখানকার প্রধান মন্দিরগুলো ঘুরিয়ে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। গাইডও থাকবে সঙ্গে। সব বুঝিয়ে দেবে।

ঈশান বলল, 'তখন তো দেখবেই ভালো করে। আসলে দেখলাম বাইরে জ্যোৎস্না ফুটেছে। মন্দিরটাও দেখা যাচ্ছে, তাই ভাবলাম... তার কথা শেষ হতে না হতেই দিবাকরদা হেসে বললেন, 'যাও তবে ঘুরে এসো, বুঝতে পারছি তোমার আর ওসব দেখার তর সইছে না। তোমার বয়সে আমি যখন এসেছিলাম তখন আমারও এমন আগ্রহ ছিল ঐ মূর্তিগুলো নিয়ে। বহুদিন ধরে শুনতাম ওদের কথা। দেখে এসো, তারপর স্বপ্নে আহ্বান করো ওদের।' এই বলে চোখ মটকালেন তিনি।'

তাঁর কথা শুনে একটা চাপা হাসির রেখা খেলে গেল উপস্থিত সকলের ঠোঁটের কোণে। দিবাকরদার ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। এই খাজুরাহোর মন্দিরগুলোর গায়ে অসংখ্য মিথুনমূর্তি আছে। অনেকে সেই মূর্তিগুলোর টানেই এখানে ছুটে আসেন। বসনহীন নারী-পুরুষের মুর্তি সব। এ ব্যাপারটা না দেখলেও শোনা আছে ঈশানের। এখানে আসার পর এক ফাঁকে একটা পোস্টকার্ড পিকচার বুক কিনেছে ঈশান। তাতেও ছবি আছে তেমন কিছু ভাস্কর্যের। দিবাকরদার মুখে এতগুলো লোকের সামনে এ কথা শুনে বেশ লজ্জা পেল ঈশান। সে আর কথা না বলে এগোল রিসর্ট ছেড়ে বাইরে বেরোবার জন্য। রিসর্টের গেটে দাঁড়িয়ে ছিল সিকিউরিটির একজন লোক। বাইরে বেরোবার আগে ঈশান তবু তাকে একবার বলল, 'ঐ যে মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে ওখানে একবার যাচ্ছি, কোনো অসুবিধা হবে না তো?'

লোকটা হিন্দিতে জানাল, 'না, কোনো অসুবিধা নেই, রাতে মাঝে মাঝে পুলিশ পেট্রল হয়। তারা জিজ্ঞেস করলে বলবেন আপনি এখানে উঠেছেন। আপনার গলায় আইডেন্টিটি কার্ড তো ঝুলছেই। কোনো সমস্যা হবে না। ওই কান্তারিয় মন্দিরেই একমাত্র পূজা হয়। তবে মন্দিরের পুরোহিত সন্ধ্যারতি শেষ করে এতক্ষণে মনে হয় চলে গেছেন। যান দেখে আসুন। লোকটার কথায় আশ্বস্ত হয়ে রিসর্ট ছেড়ে বাইরে বেরোল ঈশান।

শীতের রাত। ফাঁকা রাস্তা। ট্যুরিস্টপার্টি যারা খাজুরাহো দেখতে এসেছিল তারা হয় ফিরে গেছে অথবা হোটেল রিসর্টে কম্বলের তলায় রাত্রিবাস করছে। কুয়াশা নামতে শুরু করলেও চাঁদের আলোতে মোটামুটি সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন সব মন্দিরের চুড়ো। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ওভাবেই চাঁদের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে তারা। কান্তারিয় মন্দির রির্সর্ট থেকে যত কাছে মনে হয়েছিল ঠিক তত কাছে নয়। নির্জন পথে হাঁটতে মন্দ লাগছিল না ঈশানের। এক সময় পিছনের হোটেল রিসর্ট থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ শব্দটুকুও মিলিয়ে গেল। মিনিট পনেরো চলার পর মন্দিরের কাছাকাছি পৌঁছতেই

ঈশানের সামনের সব কিছু হঠাৎ যেন ঝাপসা হয়ে গেল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ঈশান। ব্যাপারটা বুঝতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল। আসলে একটা কুয়াশার চাদর হঠাৎই যেন নেমে এসেছে মন্দিরের চারপাশে, তাই কুয়াশার আড়ালে প্রায় অদৃশ্য মন্দিরটা। গায়ে চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে কুয়াশা ভেদ করে সামনে এগোতে লাগল ঈশান। আর তারপর সামনের কুয়াশার পর্দা যেন কেটে গেল। ঈশান দেখতে পেল সুবিশাল প্রাচীন এক মন্দিরের বেদিমূলে এসে দাঁড়িয়ে সে। প্রাচীন পাথরের তৈরি সোপানশ্রেণি তার সামনে থেকে উঠে গেছে বেদির ওপর। আর সেখান থেকে মন্দিরগাত্র পর্বতমালার মতো ধাপে ধাপে পিরামিডের মতো উঠে গেছে চন্দ্রালোকিত আকাশের দিকে। মন্দিরের গায়ে চাঁদের আলোতে জেগে আছে অসংখ্য ভাস্কর্য, অলংকরণ, মূর্তি। অদ্ভুত সুন্দর হাজার বছরের প্রাচীন এক মন্দির! খাজুরাহোর কান্তরিয় মন্দির। চান্দেলা রাজবংশের অতুলনীয় কীর্তি।

অনেকটা মন্ত্রমুগ্ধর মতোই সোপানশ্রেণি বেয়ে ওপরে উঠে এল ঈশান। মন্দিরের ভিতর থেকে কোনো আলো ভেসে আসছে না, কোথাও কোনো লোকজন নেই। শুধু ঘি আর ধূপমিশ্রিত মৃদু সুবাস ছড়িয়ে আছে বাতাসে। রিসর্টের সেই লোকটা সম্ভবত ঠিকই বলেছিল। সন্ধ্যারতি শেষ করে পূজারি মন্দির ছেড়ে চলে গেছেন অনেকক্ষণ আগে। উঁচু বেদি থেকে একবার দূরে চারদিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল ঈশান। কিন্তু কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। চারপাশে কুয়াশাবৃত্তর আড়ালে যেন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন মন্দিরটা। মাথার ওপর পূর্ণচন্দ্র যেন শুধু ওপর থেকে মায়াবী আলো ফেলছে মন্দিরের ওপরেই। গর্ভগৃহ অন্ধকার হলেও মন্দিরের শীর্ষবিন্দু থেকে বেদি পর্যন্ত বহিঃগাত্রর সব কিছু স্পষ্ট দৃশ্যমান। ঈশানের কিছুটা তফাতেই বেদিমণ্ডপে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক শার্দূল মূর্তি। বিভিন্ন পশুপাখির শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মিলিয়ে প্রাচীন ভাস্করের দল রচনা করেছিল সেই কল্পিত শার্দূল। ঈশান তার কাছে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখল মূর্তিটাকে। সত্যিই কী অসম্ভব সুন্দর কল্পনা ছিল সে সময়ের শিল্পীদের! তারপর সে ধীর পায়ে প্রদক্ষিণ শুরু করল মণ্ডপ। বয়সের ভারে কিছু কিছু মূর্তি ভেঙে গেলেও মহাকাল তার থাবা সম্পূর্ণ বসাতে পারেনি এই মন্দিরের ওপর। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কত ঝড় জলকে উপেক্ষা করে, মহাকালকে অগ্রাহ্য করে আজও মন্দির গাত্রে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন ভাস্কর্যগুলো। চাঁদের দিকে তাকিয়ে তারা যেন হাসছে। ঈশান ঘুরে ঘুরে দেখতে শুরু করল মন্দির গাত্রের ভাস্কর্যগুলো। অসংখ্য দেবদেবী, সুরসুন্দরী, অপ্সরা, যক্ষ, জীবজন্তুর মূর্তি ছড়িয়ে আছে চারদিকে। আর আছে বিভিন্ন ভঙ্গিমার অগুনতি মিথুনমূর্তি। চাঁদের আলোতে তারা সব যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তারা যেন কেউ পাথরের তৈরি নয়, রক্তমাংসের মানুষ সব! ঈশান অবাক হয়ে ধীরে ধীরে দেখতে লাগল সেসব।

প্রাচীন শিল্পীরা সেসময়ের মানুষদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের চিত্রও খোদিত করে গেছেন মন্দির গাত্রে। বিশেষত নারীদের অঙ্গ সজ্জার দৃশ্য। ঘুরতে ঘুরতে তেমনই এক দৃশ্যর সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল ঈশান। দেওয়াল-গাত্রে খোদিত সেই ছবিতে এক অপরূপা সুরসুন্দরী বসে আছে। তার এক পা বুকের কাছে, অন্য পা সামনে প্রশস্ত। সে-পায়ে মল পড়িয়ে দিচ্ছে একজন পরিচারিকা। অন্য দুজন পরিচারিকার একজন তাঁর কবরীবন্ধনে ব্যস্ত, আর একজন তার সামনে দর্পণ ধরে আছে। সেই সুরসুন্দরীর দেহসৌষ্ঠব যেন ম্লান করে দিচ্ছে আকাশের চন্দ্রিমাকে। কবরীবন্ধন আর মল পড়ানো শেষ হলেই উঠে দাঁড়াবে উন্নত বক্ষদেশ ম্লান কটির সেই অপরূপা। মূর্তিটার দিকে স্থির দৃষ্টে তাকিয়ে ঈশান ভাবছিল, কীভাবে ভাস্কররা কল্পিত করত এই সব নারীদের! এরা কি সত্যিই ছিল? এই যে দেওয়ালগাত্রে খোদিত এত নারী। মূর্তি, মিথুনরত নারীমূর্তি এ সবই কি নিছক প্রাচীন শিল্পী ভাস্করদের কল্পনা, নাকি সত্যিই একদিন রক্তমাংসর ছিল এই নারীরা? নইলে কীভাবে এত জীবন্তভাবে তাদের রচনা করলেন সে সময়ের শিল্পীরা?

'মগধ, মালব, কামরূপ, বঙ্গ-সমতট থেকে বিশেষ শারীরিক লক্ষণযুক্ত নারীদের সংগ্রহ করে আনা হত এখানে। তারপর তাদের মধ্যে থেকে আবার পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত করা হত কাদের সুরসুন্দরী বা দেবদাসী বানানো হবে। যাদের দেখে মূর্তি নির্মাণ করতেন ভাস্করের দল।' — কথাটা কানে যেতেই

চমকে উঠে ফিরে তাকাল ঈশান । যেন মনে মনে নয়, ঈশান প্রশ্নটা কাউকে করে ছিল, আর সে তার জবাব দিল! ঈশানের কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন মহিলা । শাড়ির ওপর শাল জড়ানো । শালের অবগুণ্ঠনের আড়ালে চন্দ্রালোকে তার মুখমণ্ডল যতটুকু দৃশ্যমান, তাতে তাকে যুবতী বলেই মনে হয় । এই নির্জন মন্দিরপ্রাঙ্গণে এত রাতে একাকী তাকে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল ঈশান । কোথা থেকে এলেন এই মহিলা? তারপর তার মনে হল তিনিও হয়তো অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছেন । যখন তিনি বাংলায় কথা বলছেন । আর তাকে দেখে অবাক হবার কিছু নেই । আর মেয়েরা এখন অনেক সাহসী । ঈশান নিজে যদি এত রাত্রে একলা এখানে মন্দির দেখতে আসতে পারে তবে সে-ও আসতে পারবে না কেন?

ঈশান প্রাথমিক বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে একটু ইতস্তত করে তাকে প্রশ্ন করল, ‘আপনি কোথা থেকে এখানে এসেছেন?’

‘তিনি মৃদু হেসে জবাব দিলেন ‘ঐ যে বঙ্গ সমতট ।’

ঈশান বলল, ‘আমার নাম ঈশান । একটু আধটু লেখালেখি করি । আপনি?’

মহিলা জবাব দিলেন, ‘আমার নাম সোমদত্তা । এ মন্দির যে সময় তৈরি হয়েছিল সে সময় হলে আমাকে ‘‘নটী’’ বলত, এখন বলা হয় ‘‘নর্তকী’’ ।’ বেশ জবাব দিচ্ছেন ভদ্রমহিলা । ঈশান এবার হেসে ফেলে বলল, ‘হ্যাঁ, শুনেছি, কলকাতা থেকে একটা ডান্সট্রুপ এসেছে । যদিও তাদের কারো সাথে পরিচযের সুযোগ হয়নি । আপনার সাথেই প্রথম আলাপ হল । এত রাতে একলা এখানে আপনার ভয় করছে না?’

মুহূর্তর জন্য যেন প্রশ্নটা শুনে চুপ হয়ে গেল সোমদত্তা । তারপর কুয়াশার পর্দা ভেদ করে দূরে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করে বলল, ‘সত্যি কথা বলতে কি ভয় যে করছে না তা নয়, তবে আপনাকে পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম । চলুন মন্দিরটা এবার ঘুরে দেখা যাক ।’

ঈশান বলল, ‘হ্যাঁ, চলুন ।’

ধীর পায়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করা শুরু করল তারা দুজন । চারপাশে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য সব মূর্তি । তার মধ্যে অধিকাংশই সব মিথুনমূর্তি, অথবা স্বল্পবসনা বা বিবসনা নারীমূর্তি । সুন্দর মুখশ্রী, কোমলবাহু, ঘন সন্নদ্ধ স্তনদ্বয়, মাংসল উদরে গভীর নাভিকূপ, ক্ষীণ কটিদেশের নারীমূর্তিগুলো যেন তাকিয়ে দেখছে তাদের দুজনকে । সঙ্গে মহিলা থাকায় প্রাথমিক অবস্থায় ঈশানের যে একটা মৃদু অস্বস্তি হচ্ছিল না তা নয়, তবে চুপচাপ মূর্তিগুলো দুজন মিলে ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে সে অস্বস্তি এক সময় কেটে গেল । ক্রমশ মন্দিরের গোলকধাঁধায় প্রবেশ করল তারা দুজন । মন্দিরের গর্ভগৃহকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য ছোট ছোট মন্দির । তার ভিতর আছে অসংখ্য দেবদেবী লক্ষ্মি গণেশ-নারায়ণ ইত্যাদির মূর্তি, স্তম্ভগাত্রে খোদিত আছে শৃঙ্গার দৃশ্য । ঈশান খেয়াল করল সম্ভবত ভদ্রমহিলার পায়ে মল বা নূপুর পরা আছে । মাঝে মাঝে মৃদু ঠুং টাং শব্দ হচ্ছে । এতবড় মন্দির চত্বরে শব্দ বলতে শুধু ওইটুকুই । বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াবার পর মৌনতাভঙ্গ করার জন্য ঈশান বলল, ‘অদ্ভুত সুন্দর মন্দির । এসব ভাস্কর্য কোনারক মন্দিরে কিছুটা দেখা যায়, কিন্তু শুনেছি আর অন্য কোথাও দেখা যায় না । কারা কেন দেবালয়ে তৈরি করল এসব মূর্তি?’ শেষ বাক্যটা স্বগতোক্তির স্বরেই বলল ঈশান ।

সোমদত্তা বেশ স্পষ্টভাবে বলল, আপনি ওই মিথুনমূর্তিগুলোর কথা বলছেন তো । দেবালয়ে মিথুনমূর্তি নির্মাণের পিছনে বেশ কয়েকটা কারণ ছিল । সেসময় মানুষের বিশ্বাস ছিল মন্দিরে মিথুন মূর্তি থাকলে বজ্রপাত হয় না । বজ্র স্পর্শ করে না মিথুনরত নারী পুরুষকে । আবার কেউ কেউ বলেন ওই যুগল মূর্তিগুলোর মিলনের মধ্যে দিয়ে দেহের সাথে আত্মার মিলনকে বোঝানো হয়েছে । তাছাড়া সেসময়ের ভাস্কর-শিল্পীরা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সত্যকে গোপন রাখতে চাননি । তা খোদিত করে গেছেন মন্দিরগাত্রে । এক সময় চান্দেল রাজাদের রাজধানী ছিল এই মন্দির নগরী খাজুরাহো । আর এই কান্তরিয় মহাদেব মন্দির-নির্মাণ করিয়েছিলেন মহারাজ বিদ্যাধর । কী আমি ঠিক বলছি তো?’

ঈশানের খাজুরাহো নিয়ে তেমন কোনো পড়াশোনা নেই । তবে সঙ্গিনীর কথা শুনে কেন জানি তার মনে হল এ কথাগুলো তার জানা, যে গাইডবুকটা সে কিনেছিল তাতে একবার ইশান চোখ বুলিয়েছিল । হয়তো-বা সেখানেই লেখাছিল এই কথাগুলো । তবে মেয়েটা যে এই জায়গা সম্বন্ধে বেশ কিছু জানে তা অনুমান করে ঈশান তাকে প্রশ্ন করল, 'আপনি কি ইতিহাসের ছাত্রী ছিলেন? আগে এসেছেন এখানে?' সোমদত্তা জবাব দিল, 'এ মন্দিরের আমি সব কিছু চিনি-জানি ।'

'ঈশান হেসে বলল, 'বুঝলাম, তার মানে আপনি আগে এসেছেন এখানে । বিনা পয়সায় তাহলে একজন গাইড পেলাম আমি ।'

ঈশানের কথায় সোমদত্তা যেন মৃদু হাসল মনে হয় । তারপর বলল, 'আচ্ছা, এ জায়গা আপনার চেনা মনে হয় না? মনে হয় না আপনিও কোনো দিন এখানে এসেছেন?'

ঈশান জবাব দিল, 'আমি এখানে প্রথম এসেছি । তবে এক জায়গাতে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালে মনে হয় সে জায়গা আমার চেনা । যেন আগে কোনোদিন এসেছি সেখানে । সে অনুভূতি কিছুটা আমার হচ্ছে ।'

সোমদত্তা বলল, 'আসুন আপনাকে একটা জিনিস দেখাই ।' এই বলে সে এগোল গর্ভ মন্দিরের দিকটাতে । ঈশান তাকে অনুসরণ করল । গর্ভমন্দিরের প্রবেশ মুখের কাছাকাছি পৌঁছে ঈশান থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'ভিতরে যাওয়া কি ঠিক হবে? যা অন্ধকার!'

মন্দিরের ভিতরে ঢোকার মুখটাতে ঈশানের কথা শুনে মুহূর্তর জন্য পিছনে ফিরে তাকিয়ে সোমদত্তা বলল, 'ভয় পাচ্ছেন?'

ঈশানের এবার বেশ লজ্জাবোধ হল তার কথা শুনে । সে যখন ভিতরে ঢোকার সাহস পাচ্ছে তখন ঈশান পারবে না কেন? 'আচ্ছা, চলুন' বলে ঈশান প্রবেশ করল গর্ভমন্দিরে ।

বিশাল গর্ভমন্দির । তার ভিতরেও নানা অলিগলি । সেখানে আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে আছে নানা দেবদেবী বা সুরসুন্দরীদের মূর্তি । ছাদের ফাটল গলে বা অন্য কোনোভাবে কিছুটা চাঁদের আলো ঢুকছে ভিতরে । আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে থাকা নারী-পুরুষের মূর্তিগুলোকে কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে । ঈশানের কয়েক পা আগে চলেছে সোমদত্তা । তার শান্ত ধীর পদচারণা দেখে ঈশানের মনে হল, সত্যি যেন সে মন্দিরটা চেনে । ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছে সে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ।

ঈশানকে সঙ্গে নিয়ে এক সময় এক জায়গাতে এসে থামল সোমদত্তা । কোথা থেকে যেন চাঁদের আলো এসে পড়েছে সামনের দেওয়ালটার ওপর । আর সেই আলোতে তাদের সামনে জেগে আছে একসার ক্রীড়ারত নারীমূর্তি । ছোট ছোট বল বা গোলক নিয়ে তারা খেলা করছে । কারো হাতের তালুতে গোলক রাখা, কেউ আবার গোলক স্থাপন করেছে তাদের উন্মুক্ত বক্ষ বিভাজিকার খাঁজে ।

অদ্ভুত সুন্দর নারীমূর্তি সব । প্রত্যেকেই যেন জীবন্ত । ছোট গোলক নিয়ে নারীদের খেলার ব্যাপারটা খুব প্রাচীন প্রথা । মূর্তিগুলোকে দেখে একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল ঈশানের । সাহিত্যের কথা । একটু ইতস্তত করে ঈশান বলল, 'জানেন মহাকবি কালিদাসের রচনায় এই বলের উল্লেখ আছে — ''ছোট্ট গোলক তুমি আমার প্রিয়ার করকমলের ছোঁয়ায় লাফাও । উঁচুতে আরও উঁচুতে লাফাও । ছুঁতে চাও তার ওষ্ঠ । অথচ প্রতিবারই ভুল করে নেমে আসো মাটিতে । আমি সাক্ষী থাকি সেই মর্মবেদনার ।''

সোমদত্তা সেকথা শুনে প্রথমে যেন মৃদু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, মর্মবেদনা ।' তারপর যেন একটু উৎসাহিত হয়ে বলল, 'আর কিছু, আর কিছু মনে পড়ছে আপনার এই নারী-মূর্তিগুলো দেখে? বিশেষত ওই গোলকগুলোর ব্যাপারে?'

ভালো করে মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে ঈশান বলল, 'না, তেমন কিছু নয়, তবে এই মূর্তিগুলো দেখে কেন জানি মনে হচ্ছে এদের আগে আমি দেখেছি । এমনও হতে পারে কবির বিবরণ পড়ে মনের কল্পনায় । তাই হয়তো একটু চেনা মনে হচ্ছে এই রমনীদের ।'

ঈশানের কথা শুনে মৃদু চুপ করে থাকার পর সোমদত্তা বলল, 'ওই ছোট গোলকগুলো কিন্তু অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজেও ব্যবহার করা হত । বক্ষ সৌন্দর্য এই নারীমূর্তিগুলোর অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল । যেসব নারীদের মগধ, কামরূপ, বঙ্গ সমতট থেকে সংগ্রহ করে আনা হত তাদের সুরসুন্দরী রূপে নির্বাচন করা হবে কিনা তার জন্য এক অন্তিম পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল । ওইসব নারীদের বক্ষ উন্মুক্ত করে দাঁড় করিয়ে কিছুটা তফাত থেকে আকাশের দিকে এমনভাবে ওই ছোট গোলক ছুড়ে দেওয়া হত যা ওপর থেকে এসে নারীর দুই বক্ষের মাঝে পড়ে । গোলক যদি ফাঁক গলে গড়িয়ে নীচে পড়ে তবে সে নারীকে সুরসুন্দরী হবার অনুপযুক্ত ধরা যেত । তারা দাসী হত সুরসুন্দরীদের । আর যে নারী ওই গোলক তার দুই বক্ষের মাঝখানে ধারণ করতে পারত, সে হত সুরসুন্দরী । তাকে দেখে মূর্তি নির্মাণ করত ভাস্করের দল । এই মন্দিরে যত সুরসুন্দরীদের মূর্তি আছে তাদের সবাইকেই এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে ।

সম্পূর্ণ অজানা এক কথা শুনলেও ঈশানের কেন জানি মনে হল এ কথাটাও তার জানা । সে শুধু বলল, 'যদি মন্দিরের আরও ওপরে ওঠা যেত তবে মন্দিরের শীর্ষগাত্রে যেসব মূর্তিগুলো আছে তাদেরকেও কাছ থেকে ভালোভাবে দেখা যেত ।'

সোমদত্তা বলল, 'চলুন তবে । আমি ওপরে ওঠার পথ চিনি । ওই পথ বাইরে থেকে বোঝা যায় না । মন্দির যখন নির্মিত হয়েছিল তখন ভাস্করের দল ওই পথে ওপরে উঠে কাজ করত ।'

তার কথা শুনে ঈশান বলল, 'আপনি এ মন্দিরের এত কিছু চেনেন কী করে? কতবার এসেছেন এখানে?

সোমদত্তা তার কথা শুনে হাসল । তারপর এগোল সামনের দিকে । অগত্যা ঈশান অনুসরণ করল তাকে ।

গর্ভগৃহ সংলগ্ন একটা কক্ষ থেকে সংকীর্ণ একটা সোপানশ্রেণি ওপরে উঠে গেছে । সোমদত্তা উঠতে শুরু করল সেই সিঁড়ি বেয়ে । আর তার পিছন পিছন ঈশান । দেওয়ালের ফাটল দিয়ে মাঝে মাঝে আলো এসে পড়ছে সিঁড়িতে । বাকি জায়গাগুলো অন্ধকার । ছমছম নূপুর বাজছে সোমদত্তার পায়ে । সিঁড়ির অন্ধকার বাঁকগুলোতে যেখানে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সোমদত্তা, সেখানে ওই নূপুরধ্বনিকেই অনুসরণ করছে ঈশান । বেশ কিছুক্ষণ ধরে ওপরে ওঠার পর এক সময় সামনেটা বেশ আলোকিত হয়ে উঠল । সোমদত্তার পিছন পিছন ঈশান এসে প্রবেশ করল ঘরের মতো একটা জায়গাতে । মাথায় ছাদ থাকলেও তার চারপাশ খোলা । চারদিক থেকে মন্দিরগাত্রের পাথুরে থাক এসে মিশেছে সে-জায়গার সাথে । চন্দ্রালোকে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুরসুন্দরীরা । ঈশান বুঝতে পারল সে সম্ভবত মন্দিরের শীর্ষদেশের কোনো জায়গায় উঠে এসেছে । নীচের মন্দির চত্বরটা পুরো দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে । আর মন্দিরকে ঘিরে থাকা কুয়াশাবলয়ের মাথার ওপর দিয়েও এদিক-ওদিকে দেখা যাচ্ছে মন্দির-নগরীর সার সার চূড়া ।

ঘরের মতো জায়গাটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সোমদত্তা প্রশ্ন করাল 'এই জায়গাটা চেনা মনে হচ্ছে আপনার?'

ঈশান ভালো করে তাকাল চারপাশে । ঘরের মতো জায়গাটার এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে নানা প্রকারের প্রস্তরখণ্ড, কিছু অর্ধসমাপ্ত মূর্তি । জায়গাটার এক কোণে কিছু লৌহ কীলক, হাতুড়ি ইত্যাদি প্রাচীন যন্ত্রপাতিও পড়ে আছে ।

ঈশান কোনো দিন এ জায়গাতে আসেনি । কিন্তু এবার হঠাৎ তার মনে হতে লাগল জায়গাটা তার পরিচিত । সে বলল, 'আচ্ছা এখানে সিক মূর্তি বানানো হত?'

সেমদত্তা বলল ? হ্যাঁ, তারপর সে মূর্তিগুলো স্থাপন করা হত এ জায়গা সংলগ্ন মন্দির-শীর্ষের তাকগুলোতে । এ জায়গা দেখে আর কিছু মনে পড়ছে আপনার?'

চারদিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে কেমন যেন এক অদ্ভুত অনুভূতি শুরু হল ঈশানের মনে । ঈশান স্পষ্টভাবে জবাব দিল, 'কেমন যেন চেনা মনে হচ্ছে এ জায়গা...'

সোমদত্তা আবার জানতে চাইল, 'আর কিছু আর কিছু?'

জায়গাটা দেখে ঈশানের মনের ভিতর অস্পষ্ট কিছু ফুটে উঠে আবার যেন মিলিয়ে যাচ্ছে । ঈশানের মনে হচ্ছে সে যেন কিছু একটা এবার বুঝেও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না!

ঈশানকে চুপ করে থাকতে দেখে সোমদত্তা যেন একটু বিষণ্ণভাবে বলে উঠল, 'এই মন্দির, গোলক নিয়ে ক্রীড়ারত সুরসুন্দরীদের মূর্তি, ভাস্করদের এই জায়গা দেখে এখনও তোমার কিছু মনে পড়ছে না ঈশান?'

কথাগুলো বলা শেষ করে সোমদত্তা ঘরের কোণ থেকে তুলে নিল একটা লৌহ কীলক আর হাতুড়ি । তারপর বলল, 'এসো আমার সঙ্গে' । ঈশান খেয়াল করল সোমদত্তার সম্বোধন এবার পাল্টে গেছে । ঈশানের কপালের দু-পাশের রগগুলো কেমন যেন দপদপ করতে শুরু করেছে । কীলক আর হাতুড়িটা নিয়ে সে জায়গা ছেড়ে একটা তাকের দিকে এগোতে শুরু করল সোমদত্তা । তাকে অনুসরণ করল ঈশান ।

মন্দিরের শীর্ষদেশের সংকীর্ণ তাক! কোনো প্রাকার নেই তার । অনেক নীচে মন্দির প্রাঙ্গণ । উন্মুক্ত তাকগুলোর মাঝেমাঝে শুধু বিভিন্ন ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে সুরসুন্দরীদের দল । চাঁদের আলোতে তাদের ঠোঁটের কোণে যেন আবছা হাসি লেগে আছে । যেন কিছুর জন্য প্রতীক্ষা করছে তারা । তাক ধরে এগিয়ে চলছে সোমদত্তা । তার পিছনে ঈশান যত এগোচ্ছে তত যেন ঈশানের মনে হচ্ছে এ জায়গা তার খুব চেনা, খুব চেনা! কিন্তু তা কী করে সম্ভব? তাকের শেষ প্রান্তে এক সময় এসে পৌছল সোমদত্তা । সেখানে অন্য মূর্তিগুলোর তফাতে একাকী দাঁড়িয়ে আছে এক সুরকন্যার মূর্তি । সেখানে এসে থামল তারা দুজন ।

সোমদত্তা ঈশানকে বলল, 'এবার ভালো করে তাকাও মূর্তিটার দিকে ।'

ঈশান তাকাল । চাঁদের আলোতে দাঁড়িয়ে আছে সেই সুরকন্যা, গ্রীবাটা ঈষৎ আনত । চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকা ঘন সন্নিবেষ্ট বক্ষদেশ, ক্ষীণ কটির সেই সুরসুন্দরীর গা বেয়ে যেন জ্যোৎস্না চুইয়ে পড়ছে । মৃণাল লতার মতো তার বাহুযুগলের করপল্লব দুটো বুকের ঠিক মাঝখানে চেপে ধরা । হাত দুটো কি লজ্জা নিবারণের জন্য বুকের মাঝখানে ওভাবে চেপে ধরেছে, নাকি সেখানে লুকিয়ে রেখেছে অন্য কিছু?

ঈশান বলল এ মূর্তি যে আমার চেনা মনে হচ্ছে?

সোমদত্তা সেই লৌহ-শলাকা আর হাতুড়িটা ঈশানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'এ মূর্তি তো তুমিই বানিয়ে ছিলে একদিন । বঙ্গসমতট থেকে এসেছিল এক নারী । ভাস্করশ্রেষ্ঠ তুমিও বঙ্গ সমতটেরই লোক ছিলে । এই মন্দিরের প্রধান ভাস্কর । তোমার কাছেই থাকত সেই দুর্মূল্য স্ফটিক গোলক । যা বক্ষের মাঝখানে ধারণ করেছিল এই নারী, আর তার সাথে সাথে তোমার হৃদয়ও ...'

কী বলছে সোমদত্তা! মাথার ভিতরটা যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে ঈশানের । যেন বাস্তব আর পরাবাস্তবতার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঈশান । সোমদত্তা বলে চলল, 'তারপর তোমাকে আর এই নারীকে নিয়ে রচিত হল কত ভাস্কর্য । তুমিও ভালোবেসেছিলে তাকে । কিন্তু একদিন তোমার কার্যোপলক্ষে কিছু দিনের জন্য দেশে ফেরার প্রয়োজন হল । নারীর সৌন্দর্য নির্বাচনের জন্য ওই স্ফটিক গোলক ছিল হীরকখণ্ডর চেয়েও দামি । যাবার আগে তুমি সেই গোলক গচ্ছিত রেখে গেলে এই নারীর কাছে, তোমার সৃষ্ট এই মূর্তির মধ্যে । বলে গেলে তুমি যত দিন ফিরে না আসো ততদিন সে যেন বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখে সেই গোলক । কিন্তু তুমি আর ফিরলে না । রাজ নির্দেশে একদিন তল্লাশি শুরু হল সেই গোলকের । তারা অনুমান করল তোমার প্রেয়সী নিশ্চয়ই সন্ধান জানে সেই গোলকের আর তারপর ... ।'

সোমদত্তার কথাগুলো যেন তছনছ করে দিচ্ছে ঈশানের মাথার ভিতরটা । ঈশানের ভিতর থেকে যেন জেগে উঠেছে অন্য এক ঈশান । তবু সে শেষ একবার বলার চেষ্টা করতে যাচ্ছিল, 'এ সব আবোলতাবোল কী বলছেন আপনি!'

সে কথা বলার জন্য ঈশান তাকাল সোমদত্তার দিকে । কখন যেন শালের আবরণ খসিয়ে ফেলেছে সোমদত্তা । ঈশান দেখতে পেল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা সুরসুন্দরী আর সোমদত্তার মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই । তারা দুজন যেন একই নারী!

সে দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ঈশানের মনের ভিতর থেকে যেন খসে পড়ল হাজার বছরের খোলস । ঈশান চিৎকার করে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি । সব মনে পড়ে গেছে আমার । সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বঙ্গ সমতট থেকে এ দেশে আর ফেরা হয়নি আমার ।'

তার মূর্তিটার মতোই তার ঠোঁটের কোণে একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল সোমদত্তার । সে বলে উঠল, 'কিন্তু আমি যে হাজার বছর ধরে তোমার প্রতীক্ষায় এখানে দাঁড়িয়ে আছি ভাস্করশ্রেষ্ঠ । তোমারই সেই স্ফটিক গোলক বুকে নিয়ে, তোমার ভালোবাসাকে বুকের মধ্যে আগলে ধরে । আমি কাউকে জানতে দিইনি তার কথা । কারো হাতে তুলে দিতে পারিনি তোমার-আমার ভালোবাসাকে ।

ঈশান আর্তনাদ করে বলে উঠল, 'আমাকে তুমি ক্ষমা করো । আমি ভুলে গেছিলাম তোমাকে ।'

বিষণ্ণ হেসে সোমদত্তা বলল, 'ক্ষমা নয়, আমি যে তোমায় ভালোবাসি । সেজন্যই তো আমি সে-গোলক তুলে দিতে পারিনি রাজরক্ষীদের হাতে । সে গোলক যে ভাস্করের হাতে যেত সেই হত তোমার জায়গায় প্রধান ভাস্কর । সে কেমন করে সইতাম আমি । কিন্তু হাজার বছর ধরে বুকের মাঝখানে লুকিয়ে রাখা এ গোলকের ভার আমি আর সহ্য করতে পারছি না । সামান্য সুরসুন্দরী আমি । হাজার বছর আগে তুমি যদি আমাকে ভালোবেসে থাকো তবে মুক্তি দাও আমাকে ।'

বিস্মিত ঈশান বলে উঠল, 'মুক্তি? কী ভাবে?'

সোমদত্তা বলে উঠল ওই মূর্তি আর আমি অভিন্ন নই । তোমার হাতের ওই লৌহশলাকা হাতুড়ি দিয়ে বিদ্ধ করে আমার বুকে । খুন করে আমাকে । আমার বুকের ভিতর থেকে উৎপাটিত করো তোমার স্ফটিক গোলক । এই বলে নীচের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখার চেষ্টা করল সে । এক মুহূর্তের জন্য একখণ্ড কালো মেঘ এসে ঢেকে দিল চাঁদকে । ঈশান দেখতে পেল মূর্তিটা অদৃশ্য হয়েছে তার জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে সোমদত্তা!

ঈশান বলল, 'এ কী বলছ তুমি । চলো আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই ।'

সোমদত্তা বলে উঠল, 'পালানো হবে না আমার । আমাকে নিয়ে পালাতে গেলে তোমারও বিপদ হবে । রক্ষীরা ঠিক ধরে ফেলবে দুজনকে । আমাকে তুমি খুন করে মুক্তি দাও এই সুরসুন্দরীর জন্ম থেকে । কীলক বসিয়ে দাও আমার বুকে, কথাগুলো বলতে বলতে এবার কেমন যেন সে চঞ্চল হয়ে উঠল ।

ঈশান বলল, 'কোথায় রক্ষী কেউ তো কোথাও নেই!'

সোমদত্তা বলল, 'খুন করো, খুন করো আমাকে । কীলক বসিয়ে দাও । দ্বিধা কোরো না । যেমনভাবে কঠিন পাথরের গায়ে এই কীলক আর হাতুড়ির ঘায়ে তুমি আমার প্রাণ সঞ্চার করেছিলে তেমনই ভাবো কোনো প্রস্তরমূর্তির বুকে আঘাত হানছ তুমি । নারী নয়, তুমি প্রস্তর ঘাতক ।'

আর এরপরই সোমদত্তা চিৎকার করে উঠল, ওই দেখো তারা এসে পড়েছে! আর সময় নেই ।'

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মশালের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মন্দির চত্বর । এখানে-ওখানে মন্দিরগাত্রের নানা জায়গাতেও জ্বলে উঠল মশালের আলো । নীচে তাকিয়ে ঈশান দেখতে পেল । মন্দির চত্বর থেকে পাথুরে দেওয়ালের পথ বেয়ে সার বেঁধে ওপর দিকে উঠে আসছে হাজার বছরের প্রাচীন এক রক্ষীবাহিনী । মশালের আলোতে ঝিলিক দিচ্ছে তাদের হাতে ধরা তলোয়ার, বর্শার ফলা । তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে আদিম জিঘাংসা, নারী লালসা । অতি দ্রুত ওপরে উঠে আসছে তারা!

সোমদত্তা আবারও চিৎকার করে উঠল, 'আর দেরি কোরো না । খুন করো আমাকে, নইলে তুমিও বাঁচবে না । ওই গোলকের জন্য হাজার বছর ধরে এমন চাঁদনি রাতে ওরা আসে । সবাই মিলে গোলক না পেয়ে চরিতার্থ করে তাদের লালসা । তুমি কি সহ্য করতে পারবে সেই দৃশ্য? গোলক ওদের হাতে তুলে দেব না বলে যুগ যুগ ধরে সহ্য করেছি এই অত্যাচার । দোহাই তোমার । এবার আমাকে মুক্তি দাও । খুন করে মুক্তি দাও আমার প্রাচীন আত্মাকে । তারপর আবার আমার তোমার মতো নবজন্ম হবে । দোহাই তোমার দেরি কোরো না ।'

ভাস্কর ঈশান চিৎকার করে অসহায়ভাবে বলে উঠল— 'না, এ দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারব না।'

ক্রমশ উঠে আসছে পিশাচের দল। কানে আসছে তাদের অস্পষ্ট উল্লাসধ্বনি।

না, আর দেরি নয়। মন শক্ত করল ভাস্কর। তার দু-হাতের মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠল। স্তনের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে সোমদত্তা। মনের সব শক্তিকে একত্রিত করে সোমদত্তার বুকের ঠিক মাঝখানে লৌহ কীলক প্রতিস্থাপিত করল ঈশান। মুহূর্তের জন্য এবার যেন হাসি ফুটে উঠল সেই সুরসুন্দরীর ঠোঁটের কোণে। মুক্তির হাসি। কোলাহল আরও কাছে উঠে এসেছে। আর দেরি না করে ঈশান হাতুড়ির ঘা দিল কীলককে। ঠং করে একটা শব্দ হল। তার আঘাতে কী যেন একটা ছোট্ট উজ্জ্বল গোলকের মতো জিনিস তার স্তনের ভিতর থেকে নিক্ষিপ্ত হল আকাশের দিকে। লৌহ শলাকাটা আমূল প্রেথিত হল সুরসুন্দরীর স্তনে। থরথর করে কেঁপে উঠল সুরসুন্দরী। তারপর টাল খেয়ে উন্মুক্ত তাক থেকে ছিটকে পড়ল নীচের দিকে। তার দেহ নীচে আছড়ে পড়ার সাথে মিশে গেল ঈশানের আর্তনাদ। আর সঙ্গে সঙ্গেই সব কোলাহল থেমে গেল, সব আলো নিভে গেল। নিস্তব্ধ হয়ে গেল চারপাশ। একদম নিস্তব্ধ যে বৃত্তাকার কুয়াশার স্তর কান্তরিয় মন্দিরকে ঘিরে ছিল তা যেন মন্দিরকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। ওপরে উঠে আসছে কুয়াশা। ঈশান এরপর যে-পথ বেয়ে সেখানে পৌঁছেছিল পাগলের মতো ছুটতে শুরু করল সেদিকে।

পরদিন বেলা আটটা নাগাদ দিবাকরদার ডাকে ঘুম ভাঙল ঈশানের। ঘুম ভেঙে উঠে বসার কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মনে পড়ে গেল, গতরাতের ঘটনার কথা। সেটা কি সত্যি ছিল, নাকি স্বপ্ন? সে দিবাকরদাকে জিজ্ঞেস করল, 'কাল কখন ঘরে ফিরেছি আমি?'

দিবাকরদা বললেন, 'তা তো বলতে পারব না। কাল পানটা একটু বেশি হয়ে গেছিল। ওরাই আমাকে ধরাধরি করে এঘরে পৌছে দেয়। কোনো হুঁশ ছিল না আমার। এখন চটপট তৈরি হয়ে নাও। গাইড এসে গেছে, মন্দির দেখতে বেরোতে হবে।'

কিছু সময়ের মধ্যেই মন্দির দেখার জন্য গাইডের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল ঈশানরা। সঙ্গে আয়োজকরাতো আছেই। বেশ বড় দল। তারা প্রথমে এসে উপস্থিত হল কান্তরিয় মন্দিরে। বিশাল মন্দির। অপূর্ব তার শিল্প সুষমা। সকালের সূর্যালোকে তার গায়ে জেগে আছে অসংখ্য সুরসুন্দরী, মিথুন ভাস্কর্য। হাজার বছরের প্রাচীন মন্দিরের গায়ে সেসব ভাস্কর্য দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। গাইড তাদের বলল, 'এই মন্দিরে যেসব সুরসুন্দরীদের আপনারা দেখতে পাবেন তারা কিন্তু কেউ কল্পিত ছিলেন না। মগধ, উজ্জয়িনী, কামরূপ এমনকী আপনাদের বঙ্গসমতট থেকেও তাদের সংগ্রহ করে এনে তাদের মডেল বানিয়ে মূর্তি নির্মাণ করত শিল্পী ভাস্করের দল।'

গাইডের সাথে তার কথা শুনতে শুনতে বিমোহিতভাবে মূর্তিগুলো দেখতে দেখতে মন্দির দেখতে শুরু করল সবাই। হঠাৎ এক জায়গাতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল গাইড। তার সাথে সাথে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পুরো দলটা। সামনেই পাথুরে চাতালের ওপর পড়ে আছে খণ্ডবিখণ্ড এক সুরসুন্দরীর মূর্তি। গাইড একবার মন্দির শীর্ষের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সম্ভবত মাথার ওপরের কোনো তাক থেকে রাতে খসে পড়েছে মূর্তিটা। গতকালও এখানে এটা দেখিনি। মাঝে মাঝে এমন হয়। হাজার বছরের প্রাচীন স্থাপত্য তো। মাঝে মাঝে এটা-ওটা খসে পড়ে। সবাই গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াল মূর্তির খণ্ডিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে। তার বুকটা অক্ষত আছে। আর তার মধ্যে প্রোথিত আছে একটা প্রাচীন লৌহ শলাকা। একজন বলল, 'এ শলাকাটা দিয়েই মনে হয় দেওয়ালের গায়ে আটকে রাখা হয়েছিল মূর্তিটাকে। কিন্তু এখন দেখে মনে হচ্ছে ঠিক যেন কেউ বুকের মধ্যে শলাকা বিঁধে খুন করেছে সুরসুন্দরীকে।' তার কথা শুনে মৃদু চমকে উঠল ঈশান। আর তারপরই তার পায়ের কাছে একটা জিনিস পড়ে থাকতে দেখে সেটা কুড়িয়ে নিল ঈশান। পাথরের তৈরি নিটোল একটা গোলক। অনেকটা পায়রার ডিমের আকৃতির। হয়তো হাজার বছর ধরে পাথরের মধ্যে থাকার কারণে: স্ফটিক গোলক রূপান্তরিত হয়েছে লালচে পাথরের গোলকে। গাইড

গোলকটা দেখে বলল, ‘এ ধরনের বল মাঝে মাঝে এখানে কুড়িয়ে পাওয়া যায় । চলুন এগোনা যাক । এ মন্দির দেখা শেষ করে অন্য মন্দিরে যেতে হবে । আরও অন্য মন্দির আছে এখানে।’

শলাকাবিদ্ধ সেই সুরসুন্দরীকে পাশ কাটিয়ে অন্যদের সাথে ঈশান এগোল সামনের দিকে ।

হিসেবে কিছু ভুল ছিল

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়



জুতোজোড়া প্রথমে সজীব হয়ে নড়ে উঠল, তারপর গটগট করে বিছানার কাছে গিয়ে থেমে পড়ল।...

মহীতোষবাবুর গায়ে কাঁটা দিল। হেমেন রায়ের রহস্যরোমাঞ্চ সমগ্র বইটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। নাহ, আজ থাক। বাকিটা কাল সকালে পড়বেন।

ঘড়িতে এগারোটা পঞ্চাশ। কনকনে শীতের রাত। চারিদিক নিশুতি। মহীতোষবাবুর মনে পড়ে গেল, আজ হেরম্ব দাস লেনে প্রকাণ্ড বাড়িতে তিনি একেবারে একা।

করিডরের আলোগুলো জ্বালিয়ে দিলেন। জ্বলুক সারারাত। বেডরুমেও আজ আলো নেভাবেন না।

হঠাৎ য—যা! আলো নিভে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। লোডশেডিং? শনিবারের রাতে!

পাঞ্জাবির পকেট হাঁটকে লাইটারটা বের করলেন। বুকের ভিতর ধপ—ধপ শব্দ।

হলুদ শিখা অনেকটা সাহস ফিরিয়ে দিয়েছে। মোমবাতি কোথায় আছে? মনে পড়ছে না।

পিপিং...পিপিং...। ল্যান্ড ফোনটা বাজতে শুরু করেছে। এত রাতে কে করল? বাজুক গে। তুলবেন না। উহুঁ, ইলেকট্রিক সাপ্লাই থেকে হতে পারে। নতুন কী একটা যন্ত্র বসিয়ে দিয়ে গেছে। সেই সিস্টেমে হয়তো পাওয়ার ফেলিওর ধরা পড়েছে।

মহীতোষ চেনা পথে ফোনের দিকে এগোলেন। একহাতে জ্বলন্ত লাইটার।

'হ্যালো।'

'দাদা! ভালো আছ?'

গলাটা চেনা—চেনা। একটু ফ্যাঁসফেসে।

'ক—কে?'

'সে কী দাদা! ছোটভাইকে এর মধ্যেই ভুলে গেলে?'

'ম—মানে? ক—কে আপনি?'

'তোমার ছোট ভাই। মনোতোষ।'

'কী! বাজে কথা বোলো না। আমার কোনও ছোটভাই নেই।' মহীতোষের গলা কেঁপে যাচ্ছে।

'এখন নেই। কিন্তু ছিল তো! এখানে একা—একা বড্ড কষ্টে আছি দাদা। তোমার কাছে আসছি।...ধরো না, এসেই গেছি। আজ তোমায় নিয়ে যাব দাদা।'

ফোন কেটে গেল।

মহীতোষ ধপ করে বিছানায় বসে পড়েছেন। শরীর থরথর করছে। দরদর করে ঘাম বেরোচ্ছে। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে চেপে থাকা লাইটারটা পড়ে গেল। ডান হাতের রিসিভারটাও টলটল করছে।

ঠিক তখনই খট—খট...খটাখট...খট....খট...। বাথরুমের ভেতর থেকে বিশ্রী আওয়াজ। হঠাৎ কারা ধস্তাধস্তি শুরু করে দিয়েছে।

মনোতোষ! ওকে নিয়ে যেতে সদলবলে এসে গেছে?

মহীতোষ বিছানায় এলিয়ে পড়লেন। সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। বুকের বাঁ দিকে চিনচিনে ব্যথা।

একটানা মিনিটখানেক চলার পরে অপার্থিব আওয়াজ থেমে গেল। মনোতোষ ঢুকে আসবে?

মহীতোষের চক্ষু বিস্ফারিত। একফোঁটা শক্তি নেই। চিনচিনে ব্যথা লাফিয়ে—লাফিয়ে বাড়ছে, ঠোঁট শুকনো, জিভ অসাড়।

বাথরুমের ভিতরে এবার কল—কল—কল—কল। কেউ জলের কল খুলে দিয়েছে। কী চায় মনোতোষ?

জলের শব্দ বন্ধ হয়েছে। মহীতোষ উঠে বসার চেষ্টা করলেন। পারলেন না।

আচমকা আবার! আবার সেই ভয়ানক ধপাধপ...ধপাধপ। পুরো বাথরুমটা সেই শব্দে কাঁপছে।

বুকের বাঁ দিকটা খিমচে ধরলেন মহীতোষ সান্যাল। উঃ! অসহ্য!

'প্রিয়তোষবাবু, নমস্কার। ভেতরে আসব?'

'আপনি!'

'কিরণকুমার। ডি.ডি. ইনসপেক্টর, লালবাজার।'

'আসুন। কিন্তু আমি ঠিক...লালবাজার...'

'মহীতোষ সান্যাল আপনার জ্যাঠামশাই তো?'

'হ্যাঁ। কাল রাতে জ্যাঠাবাবু ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে...আজ সকালে দরজা ভেঙে ওনাকে... তখনই ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানকে খবর দিয়েছি...কিন্তু...পুলিশ...কেন?'

'সোজাসুজি বলতে গেলে তদন্ত করতে।'

'তদন্ত!'

'ইয়েস প্রিয়তোষবাবু। সকালে জয়েন্ট সিপি সায়েবের ফোন পেয়ে তড়িঘড়ি আমায় ছুটে আসতে হয়েছে। ও.সি.—ও একটু পরে আসছেন।'

'জয়েন্ট কমিশনার!'

'হ্যাঁ। মহিমা বাগচীকে চেনেন নিশ্চয়ই?'

'নিশ্চয়ই। আমার বোন। জ্যাঠাবাবুর একমাত্র মেয়ে। বিয়ের বছর পাঁচেক পরে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যায়। ঘণ্টাখানেক আগে আমিই ওকে খবরটা জানিয়েছি।'

'ঠিক। ম্যাডামের হাসব্যান্ড জয়েন্ট সিপির বাল্যবন্ধু। সেই কানেকশানেই সাহেবকে ওনারা জানিয়েছেন, মহীতোষবাবুর মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। দে ওয়ান্ট পোলিস ইনভেস্টিগেশন।'

'মাই গড! মহিমা আমায় তো কিছু বলল না! স্ট্রেঞ্জ! ও বিদেশে চলে যাওয়ার পর থেকে জ্যাঠাবাবুকে আমরা—আই মিন আমার ফ্যামিলিই দেখাশোনা করে আসছে। আমায় ছেলের থেকেও বেশি ভালোবাসতেন। এমনকী জ্যাঠাবাবুর ব্যবসা—কারখানা সবকিছুই আমায় সুপারভাইস করতে হয়! ওনার বয়েস হয়েছিল সেভেনটি প্লাস।'

'জানি মিস্টার সান্যাল। আসতে—আসতে আমি কিছু ইনফরমেশন ইন—পুট নিয়ে এসেছি। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, আমি হেলপলেস। হাই লেভেলের অর্ডার...।'

'আমি টেরিবলি শকড মিস্টার কুমার। মহিমা কি আমায় সন্দেহ করছে?'

'না। তেমন কিছু অবশ্য শুনিনি।...আপনার জ্যাঠা কি একাই থাকতেন?'

'মহিমার বিয়ের পর পাঁচবছর একাই ছিলেন। একা মানে উনি আর কাজের লোকজন। জেঠিমা অনেকদিন আগেই গত হয়েছেন। আমি শ্যামবাজারের ফ্ল্যাটে থাকতাম। একদিন নিজে থেকেই বললেন, বউমাকে নিয়ে

তুই এখানেই চলে আয়। এত বড় বাড়ি, ফাঁকা পড়ে আছে। আমরা তবু আসতে চাইনি। শেষে খুব জোরজার করাতে বউ—ছেলে নিয়ে চলে আসি। সেও প্রায় তিন বছর হয়ে গেল। আমার ছেলে তো দাদাইয়ের খুব ন্যাওটা।...উঃ, কিছুই বুঝতে পারছি না। মহিমা বলছে...'

'কুল ডাউন মিস্টার সান্যাল। আপনি বললেন, দরজা ভেঙে ঢুকেছেন। দ্যাট মিনস, কালকে রাতে আপনারা এ বাড়িতে ছিলেন না?'

'না। অ্যানুয়ালের পরে ছেলের ছুটি। মামার বাড়ি যাওয়ার বায়না করছিল। তাই পাঁচদিন হল, বউ—ছেলেকে হাতিবাগানে শ্বশুরবাড়ি রেখে এসেছি। কাল রাতে আমায় শাশুড়ি মা খেতে ডেকেছিলেন। তাই আমিও সেখানে যাই। হঠাৎ ভোর ছ'টা নাগাদ সন্ধ্যা ফোন করে জানাল, দরজা বন্ধ। কলিংবেল বাজিয়ে, ধাক্কাতেও জ্যাঠাবাবু সাড়া দিচ্ছেন না। তখন এক কাপড়ে ছুটে আসি।'

'ওকে। সন্ধ্যা কি কাজের মহিলা?'

'হ্যাঁ। রাত দিন থাকে। কাল ওর ছেলের শরীর খারাপ খবর পেয়ে রাতটুকুর জন্যে গেছিল। জ্যাঠাবাবু নিজেই ওকে ছুটি দিয়েছিলেন।'

'অন্য কাজের লোকজন? একা সন্ধ্যাই বাড়ির সব কাজ করত?'

'না। একমাত্র সন্ধ্যা রাতদিন থাকত। আমরা এ বাড়িতে আসার পর থেকে অন্যরা পার্ট টাইম। কেউ রান্না, কেউ ঘরদোর সাফ, বাসন মাজা, বাজারঘাট...ফ্যামিলির দিকটা আমার স্ত্রী দেখতেন।'

'হুম! তার মানে কাল মহীতোষবাবু একাই ছিলেন?'

'জাস্ট রাতটুকু। আমি সাতটা নাগাদ জ্যাঠাবাবুকে বলে বেরিয়েছি। সন্ধ্যা বলল, ও গেছে আটটা নাগাদ।'

'আপনার বাবা কোথায় থাকেন?'

'বাবা!...আমার বাবা—মা কেউ নেই মিস্টার কুমার। বাবা দশ বছর হল গত হয়েছেন। মা গেছেন আমায় জন্ম দিতে গিয়ে।'

'সো স্যাড। কী হয়েছিল বাবার?'

'কিছু হয়নি। হি কমিটেড সুইসাইড। তখন আমি জাস্ট এম.এ. পাশ করেছি।'

টুং—টুং। কলিংবেল বাজল।

'আসুন ডাক্তারকাকু।'

'হঠাৎ কী হল প্রিয়তোষ? আমি তো স্তম্ভিত! লাস্ট উইকেও মহীতোষদার সব চেক আপ হল। হি ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি পারফেক্ট! ইনি?'

'লালবাজার থেকে।'

'নমস্কার ডক্টর। আমায় তদন্ত করতে জয়েন্ট কমিশনার সায়েব পাঠিয়েছেন। মহীতোষবাবুর সব ঠিক ছিল, বলছেন?'

'হ্যাঁ অফিসার। জাস্ট হার্টটা একটু—'

'কী?'

'একটু উইক। অবশ্য সে বরাবরই। বাইরের থেকে মানুষটা খুব কড়া, রাশভারী। কিন্তু ভেতরে—ভেতরে একটু ভিতু।'

'ভিতু!'

'ওই আর কী! ভূতের ভয় ছিল। আমার সঙ্গে অনেকদিনের সম্পর্ক, তাই নানারকম কথা হত। আবার পরলোকতত্ত্ব, আত্মা—টাত্মা, ভৌতিক—থ্রিলার এসব বই খুব পড়তেনও।'

'পিকিউলিয়র।'

'হ্যাঁ অফিসার।...চলো প্রিয়তোষ, একবার দেখে আসি ওনাকে। আপনিও চলুন। ভেরি স্যাড।...ভালো কথা, মহিমাকে খবর দিয়েছ?'

'দিয়েছি। ও আসছে বলল। না আসা পর্যন্ত বডি পিস হেভেনে রাখতে হবে।'

'সে তো নিশ্চয়ই।...হুঁ! বডিতে রাইগর মর্টিস সেট ইন করেছে। মানে মৃত্যুটা হয়েছে কাল বারোটা—সাড়ে বারোটা নাগাদ।'

'আর?'

'ম্যাসিভ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছে অফিসার। সাডেনলি!'

'সাডেনলি কেন?'

'কারণ আমার ডাক্তারি চোখ বলছে, মৃত্যুর আগে কোনও কারণে খুব ভয় পেয়েছেন। চোখদুটো খোলা। ডানহাত বুকের বাঁ দিকে।'

'বিছানাটা দেখুন ডক্টর! এলোমেলো। জায়গায়—জায়গায় ভিজে গেছে।'

'আতঙ্কে নিশ্চয়ই ঘাম বেরিয়েছিল।'

'ডক্টর, নিচের দিকটা দেখেছেন? পাজামাটা ভিজে।'

'দেখেছি অফিসার। সাডেন অ্যাটাকে অনেকসময় ইউরিন বা স্টুল বেরিয়ে আসে।...আচ্ছা, আমি কি ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে পারি?'

'হ্যাঁ ডক্টর। আপনার ফাইন্ডিংস লিখে দিয়ে যান। বাই এনি চান্স, এখন তো ক্রিমেশন হচ্ছে না। ন্যাচারালি কোনও তাড়া নেই। ম্যাডাম আসুন, তারপর ডিসিশন নেওয়া যাবে। প্রিয়তোষবাবু! একটু কাছে আসুন তো।'

'মানে! কেন?'

'গন্ধ! কাম! কাম! কাল রাতে কী করছিলেন?'

'ওই মানে...শালাদের সঙ্গে একটু আড্ডা, তার সঙ্গে...ইয়ে...'

'কখন?'

'রাত দশটা নাগাদ।'

'তারপরে আর বেরোননি?'

'না—না। ডিনার সেরে ওখানেই শুয়ে পড়ি।'

'গুড। বাথরুমটা কোথায়?'

'এই তো। পাশেই।'

'খুলুন। লাইটটা জ্বালুন।...হুঁ...উঁ...ওকে, ওকে।'

'অফিসার, আমি কি এবার যেতে পারি?'

'জাস্ট একমিনিট। আপনার নাম্বারটা নেব। আচ্ছা, ডক্টর এটা খেয়াল করেছেন? বেডসাইড ফোনের রিসিভার নিচে ঝুলছে।'

'হ্যাঁ, তাই তো!'

'এর মানে কী বলুন তো? মৃত্যুর ঠিক আগে মহীতোষবাবু কারও সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন।...যাই হোক, যা দেখার আপাতত কমপ্লিট। ওসি এলেই আমরা বেরিয়ে যাব। বাড়ি সিল করে পুলিশ ওয়াচিং থাকবে মহিমা ম্যাডাম না আসা পর্যন্ত। প্রিয়তোষবাবু, আপনার আর ডাক্তারসায়েবের নাম্বারটা নেব।'

'কিন্তু জ্যাঠাবাবুর বডি...?'

'ওটা আর আপনার হেডেক নয়। বডি আমাদের কাস্টডিতে থাকবে।...আপনাদের সন্ধ্যা কোথায়?'

'এখানেই আছে। ও খুব ভেঙে পড়েছে। সারাদিন ও—ই তো মানুষটার সেবা করত।...সন্ধ্যা! এদিকে এসো।'

'ওকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব। না—না—না, নিশ্চিন্ত থাকুন প্রিয়তোষবাবু। ওর ওপর কোনও টর্চার করা হবে না।'

'এসো কিরণ। উই আর ওয়েটিং ফর য়ু। উইদিন আ ডে, য়ু হ্যাভ ব্রেক থ্রু দ্য ক্রাইম, ডান আ গ্রেট জব।'

'থ্যাঙ্ক য়ু স্যার। অল ক্রেডিট গোস টু য়ু স্যার। আপনিই আমায় ওখানে পাঠিয়েছিলেন।'

'না কিরণ। বরঞ্চ মহিমাকে কিছুটা ক্রেডিট দেওয়া যায়। বিকস ও আমাকে অত ভোরে ফোন করে বারবার রিকোয়েস্ট করেছিল। আই ডিডন্ট বিলিভ। কিন্তু আফটার অল ও আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের বেটার হাফ। আমি ওর রিকোয়েস্ট রাখতে বাধ্য হই।'

'রাইট স্যর। ম্যাডামের কাছে আমরা গ্রেটফুল। নইলে সত্যিটা কোনওদিন প্রকাশ পেত না।'

'ইয়েস কিরণ।...স্টার্ট করো।'

'ডক্টর মিত্র, সবচেয়ে আগে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনার কথা থেকে আমি প্রথম ক্লু পেয়েছি।'

'তাই?'

'ইয়েস। মনে করে দেখুন ডক্টর, কাল আপনি বলে ছিলেন, মহীতোষবাবু বাইরে কড়া। আসলে ভিতু মানুষ। পার্টিকুলারলি ওনার ভূতে খুব ভয়। ভূত বিশ্বাস করেন, তাই ভয় পান, আবার ভূতপ্রেত নিয়ে চর্চা করেন। এরপর মহীতোষবাবুর চোখ—খোলা ডেডবডি দেখে আপনার ফার্স্ট রিঅ্যাকশন ছিল, মৃত্যুর আগে উনি ব্যাপক ভয় পেয়েছেন।'

'হুঁ।'

'তখনই আমার মনে হল, মহীতোষবাবু ভয় পাবেন কেন? কেউ কি ভূত সেজে এসেছিল? মেন গেট বন্ধ। পসিবল নয়। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল, ল্যান্ডফোনের রিসিভারটা ঝুলে আছে। অর্থাৎ একটা ফোন এসেছিল...এবং কথা বলার পরে মহীতোষবাবুর ফোন ধরে রাখার কন্ডিশন ছিল না। সে ফোন কার বলুন তো?'

'কার?'

'মহীতোষবাবুর ছোটভাই মনোতোষের। যিনি দশ বছর আগে ইহলোক ত্যাগ করেন।'

'ওয়াট! আমার ছোটকাকা! কী বলছেন?'

'ঠিকই বলছি ম্যাডাম। আপনার মৃত ছোটকাকা তো ফোনটা করেননি। করেছিলেন প্রিয়তোষ। বাবার গলা নকল করে, ডিসটর্টেড ভয়েস—এ। জ্যাঠাকে ভয় দেখাতে। ঠিক তার আগেই উনি বাড়ির মেন সুইচ অফ করে দেন। পুরো বাড়ি অন্ধকার হয়ে যায়।...কাল সকালে আমি যখন আচমকা পৌঁছ যাই, তখনও বাড়িটায় ইলেকট্রিসিটি ছিল না। সকালবেলা, শীতকাল। ফ্যান বা এসির দরকার নেই। পুরো বাড়ি থেকে সকলকে বের করে যখন আমরা দখল নিই, তখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়।'

'ওয়ান মিনিট কিরণ। হাও ইস ইট পসিবল? সাপ্লাই লাইনের মেইন সুইচ, মিটার সব তো বাড়ির মধ্যেই থাকে!'

'না চম্পকদা। মিস্টার কুমারের ইনফর্মেশন কারেক্ট। নর্থ ক্যালকাটার পুরনো বাড়িগুলো সব গায়ে—গায়ে জোড়া। অন্ধকার সরু কমন প্যাসেজে মিটার—বক্স, মেন—সুইচ সেই মান্ধাতার আমল থেকে আছে। পরে সিইএসসিকে চিঠি দিয়ে অনেকে মিটারের প্লেসমেন্ট চেঞ্জ করে নিয়েছে। বাবা করেননি। একটু গেঁতো ছিলেন।...কিন্তু মিস্টার কুমার, আমার দুটো প্রশ্ন আছে।'

'বলুন ম্যাডাম।'

'প্রথমত, প্রিয়দাই যে ফোনে ছোটকাকা হয়ে ভয় দেখিয়েছে, এভিডেন্স কী? সেকেন্ডলি, সে—ই যে মেন সুইচ অফ করেছে, তার প্রুফ?'

'ফোনের প্রুফ কালকেই বি.এস.এন.এল. থেকে কালেক্ট করেছি। ওটাই ছিল লাস্ট কল। নেক্সট কল না আসা পর্যন্ত কথাগুলো রেকর্ডেড থাকে। ফোনটা এসেছিল কোনও মোবাইল থেকে। ব্যাঙ্গালোরের সিম। অরিজিন্যাল মালিককে পাওয়া যায়নি।'

'দ্বিতীয়টা?'

'দ্বিতীয়টা সিসি টিভির ফুটেজ দেখে। তাছাড়া মেন সুইচে প্রিয়তোষবাবুর ফিঙ্গারপ্রিন্টও পাওয়া গেছে।'

'সিসি টিভির ফুটেজ বলতে?'

'রিসেন্টলি কলকাতা পুলিশ প্রায় সব মাঝারি স্ট্রিট আর বড় রাস্তায় সিসি টিভি বসিয়েছে। হেরম্ব দাস লেন গলির মুখের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে, প্রিয়তোষবাবু রাত ১১—৫৫ পর্যন্ত আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা থেকে বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট ধরে বেশ কয়েকবার হাঁটাহাঁটি করেছেন। অথচ আমায় বলেছিলেন, উনি নাকি সাড়ে দশটায় শুয়ে পড়েছিলেন। অথচ শ্বশুরবাড়ির লোকজন বলল, পরশু রাতে উনি সেখানে আদৌ যাননি।'

'আনবিলিভেবল! প্রিয়তোষ যেভাবে জ্যাঠার দেখভাল করত, নাহ! মেলাতে পারছি না।'

'আমিও প্রথমে পারিনি। কাল দুপুরে আপনার কাছ থেকে ওদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি জানার পরে ক্রিমিনোলজি বইগুলো ঘেঁটেছি। এরকম ইনসট্যান্স আছে ডক্টর। এনি ওয়ে ওনার মোটিভ প্রসঙ্গে সব শেষে আসছি ডক্টর। তার আগে প্রিয়তোষের টোটাল প্ল্যানটা বলে নিই।'

'ওকে কিরণ।'

'থ্যাঙ্কয়ু স্যার। প্রিয়তোষবাবু ফোন, আলো নেভানো ছাড়াও আরেকটা ইনোভেটিভ প্ল্যান সাজিয়েছিলেন। ভেরি ইন্টারেস্টিং। সেটা কাজের মেয়ে সন্ধ্যাকে একতাড়া নোট ঘুষ দিয়ে। সন্ধ্যা কিন্তু বোঝেনি। মহীতোষবাবুর বেডরুমের ঠিক বাইরে বেশ বড় বাথরুম। তার এককোণে ওয়াশিং মেশিন। লেটেস্ট মডেল, পুরোটাই কম্প্যুটারাইজড। ঠিকঠাক টাইমার সেট করে, কাপড়জামা ঢুকিয়ে দিলে মেশিন নিজে—নিজেই জল নেয়, কাচাকুচি করে, জল বের করে দেয়, আবার জল নেয়, ধোয়, জল বের করে। টাইম ফুরনো না পর্যন্ত এই প্রসেস চলতেই থাকে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার বাড়িতেও স্ত্রী কিনেছে। দারুণ ব্যাপার!'

'রাইট ডক্টর। কিন্তু আপনি মিসেসের কাচাকুচির সময় কখনও থেকেছেন কি?'

'কী করে থাকব! আমি তো সকালেই বেরিয়ে যাই।'

'মহীতোষবাবুও কখনও থাকেননি। উনিও সকালে অফিস বেরিয়ে যেতেন। দুপুরে সন্ধ্যা কাচাকুচি করে। তাই জানতেন না, কাচার সময় রেগুলার ইন্টারভ্যালে মেশিনের ভিতর থেকে 'খটাখট' শব্দ হয়! তারপর জল বেরোনোর কলকল...তারপর শিস—এর শব্দ...কিছু বুঝলেন?'

'নাহ!'

'ইমাজিন করুন। আলো নিভল, ভৌতিক ফোন করল মৃত ভাই, তারপর নিঝঝুম বাড়িতে ওইরকম বিকট শব্দ...জল পড়ছে...! কী ঘটবে মহীতোষবাবুর?'

'মাই গড! কী বলছ কিরণ! ওয়াশিং মেশিনে টাইমার সেট করে কাপড়জামা ঢুকিয়ে দেওয়া ছিল?'

'ইয়েস স্যার। সন্ধ্যাকে দিয়ে প্রিয়তোষ এই কাজটা করিয়েছেন। টাইম সেট করা ছিল রাত বারোটা!'

'তুমি বুঝলে কী করে?'

'স্যার, মেশিনের মোটা পাইপ দিয়ে ওই সকালেও জল সিপ করছিল। নর্দমার মুখটা ভিজে। সেকেন্ড টাইম চেক করতে গিয়ে সব ক্লিয়ার হয়ে গেল স্যার।'

'গ্রেট! গ্রেট কিরণ! উই আর রিয়্যালি প্রাউড অব য়ু।'

'আই'ম অলওয়েস অ্যাট ইওর সার্ভিস স্যার।'

'এবার ইন ব্রিফ বলো তো, প্রিয়তোষের মোটিভ কী ছিল? যাকে এতদিন এত যত্ন করে দেখাশোনা করল, তার বিজনেস সুপারভাইস করল, তাকেই এভাবে সরিয়ে দিতে গেল কেন?'

'স্যার, একটা কথা বলব?'

'বলো।'

'প্রিয়তোষবাবুর মোটিভ ম্যাডাম সব জানেন স্যার। নইলে খুড়তুতো দাদার কাছে বাবার মৃত্যুর খবর পেয়েই আপনাকে ফোন করতেন না। আমি স্যার, ওনাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি জেনেছি ডক্টর মিত্রর কাছ থেকে।'

'মহিমা! বলবে?'

'আমি?...আ—চ্ছা। ইটস আ স্যাড স্টোরি। চম্পকদা, আমার বাবা মানুষটা কিন্তু খারাপ ছিলেন না।'

'না—না। তা কেন হবে? বলো, বলো। আমরা বিশ্বাস করব।'

'চম্পকদা, বাবা ছিলেন একটু অদ্ভুত স্বভাবের। একদিকে স্নেহপ্রবণ, অন্যদিকে প্রচণ্ড রাশভারী। তেমনি ভয়ানক রগচটা। রেগে গেলে কোনও জ্ঞান থাকত না। যে—ই হোক, যা মুখে আসত, বলে দিতেন! একটা টাকাও বাজে খরচ করতেন না, অন্য কেউ করলে তার আর রক্ষে নেই। বাবা তাকে ধুয়ে দিতেন।'

'আ—চ্ছা।'

'কাকিমাকে আমি দেখিনি। তারপর মা—ও হঠাৎ চলে গেলেন। বাবা লাগামছাড়া বদরাগী হয়ে উঠলেন। একেবারে হিটলার হয়ে গেলেন। তখন বাবা—কাকা আর আমরা দুজন। আমাদের ব্যবসায় বাবা সোল প্রোপ্রাইটার। কিন্তু কাকা অংশীদার না হলেও ছিলেন মালিকের মতো। কারণ ভাইকে অসম্ভব ভালোবাসতেন বাবা। এরকম একটা সময়ে, বোধহয় বছর আট—নয় আগে, বাবার সঙ্গে কাকার একদিন মতান্তর হল। ব্যবসায় কোনও একটা লোকসান নিয়ে বাবা সকলের সামনে কাকাকে অকথ্য গালাগালি করলেন। কাকা নিতে পারেননি। সেই রাতে কাকা অপমানে সুইসাইড করলেন।'

'সে কী!'

'হ্যাঁ চম্পকদা। প্রিয়দা কাঁদতে—কাঁদতে মামাবাড়ি চলে গেল।...কিছুদিন পরে অবশ্য বাবা নিজে গিয়ে প্রিয়দাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে এল। প্রিয়দা তবু এ বাড়িতে থাকল না। তবে বাবার অনুনয়—উপরোধে ব্যবসা দেখতে শুরু করল।'

'তারপর?'

'আমার বিয়ে হয়ে গেল। একসময় আমেরিকাও চলে গেলাম। বাবার বয়স বাড়ছে। আবার খ্যাপামি বাড়তে শুরু করল। যখন—তখন গালাগালি করে প্রিয়দাকে। দাদা গুম খেয়ে রাতে ফোন করে আমায়। আমি ফোন করে দাদাকে বোঝাই। রাগ কমে গেলে বাবা আবার অন্য মানুষ। ভাইপোর হাত জড়িয়ে দুঃখপ্রকাশ করে। এরমধ্যেই বাবা ধুমধাম করে ওর বিয়ে দিয়েছে।'

'তারপর?'

'বাবা অনেক অনুনয়—উপরোধ করে দাদা—বউদিকে পার্মানেন্টলি এ বাড়িতে থাকার জন্য নিয়ে এল।...তাতে সমস্যা কিন্তু বাড়ল। চম্পকদা, বউয়ের সামনে অপমান সহ্য করা খুব কঠিন।'

'রিসেন্টলি এরকম কোনও ঘটনা ঘটেছিল?'

'হ্যাঁ চম্পকদা।...দিন চারেক আগে। প্রিয়দা বউদি—ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ওঠে। বাবা অনেকবার ওকে বুঝিয়েছে, নিজের দোষ স্বীকার করেছে, প্রিয়দা ফেরেনি। কিন্তু অফিসে ঠিক আসত। বাড়িতে এসে বাবাকে দেখাশোনা করে রাতে চলে যেত। আসলে বাইরের লোককে বুঝতে দিত না। প্রতি রাতে এই নিয়ে বাবার সঙ্গে আমার ফোনে কথা হত। আমার ধারণা, প্রিয়দা সেই সময়েই প্রতিশোধের ডিসিশন নিয়ে ফেলে।'

'ওঃ!'

'প্রিয়দা স্যালারি পেত। বাবা ওকে পার্টনার করেনি। কিন্তু আমায় বলেছিল, গোটা ব্যবসাটা প্রিয়দার নামেই উইল করেছে। সম্পত্তিরও ফিফটি পার্সেন্ট ওকেই দিয়েছে। কিন্তু প্রিয়দা তো এসব কিছুই জানে না। তাই —'

'হ্যাঁ মহিমা। বাবার মানে তোমার ছোটকাকার সুইসাইডের ঘটনাই বা প্রিয়তোষ ভোলে কী করে?'

'ঠিক বলেছেন চম্পকদা। প্রিয়দাকে আমি খুনি ভাবতে পারছি না।'

ঋতির উপহার

পিনাকী মুখোপাধ্যায় (মুখার্জী)



ঋতি যখন মণি মুখার্জি রোডের সাত নম্বর বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল তখন শীতের সন্ধ্যা আরও ঘন হয়েছে। ভীষণ নার্ভাস লাগছে তার। সে কোনো ভুল করছে না তো? তার কি একবার মনোজিৎকে ফোন করা উচিত ছিল? কালো রঙের বিশাল লোহার গেটটার সামনে দাঁড়িয়ে ঋতি ভাবছিল সে ফিরে যাবে কি না। তখনই বেজে উঠল মোবাইলটা।

একটু চমকে উঠল ঋতি। দেবযানীর ফোনটা রিসিভ করতে গিয়ে একটু যেন কেঁপে গেল গলাটা, 'হ্যালো।'

'কতদূরে?'

'আপনাদের বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছি।' আড়ষ্ট গলায় বলল ঋতি।

'কেন? দাঁড়িয়ে আছ কেন? গেট খুলে চলে এসো ভেতরে। নীচে কলিংবেল বাজালেই রঘুদা দরজা খুলে দেবে।'

'ঠিক আছে।'—ফোনটা ব্যাগে রেখে ধীরে ধীরে গেট খুলে ঢুকে আসে ঋতি। মোরাম বিছানো চওড়া পথের দুপাশে গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা আর গ্যাঁদার মিছিল। বারান্দায় উঠে কলিংবেলে হাত ছোঁয়াল ঋতি।

একটু পরেই একজন বয়স্ক লোক দরজা খুলে দিলেন। ইনিই বোধহয় রঘুদা। ঋতি কিছু বলার আগেই বলে উঠলেন, 'বউদিমণি ওপরে আছেন। এ ঘরের পরেই সিঁড়ি পাবেন। উঠেই প্রথম ঘরটা।'

'বউদিমণি' কথাটা কি একটু জোর দিয়ে বললেন ভদ্রলোক? না কি ঋতির কানেই একটু বেশি জোরে বাজল শব্দবন্ধটা? বুঝতে পারল না ঋতি।

ক'টা মাত্র সিঁড়ি। অথচ পা দুটো যেন চলতেই চাইছে না। কেন যে রাজি হল ঋতি এখানে আসতে? সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকেই বিগড়ে ছিল মেজাজটা। সারা সপ্তাহের লাগামছাড়া ব্যস্ততার মাঝখানে রবিবারের চিলতে অবসরটা একটু ঢিলেঢালাভাবে কাটাতে ইচ্ছে করে ঋতির। ভেবেছিল একটু বেলা করে উঠবে। কিন্তু সাতটা বাজতে না বাজতেই দরজায় টোকা।

ঘুমচোখে দরজা খুলতেই বিরক্ত গলায় মা বলে উঠেছিলেন, 'আজও বাজারে না যাওয়ার মতলব নাকি তোর? অন্ধ্রের রুই খেতে খেতে তো চড়া পড়ে গেল জিভে।'

'সাতটাও তো বাজেনি মা। আটটার আগে তো ভালোভাবে বাজারই বসে না।' হাই তুলতে তুলতে বলেছিল ঋতি।

'সেটা আমিও জানি। কিন্তু মেকাপ নিয়ে রেডি হতেই তো তোমার ঘণ্টাখানেক লাগবে। কুসুম তো আর সারাদিন ধরে বসে থাকবে না। আর যদি ভেবে থাকো আজও ডালসেদ্ধ, আলুসেদ্ধ দিয়ে চালিয়ে পয়সা

বাঁচাবে, তবে যাও। আবার শুয়ে পড়ো গিয়ে। তোমার তো ইচ্ছে ঘুম। চিন্তাভাবনা তো নেই কিছু।'

সবসময় সুরমা এইরকম ঠুকে ঠুকে কথা বলেন। সাধারণত চুপ করেই থাকে ঋতি। কিন্তু আজ হঠাৎই গরম হয়ে গেল মাথাটা। বলবে না বলবে না করেও বলে উঠল, 'কীসে পয়সা বাঁচাতে দেখলে? যা বলছ তাই তো করা হচ্ছে। পয়সার জন্য কী আটকেছে তোমার?'

'পাড়ার ডাক্তার দেখিয়ে আমার চিকিৎসা করানো পয়সা বাঁচানো ছাড়া কী? সুগার, প্রেসার নর্মাল থাকলেই মানুষ সুস্থ থাকে? হাঁটুর ব্যথাটা কবে থেকে ভোগাচ্ছে, একজন ভালো হাড়ের ডাক্তারকে দেখানোর কথা একবারও মনে হয়েছে তোর?'

'ডক্টর সাধুখাঁ এম.ডি./মা। যথেষ্ট নামকরা ডাক্তার। উনি যে ব্যায়ামগুলো করতে বলেছিলেন একদিনও করেছ? ব্যায়াম না করলে ব্যথা এমনি এমনি কমবে? যাকেই দেখাও, ব্যায়ামই প্রেসক্রাইব করবেন।'

'তুই তো সব জেনে বসে আছিস। বেশি জেনেই তো এই দশা। আইবুড়ো থেকে হাড় মাস জ্বালিয়ে খাচ্ছিস আমার। তোর দিদিদের বাড়ি গিয়ে দু'দিন যে জুড়িয়ে আসব সে উপায় অবধি নেই। জীবনভর মেয়ের হেঁশেল সামলাতে হবে।'

চুপ করে যায় ঋতি। মিথ্যে কথার কী জবাব দেবে সে? বড়দি, মেজদি কখনও মাকে নিজেদের কাছে নিয়ে রাখতে চায় না। যেহেতু ঋতি ভালো চাকরি করে এবং তার বিয়ে হয়নি, তাই মাকে দেখার দায়িত্বটা শুধুই যেন তার। সে কারণেই ছত্রিশ পেরনো ঋতির বিয়ের প্রসঙ্গ সযত্নে এড়িয়ে চলে সকলে। ঋতির হেঁশেল সামলায় রাতদিনের লোক কুসুম। কুটোটা নাড়তে হয় না মাকে। কথা বাড়াতে আর রুচি হল না ঋতির। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'কুসুমকে চা বসাতে বলো। আমি আসছি। আর আসছে সপ্তাহেই একজন অর্থপেডিককে দেখিয়ে আনব তোমায়।'

সুরমা কিছুতেই খুশি হল না। ওঁর কপালে বিরক্তির গভীর আঁচড়গুলো কিছুটা নরম দেখাল শুধু।

বাজার থেকে ফিরে সোফায় বসে তখন দ্বিতীয় দফার চা খাচ্ছিল ঋতি। চোখ বোলাচ্ছিল খবরের কাগজের হেডিংগুলোয়। অচেনা নম্বর থেকে ফোনটা তখনই এসেছিল। ভুরুতে হালকা ভাঁজ ফেলে ফোনটা ধরেছিল, 'হ্যালো।'

'হ্যালো! চিনতে পারছ?'—সুরেলা মহিলা কণ্ঠ মোটেই চেনা নয়। ঋতি যখন স্মৃতি হাতড়াচ্ছে, দূরভাষিণী বলে উঠেছিল, 'আমি দেবযানী দত্ত বলছি।'

হাতে ধরা চায়ের কাপটা থেকে কিছুটা চা চলকে পড়েছিল ঋতির কামিজে। হৃৎপিণ্ডের গতি মুহূর্তেই কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। কথা জোগাচ্ছিল না মুখে।

'জানি, তুমি খুব অবাক হচ্ছ। হয়তো ভাবছ এটা আমার নতুন কোনো চাল। কিন্তু বিশ্বাস করো এর মধ্যে কোনো চালাকি নেই। সবকিছুর জন্যই তো একটা প্রস্তুতি লাগে তাই না? আমার হয়তো সময়টা একটু বেশিই লেগেছে। আল্টিমেটলি আই হ্যাভ ডিসাইডেড ঋতি। কিন্তু তার আগে একবার আমি দেখতে চাই তোমাকে। আজ একটিবার তুমি আসবে?' আন্তরিক শুনিয়েছিল দেবযানীর কথাগুলো।

বিশ্বাস—অবিশ্বাসের দোলাচলে কেঁপে উঠেছিল ঋতি। হঠাৎই যেন অনেকখানি অক্সিজেন ঢুকে গিয়েছিল বুকের ভেতর। ঋতি নয়, যেন অন্য কেউ বলে উঠেছিল, 'যাব...।'

'আমার আর একটা কথা রাখতে হবে তোমায়।'

থমকে গিয়েছিল ঋতি, 'বলুন।'

এখানে আসার কথাটা এখন কাউকে বলতে পারবে না তুমি। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, হোয়াট আই মিন?'

বুঝতে পেরেছিল ঋতি। কাউকে কিছু বলেনি সে। বিকেলে দার্জিলিং থেকে যখন ফোন করেছিল মনোজিৎ, এ ব্যাপারে কিছুই বলেনি তাকে। আসলে ঋতি ভয় পেয়েছিল। কথার খেলাপ করলে আবার যদি মত বদলায় দেবযানী।

পায়ে পায়ে কখন সিঁড়িগুলো পেরিয়ে এসেছে বুঝতেই পারেনি ঋতি। ভেলভেটের পর্দা সরাতেই ঘরের মাঝখানে চওড়া খাটে শুয়ে থাকা মধ্য বয়সিনী মাথাটা একটু তুলে বললেন, 'এসো ঋতি। ভেতরে এসো।'

এই দেবযানী? একসময় যে নজরকাড়া রূপসী ছিলেন দেখলেই বোঝা যায়। এক বছর আগের সেরিব্রাল অ্যাটাক সেই রূপের অনেকখানি কেড়ে নিলেও সবটা পারেনি। ওঁর শরীরের বাঁ দিকটা অ্যাফেকটেড হয়েছিল। নিয়মিত ফিজিওথেরাপিতে কিছুটা উন্নতি হলেও একা একা এখনও চলাফেলা করতে পারেন না দেবযানী। তবে কথার মধ্যে কোনো জড়তা নেই।

বিছানার সামনে একটা গদিআঁটা চেয়ারে ঋতিকে বসতে বললেন দেবযানী। শুয়ে শুয়েই বেডসাইড টেবিলের পাশে একটা সুইচ টিপলেন। ঋতি তখনই লক্ষ করল টেবিলটায় প্রচুর ওষুধপত্র রাখা। কিছুক্ষণের মধ্যে বছর পঁচিশের একটি রোগা বউ দৌড়ে ঘরে এল, 'ডাকছিলেন বউদিমণি?'

'আমায় একটু বসিয়ে দে তো শম্পা।'

হেডবোর্ডে কয়েকটা বালিশের ঠেস দিয়ে সাবধানে দেবযানীকে বসিয়ে দিল শম্পা। দেবযানী বললেন, 'ভালো করে দু'কাপ চা নিয়ে আয়।'

'আমার কিন্তু চায়ের দরকার নেই।' অপ্রতিভ গলায় বলল ঋতি।

'তুমি আজ প্রথম এলে। একটু চা—ও না খাওয়ালে বাইরে গিয়ে নিন্দে করবে যে। সেটি হচ্ছে না।'

শম্পা চলে গেল। ঋতি অনুভব করছিল একটা অপরাধবোধ খুব ধীরে ধীরে মাথা তুলছে চেতনার গভীরে। যে দেবযানীর কথা শুনে এসেছে ঋতি, সামনের মহিলার সঙ্গে তাকে যেন মেলানো যাচ্ছে না। সব হিসাব কেমন ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে।

পাশাপাশি টেবিলে কাজ করতে করতে কবে যে একটা সহজ বন্ধুতা গড়ে উঠেছিল দুজনের ঋতি বা মনোজিৎ কেউই বুঝতে পারেনি।

ঋতি লক্ষ করত হুল্লোড়ে, হাসিখুশি মনোজিৎ মাঝেমাঝেই কেমন বদলে যেত। গুম হয়ে থাকত ক'টাদিন। তারপরে অবশ্য আবার আগের মতো হয়ে যেত।

ক্যান্টিনে একসঙ্গে টিফিন খেতে খেতে একদিন ঋতি জিজ্ঞেস করেছিল, 'মাঝে মাঝে আপনার কী হয় বলুন তো? হঠাৎ এত গম্ভীর হয়ে যান, কথা বলতেও ভয় করে। একটুও ভালো লাগে না তখন।'

কেমন একটা চোখে ঋতির দিকে তাকিয়েছিল মনোজিৎ। শিরশির করে উঠেছিল ঋতির শরীরটা। চোখ সরিয়ে নিতে নিতে মনোজিৎ বলেছিল, 'আরেকদিন বলব।'

সেই দিনটা আসতে কেটে গিয়েছিল বেশ কয়েকটা সপ্তাহ। এক শনিবার ছুটির পর মেট্রো অবধি ঋতিকে এগিয়ে দিতে দিতে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিল মনোজিৎ। দেবযানীর কথা সেদিনই প্রথম শুনেছিল ঋতি। শুনেছিল ভালোবাসাহীন একটা সম্পর্কের জের টেনে চলার যন্ত্রণার কথা।

এক ছাদের তলায় থেকেও দেবযানীর জগৎ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তার ডিকসনারিতে 'কম্প্রোমাইজ' বলে কোনো শব্দ ছিল না। নিজের বুটিকের ব্যবসা, বন্ধুবান্ধব, ক্লাব, পার্টির বাইরে কারওর জন্য সময় ছিল না দেবযানীর। জন্মের পর থেকেই একমাত্র মেয়ে থাকত আয়ার কাছে। মনোজিৎ—এর আপত্তি সত্ত্বেও মাত্র ক্লাস থ্রি—তেই দেবযানী মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছিল কার্শিয়াং—এর কনভেন্ট স্কুলে। ছুটি ছাটাতে যখন আসত পৌলমি তখনও পেত না মাকে। দিনের পর দিন অফিস ছুটি নিয়ে মেয়েকে সঙ্গ দিত মনোজিৎ। আসলে প্রথম থেকেই বাচ্চচা চায়নি দেবযানী। মনোজিৎ—এর জেদাজিদিতে শর্তসাপেক্ষে মা হতে রাজি হয়েছিল। বলেছিল, বাচ্চচার সবরকম দায়িত্ব সামলাতে হবে মনোজিৎকেই। মনোজিৎ ভেবেছিল মা হলে বদলে যাবে দেবযানী, ভুল ভাঙতে সময় লাগেনি। ব্যবসাটাও মন দিয়ে করত না দেবযানী। কর্মচারীদের হাতে ছেড়ে দিলে ব্যবসার যা হাল হয় তাই হয়েছিল। কিন্তু ঠাটবাটের কমতি ছিল না। টাকার জোগানে টান পড়লেই তুমুল অশান্তি শুরু করত দেবযানী। মনোজিৎ—এর বড়দা আলাদা থাকলেও পারিবারিক জুয়েলারির ব্যবসাটা যৌথ মালিকানাতেই। বড়দাই মূলত দেখাশোনা করেন। সেখান থেকে যে শেয়ারটা পায়

মনোজিৎ সেটাও কম নয়। কিন্তু তবুও যেন কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছিল না। একরকম বাধ্য হয়েই এক বন্ধুর সঙ্গে পার্টনারশিপে দার্জিলিং—এর একটা হোটেল লিজ নিয়েছিল মনোজিৎ।

'টাকা দিয়ে অনেক কিছু কেনা যায় হয়তো, কিন্তু শান্তি কেনা যায় না।' বিষণ্ণ গলায় বলেছিল মনোজিৎ।

ভারী হয়ে উঠেছিল ঋতির মনটাও।

ছ'মাসের মাথায় ঋতি আর মনোজিৎ—এর সম্পর্কটা হঠাৎ করেই বাঁক নিয়েছিল একদিন। অফিসফেরত একটা রেস্তোরাঁর কেবিনে পাশাপাশি বসেছিল ওরা। স্যান্ডুইচের প্লেট নাড়াচাড়া করতে করতে মনোজিৎ বলেছিল, 'আমি আর পারছি না ঋতি। একটু একটু করে শেষ হয়ে যাচ্ছি।'

'দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।' সহানুভূতির গলায় বলেছিল ঋতি।

'কিচ্ছু ঠিক হবে না। কিচ্ছু ঠিক হবার নয়। একদিন দেখো, নিজেকে শেষ করে দেব আমি।' ভাঙাচোরা গলায় বলে উঠেছিল মনোজিৎ।

আমূল কেঁপে উঠেছিল ঋতি। নিজের অজান্তেই মনোজিৎ—এর একটা হাত টেনে নিয়েছিল দু'হাতের মুঠিতে, 'এসব কী বলছ যা তা?'

পলকেই কী যে হয়ে গেল! ঋতিকে জড়িয়ে ধরে ওর বুকে মুখ গুঁজে বাচ্চাদের মতো ফুঁপিয়ে উঠেছিল মনোজিৎ। পাড় ভাঙার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল ঋতি। শুরুটা হয়তো আগেই হয়েছিল। বুঝতে পারেনি ঋতি। সমর্পণ তাই বুঝি অমন অনায়াস ছিল। তার উন্মুখ ঠোঁটের গভীর থেকে যেন জীবনের আশ্বাস শুষে নিচ্ছিল মনোজিৎ।

এক ছুটির সকালে লংড্রাইভে যেতে যেতে ঋতি বলেছিল, 'সমাজের কাছে আমার পরিচয়টা একবারও ভেবে দেখেছ? ঠারে ঠোরে অনেক কথা কানে আসে। কী বলব? চুপ করে থাকি।'

'ব্যাপারটা নিয়ে আমিও ভেবেছি ঋতি। মিউচুয়াল সেপারেশনের জন্য আমি অলরেডি কথা বলেছি ল'ইয়ারের সঙ্গে।'

'কিন্তু পৌলমী? সে মেনে নেবে? ও তো আর ছোটটি নেই এখন। ওরও তো একটা মতামত আছে।'

'ছেলেবেলা থেকেই তো দেখেছে মা কে। মানসিক কোনো সম্পর্কই নেই দেবযানীর সঙ্গে। ছুটিতে যখন বাড়িতে আসে ওর সবকথা আমার সঙ্গে। আমাদের সম্পর্কটা বন্ধুর মতো। তোমার কথা ও জানে। ওর কোনো আপত্তি নেই।'

অবাক চোখে চেয়ে থাকে ঋতি। মা—মেয়ের বোঝাপড়া কোন তলানিতে এসে ঠেকলে মেয়ের এমন মনোভাব হয়? ভাবছিল ঋতি। তারপর বলেছিল, 'দেবযানীকে বলেছ?'

গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল মনোজিৎ। বলেছিল, 'তার সঙ্গে যখন রাতে দেখা হয়, কোনোদিনই সুস্থ অবস্থায় থাকে না। আর সকালে আমি যখন বের হই তখন তার মাঝরাত।' একটু থেমে যোগ করেছিল, 'তবু বলতে তো হবেই। আজই বলব।'

পরদিন থেকে অফিসে আসছিল না মনোজিৎ। ফোনেও ধরা যাচ্ছিল না তাকে। অস্থির হয়ে উঠেছিল ঋতি।

দু'দিন বাদে ছুটির পর ডালহৌসী থেকে চাঁদনিচক মেট্রো স্টেশনে যাওয়ার পথে ফোন এসেছিল মনোজিৎ—এর। ঋতি কোথায় আছে জেনে নিয়ে সেখানেই অপেক্ষা করতে বলেছিল ঋতিকে। ট্রাম কোম্পানির অফিসের সামনে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বাইক নিয়ে হাজির হয়েছিল মনোজিৎ। তাকে দেখে আঁতকে উঠেছিল ঋতি। মাথায় ব্যান্ডেজ, উসকো—খুসকো চেহারা। মনোজিৎ—এর মুখে সবকিছু শুনে বোবা হয়ে গিয়েছিল ঋতি।

পরশুরাতেই ডিভোর্সের কথা বলেছিল মনোজিৎ। সঙ্গে সঙ্গেই ভায়োলেন্ট হয়ে উঠেছিল দেবযানী। নোংরা গালাগালি দিতে দিতে জিনিসপত্র ছুড়তে শুরু করেছিল। দেবযানীর ছোড়া ফুলদানিতেই কপাল ফেটে গিয়েছিল মনোজিৎ—এর। তিনটে স্টিচ পড়েছিল। সে রাতেই মণি মুখার্জি রোডের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে

এসেছিল মনোজিৎ। ক'দিন বন্ধুর বাড়িতেই ছিল। তারপর গড়িয়াতে একটা টু বেডরুম ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে উঠে এসেছিল।

দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছিল তিনটে বছর। ডিভোর্স পেপারে সই করেনি দেবযানী।

এক বছর আগে যখন সেরিব্রাল হল দেবযানীর, ডাক্তার, নার্সিংহোম সবকিছু মনোজিৎকেই করতে হয়েছিল। মনের অগোচরে পাপ নেই। ভেতরে ভেতরে ভয় পেয়ে গিয়েছিল ঋতি। ওদের ভাঙা সম্পর্কটা জোড়া লেগে যাবে না তো?

ঋতির আশঙ্কা সত্যি হয়নি অবশ্য। দেবযানী কিছুটা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার পরেই সরে এসেছিল মনোজিৎ।

কিছুদিন আগে দেবযানী, মনোজিৎ—এর কমন ফ্রেন্ড তিলোত্তমা মনোজিৎকে জানিয়েছে, এবার নাকি সেপারেশনের ব্যাপারটা নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবছে দেবযানী।

বিশ্বাস করতে ভয় করত ঋতির। তবু গোপন একটা অপেক্ষা তো ছিলই।

দীর্ঘ সেই প্রতীক্ষা শেষ হতে চলেছে। কিন্তু উচ্ছ্বাসটা কেন যে আসছে না সেভাবে? কাঁটার মতো কী যেন একট খচ খচ করছে। করেই চলেছে।

'কী এত ভাবছ বলো তো?' দেবযানীর প্রশ্নে চমকে ওঠে ঋতি।

'এখন কেমন আছেন আপনি?' সহজ হওয়ার চেষ্টা করে ঋতি।

'ভালোই। দিন—রাত বিছানায় শুয়ে শুয়ে যতটা ভালো থাকা যায় আর কি। হুইলচেয়ারে বসিয়ে শম্পা মাঝে মাঝে ব্যালকনিতে নিয়ে যায়। বেশিক্ষণ বসতে পারি না। আবার এনে শুইয়ে দেয়। কী বিড়ম্বনা বলো তো। এরচেয়ে একেবারে চলে যাওয়াই ভালো ছিল। তাই না? তোমাদেরও সুবিধে হত।'

মুখটা কালো হয়ে যায় ঋতির। কী বলবে বুঝে উঠতে পারে না। তখনই হেসে ওঠেন দেবযানী, 'ঘাবড়ে গেলে নাকি? মজা করছিলাম।'

দেবযানীর কথার মাঝখানেই চা আর স্ন্যাক্সের ট্রে হাতে ঘরে এল শম্পা। কোনার দিক থেকে একটা গোল টেবিল টেনে এনে ট্রে—টা রাখল। একটা কাপ তুলে ঋতিকে দিয়ে অন্য কাপটা নিয়ে দেবযানীর কাছে গিয়ে বসল।

'চা টা আমার হাতে দিয়ে তুই এখন যা।' বললেন দেবযানী।

'তোমার অসুবিধে হবে তো। চা টা খাইয়ে দিয়ে যাই?'

'কিচ্ছু অসুবিধে হবে না। ডান হাতটা তো ঠিক আছে রে বাবা। তাছাড়া ঋতিও তো আছে। তুই যা।'

একরকম বাধ্য হয়েই চলে যায় শম্পা। মাথা নিচু করে চা খাচ্ছিল ঋতি। বুঝতে পারছিল দেবযানী তাকেই দেখে যাচ্ছেন। অস্বস্তি হচ্ছিল তার। দেবযানী তখনই বললেন, 'আমি খুব খারাপ। কত যে খারাপ ভাবতেও পারবে না তুমি। মা ছিল না তো। ছোটবেলা থেকেই স্পয়েল্ড হয়ে গিয়েছিলাম। সত্যিকারের সহমর্মিতা, ভালোবাসা কোনোদিন পাইনি। তাই বোধহয় এত ডেস্ট্রাকটিভ আমি, শুভ কিছু, সুন্দর কিছু সহ্য করতে পারি না।'

ঋতি বুঝতে পারছে না, ঠিক কী বলতে চাইছেন দেবযানী। ঋতির দিকে চেয়ে একটু বুঝি থমকে গেলেন দেবযানী। মৃদু হেসে বললেন, 'তোমাকে খুব বোর করছি না? আর সময় নষ্ট করব না তোমার। তুমি একটু কষ্ট করে ডানদিকের ওই আলমারিটা খোলো তো।'

'আমি!' অবাক ঋতি।

'তাছাড়া আর কে আছে এখানে? এদিকে বিছানার তলা থেকে চাবিটা নিয়ে আলমারিটা খোলো। একদম ওপরের তাকে একটা ফাইল আছে, সেটা নিয়ে, আর ওই ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা পেন নিয়ে আমার কাছে এসো।'

দেবযানী যা যা বললেন একে একে তাই করে গেল ঋতি। ফাইলটা খুলতেই পাওয়া গেল ডিভোর্স পেপার। গোটা গোটা অক্ষরে সই করে দিলেন দেবযানী। একটু যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। হাঁপ নিয়ে বললেন, 'ওই গ্লাসটা একটু দেবে ঋতি? বড্ড তেষ্টা পাচ্ছে।'

টেবিল থেকে জলের গ্লাসটা নিয়ে ঢাকনা খুলে এগিয়ে দিল ঋতি। জল খেতে গিয়েই ঘটল বিপত্তিটা। বিষম খেয়ে হিক্কার মতো উঠতে লাগল। দেবযানীর মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল ঋতি। হিক্কাটা কমলেও প্রবলভাবে কাশতে লাগলেন দেবযানী।

ভয় পেয়ে ঋতি বলে উঠল, 'কষ্ট হচ্ছে আপনার? শম্পাকে ডাকব?'

হাতের ইশারায় ঋতিকে নিষেধ করলেন দেবযানী। থেমে থেমে বললেন, 'এরকম প্রায়ই হয়। ওই টেবিলে দেখো একটা কালো মতো সিরাপের শিশি আছে। ওখান থেকে দু ঢাকনি দাও তো আমাকে।'

সিরাপের শিশি থেকে ঢাকনি মেপে গ্লাসে ওষুধ ঢালতে ঢালতে ঋতি শুনল কাশতে কাশতেই দেবযানী বলছেন, 'অনেক কষ্ট দিলাম তোমাকে। কিন্তু তোমাদের নতুন জীবন শুরুর চাবিকাঠিটাও তো দিয়ে দিলাম বলো। অনেক শুভেচ্ছা রইল।' একটু দম নিয়ে আবার বললেন, 'ভেবোনা মৌখিক শুভেচ্ছা জানিয়েই দায় সারব আমি। উপহারটা ডিউ থাকল। সময়—মতো ঠিক পাঠিয়ে দেব।' হাঁপাচ্ছিলেন দেবযানী।

এত কথা কেন যে বলছেন দেবযানী? কাশি তো আরও বেড়ে যাবে। খুব যত্ন করে দেবযানীকে ওষুধটা খাইয়ে দিল ঋতি।

কমে এসেছে কাশিটা। কাশির ধকলেই বোধহয় বেশ কাহিল দেখাচ্ছে দেবযানীকে। শ্রান্ত গলায় দেবযানী বললেন, 'এবার এসো তুমি। সাবধানে যেও।'

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে কেন যেন শির শির করছিল ঋতির চোখ দুটো। হিসেবটা মিলছে না কিছুতেই।

বাড়িতে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল ঋতির। পাহাড়ে রাত গভীর হয় আরও তাড়াতাড়ি। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে মনোজিৎ। সুখবরটা কালই দেবে। ভাবল ঋতি।

পরদিন সকালে বেজে চলা পরিচিত রিংটোনের শব্দে ঘুম ভাঙল ঋতির। মোবাইল কানে চাপতেই ভেসে এল মনোজিৎ—এর উদ্বিগ্ন গলা, 'কাল তুমি মণি মুখার্জি রোডের বাড়িতে গিয়েছিলে কেন?'

'তুমি কী করে জানলে?' অবাক ঋতি।

'টিভিতে দেখাচ্ছে। প্রতিটা চ্যানেলের ব্রেকিং নিউজ এটা।'

'মানে? ইয়ারকি হচ্ছে?'

'ইয়ারকি নয়। টিভিটা খুললেই বুঝতে পারবে। কাল রাতে খুন হয়েছে দেবযানী। কাশির ওষুধের সঙ্গে বিষ খাইয়ে খুন করা হয়েছে। রঘুদাদার কাছ থেকেই পুলিশ জানতে পেরেছে তোমার কথা। আমাকেও ফোন করেছিল পুলিশ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরতে বলেছে। কিন্তু আমাকে কিছু না বলে তুমি হঠাৎ কেন যেতে গেলে ও বাড়িতে?'

থর থর করে কাঁপছে ঋতি। ঋতির কাছে কালকের সমস্ত ঘটনা শুনতে শুনতে পাথর হয়ে যাচ্ছে মনোজিৎ। সিরাপের শিশিতে, গ্লাসে, আরও কত জায়গায় কী নিপুণ চালাকিতে ঋতির ফিঙ্গার প্রিন্ট ধরে রেখেছে দেবযানী! ঋতির সঙ্গে তার ঘর বাঁধার ছাড়পত্রে সই করে কী দারুণ সারপ্রাইজটাই না দিয়ে গেল দেবযানী! কী যেন দলা পাকিয়ে যায় মনোজিৎ—এর গলায়।

'কাল দেবযানীর অনেক কথা হেঁয়ালির মতো লাগছিল জানো। এখন সবকিছু জলের মতো পরিষ্কার আমার কাছে। আমি বোকা মনোজিৎ...' কান্নায় বুজে আসে ঋতির গলা।

ঠিক তখনই কারা যেন জোরে জোরে নক করতে থাকে দরজায়। মা, কুসুমের চেঁচামেচি ছাপিয়ে ঋতি শুনতে পায় একটা ভারী গলা, '...মিস সেন...দরজাটা খুলুন....মিস সেন....দরজা ভাঙতে বাধ্য করবেন না আমাদের...শুনতে পাচ্ছেন....'

'হ্যালো! ঋতি! কী হল! কথা বলছ না কেন?...' মনোজিৎ—এর চিৎকার, দরজার আওয়াজ চাপা পড়ে যাচ্ছে একটা অশরীরী হাসিতে। ঋতি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে দেবযানীর গলাটা—'উপহার পছন্দ হয়েছে ঋতি? বলেছিলাম না সময়মতো পাঠিয়ে দেব...।'

পালটানো যায় না

জয়দীপ চক্রবর্তী



রঙ্গনদের বুথে পৌঁছতে পৌঁছতেই প্রায় বিকেল হয়ে গেল। আসলে ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারেই সময় লেগে গেল অনেকখানি। মালপত্র নেওয়া, মিলিয়ে দেখে পোলিং পার্টির সকলকে একত্র করে পুলিশ ট্যাগিং করা, তারপর লঞ্চ নাম্বার দেখে ঠিকঠাক লঞ্চে চেপে বসা। আবার লঞ্চে চাপলেই তো হল না, ওই লঞ্চে অন্য যেসব বুথের ভোটকর্মীদের যাওয়ার কথা তাঁদের জড়ো হতে হবে। আর সবশেষে নদীর জোয়ার—ভাটার ব্যাপার। লঞ্চ মানুষের মর্জিতে চলে না, সে চলে নদীর স্রোত অনুযায়ী। রঙ্গনরা ভোটকর্মী পাঁচজন, সঙ্গে চারজন পুলিশকর্মী আছেন। বন্দুকধারী। ডি.সি—তে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ডিকোডিং করার সময়েই, ওঁরা বলে দিয়েছিলেন, 'বুথটা সেনসিটিভ, ট্যাক্টফুলি ম্যানেজ করবেন—' লঞ্চে আসার সময়ে পুলিশের লোকগুলোও তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন যাতে অযথা এমন পরিস্থিতি তৈরি না হয় যে তাঁদের লোকাল সব এর সাথে কনফ্রনটেশনে যেতে হয়। রঙ্গনের অবাক লাগছিল। এঁরা পুলিশের লোক, তবু এত ভয়—অন্যায়কে রুখে দেবার মানসিকতা থেকে এঁরাই যদি এতখানি দূরে অবস্থান করেন তাহলে সাধারণ মানুষ কী করবে! চওড়া নদী আর বাণী গাছের সবুজ জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রঙ্গন ভাবছিল অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে করতে ক্রমশ ক্লীব হয়ে যাওয়া মানুষগুলোর দলে নিজেকে সচেতনভাবে ভেড়াতে পারবে না সে। আইন অনুযায়ী যে দায়িত্ব সব পালন করা উচিত, সে তাই করার চেষ্টা করবে।

ফার্স্ট পোলিং চঞ্চলবাবু প্রৌঢ় মানুষ। অভিজ্ঞ। এর আগে অন্তত চারবার পঞ্চায়েত ইলেকশন করার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। কম—বয়সি সদ্য চাকরি পাওয়া রঙ্গনকে প্রথম ট্রেনিং—এর দিন থেকেই অভয় দিয়ে আসছিলেন তিনি। বুথে পৌঁছে কাঁধের ব্যাগ আর ভোটের মালপত্র নামিয়ে রাখল রঙ্গন। বুথ মানে ছোট্ট ছোট্ট দুটো প্লাস্টারবিহীন ইটের ঘর। মেঝে মাটির, অ্যাসবেস্টসের ছাউনি। ঘরে গ্রিল লাগানো জানলা আছে, কিন্তু পাল্লা নেই। এই দু—কামরাঅলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটা ঘরেই কাল ভোট দিতে হবে। ইলেকট্রিক নেই। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও বেশ ঢিলেঢালা। ভোটিং কমপার্টমেন্টের গোপনীয়তা নিশ্চিত করাটাই বেশ কঠিন। রঙ্গন ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সামনে বিস্তৃত ফাঁকা মাঠ, মাঠের ওপারে নদী। নদীর দিক থেকে একটা জোলো জোলো ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে সর্বক্ষণ। স্কুলবাড়ির ডানদিকে মাঠের ওপাশে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে দু—চারটে বাড়ি দেখা যাচ্ছে। কাঁচাবাড়ি। টালির ছাউনি। বাঁ পাশে মাঠের শেষ থেকে কৃষিজমি শুরু হয়ে গেছে। আগে এ জমিতে ভালো চাষ হত। আয়লার পর থেকে জমিটা নাকি ততখানি ফসল দিচ্ছে না আর। রঙ্গন মাঠে দাঁড়িয়ে চারপাশটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। খুব ভালো লাগছিল তার। রুক্ষ, ধূসর স্কুল মাঠটুকু বাদ দিলে চারদিকেই সবুজের কোনো খামতি নেই। নদীর দিক থেকে একটানা এত হাওয়া দিচ্ছে যে গরম মালুমই হচ্ছে না তেমন। চারদিক শান্ত চুপচাপ। একদল কচিকাঁচা ছেলেমেয়ে এসে জুটেছে

মাঠে। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে হাঁ করে রঙ্গনদের দেখছিল ওরা। একটু আগে একজন পুলিশকর্মী এগিয়ে গিয়ে 'কী চাই তোদের' বলে হেঁকে উঠতেই দুদ্দাড় করে দৌড়ে পালিয়েছিল ওরা, সেই ভদ্রলোক সরে যেতেই গুটি গুটি পায়ে আবার এসে জুটেছে ছেলেমেয়েগুলো। রঙ্গনের বেশ মজা লাগছিল ওদের দেখে। স্কুলবাড়ির পাশেই মাঠের ধুলোর ওপরে অনেকক্ষণ থেকে একটা মেয়ে চুপচাপ বসে আছে। গায়ের মলিন সালোয়ার কামিজে ধুলো মেখে একসা। একদৃষ্টে সে তাকিয়েছিল রঙ্গনের দিকে। মেয়েটি যুবতী। স্বাস্থ্য মন্দ না। তার ওড়নাবিহীন বুকের দিকে চোখ পড়তেই চোখ ফিরিয়ে নিল রঙ্গন অন্যদিকে। মেয়েটি নির্বিকার। তার চোখে চোখ পড়তে গা শিরশির করে উঠল রঙ্গনের। মেয়েটার চাউনিটা বড় অদ্ভুত। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। চঞ্চলবাবু ঘরের মধ্যে থেকে ডাক দিলেন এই সময়েই, 'স্যার আসুন, সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আলো মরে আসার আগে কাজ যতটা এগিয়ে রাখা যায় ততই ভালো। সাইকেল মেসেঞ্জার একটার বেশি হ্যারিকেন জোগাড় করতে পারবে না বলে দিয়েছে। কাজে কাজেই—'

'আসছি—''বলে কমবয়সি ছেলেমেয়েগুলোর দিকে তাকায় রঙ্গন। গলাটা ইচ্ছে করে দাবী করে বলে, 'আমরা কাজ করব। তোরা এখন যা। পালা এখান থেকে—' ছেলেগুলো রঙ্গনের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে একটু তফাতে সরে যায়। চলে যায় না। রঙ্গন মাটিতে বসে থাকা মেয়েটির সামনে এসে দাঁড়ায়। খুব নরম গলায় বলে, 'আপনি এভাবে বসে আছেন কেন এখানে? আপনি এবার আসুন। এখানে বসে থাকবেন না এভাবে।' মেয়েটি রঙ্গনের মুখের দিকে তাকায়। তাকিয়েই থাকে। কোনো কথা বলে না। নড়েও না সেখান থেকে।

রঙ্গন আবার বলে, 'কী হল, উঠুন আপনি—'

মেয়েটা গা দোলাতে দোলাতে খিল খিল করে হেসে ওঠে। সেই হাসিতে কেন যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে রঙ্গনের। ছেলের দল দূর থেকে বলে ওঠে, 'ও এখন আর সহজে কথা কয় না। ও কেবল হাসে আর কখনও কখনও কাঁদে। চৈতিদিদি পাগল হয়ে গেছে—'

মেয়েটা ঘাড় বেঁকিয়ে ছেলেগুলোর দিকে চায়। হাত নেড়ে বলতে থাকে 'যা: যা:'—তারপর আবার হেসে ওঠে, খিলখিল করে।

চঞ্চলবাবু আবার ডাকেন, 'স্যার আসুন। সব পেপারে ডিস্টিংগুইশিং মার্ক লাগিয়ে দিচ্ছি। আপনি পেপারগুলোর কমপ্লিট করতে শুরু করুন। অনেক ভাইটাল কাজ পড়ে রয়েছে। সময় নষ্ট করা যাবে না আর —' মাঠ ছেড়ে স্কুলের মাটির বারান্দায় উঠে এল রঙ্গন। প্লাসটিক বিছিয়ে বসে পড়ল অন্যদের সাথে কাজে শামিল হতে।

সন্ধে গড়ানোর পরে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বুথের ভিতরে ঢুকলেন একজন হোমরা চোমরা গোছের মানুষ। সুঠাম ঋজু চেহারা। পরনে চেক লুঙ্গি এবং শার্ট। হ্যারিকেনের আলোয় একমনে তখন পেপার রেডি করছিল রঙ্গন। প্রথমটা অল্প আলোয় অসুবিধা হচ্ছিল খুব। কাজের গতি কমে যাচ্ছিল ক্রমাগত। এখন এই আলোয় চোখ অনেকটা সেট করে গেছে। কাজ করতে আর অসুবিধা হচ্ছে না তেমন। ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেই ভরাট গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রিসাইডিং অফিসার কে আছেন?'

রঙ্গন উঠে দাঁড়াল। ভদ্রলোকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'বলুন—'

'আপনি?'

'হ্যাঁ। বলুন।' আবার বলে রঙ্গন।

আপনার তো বেশ কম বয়েস—' বলেই ফস করে একটা সিগারেট ধরালেন ভদ্রলোক। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আগে ভোট করার অভিজ্ঞতা আছে, নাকি এই প্রথম?'

'প্রথম।' বলে হাসে রঙ্গন। মনে মনে বোঝে লোকটা পরোক্ষে চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে তার ওপর। খুব স্বাভাবিক গলায় সে বলে, 'আমার অসুবিধা হবে না, ইনফ্যাক্ট সব কাজই তো একবার না একবার শুরু

করতে হয়—'অসুবিধা হবে না। আমরা আছি তো—কোনো দরকার হলে বলবেন আমাদের, সঙ্কোচ করবেন না—' ভদ্রলোক হাসলেন।

পাশের একটি ছেলে এতক্ষণে রঙ্গনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল তাঁর, 'ইনি আমাদের অঞ্চলের পঞ্চায়েত প্রধান—'

'নমস্কার—'রঙ্গন দু'হাত জড়ো করে তুলে আনে বুকের কাছে।

'নমস্কার—'সিগারেট ধরা ডানহাতটা কপালে ছোঁয়ান ভদ্রলোক 'কাল দেখা হবে—'

'নিশ্চয়ই।' রঙ্গন বলে, 'একটা কথা মাথায় রাখবেন। এজেন্টরা যেন কাল সকালে সময় মতন চলে আসেন। আমি কিন্তু ঠিক সাতটায় পোল স্টার্ট করব।'

'আপনি একদম চিন্তা করবেন না এসব নিয়ে—'

আশা করি আপনাদের সকলের সহযোগিতা পাব কাল—'

'একশোবার। আমাদের এখানে ভোট করাতে এসেছেন। আপনারা এখন আমাদের অতিথি। আপনাদেরে সুবিধে—অসুবিধে তো আমাদের দেখতেই হবে—' বলে পাশের আর একটা ষণ্ডা মতন ছেলের দিকে চাইলেন প্রধান মশাই, 'প্যাটকা, কাল সকাল থেকে থাকিস এদিকে। সকাল থেকে বিকেল স্যারদের খাওয়াদাওয়ার কোনো সমস্যা যেন না হয়। দায়িত্ব তোর।'

'হ্যাঁ দাদা। আজই আমি তরুণকে দিশি মুরগির অর্ডার দিয়ে দিয়েছি—'

'গুড। আর শোন। ভালো দেখে কিছু কচি ডাব পাড়িয়ে রাখিস। যা গরম—'

'হয়ে যাবে দাদা—'বশংবদ ভঙ্গিতে বলে ছেলেটা।

'এসবের দরকার হবে না—' গম্ভীর হবার চেষ্টা করে রঙ্গন, কনটিজেন্সির টাকা থেকে ওটা আমরা ব্যবস্থা করে দেবখন—'

'তা তো হবে না। বলেই তো দিয়েছি আপনারা আমাদের অতিথি এখন—' ভদ্রলোকের আপাত শান্ত ভাবটা ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছে। রঙ্গন বুঝতে পারল লোকটার চোখমুখ ক্রমশ শীতল আর কঠিন হয়ে উঠছে এবার। প্রধান বলে চললেন, 'এখানে আমি ঠিক করি কী হবে আর কী হবে না। আমাদের দিক থেকে সবরকম সহযোগিতা আপনারা পাবেন কোনো অসুবিধা হবে না আপনাদের। তবে হ্যাঁ, আমরাও কিন্তু কাল আপনাদের কাছ থেকে সহযোগিতা আশা করব—'

'সে তো বটেই। শুধুমুধু ঝামেলা পাকিয়ে তো লাভ নেই। আমরাও তো চাই নির্ঝঞ্ঝাটে ভোটটা করে বাড়ি ফিরতে—' রঙ্গনকে কিছু বলতে না দিয়েই ওর পাশ থেকে সেকেন্ড পোলিং অফিসার বলে উঠলেন। 'একশোবার—'থার্ড পোলিং অনাথবন্ধুবাবুও সমর্থন করলেন তাঁকে।

'মনে থাকে যেন,' পঞ্চায়েত প্রধান বললেন, 'এখানে আসাটা আপনাদের ইচ্ছেয়, কিন্তু ফেরাটা আমাদের ইচ্ছে অনুযায়ী—' ভদ্রলোক সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। রঙ্গন যাবার সময় তাঁকে কিছু বলতে যাচ্ছিল, চঞ্চলবাবু ইশারায় চুপ করতে বললেন তাকে।

ভদ্রলোক বেরিয়ে যাবার পর ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে ফাঁকা মাঠে এসে দাঁড়াল রঙ্গন।

নদীর দিক থেকে ছুটে আসা হাওয়ার গতি আরো বেড়েছে এখন। বিকেলে নদীর ও পাশে আর ধানজমির ওই দিকে সবুজ পাঁচিলের মতন বিছিয়ে থাকা গাছগুলো ভারী সুন্দর লাগছিল। এখন ছায়া ছায়া ঝুপসি অন্ধকারের মধ্যে মিশে থাকা আরো গাঢ় অন্ধকার হয়ে থাকা গাছগুলির দিকে চাইলে অকারণেই যেন গা ছম ছম করে ওঠে। কী অদ্ভুত রকম নিস্তব্ধ চারদিক! কাল এই স্কুলবাড়ির আশপাশের এলাকাগুলো থেকেই প্রায় হাজার মানুষ ভোট দিতে আসবে এই বুথে, এই নৈঃশব্দ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেন একথা বিশ্বাসই করা যায় না। আকাশে আধখানা চাঁদ উঠেছে। কিন্তু আলোর জোর নেই একটুও। মাঝে মাঝে ছেঁড়া ছেঁড়া কালো মেঘের টুকরো উড়ে এসে চাঁদকে ঢেকে ফেলছে যেই, অমনি সেই মৃদু আলোটুকুও মুছে যাচ্ছে। মেঘ সরে গেলে আবার আলো ঠিকরে আসছে আকাশ দিয়ে। পঞ্চায়েত প্রধান তাঁর দলবল নিয়ে মাঠ পার হয়ে যেতেই

একখণ্ড 'বড়' কালো মেঘ চাঁদটাকে ঢাকা দিয়ে দিল। আর তখনি একটানা খিল খিল খিল খিল করে হাসির শব্দ উড়ে এল রঙ্গনের কানে। সেই হাসির মধ্যে শুধুমাত্র অসংলগ্নতা নয়, রঙ্গনের মনে হল, যেন একটা তীব্র বিদ্রুপ খেলা করে বেড়াচ্ছিল পুরো মাঠ জুড়ে। চমকে সেদিকে ফিরে তাকাল সে।

সন্ধের আগে যেমন বসেছিল, চৈতি এখনও ঠিক তেমন ভঙ্গিতেই বসেছিল মাটির ওপর। একই জায়গায়। বসে বসে ঘাড় ঘুরিয়ে পঞ্চায়েত প্রধান যে দিকে চলে গেলেন সেদিকে চেয়ে সে হাসছিল। রঙ্গন ধীর পায়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সে হঠাৎ হাসি থামিয়ে রঙ্গনের মুখের দিকে চাইল। তারপর রঙ্গনকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠল, 'তোমরা সবাই শয়তান। তোমরা সবাই একইরকম আমি জানি তোমরা কেউ আমাদের ভোট দিতে দেবে না কাল—'

রঙ্গন অবাক হয়ে গেল। মেয়েটা তার সাথে কথা বলছে। কিন্তু এমন কথা বলছে কেন ও? ওর কথাগুলো কি নিছকই পাগলের প্রলাপ?

মেয়েটা আবারও মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে প্রধানের চলে যাওয়া— পথের দিকে। রঙ্গন একটুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে খুব শান্ত গলায় মেয়েটিকে বলে উঠল, 'চৈতিদিদি, অন্ধকার হয়ে গেছে। তুমি বাড়ি যাবে না?—'

কী বললে আমায়, দিদি—চকিতে রঙ্গনের দিকে ঘুরে তাকাল মেয়েটা। ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াল মাটি থেকে। তারপর রঙ্গনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে বলে উঠল ঠান্ডা গলায়, 'আমি বিশ্বাস করি না। নতুন গাঁয়ের পল্টনকেও তো আমি দাদা বলে ডাকতাম। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?' জিজ্ঞেস করে রঙ্গন।

চৈতি এ কথার উত্তর দেয় না। নিঃশব্দে হাসে। তারপর ঘাড় বে�কিয়ে দাঁড়িয়ে রঙ্গনের দিকে চেয়ে ডানহাত দিয়ে চুলের বিনুনিটা নাড়াতে নাড়াতে বলে, 'তুমি তো ভোটবাবু, কাল আমায় তুমি ভোট দিতে দেবে?'

'নিশ্চয়ই—' রঙ্গন আত্মপ্রত্যয়ের সাথে বলে।

'তুমি সত্যি কথা বলছ তো', মেয়েটা বিনুনি থেকে হাত সরায়, 'আমার না নিজেরটা নিজে দেবার খুব শখ। আগের বারই তো মাত্র ভোটার হলাম সবে—'

'আগেরবার ভোট দাওনি তুমি?

'না।' বলে মুখ ঘুরিয়ে নেয় চৈতি।

'ক্যানো?'

উত্তর দেয় না চৈতি। খিলখিল করে হেসে ওঠে আবার। তারপর দ্বিতীয়বার দিকে করে রঙ্গনকে, 'সত্যি সত্যিই কাল তুমি আমায় ভোট দিতে দেবে তো?

'শুধু তুমি কেন চৈতিদিদি, সবাই কাল নিজের ভোট নিজে দেবে। আমি নিশ্চিন্ত করে বলছি' রঙ্গন বলে, 'সেইজন্যেই তো আমরা এসেছি—'

'এমনি এমনিই ভোট দিতে দেবে আমায়?'

'মানে?'

'কিছুই দিতে হবে না তার বদলে?'

'কী দেবে তুমি আমায় চৈতিদিদি?'

'আমার যা আছে,' বলে দীর্ঘ হাসিতে ফেটে পড়ে চৈতি, তারপর দ্রুত হাতে কামিজের বোতাম খুলতে শুরু করে সে।

মেঘের হালকা আবডাল ফুঁড়ে চাঁদের আবছা আলো এসে পড়ছে চৈতির অন্তর্বাসহীন আধখোলা বুকের ওপর। মেয়েটাকে মায়াবী লাগছে ভীষণ। রঙ্গন মারাত্মক ভয় পেয়ে গেল। হাতের আঙুল আড়ষ্ট হয়ে উঠল তার। শরীর ঘেমে উঠল। শুকিয়ে যাওয়া গলায় কোনোক্রমে বলে উঠল সে, 'কী করছ তুমি চৈতিদিদি, তুমি

বাড়ি যাও। আমি কথা দিচ্ছি কাল তোমরা সবাই ঠিকঠাক ভোট দেবে। আমি নিজে দেখব এটা—' তারপর পিছন ফিরে ছুটতে শুরু করে সে মাঠ পেরিয়ে, স্কুলবাড়ির দিকে।

এজেন্টরা পৌঁছ গিয়েছিল সকাল সাড়ে ছ'টার মধ্যেই। প্রয়োজনীয় কাজকর্ম, সইসাবুদ সেরে কাঁটায় কাঁটায় সাতটাতেই শুরু হয়েছিল ভোট। এই সকালবেলাতেই প্রচুর মানুষ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছেন স্কুলের বাইরের ফাঁকা মাঠে। আলো ফোটারও আগে আজ ঘুম থেকে উঠতে হয়েছে রঙ্গনকে। আমার সারারাত ঘুমই হয়নি ভালো করে। বাথরুম—পায়খানার কোনো বন্দোবস্ত এখানে নেই। মাঠে—ঘাটে খোলা জায়গায় প্রাতঃকৃত্য সারার কথা ভাবতেই পারে না সে। কাজেই ও কাজটা হয়নি। পুকুরে স্নান করার অভ্যাসও নেই তার। তবুও অনেক কষ্টে পুকুরে নেমে ভয়ে ভয়ে দু—একটা ডুব দিয়ে নিয়েছে সে সেই কাকভোরে। সকাল থেকেই মনের মধ্যে একটা বিচ্ছিরি অস্বস্তি কাজ করছিল। পোল ঠিকঠাক শুরু হওয়াতে এখন অনেকটা স্বস্তি বোধ করছিল সে।

এজেন্টদের মধ্যে একজন রঙ্গনের চেনা। পঞ্চায়েত প্রধানের সাথে ভদ্রলোক কাকভোরে এসেছিলেন রঙ্গনের সঙ্গে দেখা করতে। আজ ওনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে রঙ্গনের। উনি তুহিন সরকার। এলাকায় বিল্ডিং মেটারিয়ালের বড় ব্যবসা আছে। তুহিনবাবু মানুষটি বেশ হাসিখুশি। কথাবার্তাও অমায়িক। ভোট শুরু হবার মিনিট দশ—পনেরো বাদেই পাশে বসা কমবয়েসি একটা ছেলেকে তাড়া দিলেন তিনি কীরে, কী আক্কেল বল'তো তোদের, স্যারদের চা টা কিছু খাওয়াবি তো নাকি—এখুনি? বলে হাসে ছেলেটা।

এখুনি কী রে, সাড়ে সাতটা বাজতে চলল তো—'ধমকে ওঠেন তুহিনবাবু' আরো পরে চা খাওয়ালে টিফিন খাওয়াবি কখন—জানিস তো বাবুদা বারবার করে বলে দিয়েছেন স্যারেদের যত্নআত্তিরে যেন কোনো ত্রুটি না হয়—। আর শোন, পলটন আর প্যাটকাকে এবার চলে আসতে বলে দে। পল্টনদা আটটায় আসবে বলেছে—

'মানে এক ঘণ্টা এভাবে চলবে? ব্যাপারটা রিস্ক হয়ে যাচ্ছে না?'

'রিস্কের কী আছে। এক ঘণ্টায় কত আর পোল হবে—আশি, খুব বেশি হলে একশো—হাজার ছাপ্পান্ন ভোটার আছে এই বুথে। অত ভাবছেন ক্যানো দাদা—' বলতে বলতে উঠে পড়ে ছেলেটা। রঙ্গনের দিকে চেয়ে হাসে। তারপর আসছি একটু স্যার—বলে দরজার দিকে পা বাড়ায়।

রঙ্গনের অস্বস্তি হচ্ছিল। ওদের কথাবার্তার মধ্যে অন্য কিছু একটা ইঙ্গিত আর ইঙ্গিতটা রঙ্গন ধরতে পারছিল না। একটুক্ষণের মধ্যেই চা এসে গেল। সঙ্গে দুটো করে বিস্কুট। তুহিনবাবু রঙ্গনের দিকে চেয়ে একগাল হাসলেন, 'খেয়ে নিন স্যার।'

চা খেয়ে বুথের বাইরে এসে দাঁড়াল রঙ্গন। ফাঁকা মাঠে ভোটদাতাদের দীর্ঘ লাইন পড়েছে। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে সেই লাইন। রঙ্গন একটা সিগারেট ধরাল। চলমান মানুষের সারির দিকে চেয়ে আসমানে ধোঁয়া ছাড়তে লাগে সে সিগারেট থেকে। হঠাৎ লাইনের অনেকখানি পিছন দিকে সে চৈতিকে দেখতে পেল। ভোটদাতাদের লাইনে ভোট দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে চৈতি। চোখে মুখে উত্তেজনার ছাপ স্পষ্ট। ওর ঠিক পিছনে ওর কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে এক প্রৌঢ়া। মাথায় ঘোমটা টানা। বিধবা। চৈতির মা হয়তো। রঙ্গন এগিয়ে গেল। ওর ভালো লাগছিল। মেয়েটা কাল ভোট দিতে পারবে কিনা এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছিল চৈতি, কী আশ্চর্য, ঠিক চিনতে পারল রঙ্গনকে। রঙ্গনের দিকে চেয়ে হাসল। হাসিটা কাল রাতের মতন দুর্বোধ্য ও রহস্যময় নয়। পিছনের মহিলাকে রঙ্গনের দিকে ইশারা করে দেখাল চৈতি। বলল, 'মা এ লোকটা পল্টনদের মতন নয়। ও ভালো লোক। ও আমাকে ভোট দিতে দেবে বলেছে—'

মহিলা ম্লান হাসলেন। ধীর গলায় রঙ্গনের দিকে চেয়ে বললেন, 'ও ঠিক সুস্থ নয়। ওর কথায় কিছু মনে কোরো না বাবা—'

'মনে করার কিছু নেই মাসিমা,' রঙ্গন হেসে বলে, 'চৈতিদিদির সাথে সত্যিই কাল আমার এ কথা হয়েছে—'

'ও।' বলে চুপ করে যান মহিলা। রঙ্গন বলে চলে, 'আমাদের দেশ ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র। আর আপনারা সেই গণতন্ত্রের স্তম্ভ। আমাদের তো এটাই কাজ মাসিমা, আপনারা যাতে ঠিকঠাক গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সেটা আমি অবশ্যই দেখব—'

মাঠের পাশে একটা অটো এসে থামল। অটো থেকে জনাছয়েক লোক নেমে এগিয়ে এল মাঠের দিকে। এরপর অটোর পিছনে এসে থামল তিনটে মোটর বাইক। আরো ছজন। ওরা সকলেই লাইনের সামনের দিকে এগিয়ে গেল। 'পল্টন—' বলেই হি হি করে কাল রাতের সেই অদ্ভুত গা শিরশির করা হাসিটা হেসে উঠল চৈতি।

লাইনের সামনের দিকে একটা জটলা এবং হালকা হৈ চৈ শুরু হল। রঙ্গনের মনে হল ধীরে ধীরে এগোতে থাকা ভোটদাতাদের দীর্ঘ লাইন হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। রঙ্গন বুথের ভেতরে ঢোকার জন্যে দ্রুত পা চালাল।

বুথে ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে গেল রঙ্গন। ভোটকেন্দ্রের দখল নিয়ে নিয়েছে বহিরাগতরা। চঞ্চলবাবুসহ সমস্ত ভোটকর্মীই প্রতিবাদহীন হুকুম তামিল করে যাচ্ছে ওই লোকগুলোর। চারজন পুলিশকর্মীর মাত্র একজনকে দেখতে পেল রঙ্গন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে। তাঁকে দেখে মনেই হল না ভিতরে অন্যায় এবং অসাংবিধানিক একটা ঘটনা ঘটছে এবং সেটা আটকানোর দায়িত্ব তাঁর। রাগে ফেটে পড়ল রঙ্গন। ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল সে, 'এমন ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে করছেনটা কী আপনি? ভিতরে কী চলছে দেখছেন না—'

ভদ্রলোকের চোখেমুখে বিরক্তি ফুটে উঠল। চাপা গলায় রঙ্গনকে পরামর্শ দিলেন তিনি, 'আপনিও চেপে গিয়ে বসে পড়ুন নিজের জায়গায় এভাবে। ঢাল তরোয়ালহীন নিধিরাম সর্দার হয়ে এসব আটকানো যায় না। সবাই জানে। এমনই তো চলে আসছে—'

'ছিঃ ছিঃ, পুলিশ হয়ে আপনি একথা বলছেন,' বিরক্ত হয় রঙ্গনও, 'আর নিধিরাম সর্দার বলছেন ক্যানো নিজেকে, হাতে তো রাইফেল রয়েছে আপনার—'

'খবর্দার যেন আবার ফায়ারিং অর্ডার দিয়ে বসবেন না—'পাতলা একটা হাসি ফুটে ওঠে ভদ্রলোকের মুখে, 'এসব রাইফেলে গুলি সহজে বেরোয় না। '

'মানে?'

'আরে মশাই এসব মান্ধাতার আমলের জিনিস। ভোটের সময় এগুলো বেরোয় একজিবিট করার জন্য। চালানোর জন্যে নয়। তাছাড়া আমার এই বন্দুক ঘাড়ে তুলে গুলি করার জন্যে রেডি করতে করতে সব এসে ঠাস করে চড় মেরে বন্দুকটি কেড়ে নেবে। তখন আরো বড় কেলো। আমার চাকরিটি যাবে—'ভদ্রলোকের সঙ্গে আর কথা বলার ইচ্ছে হল না রঙ্গনের। সামনের মাঠের দিকে চেয়ে সে দেখল ভোটদাতাদের দীর্ঘ লাইন ভেঙেচুরে গেছে। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে মানুষ। দু—একজন প্রতিবাদ করতে গিয়ে বকা খাচ্ছেন পুলিশকর্মীদের কাছেও। খুব কাছেই কোথাও ধ্রাম করে বোমা ফাটার আওয়াজ হল একটা। রঙ্গনের চোখের সামনেই খুব দ্রুত মাঠটা ফাঁকা হয়ে গেল। ও দেখল চৈতির হাত ধরে দ্রুত পায়ে ফিরে যাচ্ছে ওর মা। পাছে ওর চোখে চোখ পড়ে যায়, তাই তাড়াতাড়ি বুথের মধ্যে ঢুকে পড়ে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল রঙ্গন।

তুহিন সরকার রঙ্গনের দিকে চেয়ে হাসলেন। তাকে আশ্বস্ত করার ঢঙে বললেন, 'ব্যস আর কোনো ঝামেলা নেই স্যার। আপনি নিশ্চিত হয়ে বসে রিল্যাক্স করুন। আর পারলে পেপারগুলো রেডি করে ফেলুন, বাকিটা আমরা সামলে নিচ্ছি। চিন্তা করবেন না, সেন্ট পারসেন্ট পোল আমরা করব না। জানি আপনি অসুবিধেয় পড়তে পারেন তাতে। তবে এইট্টি এইট্টি ফাইভ পারসেন্ট পোল হতেই পারে। এগজ্যাক্ট নাম্বারটা একটু পরে আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, আপনি বসিয়ে নেবেন ওটা—'

অসহায় আক্রোশে বুকের মধ্যেটা জ্বালা জ্বালা করছিল রঙ্গনের। পোলিং পার্টির বাকি লোকগুলোকে দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিল সে। কারো মধ্যে কোনো বিচলন নেই। যেন এটাই স্বাভাবিক। এই লোকগুলোর হুকুম তামিল করাই যেন একমাত্র কর্তব্য তাঁদের।

রঙ্গন উঠে দাঁড়াল। প্রতিবাদে ফেটে পড়ল সে, 'এটা হতে পারে না। আমি এ হতে দিতে পারি না—'

চঞ্চলবাবু চোখের ইশারায় থেমে যেতে বললেন ওকে। সেকেন্ড ও থার্ড পোলিং অফিসারও বোঝালেন, 'স্যার আপনার অভিজ্ঞতা কম। দীর্ঘদিন ভোট করছি আমরা। আপনি থেমে যান। না হলে আমরা সবাই বিপদে পড়ে যাব।'

রঙ্গন কথা শুনল না। মোবাইল বের করল পকেট থেকে। বলল, 'আপনি বসে থাকুন হাত—পা গুটিয়ে। আমি পারব না। আমি সেক্টরে ফোন করব। দরকার হলে সেন্ট্রাল ফোর্স আনিয়ে ভোট করাব। আমি—।'

রঙ্গনকে কথা শেষ করতে না দিয়েই একটা ষণ্ডা—মতন ছেলে এসে দাঁড়াল তার সামনে। কোমরে গোঁজা আগ্নেয়াস্ত্রটা একটানে পাঞ্জাবির নীচ থেকে বের করে এনে রঙ্গনের নাকের সামনে দোলাতে দোলাতে সে বলতে লাগল, 'কর্তব্যবোধ যে একেবারে উথলে উঠছে দেখছি। দুটো দানা শরীরে ভরে দিয়ে এক্ষুনি যদি গাঙের জলে ভাসিয়ে দিই, এসব বোলচাল কোথায় যাবে চাঁদু—'

তুহিন সরকার ছদ্ম ধমক দিয়ে ওঠেন, 'তুই বড্ড অল্পে মাথা গরম করিস পল্টন। ভুলে যাস না উনি অতিথি আমাদের। এক্ষুনি দানা টানার কথা ক্যানো তুলছিস—তুই বরং এক কাজ কর। ওঁর মোবাইলটা আপাতত নিয়ে আমার কাছে গচ্ছিত রাখ। দু'ঘণ্টা অন্তর রিপোর্ট পাঠাতে হবে ওই মোবাইল থেকে। ওনার যা মনের অবস্থা তাতে ওনার ওপরে কাজের চাপ দিয়ে আর কাজ নেই। আমিই বরং সময়ে সময়ে রিপোর্টগুলো পাঠিয়ে দেব'খন—'

এই তাহলে পল্টন। চৈতি এই ছেলেটার বিষয়েই একটা কিছু ইঙ্গিত করতে চাইছিল কাল। ভাবতে ভাবতে অসহায়ের মতন নিজের চেয়ারে বসে পড়ে রঙ্গন। একটা অদ্ভুত কান্নার ভাব হচ্ছে বুকের মধ্যে। পরাজিত মনে হচ্ছে নিজেকে। নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেরই দুয়ো দিতে ইচ্ছে হচ্ছে বার বার। মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। কবে যে সত্যিকারের পরিবর্তন আসবে! ভারতবর্ষের মানুষ সত্যি সত্যি গর্ব করতে পারবে নিজেদের গণতন্ত্র নিয়ে, তুহিন সরকার বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'টিফিনে লুচি আলুর দম আর মিষ্টি বলে এবার আনাই?'

'আনান'—সকলে বলল। রঙ্গন কথা বলল না।

'দুপুরে মাংস আর ভাত থাকছে। বেশি রিচ করতে না করেছি। যা গরম—' সরকার আবার বললেন।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। হালকা ঝোলভাতই ভালো—' সকলে বলল। রঙ্গন কথা বলল না।

তুহিন সরকার রঙ্গনের দিকে চাইলেন, 'স্যার—'

'আমি খাব না কিছু—'

'সে কী, ক্যানো?'

'আমার রুচি নেই।'

'দুপুরে ভাত—'

'খাব না।'

'একটু চা বলি তবে?'

'না।'

'এটা কি আপনার প্রতিবাদ?'

রঙ্গন কথা বলল না। তুহিন সরকার নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন।

হালকা জোলো বাতাস বইছিল নদীর দিক থেকে। গাছের পাতায় ধাক্কা খেতে খেতে সেই বাতাস অদ্ভুত এক বিষণ্ণ শব্দ তুলছিল। একটানা ঝিঁঝিঁ ডাকছে আবছা অন্ধকারে। রঙ্গন সেই ফিকে অন্ধকারে নদীর দিকে

চেয়ে চুপ করে বসেছিল অন্যদের থেকে খানিকটা তফাতে। সাইকেল মেসেঞ্জার বুথ থেকে জেটিঘাটে পৌঁছে দিয়ে ওর থেকে রিলিজ নিয়ে চলে গেছে। সেক্টর থেকে খবর পাঠানো হয়েছে ওদের লঞ্চ অন্য একটা দ্বীপের পোলিং পার্টিদের তুলতে গিয়ে ভাটায় আটকে পড়েছে, জোয়ার না এলে তার আর নড়ার উপায় নেই। অতএব অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো পথ নেই এখন। সকলেই কম বেশি ক্লান্ত। দুপুরের গুরু ভোজনে আর নদীর দিক থেকে আসা ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া চোখের পাতা ভারী করে দিচ্ছে ক্রমাগত। রঙ্গনের সহকর্মীরা ভোটের জিনিসপত্রের ওপরেই মাথা রেখে শুয়ে পড়েছে কেউ কেউ। এমনকী পুলিশকর্মীরাও জেটিঘাটের নির্জন চাতালে পলিথিন শিট বিছিয়ে নাক ডাকাচ্ছেন নিশ্চিন্তে।

রঙ্গনের চোখে ঘুম আসছিল না। খিদে পেয়ে পেয়ে মরে গিয়ে একটা বিচ্ছিরি অস্বস্তি হচ্ছে শরীরের মধ্যে। মনটাও তুমুল বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। অন্যায়ের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ছাড়া কিছুই করতে পারল না সে। ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে থাকা মানুষগুলোর দিকে চেয়ে ওর মনে হচ্ছিল ঠিক এই সময়ে এই দ্বীপে ভোট না দিতে পারা মানুষগুলো একজোট হয়ে এসে যদি ভোটের অরক্ষিত কাগজপত্র সব কেড়েকুড়ে নিত তাহলেও হয়তো রিপোর্ট করানো যেত এখানে। তখনও হয়তো ফল একই হত, কিন্তু রঙ্গনের আর কোনো দায়ভার থাকত না হাতে। ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করে ঢকঢক করে খানিকটা জল খেল রঙ্গন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে একটা নির্দিষ্ট ধারায় অকারণ পায়চারি করতে লাগল নদীর পাড় বরাবর ইটপাতা রাস্তার ওপর দিয়ে।

আনমনে হাঁটতে হাঁটতেই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রঙ্গন। একটা ছায়া—মানুষ পথ বেয়ে ক্রমশ এগিয়ে আসছে এইদিকে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তার। তবে কি এক্ষুনি যা ভাবছিল তাই সত্যি হতে চলেছে—গ্রামের মানুষ একজোট হয়ে হামলা করতে আসছে তাদের ওপর রাতের অন্ধকারে? রঙ্গন চুপ করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ছায়ামূর্তি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে তার থেকে একটু দূরে এসে থামল। সঙ্গীহীন, একা একাই। তারপর কাপড়ের আড়াল থেকে একটা হাত বের করে নিঃশব্দে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল তাকে।

রঙ্গন অবাক হয়ে গেল। চিনতে একটুও অসুবিধা হল না তার। চৈতির মা। ধীর পায়ে তাঁর সামনে গিয়ে অপরাধীর মতন মুখ করে দাঁড়াল সে। তারপর চাপা গলায় বলল, 'আমায় ক্ষমা করবেন মাসিমা। আমি পারিনি—'

মহিলা কথা বললেন না। এক হাতে রঙ্গনের হাত ধরে আরো খানিকটা তফাতে নিয়ে গিয়ে শাড়ির আঁচল সরিয়ে আর এক হাতে ধরা টিফিন কৌটোটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'নাও বাবা, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও—'

—রঙ্গন ফ্যাল ফ্যাল করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। মহিলা আবার বললেন, 'আমি জানি তুমি কিচ্ছু খাওনি সারাদিন। আমি শুনেছি। অমন করে কেউ—না খেয়ে থাকলে শরীর খারাপ হবে যে—'

'আমি পারিনি মাসিমা—' গলা ভারী হয়ে আসে রঙ্গনের, ওদের দেওয়া খাবার—তুমি আমার ছেলেরই মতন। বয়েসেও, স্বভাবেও—তোমার মতনই ও—ও ছিল। তবে বড্ড এক বগ্গা। অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে পারত না। আর তোমারই মতন বোকা। বুঝতেই চাইত না যে একা একা সবকিছু পাল্টে ফ্যালা যায় না—'

'তারপর?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে রঙ্গন।

মহিলা টিফিন কৌটো খুলে মেলে ধরেন রঙ্গনের সামনে, 'বেশি কিছু নেই বাবা, অভাবের সংসার আমার। রুটি আছে। আর কুমড়োর তরকারি। রঙ্গন হাত দিয়ে রুটি তরকারি নিয়ে মুখে দেয়। মহিলা বলতে থাকেন, 'সেবার চৈতি প্রথম ভোট দেবে। পাঁচ বছর আগের সে দিনেও পল্টনরা আমাদের সরিয়ে দিয়ে বুথ দখল করে নিয়েছিল। আমার ছেলে তার দিদিকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে প্রতিবাদ করেছিল। বলেছিল দিদির ভোট দিদিই দেবে—'

'কী হল তারপর?'

'ভোট দিবি, আয়—বলে চৈতির হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে পঞ্চুদের ভাঙা গোয়ালঘরে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল পল্টন—' বলে একটু থামলেন উনি। তারপর বড় করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আমার বোকা ছেলেটা দিদিকে বাঁচাতে তখনও লড়াই করতে গিয়েছিল পল্টনের সাথে। প্রতিবাদ করেছিল সে—আর তাই দুদিন নিখোঁজ থাকার পর সে ওই নদীর জলে ভেসে উঠেছিল। পুলিশে রিপোর্ট লেখা হয়েছিল স্নান করতে গিয়ে দুর্ঘটনাবশত জলে ডুবে মৃত্যু—'

'আর পল্টন?' বোকার মতন জিজ্ঞেস করে রঙ্গন।

'দেখলে তো নিজের চোখে। সেদিনও যা করত, এখনও তাই করে। সময়মতন দলটা পাল্টে ফেলেছে শুধু। কে ওকে ছোঁবে বাবা—ওকে যে সবার দরকার। আমরা তো কারো কাছে দরকারি নই—' বলতে বলতে শূন্য টিফিন কৌটোটা আঁচলের নীচে ঢুকিয়ে নিয়ে আবার রঙ্গনের দিকে চাইলেন তিনি। তারপর আঁচলে চোখ মুছে বললেন, 'তোমার জন্য ভারী চিন্তা হচ্ছিল আমার। তুমি বেঁচে থেকো আর সাবধানে থেকো বাবা—'

রঙ্গন কিছু বলার আগেই উল্টো পথে হনহন করে হাঁটা দিলেন তিনি।

রঙ্গনও পিছু ফিরল। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের আড়াল থেকে চাঁদটা বাইরে বেরিয়ে এসেছে এখন। চাঁদ থেকে ঠিকরে আসা আলো পড়েছে রাস্তায়। নদীর দিক থেকে আসা হাওয়া আরো তীব্র হয়েছে। জোয়ারে জল ফুলে উঠেছে নদী জুড়ে। রঙ্গন জেটিঘাটের দিকে পা বাড়াল। একটু পরেই লঞ্চ এসে যাবে। রিসিভিং কাউন্টারে পৌঁছতে রঙ্গনকে সেই লঞ্চে চড়ে জ্যোৎস্নায়, জলপথে দুলতে দুলতে এখন অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে।

চিত্রনাট্য

সুজন ভট্টাচার্য



বন্ধ জানলার ওপার থেকে বৃষ্টির শব্দটা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। বাড়িটার সামনে টিনের শেডটার উপরে হুড়মুড় করে জল আছড়ে পড়ছে বলে শব্দটা বেশ জোরেই বাজছে। বাইরের অন্ধকার আর কিছু টের পাবার উপায় নেই। এমনিতেই বাড়িটা একটেরেয়া। দিনের বেলাতেই লোকজনের খুব একটা দেখা মেলে না। সন্ধে নামলে আস্তে আস্তে চারপাশের অন্ধকারে বাড়িটাকে গিলে ফেলতে শুরু করে। নিজস্ব আলোটুকু দূর থেকে যেন আকাশের তারার মতোই লাগে। সুমন্ত্র এখানে পা দিয়েই তাই বোধহয় বলেছিল—বাড়ি করার আর জায়গা পেলে না শঙ্কর! রাতবিরেতে একটা কিছু হয়ে গেলে কেউ তো টেরও পাবে না।

শঙ্কর হাহা করে হেসে উঠেছিল—টের না পাওয়াই তো ভালো গো সুমন্ত্র। সবকিছু ঠিকঠাক নেমে যাবে প্ল্যানমাফিক; অথচ কেউ টেরটিও পাবে না, এমনটাই তো চাই।

তোমার কথা বোঝা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কম্মো না,—সুমন্ত্রও হেসে ওঠে।

জানলার পর্দাটা সামান্য সরিয়ে শঙ্কর বাইরে চোখ রাখে। নাঃ, বৃষ্টির ফোঁটাগুলোও নজরে আসছে না। এমন একটা জায়গা খুঁজে বের করতেই তো কতটা সময় চলে গেল ওর। চাইবাসা স্টেশন থেকে সরাসরি যাবার মতো গাড়ি নেই। জঙ্গলের ট্রাক আর পায়ে হাঁটাই সম্বল। পশ্চিম সিংভূম জেলার গভীর অরণ্যের মাঝখানে তামসাইয়ের এই বাড়িটার সংবাদ ও পেয়েছিল জামসেদপুরেই। যাদবপুরের ফ্ল্যাটে একা একা থাকা তখন ওর পক্ষে প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে। ভিতর থেকে একটা শূন্যতা যখন হঠাৎই লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে, তখন তাকে হজম করা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। কলকাতার পাট প্রায় চুকিয়ে শঙ্কর তাই তখন ঘুরে বেড়ায় এখানে—ওখানে।

জামসেদপুরে দিমনা লেকের ধারে লোকটার সাথে আচমকা আলাপ হয়েছিল। শঙ্কর তখন একটা চেয়ারে বসে একমনে দেখে যাচ্ছিল একটা কাপলকে; বউটার খিলখিল হাসি বুঝিয়ে দিচ্ছে তার পরিবর্তনের বয়েসটা খুব বেশি নয়। মিলিও এমনি করেই ঝিলিমিলিয়ে হাসত। ওরা হানিমুনে গিয়েছিল পেলিং। কাঞ্চনজঙ্ঘা ফলসে শরীর ভেজানোর জন্য মিলি যেন পাগল হয়ে উঠেছিল।

তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি!—শঙ্কর একটা সময় বিরক্তই হয়ে উঠেছিল।

জেনেশুনেই তো একটা পাগলিকে ঘরে নিয়ে এসেছিলে মশাই—মিলি চোখ ঘুরিয়ে বলেছিল,—এখন রেগে গেলে চলবে! —মিলির এই উচ্ছ্বাসটাই শঙ্করকে সবথেকে বেশি টানত। রাশভারী বাবা আর ডিপ্রেশনের পার্মানেন্ট পেশেন্ট মার সাথে থাকতে থাকতে শঙ্কর যেন শিখে নিয়েছিল আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করাটাই হল ভদ্রতা। বিয়ের পরে মিলি যেন জীবনের খাতার একেকটা পাতা উলটে ওর সামনে নতুন করে পড়াতে শুরু করেছিল।

ডোন্ট মাইন্ড,—পাশ থেকে গলাটা শুনেই চমকে উঠেছিল শঙ্কর। বেশ লম্বাচওড়া একটা লোক, স্কুটারটা স্ট্যান্ড করে দাঁড়িয়েছে। স্কুটার মানে লোকাল লোক। বাঙালি!

আজ দিনতিনেক ধরেই দেখছি আপনাকে। সারাটা দিন লেকের পাশে চুপ করে বসে থাকেন। দিমনা আর জঙ্গল আপনাকে বেশ পাকড়ে ধরেছে বুঝতে পারছি। জঙ্গলে একটা আস্তানা বানাবেন নাকি? আমার সন্ধানে আছে। একদম ভার্জিন ফরেস্ট। দারুণ একটা ছোট্ট বাড়ি আছে; মালিক মারা গেছে বলে ছেলেরা বিক্রি করে দেবে।

পরের দিনই শঙ্কর আর শ্যামল মল্লিক মানে সেই ভদ্রলোক রওয়ানা হল তামসাই। ছোট্ট বাড়িটাকে দেখে শঙ্করের একবারেই পছন্দ হয়ে গেল।

উত্তরে মাইল—তিনেক গেলেই সারান্ডা—সিংভূম রেঞ্জ; আর যদি পশ্চিমে মাইলখানেক যান, পেয়ে যাবেন রুরু নদী। ব্যস, আর কী চাই আপনার।

নিতান্ত জলের দরেই বাড়িটা কেনা হয়েছিল। শ্যামল মল্লিক তেমন কোনো কমিশনও নিতে চায়নি।—আরে দাদা, হঠাৎ করে হাজির হয়ে গেলে একটু জল—নাস্তার বন্দোবস্ত করে দেবেন।

গুছিয়েগাছিয়ে বসতে আরো প্রায় মাসচারেক। হ্যাঁ, কলকাতার সাথে সম্পর্ক একেবারে কেটে ফেলা সম্ভব না; তাই দু—তিনমাস অন্তর যেতেই হয়। সে—ও বড়জোর সপ্তাখানেক।

আমরা কি বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকব?—এতক্ষণে মিলি কথা বলে উঠল।

এই দেখেছ! এত করে নেমন্তন্ন করে নিয়ে এলাম; আজ কিনা দরজার তালাই খুলতে ভুলে যাচ্ছি। চলো, চলো। —বাড়তি উৎসাহে শঙ্কর ওদের ব্যাগদুটোও হাতে তুলে নিয়েছিল। মিলি বাধা দিতে গেলে কোনো কথা না বলে ওর হাতটা শঙ্কর হালকা একটা ছোঁয়া দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই শঙ্কর অনুভব করল বুকের মধ্যে কেমন একটা ধাক্কা যেন আচম্বিতে লাফ দিয়ে উঠল। আশ্চর্য! এতদিন পরেও!!

মাসখানেক আগে শঙ্কর যেদিন সুমন্ত্রর ফ্ল্যাটে হাজির হয়েছিল, মিলি সেদিন ছিল না। সুমন্ত্র প্রথমে অবাক হলেও তারপরে যেন মাঝখানে কোনো ইতিহাস নেই এমন ভঙ্গিতেই কথাবার্তা শুরু করে। শঙ্করও পুরোনো কাহিনির প্রসঙ্গ আর তোলেনি।

একটা ছোট্ট বাসা বানিয়েছি, বুঝলে,—চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে শঙ্কর বলেছিল।—জঙ্গল তো তোমাদের খুব প্রিয়। বর্ষার জঙ্গল দেখেছ কোনোদিন? আমার ওখানে চলো। পাগল হয়ে যাবে। তিনদিনে একটা নতুন কবিতার বই হয়ে যাবে।

সব ঠিক হয়ে গেল। শঙ্কর চাইবাসা স্টেশনে চলে আসবে। সুমন্ত্র ওখানে বসেই মোবাইলে ট্রেনের টিকিট রিজার্ভ করে ফেলল।

চাইবাসা স্টেশনে ট্রেনটা ঢোকার পর দেখা দিতে শঙ্কর করেই একটু দেরি করেছিল। দরজা দিয়ে প্রথম বেরিয়েছিল সুমন্ত্র, হাতে লাগেজ। আবছা অন্ধকার কামরার ভিতর থেকে মিলির মুখটা প্রকাশ্য আলোতে বেরিয়ে আসতেই ওর যেন দমবন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ও তো ভেবেছিল এই মেয়েটার সবকিছু ওর জানা হয়ে গেছে; অথচ কতকিছুই যে জানার বাকি থেকে গেল! একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলার পরে কি আর নতুন করে ভাবার কোনো সুযোগ আসে মানুষের জীবনে! ভাবতে ভাবতেই শঙ্কর সামনে এগিয়ে আসে।

এখানে আসতে মিলির ইচ্ছে ছিল না; সুমন্ত্রর চাপেই ও রাজি হয়েছিল। আবার শঙ্করের সামনে দাঁড়াতে হবে ভাবলেই ওর যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। না, অনুশোচনা নয়, কেমন একটা অজ্ঞাত ভার ওর উপর চেপে বসেছিল। এমন অনেক ঘটনাই থাকে মানুষ আগাপাশতলা না ভেবেই শুরুতে যার সঙ্গ নেয়; তারপর একদিন সেই ঘটনায় সে নিজেই হয়ে ওঠে মূল পরিচালক। মিলিও তো আসলে তাই। কোনো অপরাধ ও করেনি ঠিকই, কিন্তু অন্য একটা মানুষের অসহায় মুখটার কথা মনে পড়লে ওর নিজেরই খারাপ লাগে।

ট্রেনে ওর ঘুম হয়নি। শঙ্করের মুখোমুখি হলে ঠিক কী যে করবে ভেবে ভেবেই সারাটা রাত চোখ বড় বড় করে হালকা নীল আলো—ফ্যানের ঘুরে চলা ব্লেড—ঠিক উলটোদিকের স্লিপারে বাচ্চচা নিয়ে ঘুমিয়ে থাকা

অবাঙালি বউটাকে দেখে যাচ্ছিল। ট্রেনটা যখন স্টেশনে ঢুকছে তখন ওর যেন আর মাথা কাজ করছিল না।

শঙ্কর, এদিকে—সুমন্ত্রর কথায় ও চমকে উঠে তাকিয়েছিল সামনের দিকে। লম্বা শরীরটা কি সামান্য রোগা লাগছে? গোঁফটা আরেকটু পুরু হয়েছে, চোখদুটোও যেন খানিকটা বদলে গেছে, ভাষাটা যেন ঠিক পড়ে ওঠা যাচ্ছে না। সেই মানুষটাই, অথচ যেন সেই মানুষটা নয়। মিলির বুকের ঠিক মাঝখানে একটা হালকা ব্যথা উঁকি দিয়েই আবার মিলিয়ে গেল। গ্যাসের পেন! নাকি...

ওয়েলকাম, ওয়েলকাম বলে শঙ্কর হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল সুমন্ত্রর দিকে। তারপর মিলির দিকে ঘুরে বলল—ট্রেনে কোনো অসুবিধে হয়নি তো মিলি?

শঙ্করের মুখে নিজের নামটা শুনে মিলি যেন কেঁপে উঠেছিল। শঙ্কর এত স্বাভাবিক গলায় কথা বলছে কী করে! হাবভাবে তো টের পাওয়াই যাচ্ছে না জীবনে এতগুলো নাটকীয় পরিবর্তন হয়ে গেছে। ওর কাছে কি মিলির জন্য আর একটুও স্পেস নেই! তাহলে মিলিই বা এত ভেবে মরছে কেন! মিলি নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে বলে—নাথিং।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে ওরা যেন চমকে উঠেছিল। একটা মস্তবড় জার্মান শেফার্ড। লম্বা জিভটা মুখের বাইরে বের করে ওদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। দেখলেই ভয় লাগে, এই বুঝি লাগাল এক কামড়। শরীরে নড়াচড়ার কোনো ইঙ্গিত নেই। চোখের লালচে আভায় যেন পড়ে নিচ্ছে আগন্তুকদের পরিচিতি।

কিলার ডগ, বুঝলে,—শঙ্কর বলে—অনেক কসরত করে শিখিয়েছি।

তোমার আবার কুকুর পোষার শখ জাগল কবে থেকে?—সুমন্ত্র যেন হঠাৎ চমকে ওঠার ভাবটা আড়াল করার জন্যই বলেছিল।

শখের কি কোনো নিয়মকানুন থাকে সুমন্ত্র! একটা শখ যায়, আরেকটা শখ আসে।—ব্যাগদুটো নিয়ে পাশের ঘরের দিকে যেতে যেতে শঙ্কর বলে। হঠাৎই খেয়াল হয় দরজার মুখে মিলি জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, কুকুরে যে ওর খুব ভয়, শঙ্কর জানে।

কী হল, মিলি! ভয় লাগছে?—শঙ্করের কথাতেও মিলি উত্তর না দিয়ে ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে।—কী মুশকিল হল বল দেখি রেক্স! যা, তুই ওঘরে চলে যা। তোকে বেশিক্ষণ দেখলে ম্যাডাম আবার উলটোপথে হাঁটা না লাগায়।

শঙ্করের ইঙ্গিতে কুকুরটা খুব ধীরে ধীরে ওপাশের ঘরে চলে যায়। দরজাটা ডিঙোনোর সময় একবার মুখ ফিরিয়ে অতিথিদের দিকে একঝলক তাকিয়ে দেখে। শঙ্কর শুধু দেখে মিলির মুখটা যেন রক্তশূন্য হয়ে গেছে। মিলি এমনিতেই খুব ফর্সা। কিন্তু এক বাড়িতে একটা বাঁধনছাড়া কুকুরের সঙ্গে রাত্রিবাস করতে হবে ভেবে মুখটা যেন কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে।

কী হল, এবারে তো এসো। ভয় নেই, আমি না ডাকলে ও আর আসবে না।

ওটাকে বাঁধলে কি খুব অসুবিধে হবে?—মিলির গলায় ভয়ের ছোপটা খুব স্পষ্ট।

তা একটু হবে বইকি—শঙ্কর হেসে ফেলে। —বেঁধে ফেললে আশপাশে কী হচ্ছে টের পেলেও যে আর ঝাঁপাতে পারবে না। চোর তো ঘুরঘুর করছেই।

বলো কী শঙ্কর, এখানেও চোর!—সুমন্ত্র যেন খুব অবাক হয়েছে।—সবাই যে বলে পাহাড় আর জঙ্গলের মানুষরা খুব সৎ হয়।

তা তো হয়ই। কিন্তু মুশকিল কী জানো, সেখানেও যে শহরের বাবুবিবিরা হানা দেয়। এই যেমন তোমরা এসেছ।

মানে!—সুমন্ত্র যেন রুখে উঠতে চাইছে,—আমরা কি চোর!

শঙ্কর হাহা করে হেসে উঠেছিল। তারপর বলল—শোনো, এতটা জার্নি করে যে এসেছ। আগে ফ্রেশ হয়ে নাও। স্নান করে খেয়ে লম্বা একটা ঘুম দাও। বিকেলে জঙ্গল দেখাতে নিয়ে যাব। এইসব জটিল কথা আলোচনার জন্য রাতটা তো পড়েই রইল। ওই ঘরটা তোমাদের জন্য। যাও, আর দেরি কোরো না।

শঙ্কর রান্নাঘর থেকেই টের পেয়েছিল স্নান সেরে মিলি সামনের ঘরে এসেছে। আগে এই সময়টায় মিলি গুনগুন করে গানের সুর ভাজার চেষ্টা করত। আজ কিন্তু তেমন কিছু টের পাওয়া যাচ্ছে না। মিলি কি আরো অনেক কিছুর মতোই এই অভ্যাসটাও ছুড়ে ফেলে দিয়েছে! রান্নাঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শঙ্কর একবার দেখল মিলি খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরটা দেখছে। না, যাদবপুরের ফ্ল্যাটটার সাথে মেলাতে গেলে ভুল তো হবেই। কোনোকিছুই কি আর আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে!

হাতে ভাতের হাঁড়িটা নিয়ে এই ঘরে ঢোকার আগে শঙ্কর একটা গলাখাঁকারি দেয়। মিলি পিছনে ফিরে শঙ্করকে দেখে চুপ করে থাকে। টেবিলে হাঁড়িটা নামিয়ে শঙ্কর খুব মৃদু স্বরে বলে—কেমন লাগছে এখানে মিলি?

মিলির মুখে একঝলক রক্ত লাফিয়ে উঠে আবার যেন নেমে গেল শিরা আর ধমনীর অন্ধকারে। কেমন একটা ধরা গলায় মিলি বলল—আমি কি তোমায় হেল্প করব?

আরে না, না,—শঙ্কর হেসেই উত্তর দিল—এটুকু নিজেই পারব। পরে হেল্প কোরো।

মিলি টেবিলটার দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি কি এখানে একাই থাকো শঙ্কর?

একা থাকব কেন? রেক্স আছে তো।—না, কথাটার মধ্যে খুব ভুল কিছু ছিল না। একাকীত্বের নিজস্ব দুর্গের মধ্যেই বাস করবে বলে বেশ উৎসাহ নিয়ে শঙ্কর এখানে ডেরা পেতেছিল; কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই টের পেল ও হাঁপিয়ে উঠছে। তাই একটা জার্মান শেফার্ডের পুঁচকে বাচ্চা কিনে এনেছিল জামসেদপুর থেকেই। রেক্স তখনো দুধ খায়; কোলের মধ্যেই গুটিসুটি মেরে ঘুমোয়। সময়টা ভালোই কাটছিল যতক্ষণ না বাতাসি ওকে টেনে বাইরে এনে দাঁড় করিয়েছিল। শঙ্করও অবাক হয়ে গিয়েছিল ছোট্ট রেক্সের কারবার দেখে।

কোত্থেকে একটা খরগোশ অভিযাত্রীর মতো হাজির হয়েছিল বাগানে। শঙ্করের চোখে আগে কোনোদিন পড়েনি। রেক্স ছিল বারান্দায়। সেখান থেকেই ঝাঁপ দিয়ে বাগানে নেমে খরগোশটাকে তাড়া করে গেটের ঠিক মুখে দাঁতগুলো বসিয়ে দিয়েছে গলার নলিটায়। ওর মুখের হাঁ তখনো বড় হয়নি; সেখানে তাজা রক্তের ছোপ লেগে কেমন যেন অচেনা মনে হচ্ছিল রেক্সকে।

কিলার ডগ সাব—কেনার সময় লোকটা বলেছিল বটে। আর সেইদিন শঙ্কর বুঝে গিয়েছিল, যতই কোলে ঘুমোক আর চুকচুক করে দুধ খাক, কিলার ইনস্টিংক্ট রক্তের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে। সময় এলেই বাইরের আবরণটা খসিয়ে আসল চেহারাটা উঠে দাঁড়ায়। তারপর থেকে শঙ্করও রেক্সকে সাধ্যমতো ট্রেনিং দেবার চেষ্টা করে গেছে। জামসেদপুরের সেই লোকটার কাছে বারবার গিয়ে শিখেছে ট্রেনিংয়ের কায়দাকানুন। নাঃ, বিশেষ কিছু ভেবে শঙ্কর রেক্সের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেনি। রক্তের মধ্যে আছে যখন, দেখাই যাক না, এমনটাই ও ভেবেছিল।

শঙ্করের উত্তর শুনে মিলি কী বুঝল কে জানে! আর কোনো কথা না বলে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

জঙ্গল দেখছ? ওদিকে মাইলখানেক গেলেই একটা নদী আছে, রুরু। নদী মানে ঝোরা আর কি।

আজ দেখাবে তো—বলতে বলতে সুমন্ত্র ঘরে ঢোকে।

আরে এত জলদিবাজি করলে হবে?—শঙ্কর হেসে ওঠে।—আগে খেয়ে উঠে একটা ঘুম দিয়ে নাও। সময়ে সব হবে।

মুরগির মাংসটা খেয়ে সুমন্ত্র খুব তারিফ করেছিল। খেতে বসে মিলি আর মুখ খোলেনি। শঙ্করও কথা বলানোর চেষ্টা করেনি। সুমন্ত্রই শুধু বকবক করে যাচ্ছিল। নাটকের মূল প্ল্যানিংয়ে এইসব ছোটখাটো বিষয় ডিরেক্টাররা বাকিদের উপরই ছেড়ে দেয়। লাঞ্চ হয়ে গেলে ওরা পাশের ঘরে ঢুকে যায়। আজ ওরা বেশ লম্বা ঘুমই দেবে। ট্রেনে সাত ঘণ্টার পরে লড়ঝড়ে একটা মারুতি ভ্যানে আরো ঘণ্টা দুয়েক। তার মধ্যে অনেকটাই আবার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া এবড়োখেবড়ো কাঁচা রাস্তা। কোমরকে জানান দিয়ে ছাড়ে। তা—ও নেহাত শঙ্কর গাড়িটা ম্যানেজ করতে পেরেছিল। নাহলে আরো দেরি হত।

সুমন্ত্র আর মিলি ঘরে ঢুকে যাবার পর শঙ্কর বারান্দায় এসে বসেছিল। তখনো বাইরে সূর্যের দাপট মাটিকে যেন ভয় দেখানোর জন্য লড়ে যাচ্ছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হবার মুখেই হাওয়া ছাড়তে আরম্ভ করে দিল। জঙ্গলে এমনটাই হয়। সারাদিন সূর্য যে তাণ্ডবটা নাচে, তাতে হাওয়াও যেন প্রাণ বাঁচাতে লুকিয়ে পড়ে গাছগাছালির আড়ালে। আলোটা একটু কমতেই সারাদিনের দাপাদাপির খামতিটা পুষিয়ে নিতেই যেন দুদ্দাড় করে ছুটতে থাকে। কিন্তু আজকের হাওয়াটার মধ্যে একটা অন্যরকম ইঙ্গিত ছিল। পাহাড়ের ঝরনার জল উপর থেকে নিচে ঠিকড়ে পড়ার সময় দুয়েক ফোঁটা গায়ে এসে লাগলে যেমন শিরশিরানি জাগে, অনেকটাই তেমন।

বৃষ্টি আসবে। বাঃ। ডিরেকটোরিয়াল পয়েন্টে এই বিষয়টা ছিল না। জঙ্গলের বৃষ্টির একটা অদ্ভুত রহস্য আছে। অনেকটা বিয়ের পরে পরে নতুন স্বামী—স্ত্রীর রুটিন—ভালোবাসাবাসির মতোই। অন্তত, ওরা বোর হবে না। পরিণতি জেনে ফেলার পরে মানুষ যে কেমন জড়পাথরের মতো হয়ে যায় সেটা তো ও নিজেই ভালো জানে। তার মধ্যে একটু রোমাঞ্চ আনতে পারলে ক্ষতি কী!

সবকিছু মানুষ ভেবেচিন্তে করতে পারে না। শঙ্করও পারেনি। এমনই এক বিকেলের মুখে দুটো বেজির লড়াই দেখে ও কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। ভালো করে দেখবে বলে বায়নোকুলারটা লাগাল চোখে। বোঝাই যাচ্ছে খাবারের দখল নিয়ে মারামারি। হঠাৎই চোখে পড়ল একটা পাথরের আড়ালে বসে আরেকটা বেজি মাথা উঁচু করে একবার যোদ্ধাদের দেখছে, আবার চোখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। হাঃ, আদিম খিদে, বুঝে নিতে শঙ্করের অসুবিধে হয় না। মিনিট—পাঁচেকের মধ্যেই মোটাসোটা বেজিটার কাছে হার মেনে অন্যটা পালিয়ে গেল। শঙ্করের উৎসাহ যেন আরো বেড়ে গেল। বারান্দার ধারে এসে ফোকাসটাকে আরো নিখুঁত করার চেষ্টা করল।

ততক্ষণে সেই পাথরটার ছায়ায় অপেক্ষায় থাকা মাদি—বেজিটার শরীরে মদ্দা—বেজিটা নিজের জায়গা খুঁজে পেয়েছে। শঙ্কর দেখতে থাকে। হঠাৎই ওকে একদম হতভম্ব করে দিয়ে সেই পালিয়ে যাওয়া বেজিটা কোত্থেকে একলাফে ঝাঁপিয়ে পড়ল মদ্দা—বেজিটার উপর; গলায় কামড়টা ঠিকঠাক বসেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। মোটা বেজিটা যেন বুঝতে পারছে না ঠিক কী করা যায়। আততায়ীকে সামাল দেবে; নাকি যে কাজটার জন্য এতকিছু, সেখানেই নিবিষ্ট থাকবে। খানিকটা ঝাপটাঝাপটির পর দুটোই চলে গেল পাথরের আড়ালে। খানিকবাদে মাদি—বেজিটার মুখটা দেখা গেল পাথরের বাইরে একটুখানি বেরিয়ে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে খাবি খাচ্ছে। বাকি দুটোকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও আর দেখা গেল না। সন্ধে হয়ে যাওয়ায় শঙ্কর একসময় বায়নোকুলারটা নামিয়ে রাখতে বাধ্য হয়। পরের দিন সকালে একটাকেও পাওয়া গেল না। পাবার কথাও না। জঙ্গলে কতরকমের জানোয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাতেই হাপিস করে দিয়েছে।

সেদিন রাতেই শঙ্কর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। চারপাশের পরিবেশ যেন ওকে এদিকেই ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ও শুধু এক মনোযোগী, বাধ্য ছাত্রের মতো সেই নির্দেশগুলো পালন করে যাচ্ছে। কী হওয়া উচিত, সময়ই যখন সব ঠিক করে দিচ্ছে, তখন আরেকটু উদ্যোগী হওয়াটাই ভালো। কিন্তু কীভাবে! প্ল্যানটা ঠিকঠাক তৈরি করতে লেগে গেল আরো দিনসাতেক। তারপর শঙ্কর চলে গেল চাইবাসা। কয়েকটা জিনিস কিনতে হবে।

ক্যায়া করে ভাইয়া; একেলা আদমি। কব ক্যায়া হো জাতা হ্যায়। —দোকানদারের প্রশ্নের উত্তরে সেফটি ক্যাচটা টেস্ট করতে করতেই শঙ্কর বলেছিল। দোকানদারের আর কী। রুটিন প্রশ্নের রুটিন জবাব শুনে শুনে ও—ও বোধহয় অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

সন্ধে নামার আগেই আকাশ পুরো কালো করে ফেলেছে। হাওয়ার জোরটাও বেড়েছে। বাইরের টিনছাওয়া বারান্দায় বসে শঙ্কর একমনে দেখছিল খানিকটা দূরে গাছের ডালগুলো কেমন যেন তালে তালে গা দুলিয়ে যাচ্ছে। যেন নাচের আসরের দর্শক। মাটি থেকে লাল—লাল ধুলো উড়ছে। শঙ্করের বেশ মজা লাগে। একটা নাটকের প্ল্যান বানানো কি মুখের কথা; কত কী ঘটে যেতে পারত মাঝখানের এই সময়টার মধ্যে। হয়তো

শঙ্করই মুছে যেতে পারত পৃথিবী থেকে। হ্যাঁ, মাসদশেক আগে সাপের কামড়টা যদি হাই—নেক জুতোর উপরে না পড়ে আর ইঞ্চিতিনেক উপরে উঠত, সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট তো মাঠেই মারা যেত। কিংবা সুমন্ত্র আর মিলি ওর নেমন্তন্ন স্বীকার নাও করতে পারত। হয়তো ওরাও হারিয়ে যেতে পারত এমন কোনো জঙ্গলে যেখানে কোনোদিন শঙ্কর মিষ্টির প্যাকেট হাতে নিয়ে হাজির হতে পারত না। শঙ্করের হঠাৎই নিজেকে কেমন যেন ঈশ্বর বলে মনে হতে থাকে। অন্তত দুটো মানুষের ভাগ্যের লেখা ও নিজেই স্থির করাতে পেরেছে।

বৃষ্টি নামবে নাকি! —পিছন থেকে সুমন্ত্রর গলাটা পেয়ে শঙ্কর মাথাটা ঘোরায়। তারপর বলে—উঠে পড়লে? চা খাবে তো? মিলি উঠেছে?

আরে দূর, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? —সুমন্ত্র সিগারেটের প্যাকেট বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে দেয়।

নাঃ, ছেড়ে দিয়েছি অনেকদিন। তুমি খাও।

অ্যাই শঙ্কর, তোমাদের এখানে মহুয়া পাওয়া যায় না? পেলে একবার ট্রাই করতাম। —সিগারেটের প্রথম ধোঁয়াটা ছাড়তে ছাড়তে সুমন্ত্র বলে।

যাঃ, একদম মাথায় আসেনি। কিন্তু আজ তো আর ব্যবস্থা করা যাবে না।

ঠিক হ্যায়, কাল হবে। —সুমন্ত্রর গলায় যেন কেমন একটা ফুর্তির আভাস।

কাল! শব্দটা শুনতে যত ছোট, পিছনের ক্যানভাসটা ততটাই বড়। সারাটা জীবন মানুষ তো এই কাল শব্দটাকে নিয়েই বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। সেখানেই তো বেঁচে থাকার আসল মজা। শুধু অতীত আর বর্তমান নিয়েই থাকতে হলে শঙ্করই কি আর বেঁচে থাকত? ও—ও তো বেঁচে আছে স্রেফ সেই কাল শব্দটার ভরসায়। আর সেই কাল শব্দটা যখন আজ হয়ে উঠছে একটু একটু করে, আর কয়েক ঘণ্টা পরই স্রেফ গতকাল হয়ে যাবে, তখন কী করবে ও? বেঁচে থাকবে? কী নিয়ে থাকবে? আর তো কোনো কালের গল্প থাকবে না ওর জন্য। তাহলে?

শঙ্কর উঠে পড়ে। —চা বসিয়ে দিই।

দুপুরের রান্নাটা কি তুমিই করেছিলে? —সুমন্ত্রর সিগারেট প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

নাঃ, একটা মেয়ে আসে সকালে। ওই দুবেলার রান্নাটা করে দিয়ে যায়। বাকিটা আমিই সামলে নিই। বোসো, আমি আসছি,—বলে শঙ্কর ভিতরে ঢুকে যায়।

চা নিয়ে বারান্দায় এসে দেখে ততক্ষণে মিলিও চলে এসেছে। বাইরের অন্ধকারটা বেশ জাঁকিয়ে নেমে এসেছে। বারান্দার লাইটটা এখনো জ্বালানো হয়নি বলে একটা ভূতুড়ে পরিবেশ তৈরি হয়েছে। টেবিলের উপর চায়ের কাপগুলো রেখে শঙ্কর লাইটটা জ্বালিয়ে দেয়। একটা হাল্কা সাদা আলোয় হাতদশেক পর্যন্ত নজর করা যায়।

এখানে কি এরকমই লো—ভোল্টেজ থাকে নাকি? চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সুমন্ত্র বলে।

ওই আর কী। শঙ্কর দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ডাক দেয়—রেক্স...সঙ্গে সঙ্গে মিলি যে আবার জড়সড় হয়ে পড়ল, সেটা ওর চোখ এড়াল না। —ভয় নেই, এ এখন বাইরের মাঠে নিজের কাজ সেরে আসবে; তোমাদের ডিস্টার্ব করবে না।

লেজ নাচাতে নাচাতে রেক্স বাইরে বেরিয়ে গেল। মিলির হাতে চায়ের কাপটা সামান্য—সামান্য কাঁপছে। শঙ্করের হাসি পায়। এত ভয় কোথায় রাখবে ম্যাডাম যখন সবকিছু জেনে যাবে!

চা খাওয়া শেষ হতে না হতেই ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি এসে গেল। রেক্স এক দৌড়ে ঘরে ঢুকে গেল। হাওয়ার দাপটে বৃষ্টির জল উড়ে এসে গায়ে লাগছে। বেশ রোম্যান্টিক। কিন্তু অতিথিদের কেমন লাগছে সেটাও জানা দরকার।

তোমরা কি এখানেই বসবে? নাকি ভিতরে যাবে?

দারুণ লাগছে কিন্তু যাই বলো মিলি। —সুমন্ত্র আরেকটা সিগারেট ধরিয়েছে। —শঙ্কর, ইউ আর রিয়েলি লাকি যে এমন একটা জায়গায় আস্তানা বানাতে পেরেছ। বাই দা বাই, তুমি এখন করো কী?

কী করি! —শঙ্কর মুচকি হাসে।—চিত্রনাট্য লিখি।

গ্রেট। তোমার এই গুণটা তো জানা ছিল না। বুঝেছি। সেই জন্যই এমন একটা জায়গায় বাড়ি বানিয়েছ। ক'টা ফিল্ম হল তোমার চিত্রনাট্যের উপর?

এখনো একটাও না। তবে প্রথমটার কাজ শুরু হয়ে গেছে। জানতে পারবে।

হঠাৎই রাস্তাটার ওপাশের গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে যে ঠাসবুনোট অন্ধকার, তার মধ্যে থেকে একটা তীক্ষ্ন ক্যারক্যারে আওয়াজ জলপড়ার শব্দকে ছাপিয়ে নিজেকে জানান দিল। টিমটিমে আলোতেও শঙ্কর টেল পেল মিলি কেঁপে উঠল সেই আওয়াজে।

কীসের শব্দ?—বহুক্ষণ পরে আবার মিলির মুখের কথা শোনা গেল।

মনে হচ্ছে খটাস; সাপ ধরেছে বোধহয়।

এখানে সাপও আছে,—মিলি ঝটতি চেয়ারের উপর পা তুলে বসে।

হাঃ হাঃ ম্যাডাম, এমন সব পোকাও আছে যারা কামড় দিলে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মানুষ দু ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়। বর্ষা হলে তারা আবার দালানকোঠায় শেল্টার খুঁজতে আসে।

আমি ভিতরে যাব,—বলেই মিলি উঠে পড়ে। সেই মুহূর্তেই রেক্স আবার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। ওকে দেখেই মিলি আতঙ্কে প্রায় গায়ের উপরেই উঠে পড়ে আর কি। চারটে বছর পরে মিলির গায়ের গন্ধটা আবার যেন শঙ্করকে ঘিরে ফেলতে চলে এল। ও তো ভুলেই গিয়েছিল বলা চলে। স্ক্রিপ্টে কি এগুলোও লেখা ছিল?

নাঃ সুমন্ত্র, ভিতরেই চলো,—শঙ্কর চায়ের কাপগুলো তুলে ফেলে। —এমনিতেই মিলি ভয় পাচ্ছে। তাছাড়া ঢোকার সময় ডানহাতে কেয়াগাছের ঝোপটা দেখেছ তো; বৃষ্টি নামলে তেনাদের আবার ফুর্তি চাগাড় দিয়ে ওঠে। নাও চলো।

ভিতরে ঢুকতে গিয়েই ও টের পায় রেক্সকে না সরালে মিলি ভিতরে যাবে না। —রেক্স! —শঙ্কর বলতেই রেক্স আবার ওপাশের ঘরে চলে যায়। দরজাটা বন্ধ করে দেবার পর মিলিকে এবার যেন একটু আশ্বস্ত দেখায়।

ও হ্যাঁ, মিলি, সুমন্ত্র, আজ রাতের খাওয়ার কিন্তু বন্দোবস্ত করতে পারিনি। —শঙ্কর বেশ কেটেকেটে বলে।

ছাড়ো তো, একটা রাত না খেলে মানুষ কি মরে যায় নাকি! কী বলো মিলি?

আমি কিন্তু কাল সকালেই চলে যাব, মিলি খুব জোর দিয়ে বলে ওঠে।

সে ঠিক আছে মিলি,—শঙ্কর সামান্য হেসে বলে। —তোমরা একটু বোসো; আমি এক মিনিটের মধ্যে আসছি।

বৃষ্টিটা যে ভালোই চলবে বুঝতে শঙ্করের অসুবিধে হল না। ছাতা মাথায় বাড়িটার পিছন দিয়ে ঘুরে আসতেও বেশ ভালোই ভিজে গেছে।

কোথায় গেছিলে? সুমন্ত্র অবাক হয়ে গেছে যেন। —পুরো ভিজে গেছ তো।

বাইরের গেটে তালা মারতে।

ওই বাগানের গেটে? ওখানে তালা মেরে কি তুমি চোর ঠ্যাকাতে পারবে?

হাসালে সুমন্ত্র,—শঙ্কর মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলে,—চোরকে তো আমি ইনভাইট করে আনি। তালা মারলাম বারান্দায় যাবার এই দরজাটায়।

মানে! বাইরে থেকে বন্ধ করে বাড়তি সুবিধে কী হবে?—সুমন্ত্র যেন বুঝতে চাইছে বিষয়টা। —তাছাড়া কাল সকালে তোমার ওই রান্নার মেয়েটা যখন আসবে, তখন ও বুঝবে কী করে যে আমরা ভিতরে আছি?

ও আর আসবে না সুমন্ত্র, শঙ্কর যেন মজা করছে এমন ভঙ্গিতে বলল।

ছাড়িয়ে দিলে নাকি?

নাঃ, এখানে সব্বাই জানে কাল ফার্স্ট ট্রেনেই আমি কলকাতায় চলে যাচ্ছি। আর কেউ আসবে না।

তাহলে আমাদের ডেকে এনেছ কেন? —মিলি উঠে দাঁড়িয়েছে। —নেমন্তন্ন করে এনে তুমি নিজেই চলে যাবে মানে?

এত টেন্সড হোয়ো না মিলি, শঙ্কর খুব মৃদু স্বরে বলে।

এটা কি ফাজলামি হচ্ছে? —এতক্ষণে মিলিকে শঙ্করের খুব চেনা চেনা মনে হয়। এই ঝাঁজটাই মিলিকে আর সবার থেকে আলাদা করে দিত।

একদম না মিলি। যে নাটকটা চার বছর ধরে লিখে যাচ্ছি, আজ তার এক ও একমাত্র শো চলছে। আমি একদম সিরিয়াস।

শঙ্কর, পুরনো কথা টেনে নিজেকে আর কষ্ট দিচ্ছ কেন—সুমন্ত্র সোজা হয়ে বসেছে।—তোমার খারাপ লেগেছে; আমাদেরও যে খুব ভালো লেগেছিল, এমনটাও তো নয়। কিন্তু মানুষ তো পরিস্থিতির শিকার।

দারুণ বললে কিন্তু সুমন্ত্র। শঙ্কর হাততালি দিয়ে বলে উঠল। —বন্ধু হিসাবে বাড়িতে ঢুকেছিলে; বেরোলে চোর সেজে।

বাজে কথা বন্ধ করো, সোফার হাতলে বাড়ি মেরে মিলি বলে উঠল।—যা হয়েছে তার জন্য তুমিও দায়ী। আমাকে বোঝার আদৌ কোনো চেষ্টা করেছিলে কোনোদিন?

শঙ্কর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর বলে—যেদিন বুঝলাম আমি তোমার কাছে একটা বোঝা, সেদিনই তোমাকে বোঝার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছিলাম।

শঙ্কর, যাই হোক, তোমাকে আমি বন্ধু বলেই মনে করি,—সুমন্ত্র সোজা ওর দিকে তাকিয়ে বলছে। —তুমি না থাকলে আমি তো কোথায় হারিয়ে যেতাম। তোমার উপকার মনে আছে বলেই তো এতবছর বাদে তোমার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারলাম না। মিলি আসতে চায়নি। আমিই জোর করে রাজি করালাম।

উপকার! হাঃ হাঃ হাঃ। বিনিময়ে বড় সুন্দর একটা উপহার দিয়েছিলে বন্ধু, উপকারীর বউকে চুরি করে নিয়ে।

বাজে কথা বলবে না,—মিলি আবার ফুঁসে উঠেছে। —আমরা দুজনে স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছিলাম। এটাকে চুরি বলে না।

আর আমার সন্তান!—শঙ্কর যেন সাপের মতোই হিসহিস করে ওঠে। —সেটা চুরি নয়!

শঙ্কর, অ্যাবর্শনটা খুব জরুরি ছিল,—সুমন্ত্র লাফ দিয়ে ওঠে, —নাহলে মিলিই বাঁচত না।

রাইট। সেই সিদ্ধান্তটা যার নেবার কথা, সে কিন্তু জানতে পারল সবকিছু মিটে যাবার পরে। এমনকী সে যে বাবা হতে পারে, সেই সংবাদটাও।

সুমন্ত্র আর মিলি মাথা নিচু করে বসে আছে। শঙ্কর উঠে পড়ে। ভিতরের ঘরের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ ঘুরে বলে—একটু চা খাবে নাকি? আরে, চা খেলে এই গুমোটটা কেটে যাবে।

করো, —সুমন্ত্রর গলাটা কেমন নির্জীব শোনাল। রান্নাঘরে চা বানাতে বানাতেই সুমন্ত্র আর মিলির দুয়েকটা কথার টুকরো টুকরো অংশ কানে পৌঁছে যাচ্ছিল শঙ্করের। যতই তেজ দেখাক, মিলি খুব ভয় পেয়েছে। সুমন্ত্রই ওকে বোঝাচ্ছে। মিলি বুঝতে চাইছে না। মেয়েদের এই ক্ষমতাটা জন্মগত। হয়তো চারিদিকের হাঙর—কুমির সামলাতে সামলাতে ওরা এটা খুব দ্রুত অর্জন করে ফেলে।

তোমার এই বন্ধুটাকে কিন্তু আমার মোটে সুবিধার মনে হয় না। রাতে শঙ্করের বুকে মাথা রেখে মিলিই একদিন বলেছিল। —চোখ দেখলেই অস্বস্তি লাগে; কেমন যেন খিদে—খিদে ভাব।

আরে, রোজগারপাতি নেই; কবিমানুষ। খিদে তো থাকবেই।

এ খিদে সে খিদে নয় মশাই; এ হল অন্য খিদে।

একটা জোয়ান মানুষ, তায় কবি। একটু ছোকছোকানি তো থাকতেই পারে।

আর যদি তোমার বউকেই খেয়ে ফেলে? —মিলি এবার শঙ্করের উপরে উঠে মাথাটা সামান্য উঁচু করে ওর চোখের দিকে সোজা তাকিয়েছিল।

শঙ্কর মুখটা উঁচু করে মিলির ঠোঁটটাকে আলতো স্পর্শ করে বলেছিল— তালে বুঝব, ব্যাটাচ্ছেলের ক্ষমতা আছে।

চা নিয়ে ঘরে ঢুকে শঙ্কর দেখে ওরা দুজনেই মোবাইল নিয়ে টেপাটেপি করে যাচ্ছে।

ওখানে নেটওয়ার্ক থাকে না সুমন্ত্র। নাও চা খাও।

চা খাওয়া শেষ হতেই শঙ্কর নিজের চেয়ারটা ঘুরিয়ে ওদের মুখোমুখি বসে। —হ্যাঁ, তাহলে এবারে নাটকটা শেষ করা যাক।

প্লিজ, শঙ্কর, এবার এটা বন্ধ করো। আর ভালো লাগছে না। —সুমন্ত্র আবার সিগারেট ধরিয়েছে।

না না, আর বেশি দেরি হবে না। সুমন্ত্র, মিলি, তোমাদের কেন নেমন্তন্ন করে এনেছিলাম জানো? —শঙ্কর বেশ হাসি হাসি গলায় বলে।

কেন?

তোমাদের পাপের শাস্তি দেব বলে। দুটো জীবনকে খুন করার পাপ।

তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে শঙ্কর, —সুমন্ত্র সোফা থেকে উঠতে যায়।

ওখান থেকে উঠবার চেষ্টা কোরো না সুমন্ত্র। একটা ইঙ্গিত করলেই রেক্স কিন্তু গলার নলিটা ফাঁক করে দেবে। কিলার ডগ মানেটা বোঝো তো? —নিজের নামটা শুনেই বোধহয় রেক্সও ঘরের মধ্যে ঢোকে।—দরজার পাশে বোস। —শঙ্কর কথাটা বলতে রেক্সও থাবা পেতে বসে পড়ল।

সুমন্ত্র তুমি কী বলছিলে? মাথা খারাপ—শঙ্কর আবার হাহা করে এসে ওঠে। —মাথা খারাপ না হলে কেউ কি আর খুনের প্ল্যান কষতে পারে?

তুমি আমাদের খুন করবে শঙ্কর? —মিলি এবারে কেঁদে ফেলেছে।

স্যরি মিলি, দাঁড়িপাল্লাটা একদিকে বড্ড ঝুঁকে রয়েছে; ওটাকে একটু ব্যালেন্স করে দেব।

শঙ্কর,—সুমন্ত্রর গলা কাঁপছে, —তুমি কী চাও বলো! আ—আ—আমরা সবকিছু দিতে রেডি। আমাদের ছেড়ে দাও, প্লিজ।

শঙ্কর উঠে পড়ে। ঘুরে ওদের সোফার পিছনে গিয়ে বলে—যদি বলি মিলিকে ফেরত চাই?

মানে!—সুমন্ত্র যেন বিস্ময়ের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। —মিলিকে ফেরত চাও মানে? তোমার মাথাটা সত্যিই গেছে।

হতেই পারে সুমন্ত্র। —শঙ্কর যেন মজা পেয়েছে।—একটা লোকের বউ পালিয়ে গেল; বাচ্চাটাকে খুন করা হল। তার পাগল হবার মতো যথেষ্ট অ্যালিবাই কি থাকতে পারে না? কী বলো?

আমি কোথাও পালাইনি—মিলি এবারে রুখে উঠতে চাইছে—তোমাকে সব জানিয়েই সুমন্ত্রর সাথে চলে গিয়েছিলাম।

আমিও তো তোমাদের সব জানিয়ে দিচ্ছি; আরো জানিয়ে দেব।—শঙ্কর মিটিমিটি হাসছে, যেন বাচ্চচাদের দুষ্টুমি এনজয় করছে।

শঙ্কর, একটা ঘটনা ঘটে গেছে, —সুমন্ত্র বোঝানোর জন্য চেষ্টা করে—সেটা যে খুব ভেবেচিন্তে হয়েছে, এমনটাও তো নয়। হয়ে গেছে, এই পর্যন্তই। তার জন্য খুন করতে হবে!

ধরে নাও, সেটাও এমনি এমনিই হয়ে যাবে। —শঙ্কর হাতের তালুদুটো ঘষতে ঘষতে বলে—তাহলে তো আর বলার কিছু থাকল না; কী বলো সুমন্ত্র?

সুমন্ত্র আর মিলির মুখে আর কোনো কথা নেই। শঙ্কর ওদের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। এতক্ষণের নীরবতা বোধহয় রেক্সের পছন্দ হল না। তাই একবার মৃদু স্বরে একটা ঘেউ করে উঠল।

মিলিকে পেলে আমাদের ছেড়ে দেবে? —সুমন্ত্র যেন একটা সূত্র খোঁজার চেষ্টা করছে, এমনভাবে বলল।

মিলিয়ে ছাড়ব কী করে সুমন্ত্র! তোমাকে ছাড়তে পারি। —আরেকটু ঘুরে গিয়ে শঙ্কর মিলির মুখের দিকে তাকায়। চোখের কোলে জলের দাগটা এখনো শুকোয়নি। নাঃ, মেয়েটা সত্যি বড় মিষ্টি দেখতে। —তুমি কি কিছু বলবে মিলি? শঙ্কর খুব আদুরে গলায় বলে। শুনেই মিলি আবার কেঁদে ওঠে।

আর ইউ সিরিয়াস? সুমন্ত্র জিজ্ঞেস করে।

দেয়ারস নো ডাউট ফ্রেন্ড। মিলিকে চাইলেই যদি দিয়ে দিতে পারো, ইউ আর ফ্রি।

দেন, ইটস ডান। সুমন্ত্র সোফায় হেলান দিয়ে বসে পড়ে।

মিলি, তুমি কিছু বলবে না? শঙ্কর মিলির সামনে একটু ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে। তোমার ফেলে যাওয়া হাজব্যান্ডকে যদি আবার জড়িয়ে ধরতে পারো, তোমার নেক্সট হাজব্যান্ড বেঁচে যেতে পারে। কি পারবে তো?

মিলি কোনো সাড়া দেয় না। শঙ্কর হাঁটু গেড়ে ওর সামনে বসে। তারপর ওর হাতদুটো ধরে বলে—আর যদি তোমাকে ছেড়ে দিয়ে সুমন্ত্রকে রেক্সের সামনে ছেড়ে দিই? তুমি চলে যাবে তো?

মিলি থরথর করে কেঁপে ওঠে। —আ—হা—আমি একা কোথায় যাব? —মনে হল এতক্ষণ যেন বলবার মতো একটা যুক্তি খুঁজে পেয়েছে।

শঙ্কর, তুমি কি খেলা পেয়েছ? —সুমন্ত্র চিৎকার করে ওঠে। কথা ঘোরাচ্ছ কেন?

একা কোথায় যাবে মানে কী, মিলি? —সুমন্ত্রকে পাত্তা না দিয়েই শঙ্কর বলে—সুমন্ত্রকে সঙ্গে নিয়েই যাবে? সেটা তো হবে না। হয় তুমি, না হয় ও, এনি ওয়ান।

আমি একা কোথায় গিয়ে উঠব? আমার তো থাকার জায়গা নেই। মিলির গলাটা কেমন যেন ঝিমিয়ে গেছে।

ওহো, এটা তো মাথায় আসেনি। ওকে; তুমি আমার এখানেই থাকতে পারো। টিভি নেই, ফোন নেই; এটুকুই প্রবলেম।

মিলি মাথা নিচু করে ফোঁপাতে থাকে।

কি, থাকবে? —শঙ্কর খুব আলতো করে বলে।

আমাকে মেরো না শঙ্কর; যা করতে বলো করব। মিলি সোফার ব্যাকরেস্টে হেলান দিয়ে চোখদুটো বুজে কোনোরকমে বলে।

মিলি! —সুমন্ত্র আবার চিৎকার করে ওঠে—ট্রেচারাস হোর।

গালাগালি নয় সুমন্ত্র, —শঙ্কর উঠে পড়ে। —বিশেষ করে মিলির মতো মিষ্টি গালিগালাজ করাটা আমি মেনে নেব না। রেক্সেরও বোধহয় পছন্দ হচ্ছে না। কী রে রেক্স? ঠিক তো?

নিজের নামটা শুনেই রেক্সের জিভটা যেন একটু বেশিই বাইরে বেরিয়ে আসে। —দেখলে তো সুমন্ত্র! —শঙ্কর আবার নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে। তারপর মাথাটা দোলাতে দোলাতে বলে—প্রবলেম, প্রবলেম। চারটে বছর একসাথে থাকার পর আজ দুজনেই প্রাণে বাঁচার জন্য অন্যকে খুন হতে দিতে রাজি। তাহলে স্কোপটা কার পাওয়া উচিত? এবারে সত্যি সত্যিই নিজেকে পাগল—পাগল লাগছে।

সুমন্ত্র আর মিলি কেউই কোনো কথা বলে না। শঙ্কর যেন খুব ভাবছে এমন ভঙ্গিতে পায়চারি করতে শুরু করে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলে—আইডিয়া। টস করেই ডিসিশান নেওয়া যাবে। রাইট। সুমন্ত্র, তোমার কাছে কয়েন আছে? —সুমন্ত্র পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা কয়েন তুলে সামনে বাড়ায়।

হুম, তাহলে হেড কে নেবে? আর টেল? লেডিস ফার্স্ট। তাহলে মিলিই বলো।

এটা আনফেয়ার, —সুমন্ত্রর গলাটা কেমন যেন ধরে এসেছে। —আমার নাম উঠলে আমি খুন হব, মিলি তোমার কাছেই থেকে যাবে। আর মিলির নাম উঠলে তুমি আমাকে ছেড়ে দিয়ে মিলিকে তোমার কাছে রেখে

দেবে। ইন এনি কেস মিলির কোনো রিস্ক নেই। তাহলে মিলিকেই রেখে দাও; আমি ভোর হলেই চলে যাব।

শঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর এগিয়ে আসে সুমন্ত্রর সামনে। তারপর বলে —আর আমার সেই মেরে ফেলা সন্তানটাকে যদি ফেরত চাই? সুমন্ত্র! মিলি! দেবে? দেবে আমার হাতে তুলে? তাহলে কিন্তু তোমাদের দুজনকেই ছেড়ে দিতে পারি।

শঙ্কর, প্লিজ, পাগলামো কোরো না, সুমন্ত্রর গলাটা কেমন যেন অসহায়ের মতো শোনায়।

সিদ্ধান্তটা নেবার সময় নিশ্চিত পাগলামি ছিল সুমন্ত্র; কিন্তু এখন আমি একদম সুস্থ। নাটকের শেষ কার্টেন ফেলা পর্যন্ত আমাকে সুস্থই থাকতে হবে। শোনো তোমাদের দুজনকেই আমি আজ খুন করব।

শঙ্কর, তুমিও কি বাঁচবে ভেবেছ? সবাই জানে আমরা তোমার কাছে আসছি। এখানেও লোকজন আমাদের দেখেছে। দুদিন। তিনদিন। তারপরেই খোঁজখবর শুরু হয়ে যাবে। তখন?

সেটা আমার ডিসিশন, শঙ্কর খুব ঠান্ডা গলায় বলে। —খুন তোমরা দুজনেই হচ্ছ। এই রিভলভারটা দেখেছ? —পকেট থেকে বের করার পর রিভলভারটা আলোতে ঝকঝক করছে। দেখেই মিলি আবার কাঁদতে শুরু করেছে। সুমন্ত্র গুম মেরে গেছে।

নাঃ, এতটা বাড়াবাড়ি করা ঠিক হচ্ছে না, —শঙ্কর আবার চেয়ারে বসে পড়ে। —আফটার অল, তোমরা আমার গেস্ট। ওকে, তোমরাই ঠিক করে নাও কীভাবে খুন হবে।

শঙ্কর, প্লিজ, মেরেই যদি ফেলতে চাও, একেবারে মেরে ফেলো। এই টর্চার আর সহ্য হচ্ছে না। —সুমন্ত্রর গলা ভেঙে গেছে। এতটাই ঠান্ডা পড়ে গেল নাকি!

তুমি মহুয়ার কথা বলছিলে না? —শঙ্কর রিভলভারটা আবার পকেটে ভরতে ভরতে বলে—খানিকটা ব্যবস্থা করা যাবে। আমার কাছে কুঁচিলার বিষ আছে; সাঁওতালরা খুব ব্যবহার করে। মহুয়ার সাথে মিশিয়ে দেব। নেশায় যন্ত্রণাটা টের পাবে না। মুখ দিয়ে যে গ্যাঁজলাটা উঠবে সেটা যে কীসের জন্য ভাবতে ভাবতেই তোমরা চলে যাবে।

চুপ করো প্লিজ, মিলি বলে উঠল।

ওকে, এটা বাদ। এই সুমন্ত্র, তোমরা কি যাবার আগে একবার দুটো শরীর মিলিয়ে দেখবে নাকি? মরে গেলে আর তো চান্স নেই। তাহলে ওঘরে চলে যাও। বাথরুমে একটা বাথটব তো দেখেইছ। ওটাতে দুজনেই ঢুকে পড়ো। তোমাদের খেলা যখন জমে উঠবে ঠিক তখন আমি ইমারশন হিটারটা ভেঙে টবের জলে ছুড়ে দেব। কারেন্টের ঝটকায় তোমাদের উত্তেজনাটাও বেড়ে যাবে। যতক্ষণ টানতে পারবে চলবে।

তুমি উন্মাদ হয়ে গেছ। সুমন্ত্রর চোখদুটো যেন বাইরে বেরিয়ে আসছে।

যাঃ, এমন একটা রোমান্টিক মৃত্যুও তোমাদের পছন্দ না! তুমি তো আবার নাকি কবি। যাকগে, আরেকটা অপশন দিচ্ছি। এভাবেই। তবে বাথটবের বদলে বিছানায়। শেষ হলেই আমিও একটা গুলিতেই তোমাদের শেষ করে দেব।

বন্ধ করো, তীব্র চিৎকারে মিলি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

কী আশ্চর্য! একটা পছন্দসই মৃত্যুও তোমরা বেছে নিতে পারো না। আমি কিন্তু পারি, জানো। ঠিক আছে। দা লাস্ট ওয়ান। আমি তোমাদের দুজনকেই এক্ষুনি বাইরে বের করে দিচ্ছি। রাত ধরো এখন আটটা হবে। বৃষ্টি হচ্ছে ঠিকই। তবে কপালে থাকলে কোনো গ্রামে গিয়েও উঠতে পারো। মানে যদি সাপ—হায়না বা অন্য কিছুর পাল্লায় না পড়ো।

ওকে, আমরা এটাতে রাজি। —সুমন্ত্র উঠে দাঁড়িয়েছে।

আগে শোনো হে, এত জলদিবাজি করলে তো ভুল হয়ে যাবে। তোমাদের হাত আমি পিছন করে বেঁধে দেব। আর চোখও থাকবে বাঁধা।

এত অত্যাচার আমি আর সহ্য করতে পারছি না। —মিলি উঠে ওর দিকে এগোতে যায়। —আমাকে গুলি করে দাও।

উঁহু, এগিয়ো না। রেক্সের আবার এসব হজম হয় না।

রেক্স এতক্ষণ জুলজুল করে সবাইকে দেখছিল। নামটা কানে যেতেই সামান্য গড়গড় করে ওঠে। মিলি আবার সোফায় বসে পড়ে।

ওকে, তাহলে গুলিটাই ফাইনাল। ও, হ্যাঁ সুমন্ত্র, টেবিলে একটা কাগজ আছে, দেখতে পাচ্ছ তো? একটু জোরে জোরে পড়বে? যেন আমরা সবাই শুনতে পারি। আর শোনো, মনে করবে তুমি স্রেফ একজন নিউজরিডার; কোনো আবেগটাবেগ দেখাতে যেও না। নাও।

সুমন্ত্র কাঁপাকাঁপা হাতে কাগজটা তুলে নেয়। চোখ বোলাতে শুরু করে।

স্টার্ট প্লিজ।

তোমরা দুজন চারটে বছর ধরে আমাকে যে নরকযন্ত্রণা দিয়েছ, একটা গুলিতে তার শোধ হবে না। তাই তোমাদের আমি এক মৃত্যু দেব যার অভিজ্ঞতা তোমাদের আগে আর কারো হয়নি। রেক্স পাহারায় থাকবে। তোমরা সোফা থেকে ওঠবার চেষ্টা করলেই ও ঠিক আটকে দেবে। অবশ্য উঠেও লাভ নেই। পাগলাবাবুর কুঠির দিকে এমনিতেও কেউ আসে না। তারপর বাইরের দরজায় তালা। কেউ উঁকিও মারবে না। তোমরা ওই সোফাতেই এইভাবে বসে থাকবে দিনের পর দিন। স্যরি, খাবার বা জলের ব্যবস্থা থাকছে না। রেক্সের জন্য খানিকটা থাকছে। কিলার ডগ তো! দিনতিনেক পর থেকেই ঘরে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে; পোকারা বাসা বেঁধেছে পচাগলা একটা লাশের উপর। তোমাদের মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে; কিন্তু মরতে পারছ না। বসে বসে সেই যন্ত্রণা তোমরা ভোগ করবে।

সুমন্ত্রর হাত থরথর করে কাঁপছে। মিলিও সোজা হয়ে উঠেছে। চোখদুটো যেন ঠিকরে আসছে। সুমন্ত্র অদ্ভুত এক ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলে উঠল—আর তুমি! তোমার কী হবে?

শঙ্কর রিভলভারটা পকেট থেকে বের করতে করতে বলল—রেক্স, এদিকে আয় বাপ। রেক্স উঠে ওর সামনে গেল। শঙ্কর ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে উল্টোদিকে আঙুল তুলে দেখাল। রেক্স সোফার দিকে মুখ করে একটু এগিয়ে গেল। তারপর আবার আগের মতোই সুমন্ত্র আর মিলির দিকে তাকিয়ে মেঝেতে বসে পড়ল।

আমি! —শঙ্কর একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর কেমন একটা গাঢ় গলায় বলে উঠল—ওই যে...লাশটার ব্যবস্থা করে যাব। —বলতে না বলতেই কানফাটানো একটা আওয়াজ আর আলোর ঝলকানি।

সুমন্ত্র আর মিলি চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল। চোখ খুলতেই দেখল, চেয়ারে মাথাটা হেলিয়ে শঙ্কর পড়ে আছে। ডানদিকের রগ থেকে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। চোখদুটো খোলা। বিস্ফারিত ঠোঁটে যেন একটা বিদ্রূপের হাসি ঝুলছে। রেক্স একবার মুখ ঘুরিয়ে শঙ্করের দেহটা দেখেই ওদের দিকে ফিরে তাকিয়ে মৃদু একটা গড়গড় আওয়াজ করতে থাকে।

সুমন্ত্র আর মিলি সোফায় বসে শঙ্করের লেখা চিত্রনাট্য অনুযায়ী অপেক্ষা করতে শুরু করে।

ব্ল্যাক উইডো

দেবার্চন বসু



এখন আমি মধ্যরাতে এই পার্কে এসে বসি। কখনও ঘুরে বেড়াই পার্কের এখানে—সেখানে। অথচ একটা সময় ছিল যখন আমি আমার কোয়ার্টারে বিছানায় শুয়ে ঘুমোতাম আর স্বপ্ন দেখতাম। প্রতি মাসের তেরো তারিখেই স্বপ্নটা দেখতাম। দেখতাম এক নারীকে, যদিও তার মুখ দেখতে পেতাম না।

সেই নারীর হাতে থাকত একটা লম্বা ছুরি। ধারালো এবং তীক্ষ্ন। সে তাই দিয়ে আমার হৃৎপিণ্ডের একটা অংশ কেটে নিচ্ছে। তারপর মুখে পুরে নিচ্ছে হৃৎপিণ্ডের সেই টুকরোটা। টসটস করে রক্ত গড়িয়ে পড়ত তার ঠোঁট থেকে। আর সে যখন চিবোতে থাকত আমার হৃৎপিণ্ডের অংশটিকে, আমার মনে হত আমার বুকে ভীষণ ব্যথা—আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না। কোনও এক নাম—না—জানা পাখির অস্পষ্ট ডাকে প্রতিবার আমার ঘুম ভেঙে যেত। খাটের পাশে মাথার কাছে একটা টেবিল। তার উপর একটি ডিজিটাল ক্লক। তা জানান দিত—সময় ভোর সাড়ে চারটে—শনিবার—১৩ ফেব্রুয়ারি —২০১৩ সাল।

কবে থেকে আমার এই স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছিল?

যেদিন তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল...।

আমি তখন ঝাড়গ্রামে একটা কলেজে অ্যানথ্রপোলজি পড়াতাম। তুমিও সেগুনী একই কলেজে পড়াতে। একই বিষয়। আমাদের দেখা হয়েছিল কলেজ লাইব্রেরিতে। মনে আছে সেগুনী?

প্রথমবারেই তোমাকে দেখে মনে হল, তুমি আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা। তোমার শরীরে কালিদাসীয় স্পেসিফিকেশানস। গুরু বক্ষ। গুরু নিতম্ব। ক্ষীণ কটি। আর অদ্ভুত সুন্দর তোমার দুটি চোখ। চোখের মণি সবুজাভ।

সুতরাং আমি প্রেমে পড়লাম।

একটা বই—এর মধ্যে মুখ গুঁজে ছিলে তুমি। হঠাৎই মুখ তুলে আমার দিকে তাকালে। হাসলে। বললে, 'তুমি আমায় ভালবাসতে চাও? আমার রূপমুগ্ধ তুমি?'

আমার মনের মধ্যে তখন অতলসাগর। আমি তলিয়ে যাচ্ছিলাম ক্রমশ। তবু আমার মনের মধ্যে অযাচিত এক আততিবিততি—আমি কি তাহলে স্কিজোফ্রেনিক হয়ে যাচ্ছি?

পরে আর একটা প্রশ্ন যোগ হল মনের মধ্যে।

প্রেমে কি শুধু আমি পড়েছিলাম সেদিন? তুমি পড়োনি?

পড়েছিলে। না—হলে এত সহজে শরীর দিয়েছিলে কীভাবে?

শাল—সেগুনের বাগানের মধ্যে আমার কোয়ার্টার। সেখানেই দেখা হত আমাদের। মিলিত হতাম বারংবার। কোয়ার্টারটা ছিল তোমার খুব প্রিয়। তুমি বলতে, এ তোমার গোপন স্বর্গ।

আমি ছিলাম খুব অগোছালো। কোনও কিছুই ঠিকঠাক জায়গায় রাখতে পারতাম না। ঘরে ঢুকেই একটা টেবিল। তার ওপর একটা কম্পিউটার মনিটর। তারপর দেওয়াল ঘেঁষে কাঠের একটা নিচু ডিভান— তার ওপর ধূসর রঙের জমিতে বড় বড় সোনালি ফুলের বেডকভার। ঘরের মেঝেতে এদিকে—ওদিকে বই আর নানান ম্যাগাজিন ছড়ানো। দেওয়ালে আদিবাসী পুরুষ ও মহিলার মুখোশ।

ওই ঘরে দুটো জানলা। সেখানে হলুদ—রঙা পরদা।

আমি আর তুমি যতবার পরস্পরকে পরস্পরের শরীরে নিয়েছিলাম, সবদিনই সেটা ঘটেছে কোয়ার্টারের ওই বেডরুমে। কোয়ার্টারটা যেন নির্জন এক দ্বীপ। গোটা ঝাড়গ্রাম শহর খুঁজেও এরকম নিরিবিলি বাসস্থান হয়তো আর পাওয়া যাবে না, বা হয়তো যাবে, কিন্তু তাতে আমার বা তোমার কোনও ইন্টারেস্ট ছিল না। আমরা নিজেদেরটা নিয়েই খুশি।

সেই দিনটার কথা তোমার মনে আছে সেগুনী—এক বৃষ্টিস্নাত ছুটির দিনের দুপুর! তখন দিগন্তে বিষণ্ণতা। ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল তোমাকে দিয়েই। সচরাচর তুমিই তো অগ্রবর্তিনী হয়ে আমার নিরাবরণ শরীরটাকে অধিকার করতে। আসলে তোমার অন্য একটা উদ্দেশ্যও থাকত।

তখন সে—রস বুঝিনি; কিন্তু আজ বুঝি। আমি তখন শখ করে 'জান্নাতুল ফিরদৌস নাইন্টিসিক্স' আতর মাখা শুরু করেছি— আমার রোমশ বুকের জঙ্গলে তুমি খুঁজে বেড়াতে সেই সুগন্ধ। কী, তাই না?

সুতরাং তোমার সামনে আমার আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোনও উপায় থাকত না। পূর্ণমাত্রায় সাড়া দিতে আমার সময় লাগে। অথবা এমনটাও হতে পারে যে আমি হয়তো তোমাকে 'অ্যাকটিভ' দেখতে চাইতাম আর, নিজেকে 'প্যাসিভ'। কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল—আজও জানি না। কিন্তু চরম মুহূর্তে আমি যে ক্রমশই লক্ষ্যভেদী, তা তুমি অস্বীকার করতে পারবে না। মনে পড়ে, সম্পূর্ণ তৃপ্ত ও শান্ত হওয়ার পর ফুল ফুল বেডকভার গায়ে জড়িয়ে শুয়ে থাকতাম আমরা? যেন নিস্তেজ সাপ!

মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে আমি জিজ্ঞেস করতাম—অ্যাই, ঘুমোলে নাকি? আর প্রতিবারই তা শুনে তোমার খিল খিল করে হেসে ওঠা...।

আচ্ছা, তোমার এ—সব কথা মনে পড়ে না? বড় নিষ্ঠুর তুমি!

তুমি যেদিন বাছুরডোবায় তোমার বাবা'র সঙ্গে আমাকে দেখা করাতে নিয়ে যাবে বললে, বড় অস্বস্তিতে পড়েছিলাম। কারণ, তোমার পরিবার সম্পর্কে তখনও পর্যন্ত আমি খুব কমই। জানতাম শুধু জানতাম, তোমাদের হর্টিকালচারের ব্যবসা আছে। অথচ আমার মুখ দিয়ে কলকাতায় আমার পরিবার সম্পর্কে কত কিছু জেনে নিয়েছিলে। সে—সব কথা তুমি জানো, তবু বলি, কেন না বললে বুকটা হালকা হয়।

আমি মামার বাড়িতে থেকে মানুষ হয়েছি। মা অনেক কষ্টে করে বড় করেছিলেন আমাকে। এর জন্য দায়ী অংশত আমার বাবা, বাকিটা তাঁর পারিবারিক কালচার। উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়ির ছেলে ছিলেন তিনি। অয়েল সেক্টরে বড় চাকরি করতেন। অফিসে দাপট থাকলেও বাড়িতে নিজের মায়ের কাছে একদম কেঁচো। ঠাকুমা ছিলেন দাপুটে এবং ষোলো আনা সেকেলে। আধুনিকতার কোনও হাওয়া ওই বাড়িতে বইত কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অন্যদিকে আমার মা দক্ষিণ কলকাতার নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি থেকে উঠে এসেছিলেন। বাড়িতে গান—বাজনা, ছবি আঁকাআঁকি ইত্যাদির রেওয়াজ ছিল। আমার মা বিয়ের আগে আর্ট কলেজ থেকে ফাইন আর্টস—এ গ্র্যাজুয়েশান করেছিলেন।

আমার বাবা খুব সুপুরুষ ছিলেন। তার ওপর ওইরকম চাকরি। বিয়ের আগে কোথায় ওঁদের আলাপ হয়েছিল জানি না, কিন্তু পরে মায়ের মুখেই শুনেছি বাবার ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে বিন্দুমাত্র খোঁজখবর না করে তিনি বিয়ে করতে রাজি হয়ে যান।

বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে এসে উঠলেন। ঠাকুমার সঙ্গে প্রথম মনোমালিন্য গয়না পরা নিয়ে। প্রথম কথা, মা খুব বেশি গয়না বাপের বাড়ি থেকে আনতে পারেননি। দ্বিতীয়ত, তিনি গয়না পরা খুব একটা পছন্দ

করতেন না। কিন্তু ঠাকুমার সেই এক কথা, বাড়িতে আরও তিনটে বউ আছে (আমার বাবা ছিলেন বাড়ির ছোট ছেলে। তাঁর উপরে তিন ভাই), তারা যখন পরে, তুমি পরবে না কেন? আর তুমি এমন মুখে মুখে তর্কই বা করছ কেন? আমি তোমাকে গয়না পরে থাকতে বলেছি, তুমি পরবে—ব্যস মিটে গেল ঝামেলা।

কিন্তু মা বাড়ির নতুন বউ হওয়া সত্ত্বেও ঠাকুমার কথায় কর্ণপাত করেননি। এই ইগনোর করার ব্যাপারটা ঠাকুমা সহজে ভোলেননি। রাগ পুষে রেখেছিলেন। তাই দ্বিতীয় মনোমালিন্য বা অশান্তি হতে বেশি দেরি হল না।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল এইভাবে—আমার মা যে একজন পেইন্টার তা ঠাকুমা শুনেছিলেন অনেক পরে। যখন শুনলেন, ডেকে পাঠালেন মা—কে। নিজের শোওয়ার ঘরের একটা ফাঁকা দেওয়াল দেখিয়ে বললেন, একটা বড় ছবি এঁকে দিতে হবে। মা কালীর ছবি। ছবিতে বিগ্রহের পায়ের দু—ধারে বসে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা সারদা। মায়ের কাছে একটা চার ফুট বাই তিন ফুট ক্যানভাসে এই ছবি এঁকে দেওয়া কোনও কঠিন কাজ ছিল না। এঁকেও ছিলেন তিনি। ঠাকুমা খুব খুশি হয়েছিলেন। সুতরাং বাড়ির অন্য তিন বউমা অ—খুশি। তাঁরা ঈর্ষার চোখে তাকাতেন মায়ের দিকে।

কিন্তু মা এইসব ঠাকুর—দেবতার ছবি আঁকা পছন্দ করতেন না। তাঁর আগ্রহ ছিল অন্য রকমের কাজে। তিনি নিজস্ব একটা পেইন্টিং স্টাইল খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন—ভারতীয় অঙ্কনশৈলীর সঙ্গে আধুনিক ইউরোপিয়ান শৈলী মিশিয়ে।

একদিন কী একটা কাজে বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিলেন। দুপুর নাগাদ কাজ মিটিয়ে বাড়ির দিকে ফিরছেন, দেখলেন, ফুটপাথের একদল ছেলে—মেয়ে রাস্তার ওপর ছুটোছুটি করে খেলছে। খাতা—পেনসিল সঙ্গেই ছিল, ব্যস, মা ফুটপাথেই বসে পড়লেন স্কেচ করতে। আমার মেজোজ্যাঠা ধারেকাছেই ছিলেন। পড়বি তো পড়, এ দৃশ্য তাঁর নজরে পড়ে গেল।

বাড়িতে সেদিন তুমুল হল্লা। অশান্তি। সন্ধেবেলা ঠাকুমা ডেকে পাঠালেন মা—কে। রুক্ষস্বরে বললেন, 'তুমি ফুটপাথে বসে কী করছিলে?'

মা সিন্থেটিক গলায় উত্তর দিলেন, 'আঁকছিলাম।'

'তোমার লজ্জা করে না, মিত্রবাড়ির বউ হয়ে ফুটপাথে বসতে? সত্যি সত্যি বলোতো, তুমি সুস্থ না অসুস্থ?'

'আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। আর মিত্রবাড়ির বউ হওয়া সত্ত্বেও আমার আর একটা পরিচয় আছে জানবেন। সেই পরিচয় আমি পরিবার থেকে পাইনি। নিজের ক্ষমতায় অর্জন করেছি। আমি আর্ট কলেজের গ্র্যাজুয়েট। একজন পেইন্টার।'

'শোনো মেয়ে, বাড়িতে বসে ঠাকুর—দেবতার ছবি আঁকলে আঁকো। না হলে এ বাড়িতে তোমার কোনও জায়গা নেই। বুঝলে?'

মা এরপর মাস দুই—তিন শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন। তাঁর ওপর এই মানসিক অত্যাচার সত্ত্বেও তাঁর স্বামী, মানে, আমার বাবা, মেনিমুখো নিরুত্তর ছিলেন—এ উনি মেনে নিতে পারেননি। ততদিনে উনি আমাকে কনসিভ করেছেন। ইজেল, ক্যানভাস, রং—তুলি আর আমাকে গর্ভে নিয়ে চলে এলেন নিজের বাপের বাড়িতে। আর ফিরে যাননি। আশ্চর্য, বাবা নাকি এরপর কোনওদিন আসেননি আমাদের দেখতে। এমনটাও হয়?

যাই হোক, উত্তর কলকাতার এঁদোগলির মিত্রবাড়ির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঘুচে যায় এরপর থেকে...।

জীবন চড়াই আর উতরাই—এর যোগফল। কী একটা কথা সেগুনী বলতে গিয়ে মায়ের কথা বলে ফেললাম। পৃথিবীর সমস্ত মা উতরাই—এর কথা বলে। আজ যখন পুরোনো কথা ভাবি, মনে হয় মায়ের কথা মানে, উতরাই—এর কথা। আ স্টোরি অফ ইউনিভার্সাল মাদারহুড। আসলে এত কথা বুকের মধ্যে জমে ছিল! জানবে, উতরাই মানে গা ছমছমে রাত অথবা, গভীর সন্ধে।

সেগুনী, তোমাকে বুক খালি করে এ—সব কথা বলছি কেন কে জানে! তাহলে আমি কি তোমার সমীপে নিঃস্ব হতে চাই? যাক সে যাক, এখন অন্য কথা বলি সেগুনী?

তুমি যে দুপুরে নিস্তব্ধ কলেজ লাইব্রেরিতে আমাকে প্রোপোজাল দিলে বাছুরডোবায় তোমার বাড়িতে নিয়ে যাবে বলে, সে রাতে আমি এক স্বপ্ন দেখেছিলাম। দুর্বোধ এবং ভয়ঙ্কর এক স্বপ্ন। এই স্বপ্ন দেখার কথা তোমাকে কোনওদিন বলিনি। আজ বলব।

তবে, তার আগে অন্য কথা। এক জীবন জিজ্ঞাসা। তাই প্রশ্ন, প্রশ্নের পর প্রশ্ন। আচ্ছা, মায়ের কথা বলতে গিয়ে উতরাইয়ের কথা এল কীভাবে? তাহলে কি উতরাই মানে সমস্ত সংযোগ—ছিন্ন—জীবনের কথা? কিছু হারানোর কথা? কিন্তু মন তো হারানোকে হারাতে চায় না। 'নেই' কথাটা মেনে নিতে পারে না। শুধু বিশ্বাস—অবিশ্বাসের দোলনায় দুলতে থাকে। এরই মধ্যে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা শুধু স্বপ্নে ঘটে। কল্পনায় ঘটে। অবিশ্বাস্যভাবে সে—সব ঘটনা ঘটে যায় একের পর এক। তাদের অস্বীকার করা দায়।

কী দেখেছিলাম সেই স্বপ্নে? শুনবে? শোনো তাহলে—

আকাশের নিকষ কালো অন্ধকার তখন লুটিয়ে পড়েছে ডাঙ্গাল জমির বুকে। আর সেই অন্ধকারে যেন চলছে তাণ্ডব নৃত্য। হিংস্র পশুদের উন্মত্ত উল্লাস। সেই হানাহানির যন্ত্রণা কী বীভৎস!

অথচ আমার মনে পড়ছিল, একটু আগেই আমি বিছানায় চিত হয়ে শুয়েছিলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ এভাবে শুয়ে থাকতে পারলাম না। চারপাশের গভীর আঁধার থেকে তখন দুটো কালো হাত এগিয়ে আসছে আমার দিকে। রক্তজবার আভা সেখানে স্পষ্ট, তীব্র এবং স্থায়ী। ভয়ঙ্কর পশুদের আর দেখা যাচ্ছে না। সহসা তারা বাতাসে মিলিয়ে গেছে। পশুকুল যেন শান্ত হয়েছে এবার।

কিন্তু তারপরেও চতুর্দিকে মহানিশার গাঢ় নিশুতি। কেউ কোথাও জেগে নেই। স্বর্গের পরিরাও যেন ঘুমিয়ে পড়েছে পাশ ফিরে। আর ঠিক তখনই তিনদিক থেকে তিনটি আলোর রশ্মিরেখা ফুটে উঠল অন্ধকারে। তলস্থ জমিতে সর্বস্ব গোপন করে রাখা সুন্দর আলো। এক—একটি আলোর শরীরে পরিপূর্ণ রূপ পেল এক—একটি মানুষের অবয়ব। তিনটি মানুষ। তারা হাসছে।

মধ্যিখানের মানুষটি বলছে—মনের অন্ধকার প্রবৃত্তির ছায়ায় ঢাকা। সেখানে দিনে রাতে পশুজগতের উৎপাত। বাইরের হিংস্র পশু ভিতরেই তো বাসা বেঁধে রয়েছে। নিধনযজ্ঞে বাইরের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব কিন্তু ভিতরের পশু থেকে উদ্ধার পাওয়া প্রায় অসম্ভব! তখন প্রয়োজন কনট্রোলড পাওয়ার...।

ডানপাশের আলোর মানুষটি কিছু বলছিল, কিন্তু তা ভালোভাবে কানে এল না— তাই বোধগম্য হল না।

এরপরই কয়েক পা আমি হাঁটলাম জঙ্গুলে ঝোপ সরিয়ে সরিয়ে। আমি বুঝতে পারছিলাম, আমাকে চড়াই পথ ভাঙতে হচ্ছে—এইরকম বড়ই অসম্ভব অন্ধকার আমি আগে কখনও দেখিনি। এটা কি আমারই কোয়ার্টার? তাহলে কি আমি যখন অতল নিদ্রায় দ্রবীভূত হয়েছিলাম তখন কারেন্ট চলে গিয়েছিল? আজকাল তো এ—সব এলাকায় সেভাবে কারেন্ট যায় না! তাহলে?

কোথা থেকে একটা মৃদু আওয়াজ আসছে না? নাকি কেউ মৃদু স্বরে মন্ত্র পড়ছে!

সর্বে চ পশবঃ সন্তি তলবদ ভূতলে নরাঃ।

তেষাং জ্ঞান—প্রকাশায়ঃ বীরভাবঃ প্রকাশিতঃ।

সামনেই শ্মশান। সেখানে চিতা জ্বালানো হয়েছে। লকলকে আগুনের শিখা আকাশ ছুঁই—ছুঁই করছে। ধোঁয়া পাক খেতে খেতে উপরে উঠছে, তারপর ভেঙে খান খান হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে আশেপাশে সর্বত্র। শিমুল অশ্বত্থের মাঝখানে অনেকটা ফাঁক, সেখান থেকে চিতার আগুন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আগুনের সে কী ভয়ানক দাপাদাপি! একটা মানুষকেও দেখা যাচ্ছে। তিনি লালচেলি পরে উত্তরমুখো হয়ে মন্ত্র পড়ছেন। কী যেন একটা পৈশাচিক কাণ্ড ঘটতে চলেছে...।

কীসের একটা শব্দে ঘুমটা পাতলা হয়ে এল, আর স্বপ্নটা ভেঙে যেতে ধড়মড়িয়ে বিছানার ওপর উঠে বসলাম আমি। সারা শরীর ঘামছিল। দ্রুত পায়ে বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে গিয়ে বেসিন খুলে চোখে—

মুখে ঠান্ডা জলের ঝাপটা দিতে শরীর শান্ত হল যেন। মন হল স্থির।

বুঝলাম, এখন আর চট করে ঘুম আসবে না। তবু ঘরের আলো জ্বাললাম না আমি। খাটের মাথার কাছে টেবিলে সিগারেট আর দেশলাই রাখা ছিল। অন্ধকার হাতড়ে সেগুলো হাতে নিলাম। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম খোলা জানলার সামনে। গরমের রাত। আকাশে কুসুমরঙা চাঁদ। চারপাশ অসম্ভব রকমের গুমোট। তবু একটা ফুলের বুনো গন্ধ উড়ে এসে উতলা করছে রাতের মৃদু বাতাসকে। দূরে, অনেক দূরে, একটা নাম—না—জানা পাখি অবিরত করে চলেছে টকটক শব্দ।

এই ছিল স্বপ্ন ও তার পরবর্তী অংশ। আশ্চর্য! সেদিনও ছিল ১৩ তারিখ—১৩ মে—২০১৩...

বাছুরডোবায় তোমাদের বাড়িতে প্রথম যাওয়ার দিন এক অদ্ভুত প্রশ্ন করেছিলে তুমি। তারপর শুনিয়েছিলে অদ্ভুত এক গল্প—

কেন? কেন শুনিয়েছিলে?

তুমি বলোনি কোনওদিন আমাকে।

প্রশ্নটা করার আগে এক অবাক করা আলো খেলে বেড়াচ্ছিল তোমার চোখের সবুজাভ মণিতে।

আমার কানের কাছে মুখ এনে অস্ফুটে জিজ্ঞেস করলে— 'তাহলে তাড়াতাড়ি বলো, আমি, না আমার ভালবাসা?'

'মানে?'

'মানে আমি, না আমার প্রেম, কাকে ছাড়া তুমি বাঁচবে না?'

'কেন দুটোই একসঙ্গে পাওয়া যায় না?'

তুমি উত্তর দাওনি। দাওনি, আমার প্রশ্নের উত্তর তুমি সেদিন দাওনি!

বাছুরডোবার পথে গাড়িটা নিজেই ড্রাইভ করছিলাম। তুমি বসেছিলে পাশে। প্রথমে সামান্য অন্তরঙ্গ হলে, তারপর শুরু করলে তোমার সেই গল্প...

কিস্কুরা সাঁওতাল জাতির মধ্যে রাজবংশ। মান্ডিরা জমিদার বংশ। মান্ডিজাতির এক যুবকের চেহারা ভালো ছিল না। কিন্তু তার চুলগুলি ছিল খুবই লম্বা এবং চিক্কন কৃষ্ণ বর্ণ। এই যুবকের মাথার একটি চুল হঠাৎ করে খসে পড়ল। তাতে সমস্যার পর সমস্যা। যুবকটি ভাবল, সে যদি তার এতবড় চুলটি ডাঙায় রেখে দেয় তবে এই চুলে জড়িয়ে অনেক পাখপাখালির প্রাণহানি হবে। আবার, যদি সে এই চুলটি জলে ফেলে দেয় তবে এতে জড়িয়ে বহু মাছের প্রাণনাশ হবে।

অকারণে বহু প্রাণী হত্যার পাপ এড়ানোর জন্য যুবকটি চুলটিকে একটি শালপাতার মধ্যে মুড়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিল।

নদী ক্রমশ বয়ে চলে নিম্নদিকে। কিস্কু পরিবারের এক রাজকুমারী সেই নিম্নগামী বহতায় স্নান করতে গেল। দেখতে পেল শালপাতার সেই পুঁটলিকে। তখন সে তার সইকে পুঁটলিটা তুলতে বলল। পুঁটলি খুলে রাজকুমারী দেখল একটি চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ বারো হাত লম্বা চুল। এত বড় আর এত সুন্দর চুল দেখে রাজকুমারী বলল, সই, এই চুল যদি কোনও মেয়ের হয় তবে আমি তার সাথে সই পাতাব, আর, যদি কোনও ছেলের হয় তবে তাকে আমি বিয়ে করব।

ঘরে ফিরে রাজকুমারী তার বাবা—মায়ের কাছে সব কথা খুলে বলল। তখন রাজকুমারীর প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে দিকে দিকে লোক পাঠানো হল এবং পরিশেষে মান্ডি পরিবারের সেই কুৎসিত যুবকটির সন্ধান পাওয়া গেল। রাজকন্যার সঙ্গে যুবকটির বিয়ে হল ঠিকই, কিন্তু বনিবনা হল না। কন্যার বাবা—মা মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে রাজি হলেন না।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিস্কুদের সঙ্গে মান্ডিদের বিবাদ শুরু হয়েছিল এবং তা নাকি টিকে ছিল বহুদিন।

কিন্তু জনশ্রুতি অন্য কথা বলে। জনশ্রুতি বলে, ওই বিয়ের পর থেকে মান্ডি যুবকটি কোথায় যেন হারিয়ে যায়। তাকে আর কেউ কোনওদিন দেখেনি।

এই ছিল তোমার বলা গল্পটি। কিন্তু সেগুনী, এই গল্প তুমি আমায় বলেছিলে কেন? কী ছিল তোমার অভিপ্রায়?

আর রক্ত!

আমার রক্ত দেখলে তুমি অপ্রত্যাশিতভাবে উতলা হয়ে উঠতে সেগুনী। বাছুরডোবায় তোমাদের বাড়ির সামনে গিয়ে আমার গাড়িটা থামল। কিন্তু অসাবধানে গাড়ির দরজা খুলতে গিয়ে আমার বাঁ—হাতের বুড়ো আঙুলটা থেঁতলে যায়। রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়তে থাকে। তখন তোমার চোখ বিস্ফারিত। ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তুমি তাকিয়েছিলে চুঁইয়ে পড়া রক্তের দিকে। যন্ত্রণায় তখন আমার ভিতরটা তীব্রভাবে মোচড়াচ্ছে। আমার কষে ঝুলে পড়া জিভ মুখগহ্বরে ঢুকে স্থিত হচ্ছিল না। শরীরের কাঠামোয় বল ফিরে আসছিল না। অথচ তখনও তুমি যেন সম্ভোগ—পাগল ক্ষুধার্ত! আমার কষ্টের কথা বুঝতে চাইছিলে না।

তখন বুঝিনি। আজ বুঝি—তুমি কেন আমার রক্ত দেখে শীৎকৃত হয়ে উঠতে...

উঁচু ডাঙ্গাল জমিতে তোমাদের ঘর। তারপর থাকে—থাকে নীচে নেমে গেছে উদ্ভিদ—সবুজ জমি। সেখানে ফুলের চাষ হয়। তোমাদের শস্যাগার আছে। তার পাশে প্রশস্ত ভূমি। সেখানে গাড়িটাকে নিয়ে গিয়ে পার্ক করলাম।

শস্যাগার থেকে আদিম বুনো গন্ধ ভেসে আসছিল। আমার গা গুলিয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করলাম, 'ওখানে কী আছে?'

'কুকুর', তুমি বলেছিলে।

'ওদেরকে ওখানে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে কেন?'

'কেননা ওরা হিংস্র', তুমি নিভৃত কণ্ঠে বললে।

তারপর তোমার বৃদ্ধ বাবার সঙ্গে পরিচয় হল। তিনি যুধিষ্ঠির কিস্কু।

আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম তাঁর ডান হাতটা কাঠের। সেখানে অনেক ছিদ্র।

জিজ্ঞেস করলাম, 'হাতটা কাঠের কেন?'

'এক দুর্ঘটনায় হাতটা কাটা যায়।'

'আর ছিদ্রগুলো কীসের জন্য?'

একটু পরে মনে হল, আমার এমনধারা প্রশ্ন শুনে যুধিষ্ঠির কিস্কু যেন অবাক হলেন। ঘুরে দাঁড়ালেন তোমার দিকে। তারপর অভিশপ্ত স্বরে বললেন, 'তুমি আমাদের পারিবারিক ইতিহাস এই ছোকরাকে বলোনি?'

'না, বলা হয়ে ওঠেনি।' তুমি বলেছিলে।

'বাহ! চমৎকার! ও—সব কথা না বলেই বন্ধুত্ব করা হয়ে গেছে?'

সেদিন সন্ধেবেলা বাড়ির ছাদে বসে গল্প হচ্ছিল। যুধিষ্ঠির কিস্কুও ছিলেন সেখানে। তখনই কথায় কথায় জানতে পারলাম পুরো ঘটনাটা—

তোমার একটা ছোট বোন ছিল। নাম—বেদিনি। পুকুরের জলে সাঁতার কাটতে গিয়ে একদিন ডুবে মরে সে। তারপর কিছুদিন বাদে বেদিনি এসে হাজির হয় তোমার বাবার কাছে। বলে, 'আমি একা একা আর ঘুরে বেড়াতে পারছি না। আমার আশ্রয় চাই।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করলেন, 'কীভাবে আশ্রয় দেব?'

'তোমার কাঠের হাতে আশ্রয় দেবে। ওখানে অনেকগুলো ছিদ্র তৈরি করো, যাতে আমি ঢুকতে—বেরোতে পারি। এইভাবে আমি তোমার শরীরে আশ্রয় নেব।'

অনেক রাত অবধি ছাদে বসেই গল্প হল। যুধিষ্ঠির কিস্কু চলে গেছেন অনেকক্ষাণ। আকাশে তখন শুভ্র পূর্ণশশী। তুমি কাঁদছিলে সেগুনী। রাত ক্রমশ গভীর হয়। তুমি আমার কানের কাছে মুখ এনে অর্ধস্ফুটে আবার জিজ্ঞেস করলে—

'তাহলে তাড়াতাড়ি বলো, আমি, না আমার ভালবাসা?'

'মানে?' আমি আবার শুধোলাম। 'মানে, আমি, না আমার প্রেম, কাকে ছাড়া তুমি বাঁচবে না?' 'কেন দুটোই একসঙ্গে পাওয়া যায় না?' যথারীতি তুমি আমার এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দাওনি।

অথচ তুমি ক্রমাগত প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ছিলে। বলছিলে, 'এ আমি কী ভুল করলাম সবিতাব্রত! ভুল! ভুল! সবই ভুল!'

'কেন? কেন এ—কথা বলছ?' আমি কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাস করলাম।

'তোমার সঙ্গে আমার কোনও সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে না, মানে বিয়ে হবে না!'

'কেন?'

'আমার বাবার বয়স হয়েছে। বৃদ্ধ হয়েছেন তিনি। আমার বোন, বেদিনি, তাকে আর ক্যারি করতে পারছেন না। এখন আমাকে সেই দায়িত্ব নিতে বলছেন। তাই আমাকে এখন এগিয়ে আসতে হবে... আমার বোনের দায়িত্ব নিতে হবে...'

'সেটা কীভাবে সম্ভব?'

'একটা অ্যাক্সিডেন্ট হবে। আমার একটা হাত বা পা কাটা যাবে। তারপর সেই প্রত্যঙ্গের কাঠের অবিকল নকল তৈরি হবে। যেমন আমার বাবার কাঠের ডান হাত। সেখানে অনেকগুলো ছিদ্র থাকবে। আর তখনই আমার বোন বেদিনি এসে আশ্রয় নেবে সেখানে। বুঝলে?'

'বুঝলাম।'

'না বোঝোনি।'

'কেন?'

'আমি তোমার স্ত্রী হতে পারলাম না। কিন্তু ভেবো না অন্য কোনও নারীকে তোমার স্ত্রী হতে দেব...'

'সেটা কীভাবে সম্ভব?'

'দেখতে পাবে, সবিতাব্রত...দেখতে পাবে...'

ঘটনার অপ্রত্যাশিত অবাক করা পীড়নে আমার চোখে জল এসে পড়তে চাইছিল...।

পরের দিন ঝাড়গ্রামে ফিরে এলাম।

তারপর অনেকদিন...অনেক মাস কেটে গেল...

নভেম্বর মাসের তেরো তারিখে তোমার জন্মদিন। তোমার জন্য বার্থ—ডে কেক কিনে আনলাম সেলিব্রেট করব বলে। সঙ্গে তিরিশখানা মোমবাতি।

কিন্তু কেক কাটার ছুরিটাকে সামলাতে পারলাম না।

মনের উচ্ছলিত তরঙ্গের কারণে শরীরটা কুঁকড়ে গেল। আরে অপরিমেয় সংকোচে ভার হয়ে ছুরিটা ছোবল মারল আমার ঠোঁটে। ঠোঁট কাটল। রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছিল সেখান থেকে।

তুমি তখন আমার কোয়ার্টারের কিচেন আর ডাইনিং রুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। দেখে এনজয় করছিলে আমার রক্তাক্ত ঠোঁট।

তারপর মিলন হল আমাদের।

তীব্র মিলন...

আমার রক্তাক্ত ঠোঁটে তোমার ঠোঁট প্রতিষ্ঠিত হল। আর তারপর...

ব্ল্যাক উইডোর মতো...শেষ যৌন সংসর্গের পর...আমার শরীরের সমস্ত রক্ত চুষে তুমি খুন করেছিলে আমাকে...

আচ্ছা, মাভিদের সেই কুৎসিত ছেলেটিও কি খুন হয়েছিল এই ভাবে?

—